# সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদনা ঃ মালিনী ভট্টাচার্য

পরিবেশক
এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

সহযোগী সম্পাদক ঃ
চঞ্চল ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
সাধনা রায়চৌধুরী
ইউনিটি থিয়েটার
৩৩/১, গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা - ৭০০ ০২৯

মুদ্রক ঃ
অলক ভদ্র
দীপালী প্রেস
১২৩/১, এ.পি.সি. রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

## সূচীপত্র


।। সুধী প্রধান স্মরণে।।

| | | |
|---|---|---|
| সুধী প্রধান : জীবনকথা | মানস মজুমদার | ১৭ |
| এক অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান | নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩৪ |
| সুধী প্রধান স্মরণে কয়েকটি কথা | হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ৭১ |
| সুধী প্রধান ও কৃষক আন্দোলন | হেমন্ত ঘোষাল | ৭৩ |
| সুধীদা'র সঙ্গে একত্রে বাস | গোলাম কুদ্দুস | ৭৬ |
| গণনাট্য আন্দোলনের স্মৃতি ও সুধী প্রধান | সজল রায়চৌধুরী | ৮৩ |
| গণনাট্য ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং সুধী প্রধান | সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮৬ |
| লোকসংস্কৃতি ও সুধী প্রধান | রামশঙ্কর চৌধুরী | ৯৫ |
| সুধী প্রধান ও লোকসংস্কৃতি | গিরীন্দ্রনাথ দাস | ১০১ |
| সুধী প্রধান ও লোকসংস্কৃতির কাজ | সুখবিলাস বর্মা | ১০৯ |
| পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের রূপকার সুধী প্রধান | মালিনী ভট্টাচার্য | ১১৭ |

।। লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান।।

| | | |
|---|---|---|
| লোকশিল্পের পুনরুদ্ধারে সুভাষচন্দ্র বসু | নেপাল মজুমদার | ১২৭ |
| লোকসংস্কৃতি চর্চায় ও বিকাশে গ্রাম ও শহর | তারাপদ সাঁতরা | ১৩২ |
| সাঁওতালি লোকনাট্য প্রসঙ্গে দু-চার কথা | ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে | ১৪৪ |
| রায়বেঁশে : বাংলার সুপ্রাচীন রণনৃত্য | অরুণ চৌধুরী | ১৪৮ |
| লোকনাট্য বোলান | মোহিত রায় | ১৬৭ |
| লোকনাট্য : লেটোগান | মুহম্মদ আয়ুব হোসেন | ১৮৪ |
| 'আলকাপে'র কথা | নির্মলেন্দু ভৌমিক | ১৯২ |
| বাংলার পুতুল নাচ | সুশান্ত হালদার | ২১৭ |
| উত্তরবাংলার লোকনাট্য | পুষ্পজিৎ রায় | ২২৬ |
| কণ্ঠ হতে গান কে নিল | শক্তিনাথ ঝা | ২৪৭ |
| উত্তরবঙ্গের জনজাতি : আর্থ-সামাজিক রূপান্তর | বিমলেন্দু মজুমদার | ২৭৪ |

।। সুধী প্রধানের কিছু অগ্রন্থিত লেখা।।


| | | |
|---|---|---|
| এই কলকাতা! ইহাকে বাঁচাও | | ২৯৩ |
| ফুলবাড়ী কৃষক সম্মেলনে | | ৩০৪ |
| বাংলার পল্লীকবি রমেশ শীল | | ৩১০ |
| ছায়াচিত্র যারা তৈরি করে | | ৩১৪ |
| সিনেমা শিল্পের সঙ্কট | | ৩১৮ |
| সংস্কৃতি ও সরকার | | ৩২৫ |
| বামফ্রন্ট সরকার ও লোকসংস্কৃতি চর্চার নূতন গতিমুখ | | ৩২৮ |
| রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সমীক্ষা উপসমিতির একটি অপ্রকাশিত প্রতিবেদন : ১৯৮১ | | ৩৩৩ |
| লোকসংস্কৃতি চর্চায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা | | ৩৩৯ |
| গম্ভীরা গানের পরিচয় গ্রহণ প্রসঙ্গে | | ৩৪৬ |
| লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি | | ৩৪৯ |


।। পরিশিষ্ট।।


| | | |
|---|---|---|
| দেশপ্রেমিক লোকসংস্কৃতির পতাকা জনসাধারণের হাতে | বিনয় রায় | ৩৫৯ |
| মন্ডল আবার সংসার পাতিবে | সরোজ মুখোপাধ্যায় | ৩৬৪ |
| বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নূতন ভবিষ্যতের সূচনা | | ৩৬৮ |
| সুধী প্রধানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের অংশ : ১৯৮৮ | | ৩৭১ |
| গুমানি দেওয়ানের একটি চিঠি | | ৩৭৩ |
| লোকসংস্কৃতি পরিষদ ১৯৭৯-৮০ | | ৩৭৫ |
| সুধী প্রধানের গ্রন্থ তালিকা | | ৩৭৭ |

# সুধী প্রধান স্মরণে

মুর্শিদাবাদের আলকাপ শিল্পী করুণাকান্ত হাজরা রচিত সুধী প্রধান স্মরণে একটি গান

সুধী প্রধান গেছে মরে।
সে কি আসে আর ফিরে বল
চলে গেছে পারের ডাকে।
শেল হানিয়া শিল্পীর বুকে।
যতই ডাকব আয় ফিরে আয়।
সে কি আসে আর ফিরে।
গুমানি দেওয়ান ঝাঁকসু কাকা।

ওদের সঙ্গে কর দেখা।
বুকের রক্ত মুখে তুলে।
গান ধরেছে আসোরে।।
কেঁদনা গো বঙ্গ মাতা।
ব্যথার বেথি গেল কোথা।
ফিরে এস সুধী প্রধান।
শিল্পীর ভাঙা ঘরে।।

লোকবার্তা : দ্বিতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

# সুধী প্রধান ঃ জীবনকথা

## মানস মজুমদার

বাংলা ১৩১৮ সালের (১৯১১ খ্রিঃ) ফাল্গুন মাসের কোনও এক শনিবার অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার (অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগণা) বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার সগুনা গ্রামে সুধীরঞ্জন প্রধানের জন্ম। বাবা প্রকাশচন্দ্র, মা রতনমণি। প্রকাশচন্দ্র-রতনমণির তিন ছেলে ঃ মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন ও সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জন সবার ছোট। উত্তরকালে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে তিনি সুধী প্রধান নামেই পরিচিত হন।

কনৌজি ব্রাহ্মণের পরিবার। পূর্বপুরুষ আকবর বাদশার আমলে কনৌজ থেকে এসে বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। শোনা যায়, আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে প্রধান, পান্ডে, মিশ্র, তেওয়ারি প্রভৃতি কয়েকটি গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসেন। কালক্রমে প্রধান গোষ্ঠীর একটি শাখা ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে সগুনা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এঁরা এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। জমিদার কিন্তু ছোটো মাপের। বাংলার মাটি জল ও সংস্কৃতির প্রভাবে এঁরা একসময় অবশ্য বাঙালি হয়ে ওঠেন।

সুধী প্রধান জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের অহমিকা তাঁর ছিল না। শৈশব থেকেই সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে তিনি স্বচ্ছন্দে মিশতেন। জাত-পাতের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী বাল্যে তাঁর উপনয়ন হয়। কিন্তু কৈশোরে স্বেচ্ছায় উপবীত ত্যাগ করেন। তখন তিনি বনগাঁ উচ্চ ইংরেজি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের কাছেই ইছামতী নদী। একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে অব্রাহ্মণ কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুকে একটি ঠোঙা থেকে কোনও খাবার

খেতে দেখলেন। সুধী প্রধান সেই ঠোঙা থেকে খানিকটা খাবার তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলে অব্রাহ্মণ বন্ধুরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর ব্রাহ্মণত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সুধী প্রধান কালবিলম্ব না করে তাঁর উপবীতটি ইছামতীর জলে নিক্ষেপ করলেন। জীবনে আর কোনও দিন উপবীত ধারণ করেন নি তিনি। ঘটনাটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তাঁর মন সংস্কারের দাস ছিল না। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন কাজে-কর্মে তিনি তার অজস্র প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।

ছোটোবেলা থেকেই তিনি স্বাবলম্বী। মাত্র তিন বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন। মা রতনমণি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বিশাল যৌথ পরিবারে তিনি ছিলেন উপেক্ষিতা লাঞ্ছিতা। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠারা তাঁর ওপর পীড়ন করতেন। রতনমণি অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তেঁতুলিয়ার গোপালচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে তিনি। তেঁতুলিয়া গ্রামটি সগুনার চোদ্দ-পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে ইছামতীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সে যাই হোক, শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ তাঁর অনুকূল ছিল না। স্বভাবেও একটু জেদি ছিলেন তিনি। আত্মহত্যা করে আত্মসম্মান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সুধী প্রধান মাকে পাননি, কিন্তু মায়ের জেদটুকু পেয়েছিলেন। জীবনে কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন নি। অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছেন। সে অত্যাচার-উৎপীড়ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় যে কোনও ধরনেরই হোক না কেন। মায়ের আত্মহত্যাজনিত অকালমৃত্যু নারী-জাতির প্রতি তাঁকে সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। এই সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা আমৃত্যু তিনি লালন করেছেন।

অল্প বয়সে মাকে হারালেন। উপেক্ষা আর অনাদরের মধ্যে বড়ো হতে লাগলেন। লড়াই করতে শিখলেন। শক্ত এবং সাহসী হলেন। খানিকটা বেপরোয়াও। বুঝলেন, অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। বাড়িতে শাসনের বালাই নেই। গ্রামের এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরে বেড়ান। নিম্নবর্গের মানুষজনের সঙ্গেও অবাধে মেলামেশা করেন। তাদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মনের মধ্যে তাই নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগে। সমাজের নিচুতলার মানুষজনকে ভালোবাসতে শেখেন। উত্তরকালে তিনি যে কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন তার ভিত তৈরি হয়েছিল ছোটোবেলাতেই। গ্রামের সাধারণ মানুষ, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠ নিতে শুরু করেন অল্প বয়স থেকেই। তাঁর প্রথম শিক্ষা জীবনের পাঠশালাতেই। এ শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। পরবর্তীকালে তিনি কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ উন্নয়ন ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছেন।

বাবা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিছুকাল কলকাতার রানী ভবানী স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক হেতু কর্মচ্যুত হন। সাহিত্যেও তার অনুরাগ ছিল। কবিতা লিখতেন। অবশ্য ছাপার অক্ষরে সেসব প্রকাশ পায় নি। স্ত্রীর মৃত্যুর আট বছর পরে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবাকেও তাই বেশিদিন পান নি সুধী প্রধান। কিন্তু বাবার কিছু প্রভাব তাঁর ওপরে পড়েছে। স্কুলের উঁচু ক্লাসে যখন পড়ছেন, তখনই তিনি 'যুগান্তর' দলের সংস্পর্শে আসেন। সদস্য হন। যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন বন্ধু অমিয় বসু। অমিয় বসু পরবর্তীকালে কৃতি চিকিৎসক হয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছিল এ দলের উদ্দেশ্য। সুধী প্রধান এ দলের কর্মপন্থার সঙ্গে পরিচিত হন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। দ্বিতীয়ত, পিতার সাহিত্যানুরাগ তাঁর মধ্যে অল্প বয়সেই সঞ্চারিত হয়। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁর আগ্রহ উৎসাহ দেখা যায়।

বিদ্যাশিক্ষার পর্বটিতে তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু হতোদ্যম হন নি। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে জয় করে পথ চলার আনন্দ এবং শিক্ষাই তিনি বরং লাভ করেছেন। দক্ষিণ চাতরার মধ্য ইংরেজি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনোর সময়টিতে তিনি ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সূর্যকান্ত মিশ্রের বাড়িতে থাকতেন। সূর্যকান্ত তার আত্মীয় ছিলেন। এর পর সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন বনগাঁ উচ্চ ইংরেজি স্কুলে। হস্টেলে থাকেন। ছাত্র হিসেবে মেধাবী। স্বভাবতই শিক্ষকদের নজরে পড়লেন। বিশেষ করে সহকারী শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠলেন। তাঁর জীবন-বিকাশে যতীন্দ্রনাথের দান কম নয়। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে 'নতুন মাস্টার' নামে পরিচিত ছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্র সমাজে সুধী প্রধান প্রতিষ্ঠা পান। নতুন মাস্টারমশায়ের উৎসাহে স্কুলের ছাত্রসমিতি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। মূলত ছাত্রদের সেবা ও উন্নতিসাধনই ছিল ছাত্র সমিতির লক্ষ্য। এজন্যে একটি অর্থভাণ্ডারও গড়ে তোলা হয়। অর্থভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে কিশোর সুধী প্রধান একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। ছুটির দিনে বন্ধুদের নিয়ে চলে যেতেন কারও পুকুরের কচুরিপানা কিংবা বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে। কাজ শেষ হয়ে গেলে পুকুর অথবা বাগানের মালিক খুশি মনে টাকা-পয়সা যা দিতেন তা ছাত্রসমিতির অর্থভাণ্ডারে জমা পড়ত। ঐ অর্থ থেকে দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য করা হত ; খেলাধুলোর সরঞ্জাম কেনা হত, অন্য স্কুলের সঙ্গে ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় যাতায়াত আর টিফিন খরচ চালানো হত। হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল সুধী প্রধানের। স্কুলের পাঠাগার থেকে ছাত্রেরা

বই নিত, ছাত্র প্রতিনিধি রূপে সে কাজের তদারকিতেও তিনি থাকতেন। বই যাতে ঠিক সময়ে ফেরত আসে, সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। তার চেয়েও বড়ো কথা, স্কুলের পাঠাগারটির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। বাইরের বই প্রচুর পড়তেন। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের বই। আর মনীষীদের জীবনী।

পাঠক হিসেবে তিনি ছিলেন যুগপৎ ভাবুক ও চিন্তাশীল। তাঁর সাহিত্যবোধ ছিল প্রখর। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সাহিত্যকে তিনি যাচাই বিচার করতে শিখেছিলেন। উত্তরকালে লেখা তাঁর সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে তার পরিচয় পাই। বনগাঁ স্কুলে পাঠকালেই গল্প কবিতা-প্রবন্ধ লেখার শুরু। পরবর্তী জীবনে তাঁর লেখা দুটি গল্প প্রকাশিত হয়। একটি 'সপ্তাশ্ব' পত্রিকায়, অন্যটি 'প্রভাতী' পত্রিকায়। 'প্রভাতী' পাটনা থেকে প্রকাশিত হত। তাঁর দুটি কবিতা অনুপম গুপ্ত ছদ্মনামে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে কোনও কারণেই হোক, গল্প কবিতা রচনার ধারাটি তিনি পরবর্তীকালে বজায় রাখেন নি। কিন্তু প্রায় আমৃত্যু প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। বনগাঁ স্কুলের যখন ছাত্র তখন একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে মহকুমা শাসকের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত রক্ষা পান। প্রধান শিক্ষক তাঁর এই ছাত্রটিকে স্নেহ করতেন।

তাঁর ইতিহাস-পাঠও ব্যর্থ হয় নি। বৈদিক কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের ধারাটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁকে করে তুলেছিল ইতিহাস-সচেতন। এই সচেতনতা পরবর্তী জীবনে দর্শনে পরিণত হয়। তাঁর রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, তিনি সব কিছুকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতেন। তাঁর বিচার তাই অনেকাংশেই হত নির্ভুল। তাঁর রচনাবলীতেও গভীর ইতিহাস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা কিংবা 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি' (১৯৯৭) অথবা তিন খণ্ডের 'Marxist Cultural Movement in India' (1981, 1982, 1985) প্রভৃতি বই তার নিদর্শন।

বিজ্ঞান তাঁকে যুক্তিমনস্ক ও সংস্কারমুক্ত করে তুলেছিল। তাঁর জীবনাচরণে বিজ্ঞান নিয়েছিল নিয়ন্ত্রী ভূমিকা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবরাখবর তিনি রাখতেন।

বাবা-মায়ের সাহচর্য বিশেষ পান নি। জীবনের মূল্যবোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন মনীষীদের জীবন থেকে। তাঁর জীবনে দু'জনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। একজন রামমোহন, অপরজন লেনিন। রামমোহনের মানবতাবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। লেনিনের সাংগঠনিক প্রতিভা এবং জীবনদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে অবশ্য ছাত্রজীবনে পরিচয় ঘটেনি, পরিচয় ঘটে রাজনৈতিক জীবনে।

সুধী প্রধানের জীবন-গঠনে বনগাঁ স্কুলের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এখানেই তাঁর সংগঠন শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যবোধ ও রচনাশক্তির স্ফুরণও এখানেই ঘটে। নাটকাভিনয়ে হাতে-খড়িও এই স্কুলেই। জীবনের প্রথম অভিনয় রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে। পঞ্চকের ভূমিকায়। গ্রীষ্মাবকাশের প্রাক্কালে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব উপলক্ষে এ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনয় দেখার সুযোগ তিনি পান ছোটোবেলাতেই। কলকাতার 'মনোমোহন থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাঁড়ে সম্পর্কে ছিলেন তাঁর দাদামশায়। বাবার মামা। কলকাতায় যখন যেতেন উঠতেন মনোমোহনের বাড়িতে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থিয়েটারে রিহার্সাল দেওয়ার সময় বালকসুলভ কৌতূহলে সুধী প্রধান মাঝে মধ্যে সেখানে উপস্থিত হতেন। 'মনোমোহন থিয়েটারে' অভিনয়ও দেখতেন। নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ এভাবে ছোটোবেলা থেকেই গড়ে ওঠে। এ আগ্রহ পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। বিভিন্ন নাটক সম্পাদনা করেছেন, নাটক-অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন, নাটকে অভিনয় করেছেন।

তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয়ও এ সময় পাওয়া যায়। স্কুল হস্টেলে উচ্চবর্ণের এবং নিম্নবর্ণের ছেলেরা আলাদা পংক্তিতে খেতে বসত। অনেক দিন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছিল। তিনি এর বিরোধিতা করেন। একই হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে এভাবে বিভেদ সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন তিনি। জাতপাতের এই সংকীর্ণতা মেনে নিতে পারেন নি। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তাই খাওয়া বয়কট শুরু করলেন। দিন কয়েক এভাবে চলল। কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত পুরনো ব্যবস্থা তুলে দিলেন। দুটি বর্ণের ছাত্রদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের দেওয়াল ঘুচে গেল।

হস্টেলে কিন্তু বেশিদিন থাকা হয়নি। কারণ অর্থাভাব। বাবা তো আগেই মারা গিয়েছিলেন। অভিভাবকেরা খরচ জোগাতে সম্মত হলেন না। পড়াশুনো কিন্তু বন্ধ হল না। বনগাঁর ড. বসুর বাড়িতে আশ্রয় পেলেন। তিনি ছিলেন মিলিটারি সার্জেন। তাঁর স্ত্রী চামেলি দেবী সুধী প্রধানকে খুব স্নেহ করতেন। সুধী প্রধান তাঁকে বৌদি বলতেন।

ড. বসুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তারপর গৃহশিক্ষকতা-সূত্রে ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের (পটলবাবু) বাড়িতে আশ্রয় নেন। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে ননীগোপালবাবুর ছেলেকে পড়াতে থাকেন। হঠাৎ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। যশোর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বনগাঁয় এলেন। তিনি উঠলেন ননীগোপালবাবুর বাড়িতে। সুধী প্রধান আর তাঁর বন্ধু অজিত গাঙ্গুলির ওপর সুভাষচন্দ্রের পরিচর্যার ভার পড়ল। সুধী প্রধানের সেবায় সৌজন্যে আন্তরিকতায় এবং ব্যবহারে সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুধী প্রধান

তাঁর প্রিয় হয়ে উঠলেন। এই পরিচয়ের সূত্রেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর এডি কং মনোনীত হন তিনি। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। এর নিদর্শন 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি' (১৯৯৭) বইটি। ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা প্রভূত পরিশ্রম এবং উচ্চমানের গবেষণার ফসল এ বই।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বনগাঁ স্কুল থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আই.এস.সি ক্লাসে ভর্তি হন। থাকেন গোয়াবাগানে দাদামশায় মনোমোহন পাঁড়ের বাড়িতে। কিন্তু পড়াশুনোর চেয়ে রাজনীতির চর্চাই বেশি করেন। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে আগেই তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। এখন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বিপ্লবীরা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। সুধী প্রধানও ধরা পড়েন (১৯৩০ খ্রিঃ)। জেলে যেতে হয়। প্রেসিডেন্সি জেল, সেন্ট্রাল জেল এবং হিজলি জেলে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। জেলখানায় কমিউনিস্ট পার্টির কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে আলাপ হয়। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেবতী বর্মন ও দেবকুমার দাস। জেলে যাওয়ার আগে কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি এবং ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। জেলখানায় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন রাজনৈতিক বন্দীদের সান্নিধ্যে তাঁর চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকেন।

এদিকে আদালতে বিচার চলছিল। বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রমাণ করতে পারল না। ফলে জেলখানা থেকে তিনি ছাড়া পেলেন। তবে সম্পূর্ণ মুক্তি পেলেন না। তাঁকে নদিয়া জেলার চাপরাতে অন্তরীণ করে রাখা হল। কার্যত নজরবন্দি তিনি। চাপরা "থানার পাশে খ্রিস্টান মিশনারি সাহেবদের একটি ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠান ছিল। সুধী প্রধান তাঁদের সঙ্গে খেলাধূলায় এবং গল্পগুজবে খুব মেলামেশা করতেন। তাঁর রাজপুত্রের মতো লম্বা ফরসা চেহারা এবং অমায়িক আন্তরিক ব্যবহারে সাহেবরা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁরা সুধী প্রধানকে অকারণ আটকে রাখার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন যে — Patriotism is not a crime and it is every one's human right. পত্রের উত্তরে সরকার লিখেছিলেন যে সুধী প্রধানের কোনও আত্মীয় যদি নিজের বাড়িতে নিজের দায়িত্বে রাখতে পারেন তা হলে সেখানে নজরবন্দি হয়ে থাকতে পারেন। সংবাদ পেয়ে তাঁর মামা তেঁতুলিয়ার সন্তোষ চৌধুরী ভাগ্নেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। নজরবন্দীর

শর্ত ছিল যে সুধী প্রধান তেঁতুলিয়া বাংলানী ও স্বরূপনগর গ্রামের মধ্যে চলাফেরা করতে পারবেন এবং সপ্তাহে একদিন থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।

১৯৩১ সালের শেষের দিকে সুধী প্রধান তেঁতুলিয়ায় নজরবন্দি হয়ে আসেন। কোনও দিন তিনি খালের ধারে বাচ্চাদের পাশে বসে তাদের ছিপ নিয়ে ছোটছোট মাছ ধরতেন, কোনও দিন খালি গায়ে খালি পায়ে কেবলমাত্র একখানি ধুতিকাপড় কোমরে গুটিয়ে নিয়ে বন্দুক হাতে বিছুটি বনের মধ্যে ডাকপাখি মারতে দৌড়াতেন, আবার কোনও দিন স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। . . . তেঁতুলিয়া, বাংলানী ও স্বরূপনগর তিনটি গ্রামে তিনি তিনটি ফুটবল খেলার দল গঠন করেন এবং ঐ দলগুলির ছেলেদের খেলা শেখাতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা করাতেন। এক থলে মুড়ি ও নারকেলের টুকরো নিয়ে মাঠে যেতেন এবং মাঠে খবরের কাগজ বিছিয়ে মুড়ি ও নারকেল ঢেলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বসে খেতেন। তিনি বেহালা ও আড়বাঁশি বাজাতেন এবং সুমিষ্ট গলায় স্বদেশি গান গাইতেন। গ্রামের উৎসাহী যুবকদের নিয়ে তিনি দেশাত্মবোধক বই নিয়ে থিয়েটারের দল গঠন করে মাঝে মাঝে গ্রামের লোকদের থিয়েটার দেখাতেন। এইভাবে তিনি সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে বেশ প্রিয় হয়েছিলেন এবং যুবকদের কাছে প্রিয় সুধীদা হয়ে পড়েছিলেন। সুধীদা ঐ সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে একটি কৃষক সমিতি স্থাপন করেন এবং তার মাধ্যমে কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করতেন। ১৯৩৩ সালে অতিবৃষ্টির ফলে বিল-বল্লী ভেসে গিয়ে সমস্ত ধান গাছ নষ্ট হয়ে যায়। বিলের চারপাশের কৃষকদের মধ্যে হাহাকার পড়ে। তাদের জমির খাজনা মকুব করার জন্য সুধীদা চব্বিশ পরগণা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর ডি. জেড. হজ সাহেবের কাছে অনুরোধ করে চিঠি দিলে ম্যাজিস্ট্রেট এসে সরেজমিনে বিল পরিদর্শন করে খাজনা মকুব করে দেন।" (হাজারীচরণ দাস, সুধী প্রধানের মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি, *সংস্কৃতিপত্র,* নভেম্বর-জানুয়ারি ১৯৯৮-৯৯ পৃ. ১৩-১৫)। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নজরবন্দির পর্বটিতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক ভাবে পড়াশুনো করেন। সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মার্কসবাদ সম্পর্কিত নানা বই পড়েছিলেন।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বর মাস। নজরবন্দির মেয়াদ শেষ হতে তখনও মাসখানেক দেরি আছে। বিশেষ একটা জরুরি কাজে গোপনে তিনি কলকাতায় গেলেন। আইনত এভাবে বাইরে যাওয়া নিষেধ। থানার দারোগার কাছে এ সংবাদ গোপন রইল না। দারোগা সুধী প্রধানের মামা সন্তোষ চৌধুরীর বাড়ি পাহারা দিতে লাগল। সুধী প্রধান তখন তেঁতুলিয়ায় মামার বাড়িতে থাকতেন। তিনি কলকাতা থেকে ফিরে আসতেই দারোগা

তাঁকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট কোর্টে চালান করে দিল। সরকারি আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে এস.ডি.ও তাঁকে এক মাস জেল হাজতে আটকে রাখল। মেয়াদ শেষ হতেই জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সগুনায় নিজের বাড়িতে ফিরলেন। তখন আর তিনি নজরবন্দি নন।

এভাবে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কিছু একটা করতে হয়। ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন ডাক্তারি পড়বেন। গ্রামে ডাক্তারের অভাব। বিনা চিকিৎসায় কত লোক যে মারা যাচ্ছে। তখন ম্যাট্রিক পাশ করে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (একালের নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তারি পড়া যেত। তিনিও এ উদ্দেশ্যে সেখানে ভর্তি হলেন (১৯৩৭)। স্কুলের কাছাকাছি সুরি লেনের একটা মেসবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হল।

এদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে লাগল। ১৯৩৮-এর প্রথম দিকে পরিচয় হল পার্টি সংগঠক মুজফফর আহমেদের সঙ্গে। পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হল। সুধী প্রধান পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন এবং পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৩৯-এ ডাক্তারি পড়ায় ইস্তফা দিলেন। ১৯৩৯-এর প্রথম দিকেই পার্টির নির্দেশে কৃষক সংগঠনের কাজে তিনি বিহারে গেলেন। নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেশ কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

পার্টির কাগজে সাংবাদিকতা শুরু হল। 'আগে চলো' পত্রিকার ম্যানেজার করা হল তাঁকে। মাসিক বেতন দশ টাকা। ১৯৩৯-এই বর্মন পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম বই 'কমিউনিস্ট লিগের প্রতি'। মার্কসের রচনার অনুবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্রেফতার করা হল কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মীকে। তাঁদের আইনি সাহায্য দিতে হবে। সুধী প্রধানের ওপর দায়িত্ব বর্তাল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের। উকিল মন্মথ সরকারের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর পরামর্শমতো ব্যবস্থা নিলেন। বন্দি পার্টি কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহস জোগালেন। কমিউনিস্ট পার্টি সুধী প্রধানের মধ্যে দেখতে পেল দায়িত্বশীল এক কমরেডকে।

পার্টিতে তাঁর কাজ ক্রমশ বাড়ছিল। ট্রাম-ইউনিয়ন কর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতে হবে। কে নেবেন? সুধী প্রধান। বিকেলটা এজন্যে তিনি ব্যয় করতেন। শনিবার রবিবার চব্বিশ পরগণার কৃষক কমরেডদের ক্লাসও নিতে হত তাঁকে। এই সুযোগে কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত হতেন, তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতেন। এ ছিল উপরি পাওনা। তাঁর ক্লাসগুলি কৃষকদের চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। পার্টির আর্থিক অবস্থা

তখন ভালো ছিল না। এজন্যে কোনও অর্থ সাহায্যও পার্টি করতে পারত না। আদর্শই ছিল চালিকা শক্তি। সুধী প্রধান হাসিমুখেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেন। তিনি জানতেন, কমিউনিস্টের জীবন ত্যাগের আর কষ্টের। সংগ্রামের আর সহিষ্ণুতার। আর প্রতীক্ষার। দিন বদলের, সমাজ বদলের।

পার্টি অফিস তখন ছিল ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীটে (একালের বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট)। শনিবার রবিবার বাদে অন্য দিনগুলিতে সন্ধে বেলায় যেতেন পার্টি অফিসে। কাজের হিসেব দিতেন। বিভিন্ন ব্যাপারে পার্টির নির্দেশ নিতেন। তিনি ছিলেন পার্টির একনিষ্ঠ সৈনিক। তাঁর আর একটি দায়িত্ব ছিল। তা হল, লেখক শিল্পী এবং পার্টির গোপন সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। পার্টি কর্মীদের কাছে গোপন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজটিও তাঁকে করতে হত। অসুস্থ পার্টি কর্মীদের তদারক করা, তাঁদের চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এসবও তিনি করতেন। পাশাপাশি বামপন্থী পত্রিকাগুলিতে তিনি মার্কস, লেনিন, স্তালিন, রজনীপাম দত্ত প্রমুখের বিভিন্ন রচনার অনুবাদ করছিলেন এবং সাহিত্য ও সমাজবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছিলেন। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হল তাঁর তিনটি বই : 'কৃষি ভারতের নগ্ন রূপ', 'ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ' এবং 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি'। দ্বিতীয় বইটি রাহুল সাংকৃত্যায়নের এবং তৃতীয় বইটি লেনিনের রচনার অনুবাদ। প্রথম বইটি রজনীপাম দত্তের 'India Today'-র ভিত্তিতে লেখা।

মার্ক্সীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত হন। প্রগতি লেখক সঙঘ এবং ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙেঘর কাজকর্মে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ এর ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ থেকে লেখকেরা উপস্থিত হন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমাজমুখী এবং প্রগতিশীল। যুগোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনাকে রূপদানই ছিল এঁদের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙঘ গঠনে এঁরা উদ্যোগী হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের লেখকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাববিনিময়ের একটি যোগসূত্র হয়ে ওঠে এই সঙঘ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে — কলকাতায়, বোম্বাইয়ে, পুনায়, আমেদাবাদে, বেনারসে, পাটনায়, আলিগড়ে এর শাখা স্থাপিত হয়। সুধী প্রধান যখন এ সঙেঘর কলকাতা শাখার সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন এ সঙঘ রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত, সর্বভারতীয় সাহিত্যিক মহলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। কলকাতা শাখাকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে — ঢাকায়, মৈমনসিংহে,

শ্রীহট্টে, চট্টগ্রামে, যশোরে, বরিশালে, কুমিল্লায়, বাঁকুড়ায়, মুর্শিদাবাদে, খুলনায় এ সঙেঘর প্রশাখা স্থাপিত হয়। সুধী প্রধানকে এগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। প্রগতি লেখক সঙেঘর কর্মধারা, এবং প্রগতি সাহিত্যের চর্চা ও আন্দোলন সম্পর্কে এদের তিনি ওয়াকিবহাল রাখতেন। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে প্রগতি লেখক সঙেঘর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রগতি লেখক সঙঘ সম্পর্কিত বহু মূল্যবান দলিল ও তথ্য তিনি তাঁর 'Marxist Cultural Movement in India' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯৭৯) সন্নিবেশ করে গেছেন যেগুলির ঐতিহাসিক মর্যাদা অনস্বীকার্য।

ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙেঘর জন্ম ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ। ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের পটভূমিকায়। স্পেনে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের শিকার হন সে দেশের বিখ্যাত কবি ফ্রেডারিকো গার্সিয়া লোরকা, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও বেহালাবাদক পাব্‌লো কাসালস্‌সহ বহু লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী। অত্যাচারীরা তাঁদের অনেককে নির্মম ভাবে হত্যা করে। স্পেনকে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে যে আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠিত হয় তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখক, শিল্পী, ভাস্কর, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকেরা যোগ দেন। ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয়, চেক, সুইস, হাঙ্গেরিয়ান, বুলগেরিয়ান, ইতালীয়ান, সার্ব, মেক্সিকান, মিশরি, আরবি, তুর্কি অনেকেই এ দলে ছিলেন। বিখ্যাত তরুণ সাহিত্য-সমালোচক র‍্যালফ্‌ ফক্স আর কডওয়েলও এই বাহিনীতে ছিলেন। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে তাঁদের অকালমৃত্যু ঘটে। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা তীব্র নিন্দা করেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের এইচ. জি. ওয়েলস, ই. এম. ফরস্টার, জুলিয়ান হ্যাক্সলি, গিলবার্ট মারে, ভার্জিনিয়া উলফ, জন স্ট্র্যাচি, স্টিফেন স্পেন্ডার, ফ্রান্সের আঁদ্রে মাল্‌রো ও আঁদ্রে মার্তি, আমেরিকার আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে তার ঢেউ এসে পৌঁছুল। লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা উদ্বিগ্ন হলেন। বাংলার লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও সরব হলেন। এদিকে ১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকার রাজপথে তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বলি হলেন। সারা দেশ ক্ষুব্ধ, বিচলিত। ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা একটা নতুন মাত্রা পেল। বাংলার লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হলেন। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙেঘর জন্ম হলো। যামিনী রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আবুসয়ীদ আইয়ুব, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, হিরণ্‌ স্যান্যাল, সজনীকান্ত দাস, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয়

চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই এ সঙ্ঘে যোগ দেন। ১৯৪২-এর ১৯-২০ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তাঁরা। সম্মেলনেই শেষ হল না। প্রতিবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটল নানা রচনায়। গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণশিল্পী ও লোকশিল্পীদের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার করা হল। পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায়, বিদেশি শাসককুলের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পেল নতুন তাৎপর্য। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে সুধী প্রধানের ভূমিকা মূলত সংগঠকের। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে (একালের লেনিন সরণী) ছিল সঙ্ঘের অফিস। এ ছিল তাঁর আর এক কর্মকেন্দ্র। লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন তিনি। সভা সমিতির আয়োজন করতেন। এ কাজের গুরুত্ব কম নয়। তাঁর 'Marxist Cultural Movement in India'-র প্রথম খণ্ডে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের ইতিহাস ও কাজকর্ম সম্পর্কিত তথ্যাদি তিনি উপহার দিয়েছেন, যা গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কয়েকজন লোককবি' (১৯৪৫) বইটি। ভূমিকা লিখে দেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে, ১৯৪৩-এর ২৫শে মে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্প ও মঞ্চ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন এবং তার সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সংস্কৃতির উন্নতিসাধন, আর্থিক ন্যায়বিচারের আদর্শ তুলে ধরা। এজন্যে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য সাধারণ মানুষকে এ আন্দোলনের সামিল করতে সচেষ্ট হন সংগঠকেরা। সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন এন. এম. যোশি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে শাখা কমিটি গঠিত হয়। বাংলার জন্যে গঠিত কমিটিতে ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায়। জুলাইয়ে এ কমিটির কিছু পরিবর্তন ঘটে। তিন জনকে সেক্রেটারি করা হয় : সর্বক্ষণের সংগঠক করা হয় সুধী প্রধানকে, প্রডাকশন সেক্রেটারি করা হয় শম্ভু মিত্রকে, মিউজিক সেক্রেটারি করা হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। কোষাধ্যক্ষ হন চিন্মোহন সেহানবীশ। সভাপতি হন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভার কমরেডদেরও যুক্ত করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে সংস্কৃতি আন্দোলন শুরু করে গণনাট্য সঙ্ঘ তারই একটি ফল। যদিও

গণনাট্য সঙ্ঘের সকলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। সুধী প্রধান গণনাট্য সঙ্ঘে ছিলেন ১৯৫৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রধানত সাংগঠনিক দিকটিই তিনি দেখতেন। নাটকের অভিনয় করতে হলে পরাধীন ভারতে লালবাজারের পুলিশ দপ্তরে পাণ্ডুলিপি দাখিল করে অনুমতি নিতে হত। অনুমতি নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল সুধী প্রধানের। নাটকের মহড়ার ব্যবস্থাও তিনি করতেন। অভিনয়ের জন্যে অধিকাংশ শিল্পী যেমন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটাও তিনি করতেন। দল কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে যেত। তিনি এর তদারক করতেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' 'আগুন' প্রভৃতি নাটকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন। গণনাট্য আন্দোলনের কিছু দুর্লভ দলিল তাঁর 'Marxist Cultural Movement in India'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে (১৯৭৯, ১৯৮২) পাওয়া যাবে। আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলি পাওয়া যাবে 'সংস্কৃতির প্রগতি' (১৯৮২), 'নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব' (১৯৮৯) এবং 'গণ-নব-সৎ নোট্যগোষ্ঠী কথা' (১৯৯২) বইয়েতে। প্রবন্ধগুলি গণনাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করে।

১৯৪৩-এ প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ'। সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি। অবশ্য সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজকর্ম দেখতেন সোমনাথ লাহিড়ি ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সুধী প্রধান। পত্রিকার জন্যে নিউজপ্রিন্ট সংগ্রহ, ছাপাখানার সঙ্গে যোগ রাখা, পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা এসব তিনি দেখতেন। নিজেও পত্রিকার বান্ডিল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করতেন। ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীটের পার্টি অফিস ছিল 'জনযুদ্ধে'র অফিস। এমনও হয়েছে, অফিসের একতলায় নিউজপ্রিন্ট নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নিজেই সেই নিউজপ্রিন্ট দোতলায় তুলেছেন। পার্টির পয়সা কোথায় যে সেগুলো লোক দিয়ে দোতলায় তুলবে? না, এজন্যে তাঁর কোনও লজ্জা-সংকোচ ছিল না। বরং পার্টির কাজ করছেন ভেবে আনন্দ পেতেন। 'জনযুদ্ধে' তিনি প্রবন্ধ ও রিপোর্টাজ লিখেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কলকাতার পথের দৃশ্য নিয়ে তিনি 'এই কলকাতা — ইহাকে বাঁচাও' নামে একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন লিখেছিলেন, যা বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। সঙ্গে ছিল তাঁরই তোলা আলোকচিত্র। 'জনযুদ্ধে' তিনি বিদেশি শিশু-সাহিত্যের অনুবাদও কিছু করেছিলেন। তাঁর 'সোভিয়েটের গল্প সংগ্রহ' (১৯৪৩)-এর গল্পগুলি অবশ্য বড়োদের গল্পের নিদর্শন।

'অরণি' (১৯৪১) ও 'অগ্রণী' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। প্রথমটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্পাদক সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। দ্বিতীয়টি প্রথমে ছিল ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। সরোজ দত্ত, সরোজ

আচার্য প্রমুখ লেখক এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'অরণি'-র কয়েকটি সংখ্যায় সুধী প্রধান ধারাবাহিক ভাবে এডগার স্নো-র রচনার অনুবাদ করেন। বিষয় : চীনে জাপানীদের অত্যাচার। ১৯৪৩-এর শারদীয় 'অরণি'তে তাঁর লেখা 'বাংলা সাহিত্য ও মার্কসবাদ' নামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'প্রগতি সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের একদিক'। ভট্টনায়ক ছদ্মনামে লেখা। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক সংখ্যায়।

দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশিত হয ১৯৪৫-এ। সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন এ পত্রিকার 'কিশোর সভা'-র পরিচালক। তাঁর আগ্রহে এ বিভাগে সুধী প্রধান বিদেশি শিশু সাহিত্যের বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলেন। দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬২)। প্রবন্ধটি লেখার ব্যাপারে ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস এবং ক্ষুব্ধ তারাশঙ্করকে এ প্রবন্ধের উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন।

তাঁর বিয়ের ঘটনাটি চমকপ্রদ এবং নাটকীয। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পার্টি-সদস্যা শান্তি রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ে হয় মুজফফর আহমেদেব পরামর্শে। শান্তি রায় পার্টিব কাজকর্ম করার জন্যে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। শান্তি রায়ের সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবেই মুজফফর সাহেব ঐ পরামর্শ দেন। পার্টির স্বার্থে সুধী প্রধান সম্মত হন। বিনা প্রস্তুতিতেই। শান্তি রায় ছিলেন পবিত্র রায়ের বোন। পবিত্র রায় উত্তরবঙ্গের চা-বাগান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ তাঁকে North Bengal Conspiracy Case-এ গ্রেফতার করে এবং রাজশাহি জেলে বন্দী করে রাখে। শান্তি রায় এমনই পারিবারিক আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছিলেন। বিয়ের পরেও তিনি পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গোয়া-বাগানের পার্টি কমিউনে কিছুদিন কাটান। দীর্ঘদিন আণ্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও পার্টির কাজকর্ম চালান। তিনিই প্রথম মুজফফর সাহেবকে 'কাকাবাবু' রূপে সম্বোধন করেন। পরবর্তীকালে মুজফফর সাহেব ঐ নামে বিখ্যাত হন। তাঁদের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে জয়ন্ত (১৯৪৭), মেয়ে মিতালি (১৯৫২)।

সংসারের প্রয়োজনে সুধী প্রধানকে নানা ধরনের জীবিকার আশ্রয় নিতে হয়। কখনও জুতোর সোল বিক্রি করে বেড়িয়েছেন, কখনও বা কনস্ট্যান্ট ব্যাটারী কোম্পানির ব্যাটারি। শেষ পর্যন্ত বেহালার ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামক ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ নেন। এ কাজে তাঁকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। স্বভাবতই পার্টির কাজে সময় দিতে পারতেন না। মানসিক যন্ত্রণা

হত। ১৯৫২-তে তাই পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু পার্টির প্রতি আনুগত্য বজায় ছিল। বাইরে থেকে পার্টিকে সাহায্য করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আদর্শে, বিশ্বাসে, জীবনাচরণে একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট ছিলেন। ১৯৭৪-এ তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ থেকে অবসর নেন।

পেশাদার শিল্পীদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলায় তাঁর সংগঠন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধারণাটা পেয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে-র কাছ থেকে। আর সংগঠনগতভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন মহম্মদ ইসরাইলের, যিনি চল্লিশের দশকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে, ইসরাইল 'গণনাট্য সঙ্ঘ', 'বহুরূপী' ও 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীতে কাজ করেছেন এবং সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ও রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' ছবিতে অভিনয় করেছেন। সে সময় নাট্যমঞ্চ, গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের প্রায় দিন মজুরে পরিণত করে সাময়িক চুক্তির মেয়াদে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। ফলে শিল্পীদের আর্থিক কোনও নিরাপত্তা ছিলনা, কাজেরও নিশ্চয়তা ছিল না। গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। তিনি তাই শিল্পীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করলেন, আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল। ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে (একালের নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট) এর অফিস হল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, জগন্ময় মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতেই ছিল অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। তিনি এবং তাঁর পুত্র প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কংগ্রেস রাজনীতি করলেও শিল্পীদের এই সংগঠনকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

সুধী প্রধান ১৯৪৫-এর ১০ মার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠক সম্পাদক হন। তাঁর সংগঠন নৈপুণ্যে মঞ্চ, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র ও বেতার শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ হন। সংগঠনের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ৭৪৭ জন শিল্পী আবেদন জানান। আকাশবাণী কলকাতার ১৯ জন যন্ত্রশিল্পী আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলে (১ এপ্রিল ১৯৪৫) অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের পক্ষ নিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের আলাপ-আলোচনার ফলে বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হল। শিল্পীদের পারিশ্রমিক বাড়ল। চাকরিক্ষেত্রে নিরাপত্তা এল। অনুষ্ঠান পরিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হল। তাতে বেতারের বাইরেও তাঁরা অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেলেন। 'স্টার' থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জনৈক শিল্পীর বিরোধে অ্যাসোসিয়েশন শিল্পীর পক্ষ নিয়ে বিরোধের মীমাংসায় সফল হল। গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশন শিল্পীদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে নিল। শিল্পীর মৃত্যুতে তাঁর উত্তরাধিকারী যাতে রয়ালটি পান তার

ব্যবস্থা হল। শিল্পীদের স্বার্থে সে সময় তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সংগঠনের ভিতটি পাকা করেছেন। 'গণ-নব-সৎ গোষ্ঠীনাট্য কথা' বইয়ের 'আর্টিস্ট এসোসিয়েশন, বেঙ্গল' প্রবন্ধে তিনি এই সংগঠনের উদ্ভব-ইতিহাস ও কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

কয়েকটি নাটক কালোচিত পরিমার্জনা করে নাটকগুলির অভিনয় করিয়েছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। অভিনয় দর্শকদেব প্রশংসা পেয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, 'Nildurpan & Trial of Rev. James Long' নামে একটি বই তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। দেশে বিদেশে এটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন তথ্য সহযোগে তিনি এর আর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে। বইটিব নাম 'Nildurpan or the Indigo Planting Mirror with Trial of Rev. James Long'. এতে তাঁর প্রভূত পরিশ্রম ও গবেষণানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উৎসাহে গঠিত হয় 'রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ'। সুধী প্রধান ছিলেন এই পর্ষদের প্রাণ-পুরুষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিকাশ প্রসার ও উন্নয়নের জন্যে যে পরিকল্পনা নেন তাতে লোকসংস্কৃতি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এতদিন মুষ্টিমেয় গবেষক লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণাদি সংগ্রহ-সংকলন ও সমীক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। সুধী প্রধান অ্যাকাডেমিক গন্ডির বাইরে পা বাড়ালেন। লোকশিল্পীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের নিয়ে জেলা স্তরে, বিভাগ স্তরে ও রাজ্য স্তরে উৎসব-অনুষ্ঠান করলেন। লোকগীতি, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের জানা-অজানা হরেক ফর্ম আমরা দেখতে পেলাম। সুধী প্রধানের চেষ্টায় লুপ্তপ্রায় বেশ কয়েকটি ফর্ম পুনরুজ্জীবিত হল। শিল্পীদের সম্মানদক্ষিণার ব্যবস্থা করে শিল্পীদের মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সুযোগ ঘটল। লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে তাঁর নির্দেশে সমীক্ষা চালানো হল। ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দুঃস্থ শিল্পীদের অনুদানের ব্যবস্থা করতে বললেন এবং তা কার্যকর হল। প্রতি বছর প্রবীণ কোনও লোকশিল্পীকে পুরস্কার দানের সুপারিশ করলেন তিনি। রাজ্য সরকার লালন পুরস্কারের প্রবর্তন করলেন। তাঁর পরামর্শমতো 'রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ' লোকশিল্পীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করল। লোকগীতি, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন হল। তরুণ লোকশিল্পীরা

প্রবীণ লোকশিল্পীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে থাকলেন। প্রকাশিত হল 'লোকশ্রুতি', রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্যদের মুখপত্র। এতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি যেমন মুদ্রিত হল, তেমনি রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পীদের সম্পর্কে নানা সংবাদ পাওয়া গেল। পঞ্চায়েত স্তরে লোকসংস্কৃতিচর্চায় উদ্যোগ নিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শে সরকার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি আদিবাসী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯৯৪-এ পর্যদের নাম বদলে হল 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'। কেন্দ্র স্বশাসনের সুযোগ পেল। সভাপতি সুধী প্রধান। তিনি এর রূপরেখা তৈরি করলেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন একটি 'লোকসংস্কৃতি গ্রাম' প্রতিষ্ঠার। কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের সূচনা দেখা গেল ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুরে 'লোকসংস্কৃতি গ্রাম'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হবে। কেন্দ্র থেকে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বইও প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক প্রতিবেদন। এসব তাঁরই পরিকল্পনা। তাঁর স্বপ্ন, কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধ 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'কে বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ প্রতিষ্ঠান আজ বাঙালির গর্ব। সুধী প্রধানের জীবনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্বদেশে ও বিদেশে অজস্র সেমিনারে যোগ দিয়েছেন তিনি। তাঁর সেমিনার বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশ্রণে তাঁর বক্তৃতা হয়ে উঠত আন্তরিকতা সমৃদ্ধ। সুইডেন, আমস্টারডাম, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সেমিনারে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যোগ দিয়েছেন। অভিনন্দিত হয়েছেন। 'ইনস্টিট্যুট অফ সোসাল হিস্ট্রি'র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৫-তে তিনি আমস্টারডামে 'জাতিবৈরিতা ও উপনিবেশবাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ভিয়েতনামের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসবেত্তাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রথম যোগ দেন ১৯৬৪-তে। তারপর বিভিন্ন সময়ে ঐ সম্মেলনে তিনি উপস্থিত থেকেছেন, বক্তৃতা করেছেন। ১৯৯০-এ ঐ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কমিটির সদস্যপদ তিনি লাভ করেন।

রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর Marxist Cultural Movement in India গ্রন্থের জন্যে ১৯৮৫-তে তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬-তে তাঁর হাতে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক তুলে দেন।

তাঁর লেখা অজস্র প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি সংগ্রহ করে অবিলম্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা দরকার।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৭ ডিসেম্বর দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে উত্তর কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দূরদর্শন ও আকাশবাণী থেকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। পরদিন প্রতিটি সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়।

---

সুধী প্রধানের জীবনকথার উপাদান সংগ্রহে তাঁর বিভিন্ন রচনার সাহায্য নিয়েছি। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের স্মৃতিও আমাকে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া ড. সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুধী প্রধান ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন' (*অবসর* ১৯৯৯) ড. গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'সুধী প্রধান' (স্মরণিকা, ব্রতী সঙ্ঘ, হৃদয়পুর, জানুয়ারি ১৯৯৬) এবং হাজারীচরণ দাসের 'সুধী প্রধানের মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি' (*সংস্কৃতিপত্র*, নভেম্বর-জানুয়াবি ১৯৯৮-১৯৯৯) প্রবন্ধত্রয়ের সাহায্য নিয়েছি। প্রাবন্ধিকত্রয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই কবি গোলাম কুদ্দুসকে, যিনি অনেক ভ্রান্তি নিরসন করেছেন।

# এক অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
# সুধী প্রধান

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভূমিকা

*ক. পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ ও কনৌজিয়া শাখা*

এদেশে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সুধীরঞ্জন প্রধানের অসামান্য অবদানকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার শতগুনা গ্রাম যার অধুনা নাম সগুনা সেখানকার কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯১১ সালে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদের পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ বলা হয়। আর পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণদের একটি শাখা হচ্ছে কনৌজিয়া বা কান্যকুব্জ শাখা। এই সম্পর্কে পণ্ডিত জয়নারায়ণ শর্মা তাঁর 'পঞ্চগৌড়শাখা' গ্রন্থে লিখেছেন, "সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল — ইহাদিগকে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ বলে। ইঁহারা বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে বাস করেন। ...... পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে 'কান্যকুব্জ' বিশেষ এক শাখা। এই কান্যকুব্জ পুনরায় পাঁচ শাখায় বিভক্ত। যথা - সরযূপারী বা সরোরিয়া, সণাঢ্য, জিঝৌতিয়া, ভূমিহার এবং কনৌজ।"[১] এইসব ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান ও তাঁদের পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কে জয়নারায়ণ শর্মা ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "....ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার উত্তর তীরে কান্যকুব্জ দেশে (কানপুর প্রভৃতি জেলা) বাস করিতেন এবং তথাকথিত ভূমিহার ব্রাহ্মণগণের ন্যায় যাজন প্রভৃতি কর্ম করিতেন না এবং রাজত্ব করিতেন।[২]

*খ. বাংলাদেশে প্রধানের আগমন*

সুধীরঞ্জন সগুনার প্রধান পরিবারে জন্মেছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানদের আগমন সম্পর্কে পণ্ডিত জয়নারায়ণ শর্মা লিখেছেন, "গাজীপুর জেলার মহম্মদাবাদ পরগনার অন্তর্গত তামালপুরা প্রভৃতি চব্বিশ গ্রামে কস্তোয়ার নামীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহারা কৌশিক গোত্রীয়। ঐ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ইহাদিগকে বিশেষভাবে জানেন। রাজা জয়চন্দ্রের পিতৃব্য-পুত্র মান্ধাতা কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তীর্থভ্রমণের জন্য জগন্নাথধামে যাত্রাকালে পথিমধ্যে মহম্মদাবাদ পরগনার বর্তমান কধৌত (গৌসপুর) নামক স্থানে উপস্থিত হন। ঐ স্থানের এক পুষ্করিণীতে হাত ধুইবার কালে নিজের কুষ্ঠ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে দেখিতে পান। অতঃপর তিনি সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে তাঁহার কুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় এবং তিনি দিব্য শান্তি লাভ করেন। তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং কৌশিকগোত্রীয় পাঁড়ে পদবীধারী ও বশিষ্ঠগোত্রীয় মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। ...... বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া রাজা মান্ধাতা ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের মধ্যে কৌশিক গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রধান করিয়া রাখেন; ইহাতে তাঁহার পদবী 'প্রধান' হইয়া যায়। বর্তমানে তাঁহার বংশধরদের পদবীও 'প্রধান' আছে। ইঁহাদের বাস গাজীপুর জেলার অন্তর্গত মহম্মদাবাদ পরগনার 'তামালপুর' প্রভৃতি চব্বিশখানি গ্রামে আছে। এই তামালপুরা হইতে রক্ষাকর প্রধান নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক হইয়া বাংলাদেশে আসেন। তাঁহার বংশাবলী বর্তমানে সগুনা (২৪ পরগণা), সামটা (যশোহর), কন্যাদহ (যশোহর), কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের 'প্রধান' পদবী আজও বর্তমান।"[৩]

*গ. সগুনা গ্রামের প্রধান পরিবার ও সুধীরঞ্জন*

সগুনাগ্রামের স্বনামধন্য রাজেন্দ্রনাথ প্রধানের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকাশচন্দ্র প্রধান ছিলেন সুধীরঞ্জনের পিতা। প্রকাশচন্দ্রের দুই ভাই ছিল। চারুচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র। সুধীরঞ্জনের মাতা ছিলেন রতনমণি দেবী। পণ্ডিত জয়নারায়ণ শর্মা তাঁর 'পঞ্চগৌড় শাখা' গ্রন্থে সগুনাগ্রামের প্রধানদের সম্পর্কে লিখেছেন, "এই প্রধান পদবীধারী ব্রাহ্মণ শতগুনা (সগুনা) তেও বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রকাশচন্দ্র প্রধান, শরৎচন্দ্র প্রধান, অবিনাশচন্দ্র প্রধান, আশুতোষ প্রধান, নির্মলচন্দ্র প্রধান, অহিভূষণ প্রধান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে প্রকাশবাবু তাঁহার জীবদ্দশায় যথেষ্ট সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল হাইস্কুলের ও যশোহর জেলার কালিয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসাবে ঐ বিদ্যালয়সমূহের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া-

ছিলেন। তিনি বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং সাংবাদিক মহলে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁহার সম্পাদনায় তৎসময়ে প্রচলিত 'নৈবেদ্য' পত্রিকার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তিনি কিছুদিন জয়পুর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবেও কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র বর্তমান। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন প্রধান একজন বহুনির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী; তিনি রাজনীতি বিষয়ে সাময়িক পত্রিকাতেও আলোচনা করিয়া থাকেন।"[৪]

## প্রথম অধ্যায়

### *ক. সগুনা ও পারিপার্শ্বিক জনপদসমূহের তৎকালীন ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা*

সুধীরঞ্জন যখন জন্মেছিলেন তখন সগুনা ও পারিপার্শ্বিক জনপদসমূহের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। বনজঙ্গল, খানা-ডোবায় ভর্তি ছিল চারিদিক। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ-ব্যাধিতে সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সগুনা-সন্নিহিত মমিনপুর, শ্রীনাথপুর, কেওটালী, বেড়ী, গোপালপুর, সুবিদপুর, কালাঞ্চি, রামনগর, ভারাডাঙ্গা, পাঁচপোতা, শশাডাঙ্গা, তেঁতুলবেড়িয়া, গড়জেলা, পিপলি, ঝাউডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, তরণিপুর, গোবরা, পোলতা, শাঁড়াপুর, নিশ্চিন্দিপুর, দুর্গাপুর, কাঁটাবাগান, ভেকুটিয়া, শাঁকদহ, যাদবপুর, শ্রীরামপুর, কপিলেশ্বরপুর, ঘোলা, লবণগোলা, বাগঘাটা, কাঁচদহ, চারঘাট, সুটিয়া, গাজনা, বিষ্ণুপুর, খাঁটুরা, তেপুল, নিমতলা, পূবালী, দামহাটি, মির্জাপুর, মেদিয়া, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের জনজীবন প্রায় একই রকমের ছিল। পায়েহাঁটা পথ ও জলপথ ছিল একমাত্র চলাচলের উপায়। পায়ে হাঁটা ছাড়া গোরুগাড়ি ও নৌকাই ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। সগুনা থেকে গোবরডাঙ্গায় যেতে হলে পাঁচপোতা ঘুরে যেতে হত। সরাসরি কোনো রাস্তা তখন ছিল না। কেবলমাত্র অগ্রহায়ণ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সেইসব রাস্তায় কোনোমতে চলাচল করা যেত। অবশিষ্ট সময়ে কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে কোনোমতে যাতায়াত করা সম্ভব হত না। তাই, ঐসব জনপদের মানুষেরা বর্ষাকালে ইছামতী ও যমুনা নদীর মাধ্যমে নৌকাযোগে বাইরের এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এইসব এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্বল্পসংখ্যক মানুষ কৃষিজাত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতেন। গুটিকয়েক মানুষ চাকুরি করার সৌভাগ্যলাভ করতেন। একদিকে ইংরেজশাসন ও অন্যদিকে জমিদারদের শোষণ, শাসন ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সবদিক থেকে মানুষ যাতে আরও পশ্চাৎপদ

হয়ে পড়ে তার সব ব্যবস্থাই সেই সময়ে ছিল। মানুষ যাতে সরকার ও জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী না হয় তার জন্য শিক্ষার দিক থেকে তাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছিল। সরকার তার নিজের প্রয়োজনে অফিস আদালতে করণিক সৃষ্টির লক্ষে সামান্য কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্যই ছিল। এর ফলে সমগ্র সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষরতা ও অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। জীবনের এই চরম দুর্দশা ও অনগ্রসরতাকে তারা ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

সুধীরঞ্জনের জন্মস্থান সগুনা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি জনপদ তাঁর শৈশবজীবনের সংস্পর্শে এসেছিল। সেইসব জনপদ হল চাতরা, তেঁতুলিয়া, স্বরূপনগর, হঠাৎগঞ্জ, বিথারী, হাকিমপুর, বালতি, কৈজুড়ি, মালঙ্গপাড়া, আটুরিয়া, কাটিয়াহাট, গোকুলপুর, বসিরহাট, কায়বা, গয়ড়া, চন্দনপুর, সামটা প্রভৃতি। এইসব জনপদ তৎকালীন ইংরাজ আমলে অবিভক্ত বাংলার যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগনা জেলার অধীন বসিরহাট, বনগাঁ, সাতক্ষীরা ও বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত ছিল।

ব্রিটিশ ভারতের সব গ্রামের অবস্থাই খুব দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। তবে তাঁদের প্রয়োজনে গড়ে তোলা শহরগুলির অবস্থা অবশ্য অন্যরকমের ছিল। প্রশাসনিক স্বার্থে যোগাযোগ-যাতায়াত ব্যবস্থা মোটামুটি মানোপযোগী হলেও সেখানে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান মোটেই উন্নত ছিল না। উল্লেখ করা যায় যে, সেই সময়ে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ-এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্বল্পসংখ্যক পাঠশালা গড়ে তোলা হয়েছিল। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাইমারি ও মাইনর স্কুল কদাচিৎ নজরে পড়ত। সেই আমলে গ্রামের যে সব পরিবার মোটামুটিভাবে আর্থিক দিক থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল তাদের সন্তান-সন্ততিদের পড়াশুনার জন্য শহরে পাঠানো হত। অনেক সময় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে তাঁরা তাঁদের শিশুদের রেখে দিতেন। বলাবাহুল্য, সেই সময় গ্রামীণ এলাকায় এই ধরণের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত কমই ছিল। এই প্রসঙ্গে সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "বন-জঙ্গল, খানা-ডোবা, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর—কলেরা ও বসন্ত — এই নিয়ে সগুনাকে কেন্দ্র করে ১০ মাইল এলাকা নিয়ে গ্রামগুলির সকলের অবস্থাই একরকম ছিল। বরং বলা উচিত ব্রিটিশের তৈরী শহরগুলি থেকে দূরবর্তী সব গ্রামেরই এই অবস্থা ছিল। ব্রিটিশ ভারতে স্বাস্থ্য ও যান-বাহনের এই অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়াতে হলে মানুষ যাতে নিরক্ষর থাকে তাই ছিল ব্রিটিশের কৌশল। এইসব অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে পাঠশালা ছাড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কোন স্বীকৃত প্রাইমারী ও মাইনর স্কুলও ছিল না।"[৫]

আজ থেকেশতাধিক বছর পূর্বে সেই ইংরেজ আমলে এই জেলার কয়েকটি জনপদে বিদ্যোৎসাহী স্থানীয় মানুষের অন্তহীন প্রয়াসের ফলে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এইসব জনপদ হ'ল — টাকী, নিবাধই, বারাসাত, গোবরডাঙ্গা, বনগাঁ, গোপালনগর, মালঙ্গপাড়া, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, ধান্যকুড়িয়া, গুস্তিয়া, ভাটপাড়া, নৈহাটি, কাচড়াপাড়া, হালিশহর, ইছাপুর, ব্যারাকপুর, খড়দহ, রহড়া, বরানগর, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, পানিহাটি, সোদপুর, নিমতা, দমদম, রাজারহাট, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি। তবে অধিকাংশ স্থানে পাঠশালাই বর্তমান ছিল।

এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে দেশিয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি চরম সংকটের মুখে গিয়ে পড়েছিল। এক সময় গোবরডাঙ্গার মত এলাকাতেও ছিল চিনি, কাপড়, ঘি প্রভৃতি পণ্যের বড়ো বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু ইংরেজ বণিকদের আমলে সেখানে বিদেশি পণ্যসম্ভার বিপুল পরিমাণে আমদানি হওয়াতে দেশিয় শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে যায়। সুধীরঞ্জন এ সম্পর্কে বলেছেন, "গোবরডাঙ্গা এক সময় চিনি, নীল, কাপড়, ঘি প্রভৃতি ব্যবসার বড় কেন্দ্র ছিল কিন্তু বিদেশী চিনি, নীল ও কাপড় আমদানি হওয়াতে গোবরডাঙার গুরুত্ব কমতে থাকে।"[৬]

সরকার ও জমিদার ছাড়াও এই আমলে গ্রামে গ্রামে তালুকদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার প্রমুখেরা সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসীদের শোষণ শাসন করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। যাদের কোনো উপায় ছিল না তারাই কেবলমাত্র গ্রামে পড়ে থাকত। আর যাদের সামান্যমাত্র সঙ্গতি থাকত তারা এদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে শহরে চলে যেত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### *ক. সুধীরঞ্জনের পিতামহ রাজেন্দ্রনাথ ও যশোহর জেলার কায়বার পাঁড়ে বংশ*

সুধীরঞ্জনের পিতামহ রাজেন্দ্রনাথ অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার কায়বা গ্রামের সুখ্যাত কালীশ পাঁড়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষীরদবাসিনীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সমকালীন শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ঐ পাঁড়ে পরিবারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই পাঁড়েবংশ সম্পর্কে 'পঞ্চগৌড় শাখা' গ্রন্থে পণ্ডিত জয়নারায়ণ শর্মা লিখেছেন, "যুক্ত প্রদেশের আজমগড় জেলা হইতে যে সকল সরোরিয়া ব্রাহ্মণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাস করেন—যশোহর কায়বা গ্রামের

সুবিখ্যাত পাঁড়ে বংশ তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গগত পণ্ডিত মায়ারাম পাঁড়ে বঙ্গদেশের এই বংশের আদি পুরুষ। তিনি প্রথমে যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সামটা গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন, পরে তাঁহার পৌত্র রাজারাম পাঁড়ে তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ পাঁড়ের নাবালক পুত্র টীকারাম ও রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কায়বা গ্রামে আসিয়া নূতন বসবাস স্থাপন করেন। রাজারামের পুত্র অযোধ্যারাম সামটা গ্রামে পৈতৃক ভিটাতেই বসবাস করিতে থাকেন।

মায়ারামের কায়বা বংশে রামচন্দ্রের প্রপৌত্র কণকচন্দ্র পাঁড়ে বিপুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন এবং কায়বা গ্রামে রাজপ্রাসাদের ন্যায় বাসভবন, সুবৃহৎ অট্টালিকা, অতিথিশালা, দেবমন্দির, দীঘিকা আদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্রদান তাঁহাব একরূপ নিত্য ক্রিয়া ছিল। তৎকালের লোকেরা ধর্মানুরাগী ছিলেন। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় সর্বপ্রকার আচার নিয়ম তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিতেন। তখন এখনকার মত রেলপথ হয় নাই। এজন্য তীর্থযাত্রীদিগকে সেকালে সাধারণতঃ পদব্রজেই দূরপথ গমনাগমন করিতে হইত। গঙ্গাস্নানের পর্বের সময় পূর্বদেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে যাতায়াতে কণক পাঁড়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেন এবং তিনিও পরমসমাদরে তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার দানশীলতার জন্য দেশের সাধারণ লোকের নিকট তিনি কণক রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বাংলা সন ১২৩৩ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। কণকচন্দ্রের পত্নী বিমলা দেবী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন।

কণকচন্দ্র—মৃত্যুঞ্জয়, গিরিশ, গৌরীশ ও উমেশ নামে চারি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহারা পিতার ন্যায় সদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথি বৎসল এবং দানশীল ছিলেন।

কণকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চন্দনপুরের রাধামোহন রায়ের কন্যা শিবতারা দেবীকে বিবাহ করেন। শিবতারার গর্ভে মৃত্যুঞ্জয়ের ৩টি পুত্র ও ৬টি কন্যা জন্মে। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বীরেশ্বর একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতুল চন্দ্রশেখর রায়ের নিকট থাকিয়া কৃষ্ণনগরে বিদ্যালাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গসাহিত্যের বঙ্কিম যুগে তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যচর্চাই তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল। তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ১৭ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি লীলাবতী নামক সংস্কৃত বীজগণিতপুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ২২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক আর্য্যচরিত এবং ২৫ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানসার রচিত হয়। ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মানবতত্ত্ব নামক প্রসিদ্ধ বাঙলা দার্শনিক গ্রন্থ এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে

সামাজিক নক্‌সা — 'অদ্ভুত নক্‌সা বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত তিনি আর্যশিক্ষা, আর্যপাঠ, চারুশিক্ষা, নীতি-কথামালা, বৃহৎব্যাকরণসার প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। একই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করার তাঁহার এরূপ অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তিনি একযোগে সহচরী, বিজ্ঞানদর্পণ ও জাহ্নবী নামক তিনখানি কথাসাহিত্য, ধর্মসাহিত্য ও বিজ্ঞানসাহিত্য মূলক মাসিক পত্র একই কালে সম্পাদনা করিতেন। তিনি একজন প্রকৃত স্বধর্মানুরাগী ও নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রত্যহ পূজাপাঠ না করিয়া তিনি কদাপি জল গ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহার স্বদেশের আচার-ব্যবহার বা তাঁহার সনাতন ধর্মের কেহ কোনপ্রকার অন্যায় নিন্দা করিলে তাহা তিনি কদাপি সহ্য করিতে পারিতেন না। সুবিখ্যাত কবি পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসকাব্যে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি ও প্রাচীন ঋষিদিগের প্রতি অন্যায় নিন্দা এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করায় তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামক বিখ্যাত পুস্তকে নবীনবাবুর পুস্তকের এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তক তৎকালের বিদ্বজ্জন সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে তিনি তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক পুস্তক মানবতত্ত্বের ইংরাজী অনুবাদ Man নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নানা পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিব্রত হইয়া বীরেশ্বর কায়বা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং তথায় ৬১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'নববাস' নামক একখানি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলিয়া কলিকাতায় দেশীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম একদরে বস্ত্র বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্তন করেন এবং অবসরসময়ে সাহিত্যচর্চা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ দোকানে প্রতি সন্ধ্যায় একটা সাহিত্যিক মজলিস বসিত। তাহাতে কলিকাতার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই যোগদান কবিতেন এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তথায় ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইত। কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে একরূপ সদাব্রত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না — অতিথি অভ্যাগতের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। নানা প্রকার বৈষয়িক এবং পারিবারিক গোলযোগে তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়া যায়। এজন্য তিনি নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিনযাপন করিতেন। ঈশাণী সদয় হইয়া শেষে তাঁহার এ ক্ষোভ দূর করিয়াছিলেন — বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় বীরেশ্বর আবার তাঁহার বোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক সুলেখক পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে সন ১৩১৮ সালের ২৬ শে ফাল্গুন তারিখে পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতীরে হিন্দুর চিরকাম্য মুক্তিপুরী বারাণসীধামে দেহরক্ষা করেন।

স্বনামধন্য মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় বীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সন ১২৭৭ সালের ৮ই শ্রাবণ রবিবার তারিখে কায়বা গ্রামে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কায়বা গ্রাম্য স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। সন ১২৮৬ সালে বীরেশ্বর তাঁহার পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। বীরেশ্বর কলিকাতা আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহনকে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করিয়া দেন।

উক্ত বিদ্যালয় হইতেই মনোমোহন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন, পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য্য হওয়ায় পড়াশুনা ত্যাগ করেন। চাকরীর প্রতি কোনদিনই তাঁহার ঝোঁক ছিল না। তিনি চিরদিন অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার বাল্যাবধি লক্ষ্য ছিল। এজন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি ব্যবসা করার সঙ্কল্প করেন। পিতা বীরেশ্বর পুত্রের ব্যবসার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল দেখিয়া ২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ির নীচে ঘর ভাড়া করিয়া 'পাঁড়ে ব্রাদার্স' নামে একটি পুস্তকের দোকান করিয়া দেন। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বৎসরের মধ্যে তিনি উক্ত পুস্তকালয়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন বাদে পিতা তাঁহার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি স্বদেশী কাপড়ের দোকান করিয়া দেন এবং ব্যবসায়সংক্রান্ত সমস্ত তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে তিনি সামান্যভাবে প্লাম্বারিং ও কন্ট্রাক্টের কার্য্যও করিতে আরম্ভ করেন। বীরেশ্বর একটি মোজা ও গেঞ্জির কল বসাইয়া প্রচুর পরিমাণে মোজা ও গেঞ্জি তৈয়ারী করিয়া বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। মনোমোহন তাঁহার এই কার্য্যের সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করেন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত সর্বভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এই সমস্ত ব্যবসায় লিপ্ত থাকায় দিনের পর দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এই অবস্থায় বাংলা সন ১৩১১ সালে প্রথমতঃ ঘটনাচক্রে তিনি বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের সংস্রবে আসিয়া পড়েন এবং ইহা হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হয়েন।

পিতা বীরেশ্বর যেরূপ স্বদেশবৎসল এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন পুত্র মনোমোহনও পিতার সে গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় মনোমোহন কখনও বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন না। পূর্বপুরুষগণের অনুসরণে ইনিও বরাবর দুর্গোৎসব পূজাপার্বণ অতিথি সৎকার পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ-বিদায় ইত্যাদি বংশগত ধারা বজায় রাখিয়া বংশের পৌরুষ ও কীর্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মিনার্ভা রঙ্গালয় পরিচালনাকালে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসরকাল সরস্বতী পূজার সময়ে তিনি কলিকাতার বিডন উদ্যানে সহস্র সহস্র কাঙালীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন ইহা বোধ করি কলিকাতাবাসী অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি আমৃত্যু তাঁহার কলিকাতা গোয়াবাগানের বাড়িতে বহু দরিদ্র ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া গিয়াছেন, বহু পন্ডিতকে

তাঁহাদের চতুষ্পাঠী পরিচালনায় নিয়মিত মাসিক সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার গোয়াবাগানের প্রাসাদোপম অট্টালিকা — আত্মীয় বন্ধু স্বজাতি দেশবাসী পরিচিত অপরিচিত অর্থী প্রত্যর্থী প্রভৃতি বহু লোকের কলরবে সর্বদা মুখরিত থাকিত। তাঁহার গৃহদ্বার অতিথি অভ্যাগতের জন্য চব্বিশ ঘন্টাই উন্মুক্ত থাকিত একথা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি করা হয় না।

তিনি তাঁহার জন্মভূমি কায়বা গ্রামে পঁচিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে তথায় বীরেশ্বব দাতব্য চিকিৎসালয় নামে একটি প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা ও গ্রামবাসীর জলাভাব দূরীকরণার্থে একটি সুবৃহৎ দীঘিকা খনন এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

যশোহর শহরে বীরেশ্বর চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি দৌলতপুর কলেজসংলগ্ন চতুষ্পাঠীর গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতালে বার্ষিক প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে কুড়িটি শয্যা সমন্বিত বীরেশ্বর ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেবের অভিপ্রায়ানুসারে কাশীধামের বাটীতে বীরেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সেবা পূজাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি আর একটি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কাশীতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বীরেশ্বর ধর্মশালা' নামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা তিনি যাত্রীদের জন্য নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বিরাট যাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন — উহা তাঁহার এক সুমহান্ কীর্তি। উহার জন্য তিনি চিরদিন সাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য পাইবেন এবং তিনি জনগণের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মনোমোহনের নশ্বর দেহ আজ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্র — মহান্ কীর্তি সমূহই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ-বাগডাঙ্গার উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার ২টি কন্যা ও ৩টি পুত্র। মনোমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অকালে পরলোকগমন করায় বিধাতৃবিধানে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়োগ ব্যথা পাইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আর কোন শোক তাঁহাকে পাইতে হয় নাই।

বিগত সন ১৩৪২ সালের কার্তিক মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর পাঁড়ে তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি

যথাযোগ্যভাবে তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় জনহিতকর কার্য্য সম্পাদনে তাঁহারও যথেষ্ট সহানুভূতি এবং আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে আশা হয় ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারাও জনসাধারণ নানা প্রকারে উপকৃত হইবে।

বীরেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র লালমোহন পাঁড়ে— তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ বি. এ পাশ করিয়া এক্ষণে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

বীরেশ্বরের পুত্র জিতেন্দ্রমোহন পাঁড়ে এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রমোহন পাঁড়ে এখনও জীবিত আছেন।

মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কেদারেশ্বর — তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার, তাঁহার ৪টি পুত্র — তারাকুমার, প্রফুল্ল, সুরথ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দীনেশ বি. এ পাশ করিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির অডিটর ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত হইয়াছেন। কণক পাঁড়ের দ্বিতীয় পুত্র গিরিশচন্দ্র পাঁড়ে। গিরিশের পুত্র পতিতপাবন পাঁড়ে। ইঁহার দুই পুত্র ভূধরচন্দ্র ও কুঞ্জবিহারী। ভূধরচন্দ্রের ন্যায় উদ্যমশীল ও পরোপকার ব্যক্তি বিরল। ইঁহার উভয় ভ্রাতাই দয়াদাক্ষিণ্যাদি বহু সদ্‌গুণে ভূষিত। ভূধরচন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টায় এবং মনোমোহনের অর্থানুকূল্যে কায়বা গ্রামের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভূধরচন্দ্র বর্তমানে যশোহর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার চেষ্টায় সমগ্র মহকুমার উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, তিনি যদি আরও কিছুদিন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সংস্রবে থাকেন তাহা হইলে সমস্ত জেলার সংস্কার সাধিত হইবে।

ইঁহাদের বংশধর যথাক্রমে কান্তিচন্দ্র পাঁড়ে ও করুণাময় পাঁড়ে প্রভৃতি সামটা গ্রামে এবং স্বগোত্র নিরাপদ পাঁড়ে প্রভৃতি সামটা গ্রামে বাস করিতেছেন।"[৭]

### *খ. সুধীরঞ্জনের পিতা প্রকাশচন্দ্র ও মনোমোহন পাঁড়ে*

তৎকালীন বাংলার সুখ্যাত লেখকও নাট্যপ্রেমিক মনোমোহন পাঁড়ে পারিবারিক সূত্রে সুধীরঞ্জনের পিতা প্রকাশচন্দ্রের মাতুল ছিলেন। সেই সময়ে কলকাতায় মনোমোহনের অক্লান্ত প্রয়াসে একটি রঙ্গালয় গড়ে তোলা হয়। এই রঙ্গালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল 'মনোমোহন থিয়েটার'। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ঐ থিয়েটার একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঐ মনোমোহন থিয়েটারে সমকালীন বাংলাদেশের স্বনামধন্য বহু নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে নাট্যাচার্য

শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এই থিয়েটারের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মনোমোহন পাঁড়ের লেখা বই এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ানো হত। মনোমোহন পাঁড়ে সম্পর্কে সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "প্রকাশচন্দ্রের পিতা রাজেন্দ্রনাথ প্রধান বিবাহসূত্রে কায়বার পাঁড়েদের জামাই হন। এই বংশের বীরেশ্বর পাঁড়ে তাঁর নামে বেনারসে পাঁড়ে ধর্মশালা তাঁর পুত্র মনোমোহন পাঁড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন সুলেখক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ বাংলা বিভাগের পাঠ্য ছিল। ইনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্বদেশী বস্ত্রের দোকান করেন এবং এক দামে বস্ত্র বিক্রয়ের সূচনা তিনিই করেন।"[৮]

*গ. প্রকাশচন্দ্রের ছাত্র ও কর্মজীবন — তাঁর বাসভূমি সংলগ্ন বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী তাঁর আত্মীয়বর্গের বৃত্তান্ত*

সুধীরঞ্জনের পিতা প্রকাশচন্দ্র শৈশবে তাঁর নিজস্ব বাসভূমি সগুনা গ্রাম ত্যাগ করে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতার গোয়াবাগানে তাঁর মাতুল মনোমোহন পাঁড়ের বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি সেকালের বিখ্যাত কলকাতার হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শোনা যায়, হিন্দু স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় প্রকাশচন্দ্রকে পুরস্কৃত করা হয়। এন্ট্রান্স থেকে এফ্. এ পর্যন্ত তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। এরপর জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশন অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি ১৯০৬ সালে গ্রাজুয়েট হন।

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তখন গোটা বাংলাদেশ উত্তাল। প্রকাশচন্দ্রও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই সময় জাতীয়তাবাদী লেখক সাহিত্যিকদের গ্রন্থ অধ্যয়নে তিনি গভীরভাবে মনোযোগী হন। তিনি পড়তে শুরু করলেন গ্যারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনির জীবনী, টডের রাজস্থান প্রভৃতি। জাতীয়তাবাদী মনীষী বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায়ের ছবি তিনি তাঁর পড়ার ঘরে বাঁধাই করে রেখেছিলেন। তাছাড়া, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু গ্রন্থ তাঁর অধ্যয়নকক্ষে সংগৃহীত ছিল। তাছাড়া, শেক্সপীয়র, বেকন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বইগুলিও তাঁর নিত্য পাঠের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুধীরঞ্জন এই প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "এই সময় সারা বাংলাদেশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উত্তাল। তিনি যে এর প্রভাবে পড়েছিলেন— তার প্রমাণ তাঁর লাইব্রেরীতে — গ্যারিবল্ডী ও ম্যাৎসিনির জীবনী, টডের রাজস্থান। সে যুগের স্বদেশী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায়ের ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করা ছিল। তাছাড়া, রায়

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের, ঈশ্বর গুপ্তের ও বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বই তাঁর লাইব্রেরীতে ছিল। Book of Knowledge এক সেট, শেক্সপীয়রের নাটক এক সেট, বেকন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবাবিবাহ সমর্থনে রচনা প্রকাশচন্দ্রের লাইব্রেরীতে ছিল।।"[৯]

এর পরবর্তীকালে জনৈক স্কচ অধ্যাপকের সহায়তায় প্রকাশচন্দ্র রাজস্থানের উদয়পুরে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের একটি অফিসে চাকুরি লাভ করেছিলেন। কিন্তু চলাফেরায় সরকারি নিয়ম-কানুন মানতে গিয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং অনতিবিলম্বে সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক পদে তিনি যোগদান করেন। সেই সময় প্রকাশচন্দ্র সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার অভিযোগে ইংরেজ সরকার তখন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ঘাটাল হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং পরিশেষে ঐ বিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে প্রকাশচন্দ্রকে বাধ্য করানো হয়। এই ঘটনার পর থেকে কোনো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে তাঁর আর কোনোদিন চাকুরি করা সম্ভবপর হয়নি। প্রকাশচন্দ্র এর কিছুকাল পরে কলকাতার রানি ভবানী হাইস্কুল থেকে ঐ একই কারণে কর্মচ্যুত হয়ে যশোরের সামটায় তাঁর এক আত্মীয়ের ঔষধের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। প্রকাশচন্দ্রের জীবনে সামটায় ঐ আত্মীয়বর্গের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামটায় বসবাসকারী প্রকাশচন্দ্রে আত্মীয়দের সম্পর্কে পণ্ডিত জয়নারায়ণ শর্মা তাঁর 'পঞ্চগৌড় শাখা' গ্রন্থে লিখেছেন, "মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে হিন্দুদিগের রাজকার্য্য লাভে কোন বাধা না থাকায় যুক্তপ্রদেশের শঙ্করা ডিহী হইতে আগত দীপরাম মিশ্রের পুত্র নির্ভয়রাম বীরত্ব দেখাইয়া নবাবের সৈন্য শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে এই বালক হাজার সেনার অধ্যক্ষ হইয়া 'হাজারী' উপাধিতে ভূষিত হন। এই নির্ভয়রাম সামটার হাজারীবংশের আদি পুরুষ। নির্ভয়রামের তিন পুত্র — লক্ষ্মীরাম, ভবানীরাম ও রঘুনাম। ভবানীরামের পুত্র হরিরাম। নির্ভয়রামের মধ্যমপুত্র ভবানীরাম ও কনিষ্ঠপুত্র রঘুরামের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীরামের বংশধরেরা যশোহর জেলার অন্তর্গত সামটা গ্রামে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে আবাস নির্মাণ পূর্বক বসতি করিতেছেন। লক্ষ্মীরামের পৌত্র সীতারাম। ইঁহার পৌত্র চন্দ্রকুমার এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। চন্দ্রকুমার দানশীল, সমাজসংস্কারক, শিক্ষিত ও গীতবাদ্যবিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র উমাকান্ত হাজারী ১২৭৯ সালের ২১ শে অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াও স্বীয় শক্তি ও প্রতিভাবলে প্রচুর জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। পরিণত বয়সে ইনি 'বৈদিক গবেষণা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থপাঠে নদিয়ার

পণ্ডিতমন্ডলী ইহাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। উমাকান্ত বাবুর একমাত্র পুত্র কমলাকান্ত হাজারী। ইনি একজন স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসক। ..... এম. বি (M. B) পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্ত্র চিকিৎসায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ম্যাক্‌লিয়ড সুবর্ণ পদক ও কলেজে প্রথম হওয়ায় সর্বাধিকারী সুবর্ণ পদক (Suresh Chandra Sarbadhikari Gold Medal) প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুচিকিৎসা বিভাগের হাউস সার্জেন ও পরে রেজিষ্ট্রার পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। রোগীদিগের সুখ ও সুবিধার জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে একটি বিরাট সপ্ততল বাটী নির্মাণ করিয়া তথায় আই হসপিটাল (Eye Hospital) করিয়াছেন। কমলাকান্ত বাবুর তিন পুত্র — রামকান্ত, শ্যামকান্ত ও শচীকান্ত। ইঁহার এক কন্যা ছায়া, ইহার বিবাহ মহিষাদল রাজকুমার ভবানীপ্রসাদ গর্গের সহিত হইয়াছে। ..... অনন্তরাম মিশ্র গাজীপুর জেলার জামনিয়া পরগণার অন্তর্গত রেউতিপুর গ্রাম হইতে যশোহর জেলার সুবিৎপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র ভীম ও রঘুনাথ। ভীমের বংশধর পঞ্চানন মিশ্র সুবিৎপুর হইতে সামটায় আসেন। তাঁহার পুত্র দেবনারায়ণ ; ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ, ইঁহার বংশধর সনৎকুমার বর্তমানে সামটায় বাস করিতেছেন ও কনিষ্ঠ পুত্র সনাতনের পুত্র বটুকনাথ। বটুকনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সতীনাথ মিশ্র। ইনি একজন সামাজিক, সদালাপী ও স্বাবলম্বী ব্যক্তি। স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে ইনি প্রচুর অর্থোপোর্জনকরতঃ যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। সামান্য অবস্থা হইতে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কিরূপে মানুষ সৌভাগ্যের চরম সোপানে উন্নীত হয় তাহা তাঁহার জীবনী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইনি একজন বিশিষ্ট সমাজনেতা। লংগট সিংহের সভায় যে চারিজন প্রতিনিধি বাংলাদেশ হইতে যান সতীনাথ মিশ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। ইনি ইঁহার পুত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেন নাই। সতীনাথবাবুর চারি পুত্র — শিবপ্রসন্ন মিশ্র, সচ্চিদানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, শংকরনারায়ণ মিশ্র। জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার শিবপ্রসন্ন মিশ্র এম্. বি. (কলি.) এল. আর. সি. পি (লণ্ডন), এম্. আর. সি. ও. জি (লণ্ডন) স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজের সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইনি একজন কৃতী ছাত্র, ধাত্রীবিদ্যায় তিনি বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিলাত যাওয়ার পূর্বে ইনি কারমাইকেল মেডিকেল হাসপাতালে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ প্রভৃতিতে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সুনামের সহিত ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্ট হাউস সার্জেনের কার্য্য করিয়াছিলেন। ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তথায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি অতি প্রশংসার সহিত কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সতীনাথবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সচ্চিদানন্দ মিশ্র। ইনি একজন এম্. এ। ইনি আপাততঃ Aplha Advertising Service নামে একটি বিজ্ঞাপন কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র বাচস্পতি মিশ্র অধুনা এম্. এ ও ল পড়িতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শংকরনারায়ণ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র খুলনার চন্দনপুরে যাইয়া বসবাস করিযাছেন। তাঁহার বংশধর প্রভাতকুমার ও প্রমথকুমার এক্ষণে উক্ত স্থানে বাস করিতেছেন।

সাংকৃতিগোত্রীয় বাড়াদি গ্রামের অন্নদাচরণ রায় ও গোপালহরি রায়ের পূর্বপুরুষ গাজীপুর জেলার রেউতিপুর গ্রাম হইতে আসিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বাড়াদি গ্রামে বাস করিতেছেন।"[১০]

প্রকাশচন্দ্র স্কুলের চাকুরি থেকে কর্মচ্যুত হ'য়ে যখন যশোরের সামটায় তাঁর এক আত্মীয়ের ঔষধের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হচ্ছে। ১৯১৫ সালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে তিনি সেখান থেকে তখন 'নৈবেদ্য' নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। সুধীরঞ্জন তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "ঐ আত্মীয়ের চেষ্টায় প্রকাশচন্দ্র 'নৈবেদ্য' বলে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : ভারতমাতা তৃষ্ণাতে কাতর এবং সন্তানের রক্তে সেই তৃষ্ণা প্রশমিত হ'তে পারে। রচনাটি ১৯১৫ সালে অর্থাৎ যখন বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা হয়েছিল সেই সময়ে লেখা।"[১১]

এইসব কাজ ছাড়াও সেই সময়ে প্রকাশচন্দ্র সমাজসেবামূলক নানাবিধ কর্মসূচির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সেইসব কর্মসূচি রূপায়ণে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ চাতরা গ্রামের অন্যতম সমাজসংগঠক সূর্যকান্ত মিশ্র। সূর্যকান্ত ছিলেন সগুনার প্রধানদের ভাগিনেয়। সূর্যকান্ত বয়সে প্রকাশচন্দ্রের থেকে কিছুটা ছোট ছিলেন। সূর্যকান্ত বিয়ে করেছিলেন পাঁচপোতার চৌধুরীদের বাড়িতে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই মনপ্রাণ দিয়ে সমাজসেবার কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য দক্ষিণ চাতরায় সূর্যকান্ত মিশ্রের অনুরোধে সগুনার প্রকাশচন্দ্র প্রধান সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করতেন। সূর্যকান্তের অশেষ প্রয়াসে দক্ষিণ চাতরায় ১৯১৭ সালে তাঁর নিজের চণ্ডীমণ্ডপে জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে সেই চিকিৎসালয়টি ১৯২২ সালে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। সে বছরেই সূর্যকান্ত তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন

করেন এবং অনতিবিলম্বে সেখান থেকে ঐ স্কুলটিকে বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনা হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে সূর্যকান্ত তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে দক্ষিণ চাতরার বিষ্ণুপদ রায় এবং তাঁর দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই মাইনর স্কুলে অধিকাংশ ছাত্র ছিল মুসলমান। তখনকার দিনে ঐ এলাকায় এই অভিযোগ প্রচলিত ছিল যে, অনগ্রসর মুসলমান প্রজাদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের বিদ্রোহী করে তোলা হচ্ছে। এই অভিযোগ সেই আমলে সূর্যকান্ত, বিষ্ণুপদ ও প্রকাশচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রচারিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "এই মাইনর স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র ছিল মুসলমান। মুসলমান প্রজাদের লেখাপডা শিখিয়ে বিদ্রোহী করেছেন এই অভিযোগ সূর্যকান্ত, বিষ্ণুপদের সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রকেও শুনতে হয়েছিল উত্তর চাতরার ধনী আত্মীয়দের কাছে। অবশ্য তাদের সকলেই যে এইসব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন এমন নয়।"[১২] সমাজ সংগঠনের কাজে সূর্যকান্তই যে প্রকাশচন্দ্রের পথ প্রদর্শক ছিলেন সে কথা সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছেন, "সূর্যকান্ত মিশ্রই যে পথিকৃৎ ছিলেন প্রকাশচন্দ্রের সহযোগিতায় একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সূর্যকান্ত তাঁর মৃত্যুর আগে পত্র লিখে আমাকে ডাকলেন এবং বারবার বললেন, তোমার বাবার জন্যই এইসব হয়েছে।"[১৩] খাঁটুরা থেকে প্রকাশিত 'কুশদহ' পত্রিকার ১৯০৮ সালের একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল যে, ১৯০৬ সালে চাতরা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে একটি যুবসমিতি গঠন করা হয়। ঐ যুব সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। 'কুশদহ' পত্রিকায় সে সময় সূর্যকান্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখেছিলেন।

চাতরার মত সগুনাতে জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য প্রকাশচন্দ্র এক হাজার টাকা, একখণ্ড জমি ও একটি ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সময় তিনি যশোর জেলাবোর্ডের সদস্য ও বনগাঁ লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ করা যায় যে, সগুনা দাতব্য চিকিৎসালয় আবেদনপত্রটি জেলা বোর্ডের অফিসে জমা দেওয়া হয় ১৯১৬ সালে। তখনকার দিনে সগুনা গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বনগাঁ, বসিরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমার সংযোগস্থলে। তাই সূর্যকান্ত ও প্রকাশচন্দ্র উভয়েই সকল দিক থেকে ঐসব বৃহত্তর জনপদের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়াসী হতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, মসলন্দপুর থেকে চারঘাট পর্যন্ত পাকারাস্তাটি নির্মাণে চারঘাটের বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ সবিশেষ স্মরণীয়। অন্যদিকে সগুনা থেকে সুটিয়া পর্যন্ত কাঁচারাস্তার নির্মাণে প্রকাশচন্দ্রের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয়টি অবশেষে চালু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। সেখানে চিকিৎসক হিসেবে

ডাঃ দুর্গা চক্রবর্তী যোগদান করেছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীর সাহায্যকারী হিসেবে একসময় সুধীরঞ্জন সেখানে আগত রোগীদের সেবা করেছেন। সমাজসংগঠনের বিষয়ে চারঘাটের প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বরাবর ছিল।

সাহিত্য ও শিল্পকর্মে প্রকাশচন্দ্রের অসামান্য আগ্রহ ছিল। 'নৈবেদ্য' পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও গান-বাজনা এবং নাট্যাভিনয়ে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। চারঘাটের খ্যাতিমান নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন প্রকাশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রকাশচন্দ্রের জার্মান মার্কা একটি সুন্দর বেহালা ছিল। সগুনার সাতুবাবু হারমোনিয়াম ও অতুলবাবু ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন। আর তাঁর সগুনা গ্রামের প্রতিবেশীরা খোল, করতাল ও পাখোয়াজ বাজাতেন।

১৯২৪ সালে বিহারের দেওঘরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রকাশচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

*ক. সুধীরঞ্জনের শৈশবকাল ও পাঠশালার শিক্ষার সূচনা*

১৯১৪ সাল। সুধীরঞ্জনের বয়স তখন তিন বছর। সেই সময় তাঁর মা রতনমণি দেবী খুড়শাশুড়ির কড়া সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে জ্যাঠাশ্বশুরের কৌটো থেকে গোপনে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর আফিং খাওয়ার অব্যবহিত পরে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি। কেননা, সেই সময়ে কাছাকাছি কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। তাই, সগুনা থেকে বহুদূরবর্তী বসিরহাট শহর থেকে নদীপথে যখন একজন চিকিৎসককে গ্রামে নিয়ে আসা হল তখন সব শেষ। সুধীরঞ্জন তাঁর মায়ের এই অকালমৃত্যু সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন, " সগুণার কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব প্রধানদের বড় ছেলে প্রকাশচন্দ্র প্রধানের বউ খুড়শাশুড়ির কড়া কড়া সমালোচনায় রাগ করে আফিঙের নেশাগ্রস্ত জ্যেঠাশ্বশুরের কৌটো থেকে গোপনে আফিঙ্ সংগ্রহ করে খেয়ে ফেলেন। বেলা তখন ১০টা কিংবা ১১টা। এরপর তিন বছরের শিশুসন্তান যখন দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ার সময় 'দুদু' খেতে জেদ ধরলেন তখন তিনি ব্যাপারটি আর চেপে রাখতে পারলেন না পাছে বুকের দুধের আফিঙ্ সন্তানের জীবন বিপন্ন করে। মাতৃত্বের চেতনা তাঁকে মর্মান্তিক অনুশোচনায় বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ডাক্তার কোথায় যে তাঁকে রক্ষা করবে? বসিরহাট শহর থেকে নদীপথে ডাক্তার আনতে আনতে সব শেষ।"[১৩]

প্রকাশচন্দ্রের তিনটি শিশুপুত্র ছিল। মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন ও সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জনের মামার বাড়ি ছিল স্বরূপনগর থানার তেঁতুলিয়ায়। তাঁর মাতামহ ছিলেন গোপাল চৌধুরী। অধুনা বাংলাদেশের সারসা থানার গোগা গ্রামে তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। বিল বল্লী এলাকায় নায়েবি করার অভিপ্রায়ে একদা তিনি গোগা থেকে তেঁতুলিয়ায় এসেছিলেন। গোপাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সন্তোষ এবং দুই কন্যা রতনমণি ও সরস্বতী। তৎকালীন সময়ে জমি-জমা দেখাশুনা ছাড়াও তেঁতুলিয়ার চৌধুরী পরিবার এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শৈশবে সুধীরঞ্জন তাঁর বাসভূমি সগুনা গ্রামের একটি পাঠশালায় পড়াশুনা শুরু করেন। সগুনার অদূরবর্তী স্বরূপনগর থানার গোবরা গ্রামের অধিবাসী বনমালী মণ্ডল ছিলেন সগুনার ঐ পাঠশালায় শিক্ষক মহাশয়। সুধীরঞ্জনরা তিন ভাই সহ সগুনা গ্রামের প্রধান পরিবারের অহিভূষণ, চিত্তরঞ্জন, পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রীনাথপুর গ্রামের বিষ্ণুপদ মণ্ডল প্রমুখ শিশুরা ঐ পাঠশালায় নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। সৌম্যদর্শন, উদারচেতা বনমালীবাবুর শিক্ষকতার সুখ্যাতি আজও সগুনা, শ্রীনাথপুর, বেড়ী গোপালপুর, তরণিপুর, গোবরা, গোবিন্দপুর, পোলতা, শাঁড়াপুল প্রভৃতি গ্রামের বয়ঃবৃদ্ধ সুপ্রাচীন মানুষের মুখে শোনা যায়।

### *খ. সুধীরঞ্জনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ও দক্ষিণ চাতরা মাইনর স্কুল*

পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে ১৯২৪ সালে সুধীরঞ্জন তাঁদের পারিবারিক আত্মীয়বর্গের জনপদ দক্ষিণ চাতরার মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। তাঁব পিতা প্রকাশচন্দ্র এই সময় তাঁর মাতৃহারা তিন শিশুপুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সুধীরঞ্জন তাঁর পিতার এই প্রয়াস সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আমার যতদূর মনে পড়ে আমি ১৯২৪ সালে ঐ মাইনর স্কুলে পড়তে যাই। আমরা তিন ভাই। বড় ভাই মনোরঞ্জনকে তিনি বসিরহাটে তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে রাখেন। মেজ ভাই নিরঞ্জনকে উত্তর চাতরায় এবং আমাকে একেবারে সূর্যকান্ত মিশ্রের বাড়িতে।"[১৫] উল্লেখ করা যায় যে, মাতৃহারা ঐ তিন শিশুপুত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ সুধীরঞ্জন তখনও পর্যন্ত সারাক্ষণ অসাধারণ ভাবে মায়ের অভাব বোধ করতেন। তবে মনোরঞ্জন ও নিরঞ্জন অনেকখানি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মায়ের শোক ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। দক্ষিণ চাতরা মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করার সময় সুধীরঞ্জন তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্রকে হারিয়েছিলেন, তখন সুধীরঞ্জনের বয়স মাত্র তেরো বছর। সুধীরঞ্জন তাঁর জীবনে নিঃস্বার্থ সমাজসেবার যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি তাঁর পিতা

প্রকাশচন্দ্র ও দক্ষিণ চাতরার বিশিষ্ট সমাজসেবী সূর্যকান্ত মিশ্রের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

*গ. চারুচন্দ্র প্রধান ও সুধীরঞ্জন*

মাতৃ ও পিতৃবিয়োগের পর তাঁর মেজ কাকা চারুচন্দ্র প্রধানই মূলত তাঁদের তিন ভাইকে লালন-পালন করতেন। তিনি খুব উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বর্ণাশ্রমের কঠোর নিয়মকানুন তিনি মানতেন না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। সেই আমলে গ্রামেগঞ্জে চিকিৎসার সুযোগ না থাকার জন্য কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগব্যাধি প্রায়ই মহামারী হিসেবে দেখা দিত। তাতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের প্রতিবছর প্রাণহানি হত। সগুনা গ্রামে সেই সময়ে এরকম কোন মহামারী দেখা দিলে চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে গ্রামের যুবকেরা মিলিত হয়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সে সময় 'পালারে পালা শমন পালা পালা' এইসব সংকীর্তন গাইতেন। এইসব সংকীর্তন দলে হিন্দুমুসলমান তথা সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অংশগ্রহণ ছিল। সুধীরঞ্জন তাঁর জীবনে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও গান - বাজনার প্রেরণা তাঁর মেজ কাকা চারুচন্দ্রের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। চারুচন্দ্র সম্পর্কে সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "প্রকাশচন্দ্র তো বটেই তাঁর মেজভাই চারুচন্দ্রও আচার-আচরণে বর্ণাশ্রম ধর্মের বাধা-নিষেধ মানতেন না। আমার মায়ের মৃত্যুর পর চারুচন্দ্রই প্রধানত আমাকে লালন-পালন করতেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান, নমঃশূদ্র, এমন কি যাঁদের আমরা অস্পৃশ্য বলি তাঁরাও ছিলেন। বিজয়া দশমীর পর তাঁরা এলে আমি পায়ের ধুলো নিতাম। চারুচন্দ্রের বন্ধুবর্গ গ্রামের রবিনহুডের দল ছিল — দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁদের কাজ ছিল। গ্রামে সেযুগে কলেরা বসন্তের মড়ক পড়লে চারুচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে সংকীর্তন গানে 'পালারে পালা শমন পালা পালা' গাইতেন। তিনি যেমন আমাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে শেখান তেমনি গান-বাজনার প্রথম পাঠও দেন।"[১৬]

*ঘ. সগুনার থিয়েটার দল ও সুধীরঞ্জন*

সগুনায় সেই যুগে একটি থিয়েটার দল গঠন করা হয়। সেই দলে বেহালা বাজাতেন প্রকাশচন্দ্র, সাতুবাবু হারমোনিয়াম, অতুলবাবু বাজাতেন ক্লারিওনেট এবং গ্রামের লোকেরা খোল, করতাল, ঢোল, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাজাতেন। পালা শুরু করার পূর্বে ঢোল, পাখোয়াজ, খোল, করতাল না বাজালে গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হত না।

সেখানে বিভিন্ন পালার অভিনয় হত। সগুনা গ্রামের অতি প্রবীণ মানুষেরা তাঁদের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে জানিয়েছেন যে, ঐ থিয়েটারের জন্মলগ্নে হরিলীলা, পথের শেষ, সপ্তম অবতার প্রভৃতি পালা অভিনীত হয়। শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন ঐসব পালায় অভিনয় করেছেন। সগুনার বয়োবৃদ্ধ মানুষেরা এখনও সেইসব দিনের কথা ভোলেননি! সগুনার থিয়েটারে মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন, সুধীরঞ্জন ছাড়াও খগেন্দ্রনাথ প্রধান, কালীপদ দেবনাথ, দাউদ পাটনি, মতি পাল, কৃষ্ণপদ পাল, চিররঞ্জন প্রধান, মৃন্ময় প্রধান, গোপাল প্রামাণিক, গোপাল পাল, অহীন্দ্রনাথ প্রধান, নীহাররঞ্জন প্রধান, নগেন্দ্রনাথ প্রধান, অমরেন্দ্রনাথ প্রধান, যতীন্দ্রনাথ মন্ডল, যুগলকিশোর মণ্ডল, কিশোর মণ্ডল, কৃষ্ণপদ প্রামাণিক, নরেন্দ্রনাথ পাল, কানাই পাল, নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ গানে, কেউ বাদ্যে, কেউ অভিনয়ে আবার কেউ মঞ্চসজ্জাতেও অংশগ্রহণ করেন। ঐ থিয়েটারে সুধীরঞ্জন হারমোনিয়াম বাজানো শিখেছিলেন। নাট্যাভিনয়ে সুধীরঞ্জন তাঁর দক্ষতা যেন জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "মনোমোহন পাঁড়ে, যাঁর মনোমোহন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাটকাভিনয় করেছেন — তাঁর ভাগনেরা থিয়েটার করবে না — এমন হতে পারে না। তার উপর চারঘাটের যোগেশ চৌধুরী যিনি পরবর্তী যুগে নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি প্রকাশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। প্রকাশচন্দ্রের জার্মানমার্কা বেহালা ছিল, সাতু কাকার হারমোনিয়াম, অতুল কাকার ক্লারিওনেট, বাঁয়া-তবলা কেউ বাজাতো কিনা মনে পড়ছে না— কিন্তু কপালীপাড়ায় ভাল খোল ছিল। সে যুগে থিয়েটারের আগে ঢোল, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাজনা না বাজালে দর্শকরা জমা হতো না। শুনেছি, সগুণার থিয়েটারে কোনো শিশুর ভূমিকায় আমাকে মঞ্চে নারীবেশী কোন পুরুষ অভিনেতা নিয়ে গিয়েছিলেন। ....আমাদের আটচালার সামনে প্রতিবছর রাশের মেলা হত।"[১৭]

সগুনার থিয়েটারে তৎকালীন যুগের খ্যাতিমান নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও অভিনয় করেছেন। যোগেশচন্দ্রের মূল বাসভূমি ছিল সগুনার অনতিদূর চারঘাট গ্রামে। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে সুধীরঞ্জনদের পরিবারের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিতে সুধীরঞ্জন লিখেছিলেন, "ছোটবেলায় সাতু কাকার কাছে এবং আমার বড় ভাই মনোরঞ্জন প্রধানের কাছে শুনেছি — সগুনার মঞ্চে যোগেশবাবু আমার বাবা ও কাকাদের সঙ্গে অভিনয় করতেন এবং 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে একটি শিশু চরিত্রে আমাকেও নামানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমার বড় ভাই-এর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। কারণ তিনি আমাদের পিতৃবন্ধু হিসেবে আমাদের স্নেহ করতেন। সে যুগের সংবাদপত্রের মতে, তাঁর জন্ম ১৮৮৭ সালে।

শুনেছি, তিনি ক্লাস নাইনে পড়ার সময় 'সীতার বনবাস' নাটক লেখেন—তাঁর মায়ের আপত্তিতে সে নাটক নষ্ট করে ফেলা হয়। আবার একথাও শুনেছি — ঐ নাটক 'শ্রীরামচন্দ্র' নামে সগুণার মঞ্চে অভিনীত হয়। আমাদের ঠাকুরমা মনোমোহন পাঁড়ের বড়দিদি ছিলেন বলে নাট্যজগতের সঙ্গে আমাদের বাবা-কাকাদের নাট্যাভিনয়ের সম্পর্ক ছিল। বস্তুত সেযুগে গ্রামের পূজা-পার্বণে কলকাতার থিয়েটারের জনপ্রিয় নাটকগুলি অভিনয় করা হত। মনোমোহন থিয়েটারের পরিত্যক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সংগ্রহ করা আমার বাবার পক্ষে সহজ ছিল এবং কাকারা চমৎকার একটি কনসার্ট পার্টি তৈরী করেছিলেন। সাতুকাকা হারমোনিয়াম বাজাতেন। ন'কাকা (অতুলচন্দ্র প্রধান) ক্লারিওনেট এবং আমার বাবা বোধ হয় বেহালা বাজাতেন। কারণ একটি জার্মাণীতে প্রস্তুত বেহালা আমাদের বাড়িতে ছিল — আমি নিজে চোখে দেখেছি। কাজেই সগুণার নাট্যমঞ্চে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম নাট্যচর্চা — একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না। ... যাই হোক, শিশিরকুমার ভাদুড়ির মুখে আমি শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' করার অনুমতি হঠাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ায় তিনি প্রায় রাতারাতি যোগেশবাবুকে দিয়ে 'সীতা' লেখালেন। আসলে সেই যে 'সীতার বনবাস' বা 'শ্রীরামচন্দ্র' — এর খসড়া সগুণার মঞ্চে হয়েছিল — আমার ধারণা, তারই ভিত্তিতে শিশিরকুমার নির্দেশিত 'সীতা' লেখা যোগেশচন্দ্রের পক্ষে সহজ হয়েছিল।"[১৮]

*ঙ. সুধীরঞ্জনের জীবনগঠনে বনগাঁ হাইস্কুল*

দক্ষিণ চাতরা মাইনর স্কুল থেকে পড়াশুনা শেষ করে সুধীরঞ্জন ১৯২৬ সালে বনগাঁ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই সময় তিনি স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকতেন। এই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ নির্ধারিত হয়ে যায়।

বনগাঁ হাইস্কুলে প্রবেশ করে স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে সুধীরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করে পুরস্কৃত হন। ঐ নাটকে অভিনয় করার সুবাদে বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র অরবিন্দ উকিলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অরবিন্দও ঐ নাটকে দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই উকিল পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কালক্রমে সুধীরঞ্জনের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। তাঁদের আদি বাসভূমি ছিল বনগাঁ অনতিদূর কুন্দীপুর গ্রামে। ঐ পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে সুধীরঞ্জনের জীবনের প্রকৃত কর্তব্যের পথ যে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ".... বনগাঁ স্কুলে ঢুকেই গরমের ছুটির আগেই স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রীতিমত প্রতিযোগিতার মারফত রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয়

করে পুরস্কৃত হই। আর এই সুবাদে পরিচিত হই দশম শ্রেণীর ছাত্র অরবিন্দ উকিলের সঙ্গে। তিনি দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আমার পরিবারের পক্ষে এই সংযোগ আমার কাল হয়েছিল — আর আমার পক্ষে মানবজন্মের প্রকৃত কর্তব্যের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।"[১৯] .

অরবিন্দের বড় ভাই ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল ছিলেন তখনকার দিনে দেশবিখ্যাত ক্ষয়রোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি বাঘা যতীনের বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইংরেজদের নজরবন্দি হয়েছিলেন। ডাঃ উকিলের ভাগিনেয় ডাঃ অমিয়কুমার বসু ছিলেন একজন হৃদরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন! ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, সেই বিদ্যালয়জীবনে মাত্র তেরো বছর বয়সে সুধীরঞ্জন ডাঃ অমিয়কুমার বসুর সান্নিধ্যে গিয়ে 'যুগান্তর' দলের সদস্য বিবেচিত হয়েছিলেন। ডাঃ অমূল্যচন্দ্রের বনগাঁর বাড়িতে 'অভীক সংঘ'এর কার্যালয় ছিল। সেখানে ছোট্ট একটি গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থাগারে আয়ারল্যাণ্ড, ইটালি ও রাশিয়ার বিপ্লবীদের জীবনী ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা নানা বই ছিল। ঐ বাড়িতে একসময় শিবাজি উৎসবে সুধীরঞ্জন স্বদেশি গান পরিবেশন করেছিলেন। ডাঃ উকিলের অন্য এক ভাই নির্মলচন্দ্র কিছুদিন বনগাঁ হাইস্কুলে সুধীরঞ্জনকে ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। সুধীরঞ্জনের লেখাপড়ার সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে লেখাপড়ার প্রয়োজনে তাঁর কাছে সব সময় যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সুধীরঞ্জন আশৈশব বর্ণাশ্রমে প্রথার ঊর্ধ্বে ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অতি সহজেই মেলামেশা করতে তিনি দ্বিধাবোদ করতেন না। অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সেই ছাত্রাবস্থাতেই জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বর্ণসম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের সম্পর্কে তিনি অতিশয় সংস্কারমুক্ত ছিলেন। বনগাঁ হাইস্কুলের ছাত্রাবাসে থাকাকালীন তিনি এই সম্পর্কে একদা এক দুঃসাহসিক ভূমিকার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ছাত্রাবাসে নিয়ম ছিল, ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা রান্নাঘরের ভেতরে বসে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং অন্যেরা বসবে বারান্দায়। সুধীরঞ্জন একদিন স্বেচ্ছায় বারান্দায় গিয়ে খেতে বসেন এবং একদিন মুসলমান ছাত্রাবাসে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এই ঘটনায় চারিদিকে তখন হৈ হৈ রব পড়ে গেল। মুসলমান ছাত্রাবাসে তিনি অন্য এক কারণে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে বনগাঁ লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মতিয়ার রহমান। তাঁর সঙ্গে সুধীরঞ্জনের পিতা প্রকাশচন্দ্রের এক সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই পরিচয়সূত্রে সুধীরঞ্জন একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর পুত্র নূরুল হুদা ছিলেন সুধীরঞ্জনের সহপাঠী। পারিবারিক সম্পর্কের এই সূত্রে তাই নূরুল হুদা সুধীরঞ্জনকে তাঁদের ছাত্রাবাসে যাওয়ার

জন্য একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই ঘটনার পরে ঐ বিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হেডপণ্ডিত মশাই সুধীরঞ্জনের ওপর ভয়ানক চটে যান। এর পূর্বে পণ্ডিতমশাই প্রায়ই সুধীরঞ্জন সহ অন্যান্য অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পূজার নৈবেদ্য এনে খাওয়াতেন। মুসলমান ছাত্রাবাসে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার অভিযোগে পণ্ডিত মশাই কালক্রমে সুধীরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর ফলে স্কুলে সংস্কৃত বিষয়ে আশানুরূপ নম্বর পাওয়া সুধীরঞ্জনের পক্ষে আর কখনও সম্ভবপর হয়নি। তবে বনগাঁ হাইস্কুলে থাকাকালীন পরপর চার বছর তিনি ইংরেজি, বাংলা ও অংক বিষয়ে ক্লাসে বরাবর প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সুধীরঞ্জন যথার্থ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জাত-পাতের বিষয়টিকে তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন, "একদিন বিকেলে ইছামতী নদীতে বোটের পোলের উপর দাঁড়িয়ে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন অব্রাহ্মণ ছাত্র আড্ডা জমিয়েছিল মুড়ি খেতে খেতে। সেখানে হাজির হয়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র সুধী প্রধান ঠোঙা থেকে মুড়ি খেতে আরম্ভ করলেন। বন্ধুরা বিস্ময়ে বললেন — এ কী করলি। গলায় পৈতে, তুই যে ব্রাহ্মণ! সুধী প্রধান তৎক্ষণাৎ তাঁর পৈতাটি ছিঁড়ে ইছামতীর জলে ফেলে বললেন এবার বল্ কী বলবি? তিনি জীবনে আর কোনদিন পৈতা ধারণ করেননি।"[২০]

বনগাঁ হাইস্কুলে বাংলার শিক্ষক ইস্হাক সাহেব ছাত্র সুধীরঞ্জনকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ দেখে ইস্হাক সাহেব একদিন তাঁকে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন, "তুমি অবশ্য লেখক হবে।" ঐ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং নতুন মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুধীরঞ্জনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। সুধীরঞ্জন পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় এঁদের দু'জনের সম্পর্কে লিখেছেন, "বনগাঁ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং নতুন মাস্টার মশাই যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে যথাক্রমে পিতা ও মাতার মত ব্যবহার করতেন। প্রধানশিক্ষক অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা অল্পই বলেছি। কিন্তু আমি জানতাম সব সময়ে আমার প্রতি সস্নেহ নজর রাখছেন। নতুন মাস্টারমশাই ক্লাসে অত্যন্ত গম্ভীর এবং অত্যন্ত সফল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু খেলার মাঠে সমবয়সীর মত ব্যবহার করতেন।"[২১]

এই নতুন মাস্টারমশাই বিদ্যালয়ের উৎসাহী ছেলেদের নিয়ে জনসেবামূলক কাজকর্ম কী ভাবে করতে হয় তা হাতে কলমে শেখাতেন। উল্লেখ্য, সেই সময় শহরে কলেরা

ও বসন্ত রোগ প্রায়ই মহামারী আকারে দেখা দিত। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহায্যের জন্য ছাত্রাবাসে এলে সুধীরঞ্জন সহ অন্যান্যরা পালাক্রমে সেইসব রোগীর সেবা করতেন। অনেক সময় মৃতদেহ সৎকারের জন্যও তাদেরকে এগিয়ে আসতে হত। নতুন মাস্টারমশাই-এর দারুণ উৎসাহে তাঁর বাসস্থানের সামনে সুধীরঞ্জন এবং অন্যান্য ছাত্রেরা মিলিত হয়ে একটি ব্যায়ামাগার, একটি ছাত্র সমিতি ও একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে তাঁরা নানা প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সুধীরঞ্জন পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, "নতুন মাস্টার মশায়ের বাসার সামনে কিছু জায়গা ছিল। সেখানে আমরা ব্যায়ামাগার করি এবং তার বাইরের ঘরে ছাত্রসমিতি গঠন করে লাইব্রেরী করি। সেই 'অভীক সংঘ'-এর বইগুলি আনি। তাছাড়া, কিছু বই কিনি। পয়সার জন্য আমরা শনি রবিবারে উকিল মোক্তারদের বাড়ির খোলা জমি কুপিয়ে বেড়া বেঁধে দু'তিন টাকা পারিশ্রমিক পেতাম। আমাদের কাজের উদ্দেশ্য জেনে তাঁরা আনন্দের সঙ্গে মুড়ি গুড় খাইয়ে দু' এক টাকা দিতেন। তাছাড়া, একবার আমরা কলকাতা থেকে বিখ্যাত বিষ্ণু ঘোষের দলকে এনে তাদের প্রদর্শনী মারফৎ চাঁদা তুলেছিলাম। উকিল বাড়ির ডাঃ বিমল উকিল ও ডাঃ সুকুমার এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এইসব কাজের পিছনে নতুন মাস্টারমশায়ের প্রেরণা ছিল"[২২]

বনগাঁ হাইস্কুলে পড়তে পড়তে সুধীরঞ্জন বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শুরু করেন। ১৯২৭ সালে বসিরহাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যোগদান করেন। তিনি ঐ সম্মেলনে ডাঃ অমিয়কুমার বসুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুধীরঞ্জনের সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের একে একে পরিচয় ঘটে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাই এবং প্রথম বাঙালি যিনি লেনিনের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাছাড়া, ফিলিপ স্প্র্যাট ছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। তিনি এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার করতে এসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন। বনগাঁর কংগ্রেস নেতা ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে একসময় সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে সুধীরঞ্জনের পরিচয় হয়। কালক্রমে তৎকালীন স্বদেশী দলের নেতাদের কাছে সুধীরঞ্জন বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কর্মতৎপরতা, সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার বলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সমবয়সী বন্ধুদেরও তিনি এইসব রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "স্বদেশী দলের নেতাদের কাছে সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে আমার প্রথম রিক্রুট ছিলেন অজিত

গাঙ্গুলী। তাঁকে নিয়ে একদিন বনগাঁ থেকে সরাসরি যশোর রোড ধরে ১২ ঘন্টা হেঁটে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম।"২৩

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুণ তাঁর কাকা চারুচন্দ্র প্রধান ছাত্রাবাসে তাঁকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। তার ফলে ছাত্রাবাস ছেড়ে তাঁকে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সুধীরঞ্জন তাঁর পুত্রকে পড়াতেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সকলেই তাঁকে তাঁদের পুত্রের মত ভালবাসতেন। বছরখানেক পরে তিনি আবার ছাত্রাবাসে চলে আসেন। পরবর্তীকালে বনগাঁয় থাকাকালীন শেষদিন পর্যন্ত তিনি ডাঃ অমিয়কুমার বসুর বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। ডাঃ অমিয়কুমার বসুর পিতা ছিলেন সুধীরঞ্জনের পিতা প্রকাশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডাঃ বসু ইতিমধ্যে তাঁর পিতা, মাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে সুধীরঞ্জনের আলাপ করিয়ে দেন। এর পরে ডাঃ বসু উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে চলে যান। বিলেতে যাওয়ার পূর্বে তিনি বিপ্লবী রসিক দাসের সঙ্গে সুধীরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকতেন। তাই চিঠি দিয়ে তাঁর আর এক সহযোগী বন্ধু ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়কে বনগাঁয় গিয়ে সুধীরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। ডাঃ নারায়চন্দ্র রায় অনতিবিলম্বে ডাঃ অমিয়কুমার বসুর বনগাঁর বাড়িতে গিয়ে সুধীরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়ের সহায়তায় সুধীবঞ্জন ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেই অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর তিনি পার্শ্বরক্ষী বা এডিকং নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় লাহোর জেলে অনশন করে বিপ্লবী যতীন দাস মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যতীন দাসের এই মৃত্যুর খবর পেয়ে সুধীরঞ্জন বনগাঁ থেকে তাঁর দুই বন্ধু সোহরাব ও অজিত গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় প্রথমে ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়ের বাড়িতে যান এবং সেখান থেকে যতীন দাসের শ্মশানযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কলকাতার পথে সেই প্রথম ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যায়।"

## চতুর্থ অধ্যায়

### *ক. দেশের মুক্তি আন্দোলন ও সুধীরঞ্জন*

বনগাঁ হাইস্কুলের শিক্ষা শেষ করে সুধীরঞ্জন ১৯৩০ সালে কলকাতার গোয়াবাগানে মনোমোহন পাঁড়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়বার জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজে গিয়ে ভর্তি হন।

সেই বছর ২৭শে আগস্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ একই অভিযোগে এর দুদিন আগে অর্থাৎ ২৫শে আগস্ট ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য, ডাঃ রায়ের বাড়িতে বোমা তৈরি করে একদা টেগার্ট সাহেবের গাড়িতে সেই বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই ঘটনায় আরও যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সুধীরঞ্জনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়ায় ইংরেজ সরকার তাঁকে গুরুতর কোনো শাস্তি না দিয়ে কেবলমাত্র বন্দি করে রাখার নির্দেশ জারি করে। ১৯৩৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন জেলখানা, হিজলি বন্দি শিবির এবং নদিয়ার চাপড়া ও উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে নজরবন্দি করে রাখা হয়। জেলখানায় থাকাকালীন সুধীরঞ্জন দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন এবং বিশিষ্ট মার্কসবাদী ব্যক্তিত্ব রেবতী বর্মণের প্রেরণায় মার্কসীয় ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। উল্লেখ করা যায় যে, স্বরূপনগর থানায় নজরবন্দি থাকার সময়ে তিনি বিল বল্লীর খাস মহলের বিভিন্ন এলাকার প্রজাদের খাজনা মকুব করার লক্ষ্যে একটি ইস্তাহার প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই প্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইংরেজ সরকার সেই সময় স্বরূপনগর থানার দশটি গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩৩ সাল। সেই সময় সুধীরঞ্জন স্বরূপনগর থানা থেকে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে কমল সরকার, মনোরঞ্জন রায়, আছমাতুল্লা সাহেব, নিত্যানন্দ চৌধুরী প্রমুখ কৃষকনেতাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তখনকার দিনে গ্রামের কৃষকসাধারণ ১৪৪ ধারার মূল অর্থ বুঝতেন না। তাই তাঁরা দলে দলে তহশিলদারের কুঠির দিকে আসতে থাকেন। স্বরূপনগর থানা এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সেই সময় সুধীরঞ্জনের অসামান্য ভূমিকা ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সুধীরঞ্জন লিখেছেন, "এটা ১৯৩৩ সালের কথা এবং বিনীতভাবে দাবি করি ঐ অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনে প্রথম চাঞ্চল্য আমার জন্য। কৃষকরা তো ১৪৪ ধারা কাকে বলে জানে না। তাঁরা দলে দলে খাস মহলের তহশিলদারের কুঠির দিকে আসতে থাকেন! আর আমার স্বেচ্ছাসেবক ভদু দফাদার, ফণী মোল্লা তাঁদের বারণ করতে থাকে। ওরা আজ কেউ বেঁচে নেই। 'বসিরহাট হিতৈষী পত্রিকায় এই সংবাদ বেরিয়েছিল কিন্তু তার কপি অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। কিছু পুরনো লোকের স্মরণে থাকতে পারে।"[২৪]

নদিয়া জেলার চাপড়া থানায় নজরবন্দি থাকার সময়ে ১৯৩১ সালে একদিনের জন্য প্যারোলে অর্থাৎ পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়ে সগুনায় নিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহ রাজেন্দ্রনাথ প্রধানকে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

মনোমোহন পাঁড়ের চেষ্টায় সুধীরঞ্জন এই সুযোগ লাভ করেছিলেন। সুধীরঞ্জন যখন সগুনায় গিয়েছিলেন তখন মনোমোহন পাঁড়েও সগুনায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তিনি দুঘন্টা পিতামহের কাছে ছিলেন। পিতামহ তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি সত্য পথে আছ। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সফল হবে।" সুধীরঞ্জন পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় পিতামহের ঐ আশীর্বাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "সত্য পথে থাকা যে কী কঠিন কাজ তা কি তিনি জানতেন না? যিনি নিজের প্রথম কৃতী সন্তানের মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নি, তাঁর চোখে সেদিন জল দেখলাম। জানি না, সত্যের কঠোর পথে চলার নির্দেশ তাঁর প্রিয় নাতিকে দিতে তাঁর চোখ অশ্রুসজল কেন হল!"[২৫]

১৯৪২ সালে তাঁর পিতামহীর অসুস্থতার খবর পেয়ে সুধীরঞ্জন সস্ত্রীক সগুনায় গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর দীর্ঘদিনের পুরনো সহকর্মী পার্শ্ববর্তী শ্রীনাথপুর গ্রামের বিষ্ণুপদ মন্ডলের আহ্বানে তাঁর বাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর আগমন উপলক্ষে বিষ্ণুপদ মন্ডলের বাড়িতে সেদিন এক সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে সুধীরঞ্জন সস্ত্রীক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপদ মন্ডল ছাড়াও ঐ গ্রামের নরেন্দ্রনাথ খাঁর সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও নরেন্দ্রনাথ খাঁর যে অসামান্য অবদান ছিল সে সম্পর্কে সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "আমাকে কত ঘাটে জল খেয়ে মার্কসবাদী হতে হয়েছে, কিন্তু সে (বিষ্ণুপদ মণ্ডল) গ্রামে থেকেই গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন দিনের আদর্শ প্রচার করেছে, বার বার জেলে গেছে এবং আজ তার পরিবারের যে অবস্থাই হোক্, সে যে আবহাওয়া সৃষ্টি করে গেছে প্রয়াত নরেন খাঁ প্রমুখকে নিয়ে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে তা আমার কাজের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান।"[২৬]

### *খ. মুজফ্ফর আহমেদের সাহচর্যে সুধীরঞ্জন ও শান্তি রায়*

কারাবাসের জীবন শেষ করে সুধীরঞ্জন মুজফ্ফর আহমেদের সাহচর্য লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে মুজফ্ফর আহমেদের পরামর্শে তাঁর ব্যক্তিগত সহায়িকা শান্তি রায়ের সঙ্গে সুধীরঞ্জন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের পাশে সহধর্মিণী হিসেবে শান্তি রায়ের আগমন এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শান্তি রায়ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। শান্তি রায়ের অকাল মৃত্যুতে ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'শান্তি রায়ের পরিচিতি' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, "বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে সিলেটে শান্তি রায়ের জন্ম। পৈতৃক ভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ থানার

অন্তর্গত ভগবাননগর নামক গ্রামে। পিতা প্রয়াত প্রমথবন্ধু রায় আসামের একটি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম পঙ্কজিনী দেবী। তিনি অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান বলে ছোট ভাইদের মানুষ করার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। ছোট ভাই পবিত্র রায় 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর দিদি শান্তি রায়কেও ওই দলে নিয়ে আসেন। সেখানে সরকারবিরোধী কার্যকলাপ করার জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩২-৩৩ সালে ভাই-এর সাথে দিদিও গ্রেপ্তার হন এবং ১৪ মাস বাংলার বিভিন্ন জেলে বন্দী জীবনযাপন করেন। জেলে থাকাকালে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলায় অভিযুক্ত শান্তি দাস ও সুনীতি ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কিছুদিন আসামের গোয়ালপাড়ায় কংগ্রেসের বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারে কলকাতায় চলে আসতে হয়। সেখানে বিমলপ্রতিভা দেবীর আশ্রয়ে থেকে কংগ্রেসের কাজ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভাই পবিত্র রায় সাত বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসামে সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ার কাজে নিযুক্ত হন। জেলে বন্দী থাকাকালে পবিত্র রায় ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান। সেই সূত্রে ১৯৩৬-৩৭ সালে নাটোরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে মুজফ্ফর আহমেদের সাথে শান্তি রায়ের প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি কলকাতায় এক প্রসূতিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংযোগ রাখতেন। এই সময় সন্দেহক্রমে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দেয়। প্রসূতিবিদ্যা শিক্ষার সময় তিনি পায়ে আঘাত পান। পায়ের হাড় ভেঙে যায়। ফলে তিনি এক বছরের বেশিকাল শয্যাশায়ী থাকেন। এর আগেই পবিত্র রায়ের জেলের সাথী সুধী প্রধানের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর ভাঙা পা যখন সেরে যায় তখন সুধী প্রধান তাঁকে বিয়ে করে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রে মুজফ্ফর আহমেদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই গোপন কেন্দ্রে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল্লা রসুল, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী ও তদীয় পত্নী বেলা লাহিড়ী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বপ্রথম মুজফ্ফর আহমেদকে 'কাকাবাবু' বলে সম্বোধন করেন এবং সেই থেকেই পরবর্তীকালে মুজফ্ফর আহমেদ সবার 'কাকাবাবু' হয়ে ওঠেন। কাকাবাবু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি নিজ কন্যা ও একমাত্র শান্তি প্রধানকে ছাড়া আর কাউকে 'তুমি' সম্বোধন করতেন না। তিনি ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির মহিলাদের নিয়ে আন্দোল করেন এবং আমৃত্যু কমিউনিস্ট মতবাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রে কাকাবাবু কিভাবে পার্টি কর্মীদের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতেন এবং তাদের

দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কীরূপ উদ্‌গ্রীব থাকতেন সে কথা কাকাবাবুর মৃত্যুর পর 'বাংলাদেশ' ও 'একসাথে' নামক দু'খানি পত্রিকায় চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়ে শান্তি প্রধান দু'টি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর উৎসাহে ও চেষ্টায় সুধী প্রধানের Marxist Cultural Movement in India গ্রন্থখানি প্রকাশিত হতে পেরেছে। তিনি সব সময় এরূপ সহযোগিতা দিতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে সুধী প্রধান বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ক'রে যেতে পারেন। . . . . . তিনি রেখে গেছেন পুত্র জয়ন্ত প্রধান, পুত্রবধূ রুবি প্রধান, জামাতা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যা মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নাতি সোমসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী।"[২৭]

*গ. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সুধীরঞ্জন*

স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সুধীরঞ্জনকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রেখে ডাক্তারি পড়ার অনুমতি দেয় ইংরেজ সরকার। ১৯৩৮ সালে তাঁর ওপর থেকে যাবতীয় সরকারী নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে তিনি সে যুগের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৯ সালে বিহারে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে শহীদ ভগৎ সিং-এর অন্যতম সহকর্মী কমলনারায়ণ তেওয়ারির সঙ্গে ত্রিপুরী অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। দলের নির্দেশে কলকাতায় ফিরে এলে সুধীরঞ্জনকে দলের সাপ্তাহিক 'আগে চলো' পত্রিকার ম্যানেজার করা হয়। সেই সময় অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতা প্রভাস রায়, হেমন্ত ঘোষাল, মনোরঞ্জন শূর প্রমুখের সঙ্গে প্রতি শনিবার ও রবিবার সুন্দরবন এলাকা ছাড়াও স্বরূপনগর, আটুরিয়া, তেঁতুলিয়া, কাটিয়াহাট, সংগ্রামপুর প্রভৃতি এলাকাতে নিয়মিত পরিক্রমা করতেন। সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া ঐসব অঞ্চল পরিক্রমার সময়ে সুধীরঞ্জন মানুষের লোকায়ত সংস্কৃতির হৃত তথ্য অনুসন্ধানে গভীর মনোযোগী হতেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি স্বরূপনগর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে বাইরের সংগঠনগুলির অন্যতম সংযোগরক্ষাকারী হিসেবে তিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। রাজনৈতিক কৌশল গৃহীত হওয়ার পর তাঁরই চেষ্টায় পার্টি 'পিপলস্ ওয়ার' বা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা প্রকাশ করে। পার্টির প্রথম দৈনিক 'স্বাধীনতা'-র সহযোগী সম্পাদক তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সুধীরঞ্জন ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের বাংলা প্রাদেশিক কমিটির তিনি অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৫ সালে সুধীরঞ্জন মঞ্চ,

সিনেমা, গ্রামোফোন ও বেতার শিল্পীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালের এক ধর্মঘটে তিনি কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্রকে কয়েকদিন কেবল গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাতে বাধ্য করান। ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে গোটা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাট্যপ্রেমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সুধীরঞ্জনের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের স্বাধীনতালাভের পরেও তাঁকে এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গীত ও নাট্য আকাডেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি নানাভাবে তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুধীরঞ্জন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের নানা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া, ভারত চীন মৈত্রী সমিতি ও ভারত রুশ মৈত্রী সমিতির সঙ্গেও সুধীরঞ্জন সক্রিয় সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল আর্টিস্টস্ এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন সংগঠক সম্পাদক। রাজনৈতিক কারণে সুধীরঞ্জন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালেও গ্রেপ্তার বরণ করেন।

দুবছর ডাক্তারি পড়ার সুবাদে তিনি পার্টির রেড-এইড হাসপাতাল গড়ে তুলতে অনেক সহায়তা করেছিলেন। সুধীরঞ্জন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তাছাড়া, চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের নিয়ে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি সহ-সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে তিনি বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বার্লিন, মস্কো, এথেন্স শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দেন। এই সংগঠনের কাজে আমেরিকাতে দুবার এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি অন্তত নয় বার পরিভ্রমণ করেছেন। ভিয়েনাতে স্থাপিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসবেত্তাদের প্রতিষ্ঠানে তিনি আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই প্রতিষ্ঠানে সুধীরঞ্জন বিভিন্ন সময়ে অন্তত ছয়বার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুধীরঞ্জন বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিল্ম্ সেনসর বোর্ড, ফিল্ম্ অ্যাডভাইসরি বোর্ড ও লোকশিল্প কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

*ঘ. বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনায় সুধীরঞ্জন*

বিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই সুধীরঞ্জন নানা প্রসঙ্গে নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। সমকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও রাজনীতি নিয়ে তিনি নিজস্ব মনোভঙ্গী ব্যক্ত করেছেন। ১৯৩৯ সাল থেকে তাঁর লেখা বই প্রকাশিত হয়। মার্কস্, লেনিন ও স্টালিনের রচনার তিনি সাবলীল অনুবাদ করেন। রজনী পাম দত্তের 'বর্তমান ভারত'-এরও তিনি

মর্মগ্রাহী আলোচনা করেন। ১৯৪৫ সালে সুধীরঞ্জনের লেখা 'বাংলার লোককবি' বইখানি লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কস্‌বাদী লেখকদের প্রথম গ্রন্থ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে 'Nildurpan and the trial of Rev. James Long' বইখানিতে বিস্তৃত টীকা সহ দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটকটি অনুবাদ করে বাংলার চিরায়ত নাট্যকীর্তিকে তিনি বিদেশি পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। 'কৃষি ভারতের নগ্নরূপ' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকসমাজের অন্তহীন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। 'শিল্প ভারতের প্রতিরোধ' গ্রন্থে সুধীরঞ্জন দেশের তৎকালীন শিল্প সম্ভাবনার প্রতিবন্ধকতার নানা দিক ব্যক্ত করেছেন। রুশবিপ্লবের প্রেক্ষাপট অবলম্বনে তিনি 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কী' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। প্রগতিশীল মার্কসীয় ভাবধারায় বহুকাল ধ'রে এদেশে যে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়ে আসছে তার সুবিস্তৃত তথ্য দিয়ে তিনি তিন খন্ডে বিন্যস্ত 'Marxist Cultural Movement in India' নামক বইখানি রচনা করেন। দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে সুধীরঞ্জন রচনা করেছিলেন 'সংস্কৃতির প্রগতি' গ্রন্থখানি। গণনাট্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ওপর তিনি 'People's Theatre : Romain Rolland. First Indian Edition গ্রন্থে অনুবাদের সঙ্গে একটি তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা করেছেন। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে তিনি সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষে 'সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকের মর্মার্থকে সকলের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে সুধীরঞ্জন 'নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব' শীর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেন। সাম্প্রতিক নাট্যসংস্কৃতির ওপর নানা তথ্য দিয়ে তিনি 'গণ-নব-সৎগোষ্ঠী নাট্যকথা' গ্রন্থখানি রচনা করেন। দেশের মুক্তিসংগ্রামকে সার্থক করতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তিবৃদ্ধির রণকৌশল অবলম্বনে সুভাষচন্দ্র বসুর অসামান্য ভূমিকার ওপর সুধীরঞ্জন 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি' গ্রন্থখানি রচনা করে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। কৃষিভাবতের সংগ্রামী জনসাধারণের অসাধারণ ভূমিকা ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রবহমান ভাবধারায় সুভাষচন্দ্রের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের ওপর সুধীরঞ্জন লিখেছিলেন 'বঙ্গসংস্কৃতি সুভাষচন্দ্র ও তেভাগা সংগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থখানি। এটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

### *৬. নাট্যাভিনয়ে সুধীরঞ্জন ও নাট্যব্যক্তিত্ব অর্জনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব*

সুধীরঞ্জন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। অভিনয় প্রদর্শনে তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে

পৌঁছে দেয়। বাস্তবধর্মী অভিনয় প্রদর্শনে সুধীরঞ্জন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিনয় করার সুবাদে তিনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন প্রমুখ দেশের বহু কীর্তিমান নাট্যব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

উল্লেখ করা যায় যে, 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের জন্য নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', মধুসূদনের নাট্যসাহিত্যের চিরায়ত ঐতিহ্যকে দক্ষ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে সুধীরঞ্জন বাংলার লোকায়ত নাট্যসংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় প্রদর্শনে বাস্তবতা সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি শৈশবকাল থেকে সগুনার থিয়েটার, নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নাট্যপ্রেমিক মনোমোহন পাঁড়ে ও তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

সগুনার থিয়েটারে সুধীরঞ্জনের বাবা ও কাকাদের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করেছেন। সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের একটি শিশু চরিত্রে তাঁকেও নামানো হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র ছিলেন প্রকাশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেইজন্য তিনি সুধীরঞ্জনকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। সুধীরঞ্জন বলেছেন যে, তাঁর ঠাকুরমা মনোমোহন পাঁড়ের বড়োদিদি ছিলেন বলে নাট্য জগতের সঙ্গে তাঁর বাবা ও কাকাদের সম্পর্ক অনেকটা জন্মসূত্রে পাওয়ার মতো ছিল। কলকাতার মনোমোহন থিয়েটারের পরিত্যক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সংগ্রহ করা প্রকাশচন্দ্রের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার ছিল এবং সগুনায় তাঁর বাবা ও কাকারা সকলে মিলে একটি চমৎকার কনসার্ট পার্টি তৈরি করেছিলেন। সুধীরঞ্জন বলেছেন যে, তাঁর সাতুকাকা হারমোনিয়াম, অতুলকাকা ক্লারিওনেট এবং তাঁর বাবা প্রকাশচন্দ্র বেহালা বাজাতেন। কেননা, সুধীরঞ্জন পরবর্তীকালে তাঁদের বাড়িতে জার্মান মার্কা একটি বেহালা থাকতে দেখেছেন।

নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সুধীরঞ্জনের আশৈশব আগ্রহ ছিল। জন্ম ও পারিবারিক সূত্রে পাওয়া তাঁর এই নাট্যপ্রীতি পরবর্তীকালে বাংলার নাট্যসংস্কৃতির পরিপুষ্টিদানে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। সগুনার অদূরবর্তী চারঘাট গ্রামের বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার তাঁর পিতৃবন্ধু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে সুধীরঞ্জনের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তার ফলে যোগেশচন্দ্রের অভিনয়কৌশল ও নাট্যরচনা রীতি সুধীরঞ্জনকে সেই শৈশবকাল থেকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

দেশের চিরায়ত সংস্কৃতির ওপর যোগেশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। এর ফলে তাঁর অধিকাংশ নাট্যাখ্যানে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনয়রীতিতে বাস্তবতাবোধ সৃষ্টি করতে যোগেশচন্দ্র সেই যুগে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুধীরঞ্জন তাঁর অতি শৈশবকাল থেকে যোগেশচন্দ্রের এই নাট্যপ্রতিভার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে চারঘাট যোগেশ পাঠাগার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুধীরঞ্জন নিজে উপস্থিত হয়ে যোগেশচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। এই উপলক্ষে এক স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত এক নিবন্ধে সুধীরঞ্জন যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়ে লিখেছিলেন, "সে যুগের সংবাদপত্রের মতে তাঁর জন্ম ১৮৮৭ সালে। . . . . ১৯০৮ সালে টাকী ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রোপলিটানে এফ্. এ পড়ার সময় তিনি গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র দানীবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় তিনি কয়েকটি দেশাত্মবোধক নাটক লেখেন। এই বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। তাঁর পরিবারের কারও কাছে পাণ্ডুলিপি থাকলে তা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তেমনি শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। আমরা এইটুকু জানি যে, তিনি শিশির কুমারের আমন্ত্রণে 'তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী'-তে যোগ দেন এবং 'আঁধারে আলো' ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯২৪ সালের ৬ই আগস্ট মনোমোহন থিয়েটারে শিশিরকুমারের প্রযোজিত 'সীতা' নাটক বাংলা নাট্যাভিনয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যোগেশবাবু ওই নাটকে শম্বুক চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের মুখে শুনেছি — তিন রাত্রি অভিনয় করার পর সেই চরিত্র প্রফুল্লবাবু করেন। ব্যাপারটি কতখানি সত্য তা হয়তো সে যুগের সংবাদপত্র ও থিয়েটারের হ্যান্ডবিল থেকে জানা যাবে। তবে আমার যতটা জানা আছে যে, যোগেশবাবুর বাস্তববাদী অভিনয়ধারা ওই চরিত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আমি অত্যন্ত অল্প বয়সে এই অভিনয় দেখেছি। কিন্তু শিশিরকুমাররূপী রামের সামনে যে অভিনয়ের দ্বারা শম্বুকের চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা আজও আমার মনে আছে। কারণ দাদামহাশয়ের থিয়েটার হলে আমি পরপর কয়েক রাত্রি এই নাটক দেখেছি। এই নাটকে শিশিরকুমার যে পদ্ধতিতে অভিনয় করেছিলেন তাকে কাব্যিক অভিনয় বলা যায়। যতদূর জানি, তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' নাটকে যোগেশচন্দ্র শেষ অভিনয় করেন। যোগেশচন্দ্রের নাট্য রচনার আর একটি কীর্তি 'দিগ্বিজয়ী', যা এযুগের দর্শকরা অনেকেই দেখতে পেলেন না। আমি শিশিরকুমারের জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁকে বার বার অনুরোধ করেছি — এই নাটক অভিনয় করানোর জন্য। কারণ এই নাটক বাংলা নাট্যপ্রয়োজনার ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্যজনক জিনিস

ছিল। যেমন অভিনয়ে তেমনি মঞ্চ প্রয়োগে এই নাটক সে যুগের দর্শকদের অভিভূত করে। শিশিরকুমার বলতেন — যে ধরণের অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে তিনি 'দিগ্বিজয়ী' প্রয়োজনা করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে তেমন লোক তাঁর চোখে পড়ছে না। আমার প্রবল আগ্রহ ছিল সন্তোষ ও কানু বন্দোপাধ্যায়ের সাহায্যে নাটকটি অভিনয় করানো। তাঁরা রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু নানা ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য আমি একাজ করতে পারিনি বলে আমার আজও আফশোষ হয়। এই দুটি নাটক ছাড়া তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া', 'মহামায়ার চর', 'পরিণীতা', 'নন্দরাণীর সংসার', 'মীরাবাঈ', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'প্রতাপাদিত্য,', 'তুলসীদাস', 'ফুল্লরা', 'বিরহ মিলন', 'কৃষ্ণ সুদামা', 'মাকড়সার জাল', 'নাদির শা', 'রাবণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, 'মহানিশা', 'পতিব্রতা', 'অচল প্রেম', 'বাংলার মেয়ে', 'পথের সাথী', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতির নাট্যরূপ দিয়েও তিনি যথেষ্ট সুনাম পান। আর কত ছবিতে অভিনয় করেছেন যার মধ্যে নির্বাক যুগে 'চন্দ্রনাথ' ও 'বিচারক' এবং সবাক্ যুগে 'পল্লীসমাজ', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'পন্ডিতমশাই', 'মহানিশা', 'পথের শেষে', 'গ্রহের ফের', 'বড়দিদি', 'পাষাণ দেবতা', 'নন্দিনী', 'গরমিল', 'মিলন', 'শেষ উত্তর' প্রভৃতি। 'পরিণীতা'-তে কাজ করতে করতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও-তে অসুস্থ হ'য়ে একদিনের রোগভোগের পর ১৯৪২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর যোগেশচন্দ্র মারা যান।

আমরা যারা বাস্তববাদী অভিনয়ের পদ্ধতি পছন্দ করি যোগেশচন্দ্র তাঁদের কাছে আদর্শ ছিলেন। শিশিরকুমারও বাস্তববাদী অভিনয় পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর কাব্যিক অভিনয়ের প্রতি একটা সহজাত প্রবণতা ছিল। কিন্তু সামাজিক নাটকগুলিতে তিনি সম্পূর্ণ বাস্তববাদী অভিনয় করতেন। এইজন্য যোগেশচন্দ্রকে তিনি শুরু থেকেই কাছে টেনেছিলেন। যোগেশবাবু তাঁর সঙ্গে আমেরিকাতেও যান। অনেকের ধারণা, বাস্তববাদী অভিনয় বুঝি স্বাভাবিকভাবে সংলাপ বলা। মঞ্চে কিছুই স্বাভাবিক নয়। অন্ততঃ চড়া গলায় না বললে তা দর্শক শুনতে পাবে না। আবার স্বগতোক্তিও এমনভাবে বলা চাই, যা প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারির দর্শকরা শুনতে পায়। তাছাড়া, হাবে-ভাবে চলাফেরায় গোটা দৃশ্যের সংগঠনে স্বাভাবিকতার ভ্রম সৃষ্টি করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য জিনিস। পাগলের ভূমিকা, মাতালের ভূমিকা, সাধারণ জীবনের তুলনায় অস্বাভাবিক চরিত্রে অভিনয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যোগেশবাবু সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করার অভিনয়দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ব'লে বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"[২৮]

*চ. সুধীরঞ্জনের জীবনাবসান — বিভিন্ন সংস্থার স্বীকৃতিদান — লোকসংস্কৃতির প্রসার এবং সগুনা ও তৎসন্নিহিত জনপদের উন্নয়নে সুধীরঞ্জন*

১৯৯৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর রবিবার দুপুর ১·৪৫ মি. উত্তর কলকাতার ক্যাপিটাল নার্সিং হোমে সুধীরঞ্জন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। হাঁপানিও বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে তিনি দীর্ঘদিন ধ'রে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

সুধীরঞ্জনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'গণশক্তি'-তে বলেছেন, "বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত।... সুলেখক, সুসংগঠক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের সরকারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রকল্পের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত।.... তাঁর মৃত্যুতে আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষতি হ'ল।" পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর শোকবার্তায় 'গণশক্তি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ঘরে ব'সে থাকা চিন্তাবিদ্ তিনি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারলে চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ করা যায় না। তিনি নিজেই একটা ইতিহাস।"

জীবনের শেষদিকে প্রিয়জনবিরহ সুধীরঞ্জনকে অনেকখানি নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। শৈশবে মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তেরো বছর বয়সে পিতাকে হারান। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর মেজদা নিরঞ্জন প্রধানকে হারিয়েছিলেন। অনেকটা বার্ধক্যে এসে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯৮৬ সালে ২২শে মে তাঁর সহধর্মিণী শান্তি প্রধানের জীবনাবসান হয়। এরপর ১৯৮৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর বড়দা মনোরঞ্জন প্রধান ইহলোক ত্যাগ করেন। সবশেষে তাঁর একমাত্র কন্যা মিতালি প্রথমে স্নায়বিক রোগে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে পরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯০ সালের ২০শে অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিতালির বিয়ে হয় ১৯৭৭ সালে। তাঁদের একমাত্র সন্তান সোমসুন্দরকে নিয়ে বার্ধক্যে এসেও শোকতপ্ত সুধীরঞ্জন নানা স্থান পরিক্রমা করেছেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদের মধ্যে বর্তমানে তাঁর মেজবৌদি রঞ্জিতা প্রধান একমাত্র জীবিত আছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র জয়ন্ত ও পুত্রবধূ রুবি প্রধান দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। স্ত্রীবিয়োগের পর সুধীরঞ্জন তাঁর কন্যা ও জামাতার বিধাননগরের বাসভবনে থাকতেন। এর পূর্বে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি গোয়াবাগান, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, এনটালি, পার্কসার্কাস, নিউআলিপুর প্রভৃতি স্থানে সপরিবারে বসবাস করেছেন। সবশেষে রাজ্য সরকার প্রদত্ত বিধাননগরের শ্রাবণী আবাসনে বসবাস করেছেন।

সুধীরঞ্জনের বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর লেখা 'Marxist Cultural Movement in India' গ্রন্থখানির জন্য রাজ্য সরকার তাঁকে ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করে।

বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে দুঃস্থ লোকশিল্পীদের উপযুক্ত মর্যাদাদানে সুধীরঞ্জন রাজ্য সরকারকে নিরন্তর পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে সাক্ষরতা ও লোকসংস্কৃতির প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে তিনি রাজ্য সরকারকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। কলকাতার ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে কালিকাপুরে ৩০ একর জমির ওপর লোকসংস্কৃতি গ্রাম ও লোকসংস্কৃতি ভবন গ'ড়ে তোলার উদ্যোগ সর্বতোভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রসারে তিনি গভীরভাবে প্রয়াসী ছিলেন।

তাঁর প্রিয় জন্মভূমি সগুনা ও স্বরূপনগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সুধীরঞ্জন আমৃত্যু বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বেও তিনি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনাথবন্ধু মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ অজয় ভট্টাচার্য, বিধায়ক মোস্তাফা বিন কাসেম, সমাজসেবী গোলাম মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নীহারেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রমেশ গাইন, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বরূপনগর থানার রাস্তাঘাট, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রভৃতির সামগ্রিক উন্নয়নে তেঁতুলিয়া, হাকিমপুর, বিথারী প্রভৃতি জনপদে গিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। সরকারের কল্যাণকামী কর্মসূচী সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্য দিয়ে কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানো যায় সুধীরঞ্জন সেই সম্পর্কে সহজ সরল পন্থা অবলম্বনের জন্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারী আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর জন্মস্থান সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধিবাসীদের দুর্দশামোচনে সুধীরঞ্জন নিরন্তর প্রয়াসী ছিলেন। সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে শ্রীনাথপুর থেকে লবণগোলা পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি পাকা সড়ক নির্মাণে লবণগোলায় যমুনাসেতুর পাদদেশে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন। সম্মিলিত গ্রামবাসীদের কাছে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সুধীরঞ্জন বলেছিলেন যে, অতি শৈশবে দক্ষিণ চাতরা মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করার সময়ে তিনি ঐ রাস্তা দিয়ে সগুনা থেকে যাতায়াত করতেন। তখনকার দিনে সগুনা থেকে চাতরা

পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটাই ছিল কাঁচা। কী দুঃসহ পরিশ্রম হত বর্ষার দিনে! এখনও সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজন সেই কাঁচারাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। এবিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানান। এর পূর্বে সুধীরঞ্জন তাঁর গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত কবার লক্ষে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য উভয়েই সুধীরঞ্জনের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে ঐ বিদ্যালয়টির মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। ঐ বিদ্যালয়টি সগুনার চিত্তরঞ্জন প্রধান ও অহিভূষণ প্রধান এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সহায়তায় ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ কর্মসূচীতে বিদ্যুৎবিহীন সগুনা গ্রামটিকে বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়ার জন্য তিনি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ্‌ ও জেলা পরিষদ্‌কে অনুরোধ করেছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত তথা স্বরূপনগরবাসীর দুঃখদুর্দশা মোচনে সুধীরঞ্জন রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এজন্য কখনো মহাকরণ, কখনো বিধাননগর আবার কখনো তিনি বারাসতে ছুটে গিয়েছেন।

## উল্লেখপঞ্জী


১. পঞ্চগৌড়শাখা : জয়নারায়ণ শর্মা (পান্ডে), বৃহৎ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮, ৯

২. ঐ পষ্ঠা ১৮

৩. ঐ পৃষ্ঠা ৩১-৩৩

৪. ঐ পৃষ্ঠা ৩৪

৫. সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান : কিছু স্মৃতিকথা - সুধী প্রধান পৃষ্ঠা ১

৬. ঐ পৃষ্ঠা ১

৭. পঞ্চগৌড়শাখা : জয়নারায়ণ শর্মা (পান্ডে), বৃহৎ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭৮

৮. সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা : কিছু স্মৃতিকথা - সুধী প্রধান পৃষ্ঠা ২

৯. ঐ পৃষ্ঠা ২

১০. পঞ্চগৌড়শাখা : জয়নারায়ণ শর্মা (পান্ডে), বৃহৎ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৭

১১. সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান : কিছু স্মৃতিকথা - সুধী প্রধান পৃষ্ঠা ৩

১২. ঐ পৃষ্ঠা ৪

১৩. ঐ পৃষ্ঠা ৪
১৪. ঐ পৃষ্ঠা ১
১৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩
১৬. ঐ পৃষ্ঠা ৪
১৭. ঐ পৃষ্ঠা ৪-৫
১৮. 'যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিতে : সুধী প্রধান' চারঘাট যোগেশ পাঠাগার স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত নিবন্ধ, প্রকাশকাল ১৯৮৩
১৯. সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান : কিছু স্মৃতিকথা - সুধী প্রধান পৃষ্ঠা ৫
২০. সংস্কৃতিপত্র, জানুয়ারি, ১৯৯৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫
২১. সগুনার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান : কিছু স্মৃতিকথা - সুধী প্রধান পৃষ্ঠা ৬
২২. ঐ পৃষ্ঠা ৬
২৩. ঐ পৃষ্ঠা ৬
২৪. ঐ পৃষ্ঠা ৮
২৫. ঐ পৃষ্ঠা ৮
২৬. ঐ পৃষ্ঠা ৮
২৭. শান্তি প্রধান (সংক্ষিপ্ত পরিচিতি) : গিরীন্দ্রনাথ দাস, ২২শে মে, ১৯৮৬ প্রকাশিত
২৮. 'যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিতে : সুধী প্রধান' চারঘাট যোগেশ পাঠাগার স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত নিবন্ধ, প্রকাশকাল ১৯৮৩

# সুধী প্রধান স্মরণে কয়েকটি কথা

**হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

পরিণত বয়সে মৃত্যু হলেও সুধী প্রধানের আকস্মিক জীবনাবসান আমার কাছে একেবারেই অকালমৃত্যু, কারণ তার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়েও আমার 'পরমায়ু' তো এখনও শেষ হয়নি। তাকে যারা জানত, তাদের সকলের কাছেই সুধী প্রধানের চলে যাওয়াটা একেবারেই অকালমৃত্যু, কারণ জীবনান্ত পর্যন্ত সে ছিল সক্রিয় আর তার কাছ থেকে দেশের প্রত্যাশা তখনও অনেক বাকি ছিল। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তার অবান্তর ; মৃত্যু এমন এক ঘটনা যা কখন ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই আর তাকে আটকাবার কোনো রাস্তা কারও হাতে নেই।

যাই হোক, আমি খুশি যে সুধী প্রধানের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু আয়োজন হয়েছে, আর সেজন্যই কতকগুলো মুশকিল থাকা সত্ত্বেও কয়েক লাইন তার বিষয়ে লিখছি।

একেবারে ছেলে বয়স থেকে সুধী নেমেছে যাকে একদা বলা হত 'স্বদেশি' করার ব্রতে। দেশ যখন পরাধীন তখন মনের দিক থেকে একটু সজাগ থাকলে স্বদেশের মুক্তি প্রয়াসে যোগদান ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যদিও চতুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন কায়দায় দেশ শাসন চালিয়েছিল যাতে অনেকেই বিদেশী শাসনকে যেন মোটামুটি মেনে চলতেই অভ্যস্ত হতে পারে। তবুও আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলায়, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার উদগ্র কামনা ছড়িয়ে পড়েছিল আর এরই টানে কিশোর বয়সেই সুধী প্রধান রাজরোষে পড়ে, গ্রেফতার হয়, কয়েদবাসী হতে হয়, 'অন্তরীণ' অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে তাকে আটক থাকতে হয়। এভাবেই সে যুগের 'স্বদেশি' সংগ্রামীদের সঙ্গে তার জীবন জুড়ে যায় আর নিজগুণেই সে কিছু পরিমাণে অল্প বয়সেই নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

সেই 'স্বদেশি' করার পর্যায় থেকে স্বাভাবিক সমুত্তরণে — সুধী প্রধান-এর দীক্ষা হয় কম্যুনিজম্-এ — মার্কস-এঙ্গেলস্ -লেনিন-স্টালিন যে ধারার প্রবর্তক, সেই ধারার অন্তর্ভুক্ত হতে। এজন্যই একটু বয়স বাড়ার সময় থেকেই তাকে কম্যুনিস্ট সংগঠনের সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়। বিশ্বস্ত একজন কর্মীরূপে সে কঠিন শৃঙ্খলাপ্রায়ণ এক সংগঠনে লিপ্ত হতে থাকে।

সব কথা বলার দরকার এখানে নেই, তবে তাকে প্রধানত মনে রাখার কারণ হল এই যে, তার মন কেড়েছিল কম্যুনিস্ট বিশ্ববীক্ষা, তার জীবনদর্শন, যা চেয়ে এসেছে সকল মানুষের, আর বিশেষত নিষ্পিষ্ট নিগৃহীত শোষিত মেহনতি মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি, যে মুক্তি কেবল রাজনীতি আর অর্থনীতি নয়, সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ 'মানবিকতা'ও (যাকে বলা যায় 'মনুষ্যনীতি') বাস্তবজীবনে আয়ত্ত করতে পারে — এই সুগভীর, সুপরিব্যাপ্ত চিন্তাই কম্যুনিজমের মূলকথা। তা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, মানুষের সমগ্র জীবনযাপন ব্যাপারেই মূলগত পরিবর্তন এনে যেন নবজন্ম ঘটাতে পারে, নবসমাজ যেন মনুষ্যজীবনে যথাসাধ্য সর্বোত্তম সমুত্তরণ আনতে পারে এই তার লক্ষ্য।

এজন্যই সুধী প্রধানের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রতি আমৃত্যু একনিষ্ঠ আত্মোৎসর্গ। এজন্যই সাধারণ মানুষের বঞ্চিত জীবনে একটুখানি আলোর সন্ধান আনে যে লোকশিল্প লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি, সেদিকে সুধী প্রধানের অনলস আগ্রহ ও পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গ আমরা দেখেছি।

কথা বাড়াতে চাই না। শুধু জানি যে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে বহু অনুশীলনের ফলে সুধী প্রধান তাঁর বিশিষ্ট অবদান রেখে যেতে পেরেছেন। তার মতামত প্রকাশে কুণ্ঠা ছিল না, অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে তার কোনোরকম অতিরিক্ত সতর্কতা ছিল না, মাঝে মাঝে তার মন্তব্যের ঝাঁঝে একটু কটুতাও যেন দেখা দিত। কিন্তু তার আন্তরিকতারই প্রতিফলন এখানে দেখা যেত। স্পষ্টবাদিতা তার বৈশিষ্ট্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিল পরিশ্রমী। কেতাবি শিক্ষার মানে এগিয়ে না থাকলেও নিজেরই প্রযত্নে (এবং অবশ্যই আন্দোলনে সহযোগী সাথীদের সঙ্গে একত্র মিলে) তার নিজস্ব সংস্কৃতিবোধ দৃঢ় হয়েছিল। এর প্রমাণ বিবিধ সংগঠনে তার সক্রিয়তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

একটানা লিখে গেলাম কয়েকটা কথা। এখানে তার বহুবিচিত্র জীবন ও কর্মের পরিচয় দিতে পারলাম না। তবে বহু বৎসর তাকে আমাদের নবসমাজ নির্মাণ আন্দোলনে একাগ্রচিত্ত যুক্তিপ্রয়াসী অনুজ হিসাবে জেনেছি। তাব স্মৃতিরক্ষায় সর্ববিধ আয়োজনে আমার আন্তরিক সমর্থন রইল।

# সুধী প্রধান ও কৃষক আন্দোলন

## হেমন্ত ঘোষাল

তেভাগা আন্দোলনের আগে সুধী প্রধান 'নবান্ন' নাটক করেছেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তি শোষণ ও জুলুম করার ফলে মানুষের তৈরি করা যে দুর্ভিক্ষ, তার কারণ ও প্রতিকারের কথা তুলে ধরার জন্য 'নবান্ন' নাটকে তিনি কুঞ্জর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ফলে কৃষকের মনোবলকে ফিরিয়ে এনে সংগ্রামের মঞ্চে দাঁড় করানোর জন্য তাঁর অবদান আজও কৃষকের সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে রয়েছে। ঐ 'নবান্ন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য, মনিকুন্তলা সেন প্রভৃতিকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন রাজবন্দি হিসাবে আটক থাকার মধ্যে দিয়েই ওঁর এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিবর্তন হয় এবং কৃষকের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখা নাটক, গান প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সংগ্রামকে অভূতপূর্বভাবে সাহায্য করেছেন।

সম্ভবত ১৯৪১ সাল নাগাদ তিনি যখন তাঁর বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই সময় আমিও আত্মগোপন করে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, উনি যুক্ত ২৪ পরগনার সগুনা গ্রামে গৃহবন্দী ছিলেন এবং সেই সময় থেকেই কৃষকদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই সে লড়াইয়ে তিনি গৃহবন্দী অবস্থায় আমাদের সাহায্য করেছিলেন তাঁর লেখা তাঁর বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের যুক্ত ২৪ পরগনা জেলায় কৃষক সমাজের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া যে সব মানুষ ছিলেন সে সব আদিবাসী এবং তফসিলি জাতির তথ্য সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন মাঠে ময়দানে আমাদের সঙ্গে থেকে এদের জীবন-জীবিকা, শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ মহামারীর কারণ প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করে সেটা দেশবাসীর সামনে গান, নাটক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে কৃষক আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করেছেন, শুধু কৃষক সমাজ নয় সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষের কাছে

প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দেশের সমস্ত অংশের মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ার কাজে সুধী প্রধান কৃষকের লড়াইয়ের আন্দোলনে আজও পথিকৃৎ হয়ে আছেন।

তেভাগা সংগ্রাম শুরু হয় পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশি শোষণ তথা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার পর্যায়ে। এই লড়াইয়ে কাকদ্বীপ থেকে আরম্ভ করে সন্দেশখালি, হাড়োয়া, ক্যানিং, মীনাখাঁ, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, স্বরূপনগর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি কর্মিসভার বৈঠকে উপস্থিত থেকে অনেক সময় তৎকালীন দেশি এবং বিদেশি শক্তিদের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় শত্রুর চোখের আড়ালে গোপন বৈঠকে অশগ্রহণ করে আমাদের লড়াইকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবারে তাঁর ঐ চিন্তাধারার আদৌ কোনও সমর্থন ছিলনা। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির বাধা অগ্রাহ্য করে শোষণমুক্ত সমাজের কাজে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

গোলাম কুদ্দুস, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী এঁরাও কমরেড সুধী প্রধানের সঙ্গে মাঠে ময়দানে নেমে তাঁদের রচিত গান, কবিতার মাধ্যমে এই সংগ্রামকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। রাজা মহারাজাদের জীবনকে ঘিরে যে নাটক তার পরিবর্তে সামাজিক অত্যাচার ও জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নাটক গান পরিবেশনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সুধী প্রধান ; এছাড়া উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরীরাও ছিলেন এই উদ্যোক্তাদের প্রথম সারিতে। কমরেড সুধী প্রধান বহু সামাজিক নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার অন্যতম ছিল নীলদর্পণ। তিনি রঙ্গমঞ্চে একজন প্রগতিশীল শিল্পী হিসাবে অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। খাদ্য আন্দোলনে কলকাতার রাস্তায় নিরস্ত্র জনতার ওপর যে গুলি চলে সেই আন্দোলনেও সুধী প্রধান ছিলেন।

তেভাগা আন্দোলনের পর যখন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করল তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার এবং ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। বিভিন্ন কৃষকসভার কর্মীদের বৈঠকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে উপস্থিত থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ২৪ পরগনা জেলায় যতগুলো কৃষক সম্মেলন হয়েছে তার অনেক সম্মেলনে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে আমাদের সংগ্রামকে প্রভূত সাহায্য করেছেন, এই প্রত্যেকটি সভায় তাঁর সঙ্গে আমি ধারাবাহিক-ভাবে উপস্থিত থেকে নিজেকেও সমৃদ্ধ করতে পেরেছি যা আজও আমার জীবনে বেঁচে থাকার পাথেয় হয়ে থাকবে। সহজ, সরল জীবন, কৃষকদের সুখে দুঃখে তাঁদের

বাড়িতে শত্রুর চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে তিনি তেভাগা আন্দোলনের সময় আমাদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের মনোবলকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

সুধী প্রধান ছিলেন সহজ, সরল, আত্মভোলা প্রকৃতির। চট করে মানুষকে কাছে টানা ও যে কোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি শুধু কৃষক সমাজই নয়, সমস্ত প্রগতিশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদেরও আপন করে নিয়েছিলেন। গন্ধর্বহরের কৃষকসভার সম্মেলনে উনি বলেছেন 'হেমন্ত ঘোষালের সঙ্গে আমার পরিচয় ঐ ময়দানে। আমি তাঁকে দেখলাম কৃষক সমাজের আপনজন হিসেবে, তাঁর চলা বলা এবং জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে কোনো বাইরের লোক একথা বোঝার উপায় ছিল না।' প্রায় তিনবছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার মীনাখাঁয় অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে তিনি শেষবারের মতো উপস্থিত ছিলেন।

অনুলিখন : সোমা মুখোপাধ্যায়

# সুধীদা'র সঙ্গে একত্রে বাস

## গোলাম কুদ্দুস

কখন যে সুধী প্রধান আমার সুধীদা হয়ে গেলেন স্মরণে আসছে না।

একদিন সুধীদা সহসা আমাকে বললেন, তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।

ব্যাপার কী!

সুধীদা ব্যাখ্যা করলেন — আমরা গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য একটা আস্তানা ভাড়া করেছি। সেখানে আমাদের সঙ্গে তোমার থাকা দরকার মনে করছি।

কেন!

সে কথা তোমার না শুনলেও চলবে।

আমি তো গানবাজনা নাটকের লোক নই, আমাকে বেমানান মনে হবে না?

সুধীদা হেসে বললেন, তা কেন, তুমি তো সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক, আর গণনাট্য তো সঙ্ঘের একটা শাখা।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে সুধীদা বললেন, তুমি তো তোমার এম-এস পড়ার সময় কোথাও না কোথাও থাকবেই এবং খরচপত্র তোমাকে তো করতে হবেই, সেটা আমাদেরই দাও না।

আমি বললাম, এর জন্যেই কি আমাকে দরকার।

সুধীদা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি খেপেছ! তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। তোমার ভয় নেই, আমাদের একটা এক্সট্রা ঘর আছে, তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে না।

কিন্তু রহস্যটা থেকেই গেল। যাক, তেইশ বছরের আমি বড়বাজারে ট্রাম লাইনের পাশে চারতলার বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

'ফ্যান দাও', 'ফ্যান দাও' শব্দটার এত শক্তি নেই যে চারতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারে। আর ততদিনে শব্দটার তেজ এবং পুনরাবৃত্তিও কমে এসেছে। আমারও খেতে বসার আগে বিবেকের দংশন আগের চেয়ে পোষ মেনে এসেছে, অভ্যস্ত হতে হতে সে এখন প্রায় পোষমানা পায়রার মতো। কথাটা আরো মনে হত, ছাদের উপর শত শত নিরীহ পায়রাগুলোকে দেখে।

একদিন সুধীদার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে বললাম, পায়রাগুলো ধরে ধরে তো খেতে পারি, রোজ নিরামিষ না খেলেও চলে, আমি জানি আমাদের অর্থের অভাব।

সুধীদা চমকে উঠে বললেন, সর্বনাশ! খবরদার কখনো কোনো পায়রা ধরবি না, তাহলে এ বাড়ি থেকে পাট ওঠাতে হবে।

কেন?

মারোয়াড়ির বাড়ি, ভাড়ার শর্ত, এখানে মাছ মাংস চলবে না।

বুঝলাম, আমাদের অর্থাভাব, নিরামিষের চলন এবং এবাড়িতে বসবাসের শর্ত একেবারে সুরে তালে মিলে গেছে।

আমরা বড়বাজারের বাড়িতে বেশি বাসিন্দা ছিলাম না। শম্ভু মিত্র আমাদের সঙ্গে থাকতেন এবং খেতেন। এরূপ সদস্য এবং সদস্যার মধ্যে ছিলেন সুধীদার স্ত্রী শান্তিদি এবং আমার মতো আরো দু'একজন।

সুধীদা ছিলেন সর্বময় কর্তা এবং সেই সঙ্গে বাজার সরকার। তিনি যে কত সকালে উঠে বাজারে চলে যেতেন তা অন্যেরা জানতেও পেত না। আমাদের কারো হাতে কখনো তিনি বাজারের থলি তুলে দেন নি, আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতাম। আর সুধীদার স্ত্রী, যিনি ক্রমান্বয়ে আমার শান্তিদি হয়ে ওঠেন, তিনি ছিলেন একাধারে আমাদের রাঁধুনি, বাড়ির ঝি, চা-পরিবেশিকা, এবং ভোজন পর্বের সার্থক পরিবেশিকা। সুধীদা এবং শান্তিদি খেটে মরতেন, আমরা থাকতাম রাজার হালে।

আর গণনাট্যের রিহার্সেল শুরু হ'লে বহিরাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চা-বিস্কুটের নিয়ত জোগানদার ছিলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। এরূপ কতর্ব্যপরায়ণ গৃহভৃত্য পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

সুধীদা আমাকে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে না বলে কথা দিলেও নিরুপায় ছিলেন। আমার জন্যে যে নিভৃত ঘরখানির কথা ভেবেছিলেন, তা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। শম্ভু মিত্র আমার আগে আস্তানায় এসে হাজির হয়ে ঐ ঘরখানাই নিজের জন্য মনোনীত করেছিলেন। আমাকে যে ঘরে বাধ্য হয়ে থাকতে হল, সেখানা একেবারে রিহার্সেল হলের সামনে ছিল। দরজা খুললেই ঘরের সবটাই রিহার্সেলে আগত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখে পড়ত। আবার দরজা বন্ধ করলেও তাঁদের সজীব উচ্চ কণ্ঠের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। ফলে দরজা বন্ধ করেও নিয়ত নবান্নের 'পার্ট' শুনতে শুনতে গোটা বইটাই প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। সুধীদা একদিন বললেন, আমার হয়েছে মহাজ্বালা। বিজনের 'নবান্ন' লালবাজারের সেন্সর অফিসার সহজেই পাশ করে কী বললেন জানো? বললেন, আপনারা কি এম.এন. রায়ের দলের লোক! উচ্চবাচ্য না করে আমরা ক'জন ফিরে এলাম, কিন্তু আমি মাথায় হাত দিয়ে মহা চিন্তায় পড়লাম — এমনিতেই লোকে আমাদের বৃটিশের দালাল বলে, এরপরে এই নাটক দেখে তারা কী বলবে? দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা এই নাটকের কোথাও দুর্ভিক্ষসৃষ্টিকারী বৃটিশের বিরুদ্ধে একটাও কথা নেই। সে রকম কিছু বক্তব্য থাকলে নাটকটাকে বেতনভোগী সেন্সার অফিসার পাশ সার্টিফিকেট দিতেন না। অথচ উভয়সঙ্কট। আমি বিজনকে বললাম, দ্যাখো সেন্সরকে এড়িয়ে আকারে ইঙ্গিতে কিছু বলা যায় কী না। শুনেই বিজন রেগে গিয়ে বলল, আমি কিছু পারব না, আগে থেকেই তো সব জানা ছিল, সেই রকমই লিখতে বাধ্য হয়েছি, তুমি যা হয় করো।

একটু থেমে সুধীদা বললেন, তুমি নাটকটার পাণ্ডুলিপি পড়োনি। আমি বাধ্য হয়ে পাণ্ডুলিপির গোড়ায় কিছু জুড়ে দিলাম — কিন্তু তাতে মনুষ্যকণ্ঠের কোনো বাচন নেই, শুধু প্রেক্ষাপট হিসাবে দেখানো হয়েছে বন্যার জলোচ্ছ্বাস ও আগস্ট আন্দোলন-জাত আগুন ও প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ, সেই সঙ্গে মানুষের চিৎকার, ক্রন্দন। এতে সেন্সারের হাত এড়ানো যাবে, অথচ বৃটিশ বিরোধিতার প্রেক্ষাপট রচিত হবে, লোকে আমাদের বৃটিশের দালাল বলতে পারবে না। আবার, নাটকের মাঝখানে দেখালাম মজুতদারদের কাছ থেকে পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে, অথচ এখানে বিনাবাক্যব্যয়ে সেটা দেখানো যাচ্ছে, কাজেই সেন্সর আটকাতে পারবে না।

আবার একটু থেমে সুধীদা বললেন, বিজন এরপর থেকেই আমার উপর ভীষণ চটে আছে। ও-ভাবছে, আমি খোদার উপর খোদ্‌কারি করেছি। তুমিই বলো, আমি কিছু অন্যায় করেছি? ওটুকু না-করলে দর্শকেরা আমাদের ভুল বুঝত না? অথচ আমি ভালো করতে গিয়ে বিজনের কাছে মন্দভাগী হলাম!

নবান্নের মঞ্চ-সাফল্যের পরে সুধী বললেন, এবার বিজনের খানিকটা মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু আর এক জ্বালায় পড়েছি, তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছ বিজন আর শম্ভুর মধ্যে কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কই আমার তো সেরকম মনে হয়নি।

সুধীদা বললেন, তুমি এরপর ভালো করে লক্ষ করে দেখো — শুধু ওরা অভিনয় কালে পার্ট করতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে।

সুধীদাকে প্রশ্ন করলাম, এ রকম কথা বন্ধ করার কারণ কী?

ওরে ভাই, শিল্পী কমিউনিস্ট হয়েও উচ্চে উঠতে পারল না। বিজনের ভক্তরা বিজনকে উস্কানি দিয়ে বলছে, 'নবান্নে'র সাফল্যের কারণ হচ্ছে নাটকটার উৎকর্ষ, আর শম্ভুর ভক্তরা তাকে বলছে, আপনার নির্দেশনাই নাটকটাকে উৎরে দিয়েছে। এইসব শুনে বিজন-শম্ভুর মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেছে।

আমি বললাম, সুধীদা, কেউ কি ওঁদের বুঝিয়ে বলছেন না যে ওঁদের দু'জনের কৃতিত্বই 'নবান্নে'র সাফল্যের কারণ?

সুধীদা বললেন, সে-রকম ভালো মানুষ আছে, কিন্তু তাদের কথায় কি ওরা কর্ণপাত করছে? মোটেই না! আমার কথায় ওরা দু'জনেই আমার উপর চটেছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। এখন এসব মিটাই কী করে?

সত্যি, সে-সময় সুধীদাকে অনেক জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। একদিন দেখি, শীতের সকালে ছাদে রোদে পিঠ দিয়ে একমনে সুধীদা একতাড়া প্রুফের কাগজ নিয়ে পড়ছেন এবং কাটাকুটি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এই আর এক জ্বালা!

কী হ'ল?

গোপালদার কান্ড। মন্বন্তরের উপর তাড়াহুড়ো করে মস্ত উপন্যাস লিখে ফেলেছেন, এখন আমাকে পাকড়াও করেছেন যাতে আমি অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি কেটেকুটে লেখাটাকে যথাসম্ভব আঁটসাঁট করে তুলি! তুমিও আমার সঙ্গে হাত লাগাও!

বলেন কী! গোপাল হালদারের লেখা আমি কাটাকুটি করব কোন্ সাহসে? লোকে কী বলবে?

লোকে জানতেই পারবে না।

না। আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর বুঝাবুঝি এবং শ্রদ্ধা আছে। আপনার পক্ষে যা মানায়, আমার পক্ষে তা মানায় না।

সুধীদা আর বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। আমি কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করছিলাম, ইদানীং সুধীদা নিজের রিহার্সেলটুকু সেরেই কোথায় বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত বারোটা নাগাদ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সুধীদা আর এক দফা দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এক কালে ডাক্তারি পড়তেন, সেই সুবাদে ও অন্যান্য কারণে কলকাতার বহু খ্যাত-অখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দুর্ভিক্ষের পর মহামারী আগত, তাই পার্টি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে একটা মেডিক্যাল সংগঠন গড়ে তুলতে। তিনি তাঁর কিছু সহযোগীকে নিয়ে এই কাজে লিপ্ত হয়েছেন। গণনাট্যের হাজার রকম খুচরো কাজের পর তিনি প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ডাক্তারদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে লিপ্ত হন বলেই বাসায় ফিরতে এত রাত হয়। আবার তাঁকেই সকালের আলো ফুটতে-না-ফুটতে বাজারে ছুটতে হয়। সারাদিনে কতটুকু বিশ্রাম পান সুধীদা? কিন্তু একদিনও তাঁর মুখে চিকিৎসক-সংগঠনের কাজকে "জ্বালা" বলতে শুনিনি। ওটা যে আর্তসেবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র গড়ে তোলার কাজ।

সুধীদা সারা জীবন যে পথ ধরে চলেছেন, একটার পর একটা সংগঠন গড়তে গড়তে চলেছেন। সংগঠন গড়া ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। সংগঠন আর সুধীদা যেন দেহ আর আত্মা। একদিন বললেন, হয়ত অভিনয়ের জগতে একটা কিছু স্মরণীয় রেখে যেতে পারতাম, কিন্তু ওতে লেগে থাকার সময় কোথায়! জেল থেকে বেরিয়ে কাজি নজরুলের কাছে গিয়েছিলাম, কথায় কথায় গান শোনাতে বললেন। গান শুনে নিজে থেকে বললেন, তোমায় শেখাব। কিন্তু আমার সময় কোথায়।

সুধীদা বিছানায় আশ্রয় নিলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন। আমার সেই ক্ষমতা ছিল না। সে সময় শয্যাগ্রহণ করলেই সারা দিনের ঘটনা, আলাপ-আলোচনা এসে ভিড় করত। বিশ্বময় মানুষ মরছে যুদ্ধে এবং দুর্ভিক্ষে। কলকাতা এবং বঙ্গভূমিরই অন্য সংস্করণ লেনিনগ্রাদে। অথচ দুয়ের মধ্যে কী অসম্ভব পার্থক্য। লেনিনের একখানি প্রবন্ধ সংকলন ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। Famine বা দুর্ভিক্ষ নামক প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করলেই ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসত। সুধীদা বা শান্তিদি কেউ এসে বুকের উপর থেকে পাতা খোলা বইটি নামিয়ে রেখে, ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেন।

অনেক সময় ঘুমের মধ্যেও দুর্ভিক্ষের স্বপ্ন দেখতাম 'নবান্নে'র অভিনয়ের মধ্যে, কলকাতার রাস্তার মৃত কঙ্কালের দৃশ্যে, অবরুদ্ধ নগরী লেনিনগ্রাদের শীত ও অনাহারে মৃত দেহের ছবিতে, যার আমরা এক্সিবিশন করেছিলাম কলকাতায়। সুধীদা একদিন বললেন, রোজই রাত্রে এসে দেখি, লেনিনের Famine পড়ছ। বললাম, পড়তে পড়তে ওটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু পড়ি। ওটা আমার ঘুমের ওষুধ।

কেন বলো তো?

জানি না।

সুধীদা বললেন, জানো কিন্তু বলছ না। আমিও ভাবি। এখানে আমরা যেকাজ করতে পারছি না, ওখানে শ্রমিক একনায়কত্বে লেনিন তা পেরেছিলেন। মর্মন্তুদ দুর্ভাগ্যকে শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্যে সৌভাগ্যের হাতিয়ারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। মানুষ যে সব কিছুর প্রতিকার করতে পারে, এটা পড়তে পড়তে তোমার নার্ভ ছাড়া পায়, চোখে ঘুম আসে। তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম। সুধীদা বললেন, স্টালিনগ্রাডে লালফৌজের জয়ের পর আমাদের পার্টির জনযুদ্ধের লাইন সম্বন্ধে হয়তো ভেবে দেখার দরকার ছিল। তাই না?

এবারও আমি চুপ করে রইলাম। সুধীদা আমার মনের কথা জানতে পারেন কী করে!

কিন্তু পরে দেখেছি, সব কথা জানতে পারেন না। দুর্ভিক্ষেরই পরিণতিতে মূলত ঘটেছিল কৃষকের প্রতিরোধ — তেভাগা আন্দোলন। 'নবান্নে'র রচয়িতা, সংগঠক এবং শিল্পীদেরও ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী তেভাগার উপর নানা নাটক রচনা ও পরিবেশনের সুযোগ ছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁদের বাংলার মাঠে ময়দানে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের দরকার ছিল। কলকাতার পথের দৃশ্য দেখেই 'নবান্নে'র সৃষ্টি। দূরে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেখার কষ্ট স্বীকার না করায় শিল্পের এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছিল। বহু পরে সুধীদা রাগ ক'রে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, এঁরা তখন কলকাতায় বসে আর্ট করছিলেন।

আর আপনিও কলকাতায় বসে উনবিংশ শতাব্দীর 'নীলদর্পণ' নিয়ে মেতে ছিলেন। অথচ 'নবান্নে' গোপাল হালদারকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, "ওরে তোরা সব গ্রামে ফিরে যা।"

সুধীদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুই আমার মুখের উপর ন্যায্য কথা বলার জোর রাখিস।

সে যাক, আপনি কেন আমাকে গণনাট্যের 'কমিউনে' নিয়ে গিয়েছিলেন, এবার বলবেন কী?

শোন্, কাকাবাবু (মুজফফর সাহেব) আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন — সুধী! সাবধান! এমনিতেই লোক নারীঘটিত ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটায়, এবার তো তোমাকে আস্তানা গড়ে নাটকের প্রয়োজনে নারী অভিনেত্রী আনতে হবে। শান্তিকে

তোমার সঙ্গে রাখো। আর খুব সাবধান! তাই আমি তোমাকে আমার পার্শ্বচর হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম।

সে কথা তখন আমাকে বলতে চান নি কেন?

তুমি তাহলে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে যেতে। তোমার আচার-আচরণে কথা বার্তায় স্বাভাবিকতা থাকত না।

আপনি তাই এখনও মনে করেন?

হ্যাঁ।

পার্টি নেতারা যে সব সময় বলেন, মানুষকে সচেতন করতে হবে, সেটা তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে অচল! কাউকে কাউকে অচেতন রাখাই শ্রেয়।

সুধীদা নির্মল হাসিতে ফেটে পড়লেন — হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সুধীদা, আবার একসঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেন রে?

খুব সকাল-সকাল উঠলে সেই বড়বাজারের বাড়ির চারতলা থেকে দুর্ভিক্ষের সময় কেমন একটা মনোরম দৃশ্য দেখতে পেতাম। দুধ-ঘি খাওয়া ভুঁড়িওয়ালা মারোয়াড়ি গিন্নিরা দলে দলে হেলতে দুলতে চলেছেন গঙ্গাস্নানে।

সুধীদার আবার সেই — হাঃ হাঃ হাঃ!

তারপর বললেন, এখন একসঙ্গে থাকতে গেলে অচিরে দুই হেঁসেল হয়ে যাবে।

তার মানে!

সেই অল্প বয়সে যখন প্রথম জেলে গেলাম, দেখলাম আমাদের যুগান্তর ও অনুশীলন দলের আলাদা রান্নাবান্না হচ্ছে! আমি একটু লিখতাম-টিকতাম বলে আমার দাদারা আমাকে প্রাচীরপত্র বের করার দায়িত্ব দিলেন। আমি একটা লেখা লিখলাম, যার শিরোনাম ছিল, মরতে এসেও দুই হেঁসেল। দুই দলের দাদারাই আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমার দলের দাদারা আমাকে সতর্ক করে দিলেন।

এবার আমার হাসির পালা। সুধীদাব স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝে ক্রুদ্ধ হতেন।

# গণনাট্য আন্দোলনের স্মৃতি ও সুধী প্রধান

সজল রায়চৌধুরী

সুধী প্রধানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ ১৯৪৪ সালে। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই আমরা পরস্পরকে চিনতাম। ১৯৪৪ সালে একটি কালচারাল স্কোয়াডের সঙ্গে আমরা কয়েকজন আসাম পরিভ্রমণ করি, তখন আমার বয়স কম। আমি তখন বাংলায় এম. এ. পড়ি। তাতে ছিলেন অনিল চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য, সরোজ হাজরা, ঢাকার সাধন দাশগুপ্ত, খুলনার হিমাংশু চক্রবর্তী আর ময়মনসিংহের দুই ছাত্র, তাঁদের নাম ভুলে গিয়েছি, নেতৃত্বে ছিলেন দুই ছাত্র নেতা অরুণ দাশগুপ্ত ও অজিত রায়। তার আগে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক বাহিনী পাঞ্জাব ঘুরে এসেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশবাসীর জন্য লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে। আমরা যখন আসামে ঘুরছি তখন আর একটি স্কোয়াড ঘুরে বেড়াচ্ছে গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি এলাকায়। 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয় শেষ হয়েছে, শুরু হচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা। আমরা অর্থাৎ নীহার দাশগুপ্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, রঞ্জিত বসু, অনু দাশগুপ্ত, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় আর আমি ছিলাম এই কালচারাল সেলের সদস্য, আমরা রিহার্সাল দিতাম বৌবাজার কলেজ স্ট্রীটের জংশনের ওপরে বিরাট একটা বাড়ির দোতলার একটা ঘরে। সেখানে একদিন সুধীদা এলেন, বললেন, 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় হবে। প্রযোজনার খরচ বাবদ পিপলস রিলিফ কমিটি দিয়েছে ৭০০০ টাকা ঋণ হিসাবে, এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে, নাটকটির অভিনয় সফল করতে হলে অনেক লোক দরকার। সুতরাং সকলে মিলে এই প্রযোজনাটিকে সার্থক করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত আমরা পরিচালিত হতাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটির দ্বারা আর প্রাদেশিক কমিটির দ্বারা পরিচালিত হতেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান প্রমুখ। সেই সময় খুব সম্ভব ৮৬ নং হ্যারিসন রোডে 'নবান্ন'র মহড়া চলত, সেখানেই একটি ছোট কমিউন ছিল, সেখানে

থাকতেন সুধীদা ও শান্তি বৌদি। তখন থেকেই সুধী প্রধানের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়।

সুধী প্রধানকে আমি চারটি নাটকে অভিনয় করতে দেখেছি। 'জবানবন্দী'র বেন্দা, 'নবান্ন'র কুঞ্জ, 'মুক্তধারা'য় হুব্বা, আর 'নীলদর্পণে' নবীনমাধব। আমার বিনম্র অভিমতে 'জবানবন্দী'তেই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট অভিনয়। একটি পেয়ারা বা ঐ জাতীয় কোনো ফল খেতে খেতে এবং কথা বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ অবিস্মরণীয়। পারফরমিং আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর নামডাক না থাকলেও অভিনয় সম্পর্কে সুধী প্রধানের প্রজ্ঞা অস্বীকার করবে কে? স্বীকার করতেই হবে তিনি ছিলেন উঁচুদরের এক অভিনেতা।

গণনাট্য আন্দোলনে মধ্যবিত্ত কমরেডদের পাশাপাশি লোকশিল্পীদের অবদান অনন্য-সাধারণ। সারি, জারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ভাদু, টুসু, আলকাপ, গম্ভীরা, তরজা, কবিগান প্রভৃতি লোকশিল্প গণনাট্যকে প্রভাবিত করেছে। রমেশ শীল, শেখ গোমানী, রাইমোহন, নিবারণ পন্ডিত, গুরুদাস পাল, হলধরজী, মিসিরজী, আসগর, বিশ্বনাথ পন্ডিত, সিরাজ প্রমুখ লোকশিল্পীরা গণনাট্য সংঘকে শুধু জনপ্রিয় করেনি, শোষণমুক্তির সংগ্রামে হাতিয়ার হয়েছে গণনাট্য কর্মীদের। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সাধন দাশগুপ্ত প্রমুখ মধ্যবিত্ত শিল্পীরাও গান বেঁধেছেন লোকসংস্কৃতির আধারে। তখনকার দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির নির্দর্শন সংগ্রহ করবার ও তাকে নতুন কথায় সঞ্জীবিত করবার একটা সচেষ্টতা ছিল। লোকসঙ্গীতকে ব্যবহার করে বিজন ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন 'জীয়ন কন্যা'। তিনি, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্ররাও লোকসঙ্গীতের সুর আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন, এই সংগ্রহ ও সৃষ্টির কাজে সাধারণভাবে সেকালের সব গণনাট্য কর্মীর মধ্যে সুধীদারও বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল, সুধীদা ছিলেন সংগঠক, সুতরাং লোকসংস্কৃতির ধারার সংগঠক হিসাবেও তাঁকে কাজ করতে হয়েছে।

'নবান্নে'র আগে বাংলা নাটকে কৃষকের চরিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু কৃষকের জীবন নিয়ে, তার সুখ দুঃখ বেদনা নিয়ে একটি পরিপূর্ণ নাটক ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। 'নবান্ন' নাটকেই দেখি নায়কের ভূমিকায় কৃষককে। ভদ্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। কৃষকের মুখের কথায় যে অসাধারণ সৌন্দর্য রয়েছে, শক্তি রয়েছে তার পরিচয় বহন করেছে 'নবান্ন'। 'নবান্ন'র সূচনায় ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের চিত্র, শেষে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জীবনের প্রতিরোধের ডাক। 'নবান্ন'র পর বাংলার কৃষক ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় সংসার পাতেননি। কৃষক গাঁয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে জমি দখল করতে, ধান আর মান রক্ষা করতে। শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সন্ধিক্ষণের

নাটক 'নবান্ন'র প্রযোজনায় মানুষজন দেখেছেন যৌথ সৃষ্টি ও বাস্তব অভিনয়। তাই মানুষ হাজারে হাজারে ভিড় করেছেন 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দেখতে। 'নবান্ন' মানুষকে সচেতন করেছে। তার রুচির বদল ঘটিয়েছে। বাণিজ্যিক থিয়েটারের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়, দৃশ্য সজ্জা, মঞ্চ সজ্জা, নাট্য প্রযোজনার খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিচালনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। উপদেষ্টা ছিলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সাংগঠনিক দিকটি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সুধী প্রধানের। 'নবান্ন'র প্রাণ শক্তি ছিলেন যাঁরা, সুধী প্রধান অবশ্যই ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

# গণনাট্য ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং সুধী প্রধান

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

তিরিশের দশকের মধ্যবর্তীকাল থেকেই আমরা অনেকেই ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ ফলশ্রুতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি, তার একটা কারণ জবাহরলাল নেহরু সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে দুনিয়াব্যাপী ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ আন্দোলনে আমাদের যোগদান শুরু ঐ দশকের শেষের দিকে। মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনার প্রকাশের শুরু প্রায় ফ্যাসিবাদের জন্মলগ্ন থেকেই, বিশের দশকের প্রথম দিকেই। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা একটি গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে League against Fascism and War. যার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে জাপানের সমরবাদ প্রথম মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জার্মান ফ্যাসিবাদ প্রকাশ পায় হিটলার প্রতিষ্ঠিত নাৎসি পার্টির মাধ্যমে। ১৯৩৩ সালে জার্মান গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এক গণভোটের (Referendum) মাধ্যমে হিটলার ক্ষমতা দখল ক'রে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। ১৯৩৫ সালে ফ্যাসিস্ট ইটালি অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করে। ১৯৩৬ সালে স্পেন-এ ফ্যাসিস্ট জেনেরাল ফ্র্যাঙ্কো জার্মানি ও ইটালির সহায়তায় নির্বাচিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। এই সময় সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ গণতান্ত্রিক স্পেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ও একটি ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

সেই সময় জবাহরলাল নেহরু স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সৌহার্দ্যের বাণীবহন করে। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে ভারতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার। ১৯৩৭ সালে গড়ে ওঠে কুখ্যাত রোম-বার্লিন-টোকিওর যৌথ সোভিয়েটবিরোধী অক্ষশক্তি। পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচ্ছন্ন সাহায্য।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের তরফ থেকে জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত চায়নায় একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়। এই মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ বিজয় কুমার বসু। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদবিরোধী গণ আন্দোলনের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের দেশে এই আন্দোলন জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস শুরু হয়। তার প্রথম প্রকাশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা সেই সময়কার ছাত্রসমাজ। ছাত্র ফেডারেশন ও বিশেষ করে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্ররাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। ঘটনাটা অনেকেই বোধ হয় ভুলে গেছেন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্ররা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার মনস্থির করে। কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে। ছাত্ররা স্ট্রাইক করে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই কলেজের পুরাতন ছাত্র। ওটেনকে মারার অপরাধে যখন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে স্কটিশ চার্চ কলেজ সুভাষচন্দ্রকে ভর্তি করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের জয় হয়। তারপর সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা দেবার উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। সেই সম্মেলনে নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের নেতৃবৃন্দ। সেই সময় কলকাতায় সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছিল। এই প্রথম কলকাতার ছাত্রদের সামনে পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। সেই সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কের কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

এরপরে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। দেশে তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নতুন জোয়ার আসে। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। সেই সময় ছাত্র ও যুবশক্তিকে এই সংগ্রামে টেনে আনার জন্যে নানারকম আইনি পথ খুঁজে নেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রধান ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট বা ওয়াই সি আই।

এই যুব-ছাত্র সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশেষ করে ফ্যাসিবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। যদিও এই আন্দোলন নগরকেন্দ্রিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও একেই বোধ হয় গণনাট্য আন্দোলনের পূর্বসূরী বলা চলে। ১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে। জাপানের সামরিক বাহিনী বর্মা অবধি অধিকার করে কলকাতায়, বিশেষ করে শ্রমিক এলাকায়, বোমা বর্ষণ করে ও স্বল্প সময়ের জন্যে ভারতের জমি দখল করে। তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা সুরু হয় প্রধানত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির পরাজয় ঘটে ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সময়ে যে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার প্রয়োজন রয়েই গেল, যুদ্ধপরবর্তী গণ-সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় ভারতের মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্যায়ে।

আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনকে যেমন দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল ও ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল, গণনাট্য আন্দোলনকেও তেমনি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল ও ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এর পর নানা কারণে সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে গণনাট্য আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার প্রভাব বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বিদ্যমান। তা ছাড়া গণনাট্য সংঘ নামে বাংলায় একটি সংগঠন এখনও কাজ করে চলেছে। তাছাড়া গত প্রায় ১৪ বছর ধরে নতুন করে সর্বভারতীয় পর্যায়ে একই মতাবলম্বী বিভিন্ন গণনাট্য সংঘ সারা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে নাটক, গান ও নাচের আন্দোলন করে চলেছে।

গণনাট্য ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও সুধী প্রধানের কথা কিছু বলতে হলে, কিছুটা আত্মকথন এসে পড়তে বাধ্য। কারণ ফ্যাসিবিরোধী ও গণনাট্য আন্দোলন যখন তুঙ্গে, আমি তখন প্রথমে বাংলার ও পরে ভারতের বাইরে ছিলাম। আমি তখন প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত। গণনাট্য সংঘের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। তারপর আবার যোগাযোগ হয় যুদ্ধপরবর্তী গণ-বিদ্রোহের সময়। আবার সাম্প্রতিককালে নতুন করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে তোলার কাজেও যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়।

ফ্যাসিবিরোধী ও গণনাট্য আন্দোলনে সুধীদার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার অবগতি সীমিত। যে সময় লেখক, সংগঠক, অভিনেতা, নানারূপে তাঁকে আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখা গেছে, সে সময় আমি দেশের বাইরে। ওয়াই সি আই-য়ের সঙ্গে সুধীদা যুক্ত ছিলেন, তবে সেই সময় বেতনভোগী সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠনের কাজেই তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। আমার মনে পড়ে যে অল ইন্ডিয়া রেডিওর এক

স্ট্রাইকের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুধীদা। ওয়াই সি আই-তে আমরা প্রথমে বক্তৃতামালা, আলোচনা সভা ও তারপর সমবেত সঙ্গীত ও নাটক শুরু করি। ওয়াই সি আই থেকে আমরা ফ্যাসিবিরোধী পোস্টার প্রদর্শনী করি। এর জন্য সত্যজিৎ রায় বেশ কয়েকটি পোস্টার তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটি ছিল বেশির ভাগই প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতিমূলক। আমরা সমবেত সঙ্গীত নিয়ে প্রথম কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছই। এইভাবে আমরা ছাত্র-যুবা শ্রেণীর সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে বেরিয়ে পড়ি রাস্তাঘাটে। আমরা জনসভায় সমবেত সঙ্গীত উপস্থাপিত করতাম। সভাসমিতির কাজ সেরে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে দল বেঁধে গান গাইতাম, বেশির ভাগই পরিচিত দেশাত্মবোধক গান। তার সঙ্গে থাকত গণসংগ্রামের বিদেশি গান, হয় ইংরেজিতে, অথবা বাংলা অনুবাদে। এর মধ্যে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ের লাল ফৌজের গানও ছিল।

আমরা প্রথম দিকে যে নাটক প্রস্তুত করি, তা আমাদের স্বরচিত। একজন লিখত, আমরা তা নিয়ে আলোচনা করার পরে তাকে পরিণত রূপ দেওয়া হত। প্রথম নাটিকাগুলি বেশির ভাগই ইংরেজিতে ছিল। জলিমোহন কল লেখেন বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে আমাদের দেশের ও ইউরোপের দেউলিয়া রাজনীতির তীব্র সমালোচনাপূর্ণ নাটিকা 'পলিটিশিয়ানস্ টেক টু রোইং' ও ফ্যাসিবিরোধী নাটিকা 'বয় গ্রোজ আপ'। তখনকার ছাত্র-মহলে কী রকম আবহাওয়া ছিল তার একটা পরিচয় দেওয়া দরকার। আমরা যখন 'পলিটিশিয়ানস্ টেক টু রোইং'এর মহড়া দিচ্ছিলাম, তখন সুভাষচন্দ্রের ভাইপো অরবিন্দ বোস স্বেচ্ছায় অযাচিত ভাবে তাঁর কাকার কথা বলার, চলাফেরার ধরণ দেখিয়ে দিয়েছেন। অরবিন্দ কিন্তু আমাদের সংগঠনের সভ্য ছিলেন না। দেবব্রত বসু চীনে জাপানি আক্রমণের একটি ঘটনা নিয়ে লেখেন 'ইন দ্য হার্ট অফ চায়না' ও নাৎসি জার্মানির সাধারণ মানুষের দুরদর্শন নিয়ে লেখেন 'দ্য শপ্‌কীপার্স'। এই রকম অভিজাতকেন্দ্রিক নাট্য প্রযোজনা থেকে আমরা অতি শীঘ্রই আমাদের সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সমাজ পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে নাটক উপস্থাপিত করি। আমাদের সংগঠনের সভ্য সুনীল চ্যাটার্জি সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটির নাট্যরূপ দেন 'অঞ্জনগড়' নামে। সামন্তবাদ থেকে শিল্পায়নের পথে সামাজিক পরিবর্তন কী রূপে শ্রমিক কৃষকদের নতুন করে অত্যাচারে জর্জরিত করে এই ছিল 'অঞ্জনগড়'-এর বিষয়বস্তু। সুনীল চ্যাটার্জি আর একটি নাটক লেখেন নিম্নমধ্যবিত্ত সমস্যাসংকুল জীবনের কাহিনী নিয়ে। তাঁর এই 'কেরানী' নাটক যখন আমরা মঞ্চস্থ করি, তখন কেরানীদের কোনও সংগঠিত আন্দোলন ছিল না।

এর পরবর্তী কালে, নাৎসিদের সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের পর ও জাপানি ফৌজের ভারত আক্রমণের পর, প্রগতি লেখক সংঘকে রূপান্তরিত করা হয় 'ফ্যাসিবিরোধী

লেখক ও শিল্পী সংঘ'তে। তারপর নানা কারণে ওয়াই সি আই-এর অবলুপ্তি ঘটে। বিশেষ করে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের বিস্তৃতির পথ যখন বাংলার লেখক ও শিল্পী সমাজ নিজেদের হাতে তুলে নিলেন, তখন ছাত্র-যুবার মধ্যে সীমাবদ্ধ আর একটি সংগঠনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম যে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সেল স্থাপন করা হয়, তার একজন সদস্য ছিলেন সুধী প্রধান। অন্য দুজন চিন্মোহন সেহানবীশ ও বিনয় রায়। ওয়াই সি আই-এর শেষের দিকে বিনয় রায় হাজির হলেন তাঁর দরাজ গলা নিয়ে। তখন তিনি মেটেবুরুজে শ্রমিক আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী। তারপর বিনয় নিয়ে এলেন গ্রামের লোকসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে নতুন গণ-সঙ্গীতের ডালি। বাংলার শহর ও গ্রামকে সেই গান মাতিয়ে তুলল।

সেই সময় সুধীদার কিছু লেখা আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৪১ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন মজুমদার 'অরণি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'অরণির' আড্ডায় আমিও যেতাম। ক্রমশ 'অরণি' কার্যত ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মুখপত্রে পরিণত হয়। সুধীদা ছিলেন 'অরণি'র লেখক গোষ্ঠীর একজন। ১৯৪২ সালে 'অরণি' 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা' প্রকাশ করে। তার একটি পুস্তিকা সুধীদা লিখেছিলেন — 'জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ'। সেই সময় সুধীদা অন্যান্য বামপন্থী পত্রিকায়ও লিখতেন।

কমিউনিস্টরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল ও সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসি আক্রমণ ও জাপানের ভারতের জমিতে অনুপ্রবেশের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। এই কারণে তখন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসার জোয়ার উঠেছিল। তার মুখে ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন কমিউনিস্ট নেতৃত্বে দলমতনির্বিশেষে লেখক ও শিল্পীদের এক মঞ্চে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ভাবে যদিও সব সময় সচেতন ভাবে নয়, বরং অবস্থার চাপে, কমিউনিস্টরা তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এক সূত্রে গাঁথতে পেরেছিল।

বাংলায় ১৯৪৩ সালে যে মন্বন্তর দেখা দিল, তার আঘাতে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সব মানুষ ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময়ই গণনাট্য আন্দোলন সত্যি সত্যি দানা বেঁধে ওঠে। 'অরণি'তে প্রকাশিত হয় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা দুটি নাটক, 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'। পরে 'নবান্ন' নাটক যখন প্রথম অভিনীত হল, তখন বাংলা নাট্যজগতে এক বিপ্লব দেখা দিল। এই সময়েই গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। কমিউনিস্ট পার্টি সংস্কৃতির ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বাংলায় এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিটের সভ্য ছিলেন সুধীদা। তারপর ১৯৪৩ সালে ভারতীয়

গণনাট্য সংঘের বাংলা কমিটিতে সর্বক্ষণের সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে 'নবান্ন' নাটক গণনাট্য আন্দোলনকে নতুন স্তরে উন্নীত করে, তাতে সুধীদা অভিনয় করেছিলেন ও বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে একসঙ্গে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় সম্মেলনের সময় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়, তাতে সুধীদার বিশেষ অবদান ছিল। লোকশিল্পীদের যে সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে সুধীদা অগ্রণী ছিলেন।

১৯৪৬ সালে বোম্বাই শহরে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার পর গণনাট্য আন্দোলন সারা দেশে সংগঠিত রূপ নেয়। বিভিন্ন শহরে, গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কার্যকলাপ। বাংলার গানের দল পাঞ্জাবে গিয়েছিল মন্বন্তর পর্যুদস্ত বাংলার মানুষের সাহায্যের জন্যে টাকা তুলতে, তাদের 'ভুখা হ্যায় বংগাল' কর্মসূচি কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে যে আকৃষ্ট করেছিল তাই নয়, এমন কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যরাও আসতেন এ সব সভায়। তাঁদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়। ব্রিটিশ সরকারও বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। দেশি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে গণচেতনার উন্মেষের ব্যাপারে গণনাট্য আন্দোলনের বিশেষ অবদান ছিল। গণনাট্য আন্দোলনের গানের মাধ্যমে শহরের মানুষের নতুন করে বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। আমাদের শহর ও গ্রামের লোকসঙ্গীতের শুধু সুরই নয়, তার সমাজসচেতনতার ঐতিহ্যও নতুন রূপে প্রকাশ পায় গণনাট্য সংঘের গানে। যুদ্ধের সমাপ্তির পর যখন গণসংগ্রামের জোয়ার ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শেষ আঘাত হানে, তখন গণনাট্য আন্দোলন তার কার্যকলাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতনাকে রূপ দেয়। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিরুদ্ধেও গণনাট্য আন্দোলন সেদিন তার ঐক্যের গান ও পথনাটিকা নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, তার প্রভাব আজও বেঁচে আছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়। একই সঙ্গে স্বাধীন সরকার বহু সাংস্কৃতিক কর্মীকে সরকারি নানা কার্যকলাপের মধ্যে টেনে নিতে সক্ষম হয়। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সংকীর্ণতা ও তার উপরে সরকারি আক্রমণ ও অন্যদিকে পার্টির বাইরের শিল্পীদের ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে সংগঠিত গণনাট্য আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ - ১৯৫০ এর সময়টাকে আমরা সবাই ভুলে থাকতে চাই। অথচ এই সময়েই গণনাট্য সংঘের বিশেষ করে কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীরা অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যান। গান গাওয়া আর অভিনয় করা যেন একটা গেরিলা

যুদ্ধের রূপ নেয়। এই সময়ের তুলনায় যুদ্ধের ও যুদ্ধ পরবর্তী সংগ্রামের সময় গণনাট্য আন্দোলনের কাজ অনেক সহজ ছিল। ১৯৪২ সাল থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসার অভিযান সত্ত্বেও গণনাট্য আন্দোলন তার বক্তব্য নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারত। তা ছাড়া আন্দোলনের মধ্যে বহু অকমিউনিস্ট নামী লেখক ও শিল্পীদের সমবেত করতে পেরেছিল। তাই ১৯৪৮-১৯৫০ এর গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। মনে রাখা দরকার যে যখন বোঝা গেল এই সময়কালে নীতিগত ভুল ছিল, তখন এই সব বাহাদুর ও সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকেই কিন্তু নিজ নিজ নাট্যগোষ্ঠী সংগঠিত করে গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখেন ও প্রসারিত করেন। পরবর্তীকালে, আমরা গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব দেখতে পাই বিভিন্ন নাটক ও চলচ্চিত্রে। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' বা নিমাই ঘোষের চলচ্চিত্র 'ছিন্নমূল' বা বিমল রায়ের চলচ্চিত্র 'উদয়ের পথে' ও অবশ্যই গণনাট্য আন্দোলনের নিজস্ব চলচ্চিত্র 'ধরতি কে লাল'-এ।

সুধীদার কথায় ফিরে আসা যাক। আমার বিশেষ করে মনে পড়ে ১৯৮৫ সালে পুনাতে আজকের সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের প্রসার সংক্রান্ত তিনচার দিনের এক আলোচনা সভায় আমরা দুজনেই অংশ গ্রহণ করেছিলাম। স্বভাবতই সেখানে গণনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক স্মৃতিচারণ ও আত্মসমালোচনা হয়। সেখানে সুধীদা খুবই সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে নতুন করে সমমতাবলম্বী বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীদের আবার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে সমবেত করার সময় এসেছে। একথা যখন তিনি বলেন, তখন তিনি মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের দলিলপত্র সংগ্রহ করে, সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সব দলিলপত্র সম্পাদনার সময় তিনি নিজস্ব বহু মতামত প্রকাশ করেছেন। পাঠকবৃন্দ, বিশেষ করে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা সুধীদার সব যুক্তি নাও মেনে নিতে পারেন। ঘটনা বা ঘটনার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকা অসম্ভব নয়। তবু একথা বোধহয় অনস্বীকার্য যে এই গ্রন্থগুলিই গণনাট্য আন্দোলনে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান। পুরোনো ইতিহাসের স্মৃতিচারণা আজকের দিনে বোধহয় কিছুটা অর্থবহ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনোই ঠিক ঘটে না। তবে অনেক সময় কিছু মিল পাওয়া যায়। তার থেকে আমাদের আজকের অনেক সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ সম্ভব। ১৯৩০ সালে পুঁজিবাদের এক দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। পুঁজিপতিরা সে সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তখন কয়েকটি রাষ্ট্রে সে প্রয়াস ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়। মহাজনি পুঁজির (finance capi-

tal) সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, তীব্র জাত্যভিমানী, সব চেয়ে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী অংশের নগ্ন সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্বের প্রকাশ আমরা তখন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। যার অন্তিম পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ।

সেই সময় এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী তাদের সহযোদ্ধা রূপে পেয়েছিল সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে, যাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল প্রধান। এ সময়ের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে এই রকম শ্রেণীসমাবেশ সম্ভব হয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের সংকটমুক্ত অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রতি বুদ্ধিজীবী সমাজের আকর্ষণের জন্যে। আজ আমরা এক নতুন ধরণের অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। এর জন্যে দায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এখন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বিমুখ মহাজনি পুঁজির প্রাধান্য। অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজবাদী পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। আবার দিকে দিকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে সে সব স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তাদের সাধারণ মানুষ বিশ্বপুঁজিবাদের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। সে সংগ্রাম নিজেদের দেশের রাষ্ট্রে ক্ষমতাসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষকামী শ্রেণীর বিরুদ্ধেও। কিছু কিছু রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছে। দেশে দেশে যতই এই সংকট তীব্রতর হচ্ছে ততই জনজাগরণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছে দেশের শাসকশ্রেণী। তখন জাত্যভিমানে সুড়সুড়ি দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে এ সংকট থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় ফ্যাসিবাদ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার মূল কেন্দ্র আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সামরিক শক্তি। ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এই শক্তি সারা পৃথিবীর মানুষকে শোষণের শিকলে বেঁধে রাখতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের দেশেও তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি — সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ানোর মধ্যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে, ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ন্যাটোর সামরিক শক্তির হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছে, জাতীয় স্বার্থে যে কোনও দেশ আক্রমণ করার অধিকার তার আছে।

আবার নতুন করে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সম্মুখীন আমাদের দেশ। এই সময় আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখনই ঠিক আগেকার মতো ব্যাপক সাড়া নাও পেতে পারি। কারণ বিশ্বায়নে তাদের প্রথম দিকে কিছুটা ব্যবসায়িক উন্নতি হতে পারে। তা ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লবের সাহায্যে তাদের মগজ ধোলাইএর কাজ অতি সুপরিকল্পিত ভাবে শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য নতুন করে

গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তার ভেতরে শ্রমিক শ্রেণীকে টেনে আনতে হবে। তাদের গ্রামীণ লোকসঙ্গীতের ও তার সমাজমুখী প্রবণতার চেতনা নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। গ্রামে যে সব শিল্পকলা মৃতপ্রায় সেগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে। তার জন্যে দরকার শিল্পী হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। শহর ও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রেণী সংগঠনই সব নয়। গ্রাম ও শহরে খেটে খাওয়া মানুষের সুস্থ কারুশিল্পচেতনার উন্মেষ প্রয়োজন। এই সব শিল্পীকে শিল্পী হিসাবেও সংগঠিত করতে হবে। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, স্বাধীনতা-প্রেমী ও বামপন্থী সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করার চেষ্টা চলেছে, সেই রকমই আজ এই একই মতাবলম্বী যে সব সাংস্কৃতিক সংগঠন আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছে, তাদের এক মঞ্চে সমবেত করতে হবে। মানবজাতির শত্রুর শক্তি যতই বিরাট মনে হোক না কেন, এ কথা ভুললে চলবেনা যে ওরা মুষ্টিমেয়, এবং আমরা সংগ্রামী অগণিত জনসাধারণ। তাই আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

# লোকসংস্কৃতি ও সুধী প্রধান

রামশঙ্কর চৌধুরী

সুধী প্রধান ছিলেন প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা, সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ ও গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং ফ্যাসিবিরোধী লড়াই-এর একনিষ্ঠ সৈনিক। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ঠিক কোন্ সময় থেকে তিনি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হন তা বলা খুব কঠিন, অন্তত এই লেখক সে বিষয়ে অজ্ঞ, তবে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন থেকে বোধহয় তিনি সক্রিয়ভাবে লোক-সঙ্গীতের শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিং-এর প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতের শিল্পী নিবারণ পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই দিনগুলোয় ফ্যাসি-বিরোধী অনেক কাগজ শহরে শহরে প্রকাশিত হয়ে বহু কবিতা, সম্পাদকীয়, জেলার সর্বত্র প্রচারিত হত। ফ্যাসিবাদের রূপ এবং তার বীভৎসতা ব্যাখ্যা করে ফ্যাসিবাদী জাপানকে রুখতে হবে এই স্লোগানের পিছনে শিল্পী সাহিত্যিক, চাষী মজুর, বুদ্ধিজীবীদের সুদৃঢ় অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিভিন্ন জেলার বহু গ্রামের চাষী মহিলারা নিজেরাই গান রচনা করে তাতে সুরারোপ করে গাইতেন। বিশেষ করে এটাই গ্রামীণ চাষী মজুর মধ্যবিত্ত নর-নারীর চরিত্র, বৎসরের যে কোনো ঘটনা, যা এঁদের চেতনায় আঘাত করে, তাই নিয়েই তাঁরা সঙ্গীত রচনা ক'রে গান করেন। এ ধারা এখনো চলে আসছে। বেশি দিনের পুরাতন ঘটনা নয়, এই তো কয়েক বছর পূর্বে বিমান থেকে অস্ত্র বর্ষিত হয়েছিল, সেই বছরই সেখানের টুসু সঙ্গীতে এই বিষয়টিই ধরা আছে।

যুদ্ধ বিরতির পরে শান্তি আন্দোলনেও সুধী প্রধানকে দেখি বাংলার দুই প্রান্তের ডাক-সাইটে দুই কবিয়ালকে নিয়ে আসতে, এরা হলেন চট্টগ্রামের সংগ্রামী কবিয়াল রমেশ

শীল আর অন্য জন মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানি। ১৯৪৫ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে সারারাত্রি ব্যাপী দুই প্রান্তের কবির লড়াই, সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যতদূর জানি, শেখ গোমানির সঙ্গে মুর্শিদাবাদের কমিউনিস্ট কর্মী গৌরী ভট্টাচার্যের মাধ্যমেই সুধী প্রধানের পরিচয় স্থাপিত হয়। পরে শেখ গোমানি সাহেবের নিকট প্রায়ই যেতেন সুধী প্রধান।

শেখ গোমানি ছিলেন একজন জোতদারের সন্তান, কিন্তু চাষের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না, বরং ওঁকে বেশি সক্রিয় দেখা যেত কবিগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। তাঁর একটি দলও ছিল ; এই দলে ছিলেন বীরভূমের কবিয়াল লম্বোদর। সুধী প্রধানের সঙ্গে পরিচিত হবার পর গোমানি সাহেব রাজনৈতিক বিষয়কেই কবিগানের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করেন। দেশভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গেই থেকে যান, এবং তখনো কংগ্রেস বিরোধী গান গাওয়ার জন্য কংগ্রেসীরা তাঁকে 'পাকিস্তানের চর' বলেছিলেন। এতে কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন শক্তিশালী কবিয়াল শেখ গোমানি। খবরটা পেয়ে সুধী প্রধান গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, মুর্শিদাবাদের কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন গোমানি সাহেবের পিছনে থাকায় বেশি আর কিছু হয় নি। কলকাতার পার্টির কাগজেও এর প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এর থেকে আরো কিছু কারো জানার ইচ্ছা যদি যাকে, তবে তাঁকে সুধীদার সম্পাদিত Marxist Cultural Movement এর ১ম খণ্ডের ১১২-১১৬ পৃষ্ঠা পড়ে নিতে অনুরোধ করি। রমেশ শীল ও গোমানি সাহেবকে দুই পাশে রেখে সুধী প্রধানের একটি ছবিও উক্ত গ্রন্থে দিয়েছেন সুধী প্রধান।

মনে পড়ছে মধুসূদন মঞ্চে লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের এক সভায় মুর্শিদাবাদেরই কোনো সদস্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন গোমানি সাহেবের গানের খাতাগুলি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে, ওগুলি কেন্দ্রে এনে সংরক্ষণ করা হোক। এর জবাবে সদস্য সচিব বলেছিলেন, এখনো সেই ব্যবস্থা না করতে পারায় তা করা যাবে না, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তাই হবে।

যাক্, স্বাধীনতা পাবার পূর্বে বহু কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে এবং এই সব বিদ্রোহে অসংখ্য গান গীত হয়েছে। এই লোকসঙ্গীতগুলি যেহেতু মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়েছে, তাই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই তো সেদিন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে কৃষকরা 'তেভাগার' দাবিতে সংগ্রাম করেছেন, এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করেও বহু গান রচনা করেছেন কৃষকরা। এ গানগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত। বহু অনুসন্ধানে এই লেখক 'জং' গানের সুরে, সংগ্রামের একটি গান সংগ্রহ করেছেন। শুধু প্রেম বিরহ নিয়ে লিখিত বা রিচ্যুয়েল ভিত্তিক গানগুলিই লোকসঙ্গীত নয়, মনে রাখতে হবে জাতীয়তাবাদ

মূলক সঙ্গীতও লোক সঙ্গীত। যে গান গীত হয়েছিল ক্ষুদিরামের ফাঁসি হওয়ার পর, এখনো তা গীত হয়, 'একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি।' শোনা যায় বাঁকুড়ার এক বাউল এই গানের রচয়িতা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যত শক্তিশালীই হোক এক দিন তো তাদের এ দেশ ছেড়ে যেতেই হবে। হলও তাই, কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে রেখে গেল? এক ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। বেশি আঘাত এল বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর। গঠিত হল পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হল পূর্ব পাকিস্তান। মৈমনসিং এর সংগ্রামী শিল্পী নিবারণ পণ্ডিতকে আসতে হল পশ্চিমবাংলায়। কোচবিহারে তিনি বাস করতে শুরু করলেন, পশ্চিমবাংলার ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়ার ডাকসাইটে শিল্পী আব্বাসউদ্দীন গেলেন পূর্ববঙ্গে।

উপরে উক্ত সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বুঝতে হবে, সুধী প্রধান কেন লোকসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে বামফ্রন্টের আমলে লোকসংস্কৃতি পরিষদ, পরে পর্ষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়ে সক্রিয় অবদান রেখে গেছেন। আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনো কাজ করে যাচ্ছেন।

এই পর্ষদ তাঁদের কার্যক্রম নির্ধারণকল্পে, প্রায় শতাধিক লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের পরামর্শক্রমে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করেন এবং লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮০ সালে পুরুলিয়া, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে লোকসংস্কৃতির তিনটি আঞ্চলিক উৎসব ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন। ১৯৮১ সালে একই পদ্ধতিতে ১৫টি জেলা উৎসব ও ওয়ার্কশপ হয়। এই ওয়ার্কশপের কাজে বিশেষভাবে দুজনকে সক্রিয় নেতৃত্বে দেখা যায় — (১) সুধী প্রধান (২) অরুণ রায়। এই উৎসবগুলিতে শিল্পী ও সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে জেলাপরিষদের সভাধিপতি, অঞ্চলের সদস্য এবং বহু লোকসংস্কৃতিবিদের সাহায্য নেওয়া হয়, এবং ওয়ার্কশপে সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ্‌দের সাহায্যে প্রণালীবদ্ধ করা হয়। এই তথ্যগুলি পাবার পর রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে জেলাপরিষদের সভাধিপতি, লোকসংস্কৃতি পর্ষদ এবং তথ্যআধিকারিকদের একটি সভা পর্ষদের পরামর্শক্রমে ডাকা হয়। সেই সভার সুপারিশক্রমে "লোকসংস্কৃতি চর্চায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা" বিষয়ে ১৪ই ও ১৫ই মার্চ ১৯৮২-তে এক আলোচনা সভার জন্য খসড়া রচনার দায়িত্ব পড়ে সুধী প্রধান ও সদস্য সচিব মানিক সরকারের উপর। এই খসড়া প্রতিবেদন আলোচনাসভায় পেশ করা হয়। আলোচনা দুই দিন চলে। এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্য, গবেষক,

অধ্যাপক, সংস্কৃতি কর্মী, পর্ষদ সদস্য, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, বিধান সভার সদস্য, লোকশিল্পী, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের তথ্য আধিকারিক, অনুলেখক প্রভৃতি প্রায় একশত জন। এঁদের মধ্যে প্রায় ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে, লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সুপারিশগুলি রাজ্য সরকারের কাছে বিবেচনা ও রূপায়ণের জন্য উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

বলতেই হবে, লোকসংস্কৃতি পর্ষদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এই গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। পর্ষদের প্রতিটি সদস্যের চরিত্রে শিক্ষার অভিমান, আভিজাত্যের মর্যাদা নিয়ে ব্যতিক্রম অবস্থান লক্ষিত হয়নি। যাই হোক্, লোকশিল্পীদের প্রকৃত অবস্থা জানা দরকার, আবার এ বিষয়গুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরেও জানা সময়সাপেক্ষ এবং প্রায় অসম্ভব, তাই ১৯৮০ এবং ১৯৮১ তিনটি বিভাগে এবং ১৫টি জেলায় লোকসংস্কৃতির উৎসব ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে সুধী প্রধান যেন তাঁর যৌবনকে ফিরে পান। তাঁর উৎসাহ ছিল অন্য সদস্যদের প্রাণিত করার মতো, যেন সারাজীবন ধরে এই বিষয়টি অন্তরের সঙ্গে কামনা করেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারও চান লোকশিল্পী ও লোকশিল্পের উন্নয়ন। লোকশিল্পীদের জীবন অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, শোষণ-বঞ্চনা বেগার খাটা, মানুষের প্রাপ্য মর্যাদাবঞ্চিত মানুষ, পদে পদে মনুষ্যত্বের অপমানে প্রতিকারহীন অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হয়েছে। কবির কবিতার একটি অংশ মনে পড়ে : প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে / বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তাই তারা বুঝেছিল — এ হল ভাগ্য, অদৃষ্ট, ভগবানের দান। ইংরেজ চলে যাওয়ায় শাসক পাল্টেছে, শোষণ আরো তীব্র হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত হয়ে এঁরা ভেবেছিলেন যে মনুষ্যত্বের ভাবপ্রকাশের কোনো অধিকারই তাঁদের নেই, তাই এঁদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার দিন এসেছে।

ওয়ার্কশপগুলিতে তাই দেখা গিয়েছিল লোকনৃত্য-গীত-নাট্য এবং লৌকিক কারুশিল্পে যথাক্রমে ১৪৮১, ১১৬০, ৩৫২ এবং ৮৮ জন শিল্পী ছিলেন। এঁদের মোট সংখ্যা ৩০৮১। লক্ষ করা গেছে এক একরের একটু বেশি জমি আছে এমন শিল্পীর সংখ্যা ১৩৪, জমিহীন শিল্পীর সংখ্যা ১৫৭৪ (৬৪.৭৩)। এহো বাহ্য ; এই উৎসবগুলিতে প্রকৃতপক্ষেই এঁদের মানুষের অধিকার, মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, মনুষ্যত্বের স্বাদ এই বোধহয় প্রথম পেলেন শিল্পীরা।

শিল্পীদের অন্তরের বেদনা এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, শুধু এঁদের বৈষয়িক উন্নতি নয়, এই সঙ্গে সংস্কৃতিরও উন্নয়ন প্রয়োজন। সুধী প্রধান, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সৈনিক করে এই শিল্পীদের তৈরি করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু এই চাওয়াকে কার্যকরী করে তুলতে হলে তা শুধু পর্ষদের দ্বারা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতিকে পঞ্চায়েতভিত্তিক করতে হবে — কেননা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি সংখ্যায় অনেক বেশি এবং কলিকাতা হতেও বহুদূরে, তাই পর্ষদ কর্তৃক তা সম্ভব নয়। তাই লোকসংস্কৃতিকে পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রত্যেকটি জেলাসংস্কৃতিউৎসবে উপস্থিত থেকে, তিনি এই আলোচনাই করতেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে জেলাপরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গেও তাঁকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। নীতিগতভাবে সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও দুঃখের বিষয় পঞ্চায়েত সমিতিকে উদ্যোগী হতে দেখা যায় নি।

পঞ্চায়েত সমিতি যে কাজগুলি করতে পারেন তা কঠিন এবং অসম্ভব নয়, যথা :

(১) লোকশিল্পীদের দৈনিক রেওয়াজের জন্য একটি করে আখড়া করে দেওয়া

(২) শিল্পীরা পেটের দায়ে নিজেরা হাটে, বাজারে, মেলায় বিপণনের জন্য যান, এ কাজে সাহায্য করতে পারেন

(৩) লোকউৎসব মেলাগুলিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে

(৪) প্রতি বৎসর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ; আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, যুবকল্যাণ বিভাগ, জনশিক্ষা বিভাগ, পঞ্চায়েত সমিতি, সি. এ. ডি. এ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে লোকসংস্কৃতি উৎসব করতে পারে।

পর্ষদ খুব বেশি দিন গবেষক অরুণ রায়কে পায় নি কেন না তিনি ১৬ই আগস্ট ১৯৮২তে অকস্মাৎ মারা যান। তখনো লোকসংস্কৃতির অপিস, অপিসে কাজ করার মানুষ, সংগ্রহশালা হয়নি। সুধী প্রধানের চেষ্টাতেই বেহালায় এইসব হয়। আরো একটি অভিনব কাজ হয়, তা হল খনি অঞ্চল লোকসংস্কৃতি উৎসব, চা বাগিচা লোকসংস্কৃতি উৎসব এবং জুট অঞ্চল লোক সংস্কৃতি উৎসব। এই তিনটি স্থানে সারা ভারতের লোকশিল্পীরা অবস্থান করেন।

লোকসংস্কৃতির এই ব্যাপকতা, কাজের বিস্তৃতি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রে পর্ষদ রূপান্তরিত হয় সর্বস্তরের দায়িত্বশীল মানুষকে নিয়ে। বিরাট এক কলেবর। মধুসূদন মঞ্চে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। লোকসংস্কৃতি গ্রামও হয়, কিন্তু এত হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত স্তরে লোকসংস্কৃতিকে নিয়ে যাওয়া যায় নি। এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে একা একা ১২টি জেলার পঞ্চায়েত সভাপতিদের মিটিং করেন সুধী প্রধান। আমি ওঁকে এই বয়সে একা ঘুরতে দেখে লিখি, এই পরিভ্রমণ বিপদ নিয়ে

আসতে পারে। তিনি লেখেন, ট্রেনে যেতে যেতেই যদি মৃত্যু হয়, তাই হবে বরণীয়। তাই হলও। লোকসংস্কৃতি গ্রামে কেন্দ্রের জন্মোৎসব করার সময়ই তিনি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে যান এবং তার পরদিন মৃত্যু হয়। সেই রাত্রেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও করা হয়। মরদেহে একটা মালা দেওয়ার সুযোগও ঘটে নি আমাদের। অনেককেই তো 'নন্দনে' রাখা হয়, কিন্তু সুধী প্রধানের মরদেহ কেন রাখা গেল না, তার কারণ জানি না। মানুষটি হেঁজিপেঁজি ছিলেন না, সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়েছেন ; বর্ধমান, কল্যাণী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট সম্মানে ভূষিত করেছেন, বহু গ্রন্থের তিনি প্রণেতা, 'সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটি লিখিত হবার পূর্বে কয়েকবারই ভারতের বাইরে গেছেন। ইউরোপে একবার নয় কয়েকবারই গিয়েছেন। আমন্ত্রিত হয়ে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শেষবারের মতো খনি অঞ্চলের ও জুট অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উপর একটি প্রবন্ধ লিখে ও দেশের কোনও কাগজে দেবার জন্য নিজে জুট এরিয়ার ওয়ার্কশপের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবন্ধ লিখে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আসানসোল খনি অঞ্চলের ওপর লেখার। লিখতে শুরু করার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় তিনি চলে গেলেন।

# সুধী প্রধান ও লোকসংস্কৃতি

## গিরীন্দ্রনাথ দাস

বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভাধর সুধী প্রধান। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নাটক, গান, অভিনয়, সংগঠন, সম্পাদনা, গবেষণা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, শারীরবিদ্যা, ব্যবসায়, কৃষি আন্দোলন প্রভৃতি যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন তাতেই তাঁর সাফল্যের পরিচয় আছে।

শ্রদ্ধেয় ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য একাধিকবার আমাকে বলেছিলেন ঃ সুধীদা প্রধানত নাটক, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের লোক।

সুধী প্রধানের তখনকার কর্মতৎপরতায় ড. ভট্টাচার্যের কথাটি সঠিক। এখন মনে হয় ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের সংযুক্ত সিদ্ধান্ত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল যা একমাত্র সুধী প্রধান না নিলে তাঁকে হয়তো আমরা ঠিক জায়গায় এমন একটা সুকঠিন এবং মহৎ কাজের মধ্যে পেতাম না। কারণ সে সময় নাটক, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রে প্রতিভাধর শিল্পীর উপস্থিতি ছিল, গ্রামীণ সংস্কৃতি আন্দোলনের সংগঠনকে সঠিক পথে প্রগতিশীল রাখার আর কোনো লোক ছিলেন না। 'বহুরূপী' সংস্থার 'বহুরূপী' পত্রিকায় 'নবান্নের নায়ক' প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার লিখেছেন ঃ 'সুধী প্রধান আমার পুরানো রাজনৈতিক বন্ধু। এমন পরিশ্রমী ও সংগঠনদক্ষ শিল্পোদ্যোগী শিল্পী বোধ হয় বাংলাদেশে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না, এখনো আছেন কি না জানি না।' গত ৮.১২.৯৭ তারিখে 'গণশক্তি' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন ঃ 'এই গ্রাম (লোকসংস্কৃতি গ্রাম)

এখানকার সার্বিক কর্মকাণ্ডের ধারণা সবই সুধী প্রধানের ধ্যানধারণা থেকে আসা। সেই কর্মকাণ্ডের হাল ধরার বিকল্প কাউকে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। যদিও তার খোঁজ করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকে যোগ্য লোককে নির্বাচন করা দরকার। . . . এমন লোকের খুবই অভাব।' মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ 'তিনি বিশ্বাস করতেন লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ করা যায় না। তিনি নিজেই একটা ইতিহাস। . . . . . . তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন — লোকসংস্কৃতি পর্ষদকে মাটির কাছে পৌঁছাতে হবে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে কৃষকের যে রূপান্তর ঘটছে তা লোকসংস্কৃতির চোখ দিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।' অবশ্য গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রসার বিকাশ বিষয় নিয়ে তিনি ১৯৩৬ সাল থেকেই ভাবছিলেন।

সংস্কৃতির অভিধা নির্দেশিত হল লোকসংস্কৃতির অভ্যুদয়ের অনেক পরে। এখন সংস্কৃতি বলতে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত সবটাই বোঝায়। সংস্কৃতিরও নানান ভাগ নির্ধারিত হয়েছে ঃ উচ্চমার্গের সংস্কৃতি যা সুউচ্চ চিন্তা-ভাবনার মানুষ থেকে বিকশিত হয় আর অন্যেরা যাতে আনন্দ পান। তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি ঃ যা সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়, তাতেও অন্যেরা আনন্দ পান। ঐ দু'প্রকার সংস্কৃতির একটির মধ্যে পাওয়া যায় নিরপেক্ষ সংস্কৃতি, যাকে বলা হচ্ছে 'শিল্পের খাতিরে শিল্পসংস্কৃতি'। আর পাওয়া যায় 'প্রয়োজনের পক্ষের সংস্কৃতি'। উভয় পক্ষ কিন্তু রসাস্বাদনের কথাটা মেনে নিয়েছেন।

সুবিধাবাদী 'নিরপেক্ষ' সংস্কৃতি-অনুসারীদের বেশ কিছু ব্যক্তি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্কৃতির পক্ষে ওকালতি করেন। সে বিতর্কিত বিষয় এখানে বাহুল্য। প্রয়োজনবাদী সংস্কৃতি সমগ্র সমাজের দর্পণ। সেই সমগ্র সমাজটাই আজ দুরকম চিন্তায় বিভক্ত। এক, প্রয়োজনের পক্ষের জীবনধারণের ব্যাপারটায় কিছু লোক অন্যের ওপর প্রভাববিস্তারের মাধ্যমে শাসন- শোষণ চালাতে চায়। তারা বলে, তাদেরও জনগণ আছে। দুই. যাঁরা উৎপাদক এবং উৎপাদন-সহায়ক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীভুক্ত, যাঁরা অত্যাচারিত এবং খাদ্য-বস্ত্র-আবাসন-স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাবে ক্লিষ্ট হয়ে জীবনযাপন করছেন তাঁরা শোষিত-শাসিত হয়েই চলেছেন। তাঁরাই গরিষ্ঠজন। তাঁরাই বলেন যে বিশ্বের সব লোকই কিছু-না-কিছু শ্রম করেন ; অতএব তাঁদের সকলকে নিয়েই মানবসমাজের জনগণ। তাঁদের পক্ষের সংস্কৃতিমান শিল্পীগণ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে শাসিত-শোষিত মানুষের সংস্কৃতির প্রকাশ করতে গিয়ে সহৃদয়ের হৃদয়সংবাদী তাগিদে, মানবিকতার প্রশ্নে, সামাজিকতার দায়বদ্ধতায়, সৃজনশীল মনস্কতায় উৎপীড়িতের পক্ষ না নিয়ে

পারেন না। সুধী প্রধান এ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখকশিল্পী সংঘ প্রভৃতির সংস্কৃতি আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে ঐ বিভাগের দায়িত্ব নেবার জন্য যাঁকে সামনে আনা হয়েছিল তাঁর সে দায়িত্ব পাবার সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। সমর্থন পেলেন সুধী প্রধান। সামগ্রিকভাবে তিনি এ দায়িত্ব পাবার কী পশ্চাদ-প্রেক্ষাপটে যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত অবশ্য করা প্রয়োজন।

সুধী প্রধান শিশুকালে মাতৃহারা হন, কয়েক বছর পর বালক বয়সে হন পিতৃহারা। পরিবারে অবহেলা অযত্ন পেয়ে আশপাশের অন্ত্যজবর্গের মানুষজন হয়ে ওঠেন তাঁর বেশি আপনজন। গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে সাত-আট কিলোমিটার হেঁটে দক্ষিণ চাতরা মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করার পথে নানা বর্গের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায়, এবং চাতরার আত্মীয় সূর্যকান্ত মিশ্রের বাড়ি থাকতে থাকতে আশপাশের অন্ত্যজবর্গ ও মুসলমান সহপাঠীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠায় তাঁর মানসিক ভাবনা-চিন্তার বিকাশ-প্রসার গ্রামীণ সংস্কৃতিভিত্তিক বনিয়াদে স্থাপিত হয়।

মাইনর স্কুল পাশ করবার পর তিনি এলেন বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে। জাত-পাতের বালাই তাঁর মন থেকে আগেই দূর হয়ে গিয়েছিল। বাবা প্রকাশচন্দ্র প্রধান 'যুগান্তর' বিপ্লবীদলের কাজকর্মে গোপন সহযোগিতা করার অপরাধে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এবার তিনি হলেন দেশব্রতী। ততদিনে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনেছেন, — ভারতের স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যোগদান করলেন 'যুগান্তর' আন্দোলনে। পাশাপাশি দেখেছেন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন, — ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন ইত্যাদি। টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার মামলায় জড়িত হয়ে বন্দী, কৃষক আন্দোলনে জড়িত হয়ে অন্তরীণ অবস্থায় আবার বন্দি, মার্কসবাদী গ্রন্থাদি পাঠ ইত্যাদি তাঁকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আকর্ষণ করে। তিনি লক্ষ করলেন ১৯৩২-৩৬ সালে বিশ্বব্যাপী লেখকশিল্পীদের প্রগতিশীল চিন্তার জাগরণ ; — দেখলেন সংস্কৃতি ও অসংস্কৃতির ব্যবহার-অপব্যবহারদ্বন্দ্বে সংস্কৃতির অস্ত্র বিদ্যুৎঝলক দিয়ে উঠেছে।

ভারতের জনগণ তো গ্রামেই সর্বাধিক। গ্রামের সুধী প্রধানের চোখ আবার ফিরে তাকাল গ্রামে, শহর থেকে বিমুখ হয়ে নয়। তবে চাইলেন, শহরকেও বুঝবার সুযোগ দিতে হবে কৃষি ভারতের নগ্নরূপকে, সুনির্মল সংস্কৃতিকে। পৃথিবীর লেখক-শিল্পীদের যাঁরা

পুঁজিপতিগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের নরবলিক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ করলেন তাঁরা সোচ্চার হলেন। সোচ্চার হলেন রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখও। লণ্ডনে গঠিত হলো প্রগতি লেখক সংঘ। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্মৌ সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল নাটককে, তার অভিনয় ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে-গঞ্জে। এই সম্মেলনের সংশোধিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়, তার গঠনতন্ত্রের একটা ধারায় বলা হয়, —

c) To bring Literature and Art into closest touch with the people and the actualities of life.

প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী তৎকালীন প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা' প্রকাশিত হয়। সুধী প্রধান তখন 'জনযুদ্ধ' কাগজে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। গ্রামীণ সংস্কৃতিমুখীন ঐ লেখাকে উৎকর্ষ দিতে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে তিনি 'কয়েকজন লোককবি' সম্পাদনা করলেন। এ পুস্তকে তিনি রমেশ শীল, গোমানি দেওয়ান, শ্রীহট্ট - নোয়াখালি নদিয়া প্রভৃতি জেলার তরজা ও কবির লড়াই-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পুস্তকের ভূমিকার শেষাংশে লিখলেন, — 'এ হল জাতীয় দপ্তরের জাতীয় ইতিহাসের সংস্কৃতি অধ্যায়ের একটি অমূল্য ফাইল, — মূল্যবান পৃষ্ঠা।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী নরমেধযজ্ঞ দেশবাসীকে শঙ্কিত করল। দেশব্রতীদের কেউ বোমা-গুলিরূপ কেউ বা লেখনী-তুলিরূপ অস্ত্র ধারণ করলেন। বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনমুক্ত হল কিন্তু পুঁজিপতি শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারল না। সুধী প্রধান বামভাবনার সংগঠনে সাংগঠনিক সম্পাদনার দায়িত্বে আরো গভীরভাবে জড়িত হলেন। তিনি ১৯৪৫ সালে যে গ্রামীণ সংস্কৃতির নতুন দিক্‌নির্ণায়ক (ল্যাণ্ডমার্ক) পুস্তক 'কয়েকজন লোককবি' সম্পাদনা করলেন তার মূল্যও অনেকেই অনুধাবন করতে পারলেন না।

গবেষকগণ অনেকদিন আগে থেকেই গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর কাজ করছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ লেখক-শিল্পীকে যে গণতান্ত্রিক সৃষ্টিধারার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ দিয়েছিল, সেই দিকটায় কৃষি-গ্রামীণ সংস্কৃতিকে অস্ত্ররূপ দেবার দিক্‌নির্ণয় করলেন সুধী প্রধান। সেই গণতান্ত্রিক সৃষ্টিধারার একটা উপযুক্ত নামকরণ তখনও হয়নি। ১৮১২ সালে উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হওয়া থেকে 'ফোকলোর' কথাটা বঙ্গে

চ'লে আসছিল। সম্ভবত বিনয় ঘোষ শব্দটি 'লোকসংস্কৃতি' অভিধা প্রথম প্রকাশ করলেন। সঞ্জীবকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক বৃহৎ গ্রন্থখানিও সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৭০ সালে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৬ই থেকে ২০শে ডিসেম্বর বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ছয়টি অধিবেশনে উনিশটি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। আচার্য সুকুমার সেন, শান্তিদেব ঘোষ, অজিতকুমার ঘোষ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, তুষার চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অমলকুমার দাস, রাজ্যেশ্বর মিত্র, সুধীরঞ্জন দাস প্রমুখ স্মারক গ্রন্থে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৭৩ সালে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ঐ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাণী পাঠিয়েছিলেন। স্মারক পত্রিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আসাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর, বিহার, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ঐ স্মারকপত্রে আলোকপাত করা হল যার প্রায় সবটাই পুরাকীর্তিবিষয়ক। ঐ সম্মেলনের মূল বক্তব্য ছিল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। এত বড়ো সম্মেলন হ'ল কিন্তু প্রগতির দিক পরিবর্তনের আভাস এতে পাওয়া গেল না। এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্গের প্রগতিবাদীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু করে উঠতে পারেন নি। কারণ এটা অবিসংবাদিত সত্য যে রাজনৈতিক দর্শনে যদি বৈপরীত্য থাকে তবে সেই বিপরীত দর্শনের ক্ষমতায় আসীন সরকারের কাছে বাধা ছাড়া সহায়তা আসে না।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট-সংগঠন রাজ্যসরকারে ক্ষমতায় এল। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী সরকারের রাজ্যস্তরের বাধা অপসারিত হল, কিন্তু কেন্দ্রীয় অবাম সরকারের বিরোধী দৃষ্টিই রয়ে গেল। যা হোক, প্রগতি লেখক সংঘের আদর্শ অনুসারে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ধারা রেখে বামফ্রন্ট সংগঠনের সভা লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে করি রাজনৈতিকভাবে বামফ্রন্টের সরকারি সভায় তার অনুমোদন লাভ হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি বিভাগে লোকসংস্কৃতির চারটি ভাগের কথা ছিল। যথা লোকনৃত্য, লোকগীত, লোকনাট্য এবং লৌকিক কারুশিল্প। উক্ত চারটির সবগুলি মিলিয়ে একটি নামকরণের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সুধী প্রধানের সুপারিশক্রমে 'লোকসংস্কৃতি পর্ষদ্' গঠিত হয়ে থাকবে, — এটাই স্বাভাবিক। এ কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত

হয়েছিল। ১৯৮০-৮১ সালে জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতির ওয়ার্কশপ ও উৎসব হয় এবং 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা' নামে পরিসংখ্যানমূলক একখানা বইও প্রকাশিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাতে ৭.৩.৮০ তারিখে লিখেছেন, — 'লোকসংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্যসরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব হচ্ছে।' ঐ বইতে ৯.৩.৮২ তারিখে লিখিত ভূমিকায় সচিব পার্থসারথি চৌধুরী জানাচ্ছেন, — 'রাজ্যসরকার "লোকসংস্কৃতি পর্ষদ্" গঠন করেছেন। পর্ষদের পরামর্শক্রমেই একাজ হয়েছে।'

লোকসংস্কৃতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন হয় ১৯৮২ সালের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত। মন্ত্রী মহোদয় শুভেচ্ছাবাণী দিয়েছিলেন মার্চ ১৯৮০-তে। এতে বোঝা যাচ্ছে ঃ দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে ধীরে-সুস্থে অনেক জনসংযোগ ঘটিয়ে তখনকার সময়ে যতখানি সম্ভব গণতান্ত্রিক উপায়ে এমন একটি মহৎ কাজের সূত্রপাত হয়েছিল। ঐ বইতে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের প্রথম দিককার পৃষ্ঠায় যে নামের তালিকা আছে তাতে মন্ত্রীমহোদয়ের নামের পর প্রথম নাম সুধী প্রধানের এবং তার পর আরো পনেরো জনের নাম আছে। একেবারে শেষে রয়েছে সদস্য সচিব ও উপঅধিকর্তা মানিক সরকারের নাম।

শিল্পী-সাহিত্যিক-গবেষক হিসাবে যাঁরা সুধী প্রধান তথা মূল পরিচালককে সহযোগিতা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামশঙ্কর চৌধুরী, অরুণ রায়, মালিনী ভট্টাচার্য, মানস মজুমদার, পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সুখবিলাস বর্মা, প্রভাস ফদিকার, উপেন কিস্‌কু, মোজাফ্‌ফর হোসেন, মোহিত রায়, সুশান্ত হালদার, সুধীরকুমার করণ, পুষ্পজিৎ রায়, অজিতেশ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, চন্দন চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। সাধারণ ভাবে আমিও ছিলাম। সর্বোপরি প্রথম থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সর্বক্ষণ সতর্ক প্রহরা রেখেছিলেন।

এবার লোকসংস্কৃতির সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চারাগাছ কিভাবে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে কী কী অনুষ্ঠান-দৃষ্টান্ত রাখল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যেতে পারে ঃ —

কলকাতায় ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে প্রথম রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে কারুশিল্পের প্রদর্শনী ও সচিত্র স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতায় ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতায় ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হয়েছিল তৃতীয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব। তাতে কারুশিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল সচিত্র স্মরণিকা। তারপর গ্রামীণ সংস্কৃতি উৎসব, আলোচনা প্রভৃতি ব্যাপক চর্চার কাজ প্রধানত মফঃস্বলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯০-৯৩-এ জেলার পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা প্রভৃতি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিগত অন্যান্য বছরের ন্যায় নিয়মিত লোকসংস্কৃতি উৎসব হয়। জানুয়ারি ১৯৯৪-এ মালদহে প্রথম মহিলা লোকশিল্পীদের সম্মেলন-কর্মশালা-উৎসব, ডিসেম্বরে হিঙ্গলগঞ্জে মাঝি-মাল্লাদের লোকসংস্কৃতি উৎসব-প্রদর্শনী-কর্মশালা, এবং এই বছরেই লোকসংস্কৃতি পর্ষদের নতুন নামকরণ হয় ঃ 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-এ স্বরূপকাঠিতে লোকসংস্কৃতি চর্চা ও শ্রমিক কেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম একটি পঞ্চায়েতে নিজ প্রচেষ্টায় একটি চর্চাকেন্দ্র লোকশিল্পীরা নিজেরাই করেছেন। তাছাড়া আরো বহু জায়গায় নানা নামে অনেক লোকসংস্কৃতি উৎসব - কর্মশালার অনুষ্ঠান হয়েছে।

১৯৯৬ জুন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কালিকাপুরে 'লোকসংস্কৃতি গ্রাম' প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৯৭ জানুয়ারি, ডায়মন্ডহারবারে আন্তঃরাজ্য পুতুলনাচের উৎসব ও কর্মশালা ঐ শহর ও তার আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হলে ব্যাপক উৎসাহের চাঞ্চল্য দেখা যায়। দিল্লির সঙ্গীত-নাটক একাডেমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী চর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে ত্রিপুরা, কেরালা, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর রাজ্যের লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ময়মনসিংহ গীতিকা বিষয়ক অনুষ্ঠান হয় এবং মে মাসে আগরপাড়ায় অবাংলাভাষী শিল্প শ্রমিকদের লোকসংস্কৃতি উৎসব হয় যাতে প্রধানত বিহারি, ওড়িয়া, মধ্যপ্রদেশি প্রভৃতি লোকশিল্পীরাই ছিলেন। তাছাড়া অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক যে আলোচনাসভা বসেছিল তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সুধী প্রধান প্রয়াত হন। তারপর আসে একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন, — বড় একটা কিন্তু, — এর পর কে?

সুধী প্রধানের কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতিতে লোকসংস্কৃতির বাতাবরণ নির্মল ও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছে, লোকসংস্কৃতি আন্দোলনে 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি

কেন্দ্র' সংগঠন হিসাবে অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থাকে প্রেরণা জোগাচ্ছে, রসাস্বাদনসহ মানবসমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় লোকশিক্ষার দায়বদ্ধতা নিয়ে শিল্পী ও গবেষকগণ কর্তব্যপালন করছেন। লোকশিল্পীদের উৎসাহ দিতে বিবিধ প্রকল্প, যেমন, — লালন স্মারক পুরস্কার, দুঃস্থ লোকশিল্পী ও লোকশিল্পীসংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। লোকশিল্পীরা আজ আর ভিক্ষুক শিল্পী নন। তাঁরা সাম্মানিক অর্থসাহায্য পাচ্ছেন। কোনো উৎসবে তাঁদের বাদ দিয়ে সেই উৎসবের সাফল্য ভাবা যাচ্ছে না। লোকসংস্কৃতি আন্দোলনে বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বহু স্থানে বহু সংখ্যায় গণতান্ত্রিক কর্মভূমিকায় গড়ে উঠছে।

তাছাড়া দৈনিক থেকে বার্ষিক এবং বিশেষ বিশেষ নানাবিধ পত্র-পত্রিকা লোকসংস্কৃতি বিষয়কে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে বহু গ্রন্থও। 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র নিজস্ব পত্রিকা 'লোকশ্রুতি' ও 'লোকবার্তা' আছে; বেসরকারি নানা স্তরের নানা নামের নানা স্মারক - পুস্তিকা তো আছেই। তাই উপসংহারে বলি ঃ সুধী প্রধানের গবেষণামূলক প্রচেষ্টায় কী বিশাল অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের দলিল-নিদর্শন সৃষ্টির জন্য এক বা একাধিক হৃদয়বান গবেষকের কঠোর পরিশ্রমের আশু প্রয়োজন।

# সুধী প্রধান ও লোকসংস্কৃতির কাজ

## সুখবিলাস বর্মা

পরম শ্রদ্ধেয় সুধীদা — সুধী প্রধানের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৮৮ সালে রবীন্দ্রসদনের উল্টো দিকে ময়দানে রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠানে। সুধীদা তখন রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি। তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী পর্ষদের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীচন্দন চক্রবর্তীর সুপারিশে উক্ত অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া-চটকা পরিবেশনের সুযোগ ঘটে। পরিবেশিত গানগুলির একটি ছিল — 'ও ভাই মোর গাওয়ালিয়া রে — চতুর্দিকে জ্বলে সুরুজ বাতি, তোমার জানে দ্যাখং আন্দার আতি রে — পরার বোঝা তোমরা কতদিন বইবেন ভাই।' গান শেষ করে ষ্টেজ থেকে নেমে এলে শ্রীচক্রবর্তী পরিচয় করিয়ে দিলেন সুধীদার সঙ্গে। সুধীদা গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, ভাওয়াইয়া গানে যে এত প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনী শক্তি রয়েছে সেটা আব্বাসউদ্দীনের পরে নাকি আমার গানে পেয়েছেন। আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে কথা হল। উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত লোকসংস্কৃতি নিয়ে অল্পবিস্তর কিছু কথা হল। সেই পরিচয় পরবর্তীকালে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য হিসেবে সুধীদার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে। সুধীদার নেতৃত্বে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই পর্ষদ। আমাদের সুপারিশ মতো উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু কাজ শুরু হয় ভাওয়াইয়া চটকার মূল্যায়ন ও চর্চায়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে এক বছর ধরে 'গুরুকুল' ধাঁচে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় — কোচবিহারে ভাওয়াইয়া চটকা গানের এবং জলপাইগুড়িতে সারিন্দা বাজনার। ভাওয়াইয়া চটকার নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়াইয়া চটকাভিত্তিক লোকনাটক দোতরা, কুশান ও বিষহরা পালাগানের

কর্মশালা (workshop) অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের এক শক্তিশালী লোকমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির চর্চা ও উন্নতিতে তিনি গভীরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অফিসগৃহ, প্রেক্ষাগৃহ, সংক্ষরণাগার ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে একটি লোকসংস্কৃতি গ্রামের প্রস্তাব পেশ করা হলে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাইপাসের ধারে দু'এক খন্ড জমির খোঁজখবর পাওয়া গেলে সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা চালাতে থাকেন শ্রীচন্দন চক্রবর্তী - সুধীদার সক্রিয় মদতে। ঠিক এই সময়েই সরকারি সিদ্ধান্ত হয় যে স্বতন্ত্রভাবে লোকসংস্কৃতির জন্য কোনও বিশেষ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই — এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্মীয়মান একটি কেন্দ্রের সঙ্গেই লোকসংস্কৃতি পর্ষদের কাজ চালানো যেতে পারে। খবর পেয়েই সুধীদা সক্রিয় হয়ে ওঠেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত বদলের জন্য। তাকে সাহায্য করেন পর্ষদের অন্যান্য সদস্যগণ।

ইতিমধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্বে আসেন মাননীয় শ্রী কান্তি বিশ্বাস। সুধীদা মন্ত্রীর সঙ্গে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বহু দরবার করে সরকারি সিদ্ধান্ত বদলে সফল হন। অবশ্য এই সিদ্ধান্তবদলের ব্যাপারে লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সকল সদস্যের সক্রিয় ও যৌথ প্রচেষ্টা সুধীদার উদ্যোগের সহায়ক হয়। শুরু হয় জমি সংগ্রহের অভিযান। চন্দন চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় ও সুধীদার উদ্যমে জমির খোঁজ মেলে। অনেক জল ঘোলার পর জমির দখল পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ বিঘা জমির উপর লোকসংস্কৃতি গ্রাম নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয় ভারতসরকারের কাছ থেকে। সুধীদার পরামর্শে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য তৎকালীন সাংসদ শ্রীমতি মালিনী ভট্টাচার্য ও আমি আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের তৎকালীন সংস্কৃতি সচিব শ্রী সীতাকান্ত মহাপাত্রের সঙ্গে আলোচনা করি। মূলত তাঁর পরামর্শ অনুসরণ করে লোকসংস্কৃতি পর্ষদকে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র নাম দিয়ে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে রেজিষ্ট্রিকৃত করা হয় — উদ্দেশ্য ভারত সরকার ও অন্যান্য সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্যলাভের সুবিধাগ্রহণ। ভারত সরকারের মানবসম্পদউন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন সংস্কৃতি বিভাগে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব মঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমির দলিলের অভাব। জমির দখল পাওয়া গেলেও কেন্দ্রের নামে জমির দলিল তখনও পাওয়া যায় নি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশক্রমে মালিনী ভট্টাচার্য ও আমি তখন যোজনা কমিশন থেকে কিছু আর্থিক সাহায্যলাভের চেষ্টা করি এবং আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। যোজনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান

শ্রী প্রণব মুখার্জী প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন কেন্দ্রের সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য। এই কাজ চলতে থাকে সুধীদার অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পর সুধীদার উৎসাহ বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। ঐ জমিখন্ডের উপর কেন্দ্র নির্মাণ করে তাকে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে তিনি ছিলেন মশগুল। তাঁর এই স্বপ্নকে স্বার্থক করার জন্য কেন্দ্রের শ্রীমতি মালিনী ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, শ্রী পরিতোষ দত্ত, শ্রী পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাও উল্লেখনীয়। সুধীদা প্রায়শই ঐ জমিখন্ড পরিদর্শনে যেতেন — কেন্দ্র নির্মাণ সাবকমিটির সভায় এবং অন্যান্য সভায় নিয়মিত হাজির হতেন তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও। একই ভাবে বিভিন্ন জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব - আলোচনা চক্রে তার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নিয়মিত। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও লোকসংস্কৃতিকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসতেন। লোকসংস্কৃতির উন্নতিতে তিনি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। লোকসংস্কৃতিগ্রামকে তিনি এতই ভালবেসে ছিলেন সে সেখানে কোনও পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও মূলত তাঁর আগ্রহেই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান গত তিনচার বছর থেকে এই লোকসংস্কৃতি-গ্রামে করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা থেকে লোক সংগীত, নৃত্য, আদিবাসী সংগীত নৃত্যের দল নাচ গান পরিবেশন করে থাকেন। যে বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল genuineness ও traditionality। ঐতিহ্যগতভাবে যে সংগীত নৃত্য যেভাবে পরিবেশিত হয়ে আসছে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। লোক সংগীত ও নৃত্য, আদিবাসী সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে আজ যে বিকৃতি ও উন্নতির নামে অবক্ষয় প্রবেশ করছে সুধীদা ছিলেন তার ঘোরতর বিরোধী। তাই তো খাঁটি লোক সংগীত, নৃত্য, আদিবাসী সংগীত নৃত্যের পরিবেশনার ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেসব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার মানসে একটি সুস্থ সবল কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে সুধীদা তাঁর শেষ জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে মনে করতেন এবং নানা কথার মাধ্যমে সেটা তিনি প্রকাশও করতেন। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র গঠনের প্রাথমিক ইতিহাস নিয়ে এত কথা বললাম তার কারণ এই সে সুধীদার শেষ জীবনের বেশ কিছু বছরের কার্য্যকলাপ প্রধানত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে এবং এই 'কেন্দ্র'কে কেন্দ্র করেই। আমার সঙ্গে সুধীদার পরিচয় তাঁর জীবনের এই শেষ পর্বে। তাই আমার কাছে তাঁর মূল্যায়ন 'কেন্দ্র' ভিত্তিক হওয়াই অতি স্বাভাবিক। 'কেন্দ্র' ভিত্তিক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে। লোকসংস্কৃতির উন্নতিতে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সমস্যার সমাধানে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, অনেক ব্যাপারেই তাঁর আপোষহীন মনোভাব যাকে অনেকেই আখ্যা

দেন একগুঁয়েমি বলে — সব কিছুর পরিচয় আমরা পেয়েছি 'কেন্দ্র' ভিত্তিক কাজকর্মের মাধ্যমে। তাঁর জেদ, তাঁর আপোষহীন একগুঁয়েমির জন্যই 'কেন্দ্র' আজ এতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। তিনি জেদ না ধরলে কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও অফিস আজও হত কিনা সন্দেহ — কেন্দ্রের কার্যকলাপ এত বিস্তৃত হত কিনা সন্দেহ, আবার তাঁর এই জেদ ও একগুঁয়েমি কীভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে সে পরিচয়ও পেয়েছি এই 'কেন্দ্র' ভিত্তিক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই। সুধীদার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নিজস্ব সৃষ্টির জন্য আনন্দ ও গর্ব। এটা কমবেশি আমাদের সবার চরিত্রেই রয়েছে — কিন্তু সুধীদার ক্ষেত্রে এটা ছিল অত্যন্ত প্রকট। সব কাজ তিনি অত্যন্ত perfection এর সঙ্গে করার চেষ্টা করতেন এবং কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা হলে তা নিয়ে তিনি গর্ব করতে ভালোবাসতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটিই আবার অনেক সময়েই নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। যেমন প্রধান অনেক ব্যক্তিকেই বলতে শুনেছি সুধী প্রধান 'আমি' ছাড়া কিছু জানেন না। তাঁদের কাছে সুধী প্রধান ছিলেন 'আমি' প্রধান।

যা হোক, লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতির বিকৃতি, শস্তা নকল পরিবেশন ইত্যাদি ঠেকানোর ক্ষেত্রে এই 'কেন্দ্র' গত কয়েক দশক ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে তার নেতৃত্বে ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী এই মানুষটি। বর্তমান ইলেট্রনিক প্রচারমাধ্যমের দৌরাত্ম্যের যুগে এই বিকৃতি যে কত ব্যাপক আকার ধারণ করে চলেছে সেকথা জানার কারো বাকি নেই। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিকৃতি আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমাধ্যম, সাহিত্য সংস্কৃতি ইতাদি পরিচালনার যন্ত্র যাঁদের হাতে সেই সব বুদ্ধিজীবীর শতকরা নিরানব্বই জন উত্তরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞানহীন। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশীদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁরা তেমন শ্রদ্ধাশীল নন — বরং প্রধানতঃ কৃষিজীবী নিরক্ষর দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাই বেশি। অন্য দিকে এই জনগোষ্ঠীর কাছে রয়েছে মূল্যবান সম্পদ তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি। বুদ্ধিজীবীরা সেই সম্পদকে লুটে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন — আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন নি। ফলে ঘটেছে নানা বিকৃতি ও অগণিত নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক — এমন কি রাজনৈতিক সমস্যা, এই বিকৃতি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত ভাওয়াইয়া চটকার ক্ষেত্রে এবং ভাওয়াইয়া চট্‌কাভিত্তিক সংগীত নৃত্যের ক্ষেত্রে। ভাওয়াইয়া রাজবংশী জনগোষ্ঠীর প্রাণের সুর, এই জনগোষ্ঠীর সমাজ নৃতত্ত্ব ও সামগ্রিক জীবনদর্শনের আয়না। রাজবংশীদের কথ্য ভাষা যাকে তাঁরা বলেন 'দেশি' ভাষা এবং বিদ্বজ্জনের কাছে যার পরিচয় রাজবংশী বা কামরূপী নামে — সেই ভাষা বা উপভাষায় রচিত এই ভাওয়াইয়া গান প্রধানত নিরক্ষর কবি ও লিপিকার দ্বারা রচিত। এই গানগুলির মধ্যে সাহিত্যগুণ

যাই থাক না কেন সংগীত হিসেবে সেগুলোর মান অত্যন্ত উন্নত। তাই এই গানগুলি গুণীসমাজের সংগীত শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে। এবং সমস্যা এসেছে সেখানেই। লোকসংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আঞ্চলিকতা ও গ্রাম্যতা। এই আঞ্চলিকতা প্রকাশ পায় - লোকসংগীতের কথ্য উচ্চারণ, গাওয়ার ভঙ্গি ও সুরের শুদ্ধতার উপর। ভাওয়াইয়া চটকার ক্ষেত্রে স্বভাবতই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কামরূপী বা রাজবংশী ভাষায় রচিত গানের কথার উচ্চারণ। উচ্চারণ আবার বহুল পরিমাণে কথার অর্থের উপর নির্ভরশীল। রাজবংশী বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। G. A. Grierson রাজবংশীকে Indo-Aryan ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীরাও রাজবংশী বা কামরূপীকে বাংলা ভাষার উপভাষা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। দু'একজন বিদ্যোৎসাহী অন্য কথা বলার চেষ্টা করলেও তেমন প্রমাণ কিছু দিতে পারেন নি। বাংলার উপভাষা বা আঞ্চলিক কথ্য ভাষা হিসেবে স্বভাবতই এর নিজস্বতা রয়েছে ক্রিয়ার রূপে, শব্দ সম্ভারে, উচ্চারণে এবং বলার ভঙ্গি তে। প্রধানত বাংলা শব্দের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য ভাষার অনেক শব্দ, বিশেষ করে Tibeto-Burman অনেক শব্দ, এই উপভাষায় প্রবেশ করেছে। এই ধরণের শব্দের সাহিত্যিক চর্চা তেমন হয় নি — মধ্য বাংলার অনেক বৈশিষ্ট্য এতে এখনও রয়ে গেছে। তাই তো এই উপভাষায় ধাতুরূপ বাক্য গঠন ইত্যাদি বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। কথার উচ্চারণভঙ্গিতে আঞ্চলিকতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কথার অর্থের। ভাওয়াইয়া চটকা ঠিকভাবে গাইতে গেলে তাই শিল্পীকে উপরোক্ত এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তার জানা উচিত 'জাও' ও 'জাওঁ' এর অর্থ পার্থক্য, এর উচ্চারণ ভঙ্গি জানা উচিত। 'জাও' ক্রিয়ার প্রয়োগ মধ্যম পুরুষ বহুবচনে, অর্থাৎ, 'তোমরা জাও', সেখানে 'তোমরা'র অর্থ আপনি (গৌরবে বহুবচন), 'তোমরা জাও'-এর অর্থ আপনি যান এবং 'জাওঁ' ক্রিয়ার প্রয়োগ উত্তম পুরুষ একবচনে, অর্থাৎ মুই জাওঁ, যার অর্থ আমি যাই। তাঁর জানা উচিত রাজবংশী শব্দসম্ভারে 'লাল'-এর উচ্চারণ 'নাল', 'রাম' এর উচ্চারণ 'আম', 'রাজার' উচ্চারণ 'আজা', আবার 'আম' এর উচ্চারণ কখনো বা 'রাম'।

ভাওয়াইয়া চটকার সুরমাদকতায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক শিল্পী এই গান গাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপরোক্ত বিষযগুলির সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা ও শ্রদ্ধা না থাকার জন্য তাঁরা আখেরে ভাওয়াইয়া সংগীতরূপটির সর্বনাশ করে চলেছেন। তাঁরা জানেন না 'আই মুই শকিন্ দ্যাখিয়া বসিনু কাইন' গানটিতে 'শকিন্' কথার পরিবর্তে 'শৌখিন' ব্যবহার ও উচ্চারণ কতো মারাত্মক ভুল। শুধু তাই নয়, এই গানটি গাইতে হলে রাজবংশী সমাজের 'কাইন' প্রথা ও তার বর্তমান সামাজিক পরিচয় ও রূপ ইত্যাদি

সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা তাঁদের নেই। রাজবংশী সমাজে 'ব্যাচেয়া খাওয়া' বলতে কী বোঝায় তা না জানলে 'বাপো মাও মোর হিয়া ছাড়া ব্যাচেয়া না যায় ছোটোতে, যৈবন ঢোলে মোর পুবাল বাতাসে' গানটির পরিবেশন সুষ্ঠুরূপে হতে পারে না। ভাওয়াইয়া চটকার মধ্যেই আবার নানা গানের নানা প্রকাশভঙ্গি। পূজা পার্বনের গান - যেমন বাইটোল, কাতি, সোনারায়, গোরখনাথ ইত্যাদি, মনশিক্ষা দেহতত্ত্বের গান, প্রেমের গান নিসর্গ বিষয়ক গান পালাগান ও পালা গানের খোসাসহ গান, ধুয়া গান, বিয়ের গান, সাধারণ নাচের গান, হাসিঠাট্টার চটকা গান ইত্যাদি বিভিন্ন গানের গায়কী ও প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। দুঃখের বিষয় রাজবংশী সমাজের এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে যাদের জানা নেই - (তারা রাজবংশী সমাজভুক্ত হোন বা সমাজের বাইরের হোন) তাঁদের দ্বারা ভাওয়াইয়া চটকা অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হয় না। অথচ প্রচার মাধ্যম, সংগীত সম্মেলন, সংগীত অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যাদের প্রাধান্য তাদের অধিকাংশই এই দলভুক্ত। ভাওয়াইয়া চটকার ক্ষেত্রে বিকৃতির অবকাশ তাই আরও ব্যাপক এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটছেও তাই — কথার বিকৃতি, উচ্চারণ বিকৃতি, সুর বিকৃতি এবং সামগ্রিক পরিবেশনভঙ্গির বিকৃতি ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। বিকৃতির মাত্রা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা একটি উদাহরণ দিলে সম্যক বোঝা যাবে।

২৮ মার্চ, ১৯৯৯ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে 'উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতি আজ আক্রান্ত, বিপন্ন ....' শীর্ষক প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের লেখক সাহিত্যিক সাহিত্য সমালোচনায় অন্যতম ব্যক্তিত্ব চোমং লামা এই বিকৃতি ও সমস্যার কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, লিখেছেন শহুরে শৌখিনতা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চাপে হাঁসফাঁস করছে উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতি। বাউলসংগীতের বিকৃতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বদন বাউলের জবানিতে উল্লেখ করছেন "লোকসংগীতের বিকৃতি ঘটানোর জন্য কিছু শহুরে সৌখিন আঁতেল দায়ী। তারা কিন্তু নিজেরা লোক সংস্কৃতির চর্চা করেন না। লোকসংস্কৃতি নিয়ে মাতামাতি করে বিদগ্ধ সমাজে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করেন মাত্র। এর প্রথম শিকার হয়েছে বাউল গান।" চোমং লামা আরও লিখেছেন, উত্তরবঙ্গের তো বটেই, যে কোনো জনজীবনের ছবি, তাদের সমাজ, হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ বিরহ কৌতুকই লোকসংস্কৃতির মূল বিষয়বস্তু। শহরের সুরম্য বাতানকূল প্রেক্ষাগৃহে বসে "ফাঁদেতে পড়িয়া বগা কান্দেরে" কিংবা "ধীরে চালাও গাড়িরে গাড়োয়ান ধীরে চালাও গাড়ি" প্রভৃতি গান শুনে "প্রয়াত তুষারকান্তি ঘোষ সশব্দে কেঁদে ফেলেন .....।" লোকসংস্কৃতির বিকৃতির কারণ নিয়ে আরও অনেক কথাই লিখেছেন তিনি। লোকসংস্কৃতির উন্নয়নের নামে 'রাজ্যসরকারের আঁতলামি'র উল্লেখ করেছেন।

ভাওয়াইয়ার সুরবিকৃতির উল্লেখ করে বলেছেন, উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির অভিভাবক শ্রদ্ধেয় তারাপদ রায়, হরিশচন্দ্র কিংবা কুমার নিধিনারায়ণ যান্ত্রিকতা ও আঁতেলদের দাপটে এই লোকসংস্কৃতির বিকৃতি ঘটানো ঠেকাতে পারেন নি। অডিশনে বসা ও রেডিওতে চান্স পাওয়ার উদগ্র তাড়নায় অসংখ্য গ্রাম্য শিল্পী পল্লীগীতির সুরবিকৃতি ঘটিয়ে চলেছেন। তিনি হয়ত উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে অডিশনের বিচারক যাঁরা থাকেন তাঁদের অধিকাংশই ভাওয়াইয়া গাইতে জানেন না - ভাওয়াইয়ার সুর বৈশিষ্ট্য জানেন না।

চোমং লামার এই প্রবন্ধ থেকে বিকৃতি কী এবং কেন ঘটেছে তার একটা পূর্ণ ধারণা আমরা পাই। কিন্তু যে কারণে আমি চোমং লামার প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে ধরলাম তার উদ্দেশ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতিমনস্ক এই সাহিত্যিকের লেখাটি পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না বিকৃতি সমস্যা কত গভীর ও মাত্রাহীন। চোমং লামার নিজের জবানিতে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘ বাহান্ন বছরের। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিকৃতি নিয়েও তিনি মানসিক ভাবে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। তাই তো সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য অনেক তথ্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাবুন তো, বিকৃতির কথা লিখতে গিয়ে তাঁর নিজের অজান্তেই তিনি যখন বিকৃতি আমদানি করেন, তখন সমস্যা কোথায় গিয়ে ঠেকে! প্রবন্ধে দুটি বা তিনটি বহুল পরিচিত বহুল পরিবেশিত গানের উল্লেখ তিনি করেছেন — দুর্ভাগ্যের বিষয় দুটি গানের কথাতেই রয়েছে মারাত্মক ভুল ও বিকৃতি। 'আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' গানটি উত্তরবঙ্গের, শুধু উত্তর-বঙ্গের কেন, বাংলার লোকসংগীতপিপাসু সব মানুষেরই জানা। 'ফান্দে' কথাটিকে লেখক 'ফাঁদেতে' কেন লিখলেন বোঝা কঠিন। তিনি কি 'ফান্দে' কথাটি জানেন না না কী কথাটিকে একটু শুদ্ধ করার প্রচেষ্টা? বিকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার লেখায় দুটোই গুরুতর অপরাধ। হয়ত বা তিনি নিজেও ঐ 'আঁতলামি'র শিকার। একই কথা প্রযোজ্য অন্য গানটি সম্পর্কে যেখানে বিকৃতির পরিমাণ আরও বেশি। 'ধীরে বোলান গাড়িরে গাড়িয়াল আস্তে বোলান গাড়ি' গানটিও বহুলভাবে জনপ্রিয়। 'বোলান' কথাটি কী করে 'চালাও' হল, 'গাড়িয়াল' কী করে 'গাড়োয়ান' হল, 'ন্যাঙ' কী করে 'লই', 'মোর' কী করে 'হামার' এবং 'দয়ার' কী করে 'দয়াল' হল বোঝা মুশকিল। গাড়িয়ালের জায়গায় গাড়োয়ান, মোর এর জায়গায় হামার তবুও বা সহ্য করা যায়। কিন্তু 'চালাও দয়াল' অসহ্য এবং 'লই' বিকৃতির চরম প্রকাশ।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এটাই প্রধান সমস্যা। রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতি সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যাদের নেই তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করা বৃথা। রাজবংশী

সমাজসংস্কৃতির বাইরের — এমন কী এই সমাজভুক্ত তথাকথিত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা এই ভাষা সংস্কৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল নন তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসতি সত্ত্বেও তাঁরা এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি আয়ত্ত্ব করতে পারেন নি।

শ্রদ্ধেয় সুধীদা উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত ও নৃত্যের এই বিকৃতির মাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন — তা নিয়ে তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে ও পরিতোষদার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরিতোষদা অর্থাৎ পরিতোষ দত্ত উত্তরবঙ্গের মানুষ। উত্তর-বঙ্গের সমাজ, অর্থনীতি, ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি তিনি। লোকসংস্কৃতি পর্ষদ এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের একজন একনিষ্ঠ সদস্য। এই বিকৃতি রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে সুধীদা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন ও তাঁর সহযোগীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। এই লক্ষে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরি ছিল তাঁর স্বপ্ন। সুধীদাকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে 'কেন্দ্র' কর্তৃপক্ষ যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে - তা নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে, লোকসংস্কৃতি গ্রামটির নির্মাণ সম্পন্ন করে 'কেন্দ্র'কে প্রকৃত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে — সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে এই সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

# পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের রূপকার সুধী প্রধান

মালিনী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আজ একটি স্বশাসিত সংস্থা, যার জেলায় জেলায় বিস্তৃত কাজকর্মে প্রতিফলিত হয় গ্রামীণ ও আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি একটি বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি — এই দৃষ্টিভঙ্গি বামফ্রন্টের ভাবনার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার রূপায়ণের পদ্ধতি রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপারও নয়। তার পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ভাবনার সমন্বয়, এই গড়ে ওঠার কাজের মূল হোতা ছিলেন সুধী প্রধান।

গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে সুধী প্রধানের পরিচয় ছিল চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে। ১৯৪৩ সালে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই একই বছরে কৃষকসভার কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল লোকসংস্কৃতি নিয়ে সংগঠন গড়তে। রমেশ শীল ও গোমানি দেওয়ানকে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে সুধী প্রধান দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং তাঁদের গ্রামে গিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই যোগাযোগের ফলে গণনাট্য আন্দোলন যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্র ও নাগরিক সভ্যতার দ্বারা অবহেলিত এই লোককবিরা তাঁদের শিল্পের চর্চায় একটা নতুন দিশা পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে গ্রামের শিল্পীদের সঙ্গে সুধীদা যে অক্লেশে মিশে যেতে পারতেন এবং তাঁদের কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত হতে পারতেন তাঁর সেই অসাধারণ ক্ষমতার উন্মেষ চল্লিশের দশকেই ঘটে।

১৯৭৭ সালের আগে গ্রামবাংলা যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কবলে ধুঁকছিল সেখানে লোকসংস্কৃতিরও ছিল মুমূর্ষু অবস্থা। কৃষিব্যবস্থায় কোনো সংস্কার না হওয়ার ফলে গ্রামের মানুষের জীবন যে অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল লোকসংস্কৃতিও ছিল সেই অন্ধকারেরই বাসিন্দা। কৃষকের জমির আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বামফ্রন্টের ভূমিসংস্কারের কর্মসূচির ভিত্তি তৈরি হচ্ছিল। অপারেশন বর্গা এবং ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে জমি বন্টনের ফলে বামফ্রন্টের আমলে কৃষকের জীবনের মান সামান্য হলেও কিছুটা উন্নত হল। গরিব কৃষকের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাও দেখা দিল। সুধীদা এই জিনিসটাকে ধরতে পেরেছিলেন, এবং একে কাজে পরিণত করার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সদ্যগঠিত চলচ্চিত্র বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসাবে তিনি 'বাংলার কবিগান' শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু কবিয়ালের সংস্পর্শে আসেন। তখনই লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের কী করণীয় তা নিয়ে তাঁর ভাবনার শুরু।

সরকারের কাছে এ বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করার ফলেই ১৯৭৯ সালের গোড়ায় বামফ্রন্টের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে লোকসংস্কৃতি 'পরিষদ', পরে 'পর্ষদ' গঠিত হয়। এ ধরনের উপদেষ্টা পর্ষদ সরকারের আরো আছে, কিন্তু লোকসংস্কৃতি পর্ষদ সুধীদার প্রচেষ্টায় একটি বিশিষ্টতা পেয়েছিল। পর্ষদের সদস্য ছিলেন জেলার লোকসংস্কৃতির গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ। প্রবীণ লোকশিল্পী শ্রী নিবারণ পন্ডিতও প্রথম গঠিত পর্ষদের একজন সদস্য ছিলেন। কিন্তু পর্ষদ সরকারকে পরামর্শ দেবার আগে প্রবৃত্ত হয়েছিল সরেজমিনে লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পীদের প্রত্যক্ষভাবে চেনার কাজে। সারা পশ্চিমবঙ্গে লোকশিল্প এবং শিল্পীরা কী অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য ব্যাপক আকারে একটি সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত এই সরকার নেয়।

সে সময়ে সরকারি কর্মচারী, যাঁরা জেলায় জেলায় তথ্য ও সংস্কৃতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন অনেকেই লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। ছিল অনীহা, এবং তাচ্ছিল্যের পর্বত প্রমাণ বাধা। কিন্তু সুধীদা ছিলেন নাছোড়বান্দা, তাঁর নেতৃত্বে আমলাতান্ত্রিক অনীহাকে কাটিয়ে বিভাগীয় কয়েকটি কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম কর্মশিবির ও উৎসব হয়েছিল ১৯৮০ সালে পুরুলিয়াতে। প্রায় ৪০০ লোকশিল্পী সেখানে হাজির ছিলেন। 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের' সাহায্যে

রচিত একটি প্রশ্নমালার সাহায্যে এই বিভাগীয় কর্মশিবিরগুলিতে আগত শিল্পীদের নিয়ে সমীক্ষা চলে ১৯৮০ থেকে ৮২ সাল পর্যন্ত। ১৯৮১ সালে দশটি জেলায় সংগৃহীত তথ্য নিয়ে *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা* শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

দশটি জেলার ১৩৭৮ জন শিল্পী এই সমস্ত কর্মশিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, শিল্পীদের ৭১·৩৩ শতাংশই ছিলেন তফশিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পী। মাত্র ১২·৪১ শতাংশ ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, এটাও দেখা যায় যে এঁদের মধ্যে ৫২·০৩ শতাংশ শিল্পী ভূমিহীন। এবং মাত্র ৮·৮৫ শতাংশ শিল্পীর এক একরের বেশি জমি ছিল। অর্থাৎ সমীক্ষা থেকে খুব পরিষ্কারভাবে এটা বেরিয়ে এল যে দেশের মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামবাসী কৃষিজীবী মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিকে যাঁরা ধরে রেখেছেন তাঁরা তাঁদেরই সমপর্যায়ের দরিদ্র "অনুন্নত" অবহেলিত গ্রামীণ শিল্পী। সুতরাং এই সমস্ত ভূমিজ, একান্ত সমৃদ্ধ, প্রায়শই মুখে মুখে প্রচলিত সংস্কৃতির ধারাকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এই শিল্পীদের বেঁচে থাকার এবং শিল্পচর্চার রসদ জোগানো একান্ত প্রয়োজন।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্টের উদ্যোগে সমস্ত জেলাগুলিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়। পঞ্চায়েতের ভিত্তি যেহেতু গ্রামীণ সাধারণ মানুষ, তাই তাঁদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় দিতে উদ্যোগী হল বামফ্রন্ট সরকার। সুধীদা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেছিলেন যে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি যদি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে, একমাত্র তাহলেই পণ্যসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করে গ্রামীণ মানুষের নিজস্ব সম্পদ হিসাবে লোকসংস্কৃতি পায়ের তলায় জমি খুঁজে পাবে। এই কারণে ১৯৮২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষে পর্ষদ দুই দিনের একটি আলোচনাচক্র সংগঠিত করে। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুল, অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিশির সেন, কয়েকটি জেলার পঞ্চায়েত সদস্য, বিধানসভা সদস্য, লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রভৃতি। তাঁদের সংযোজন, সংশোধন, ও সুপারিশকে অঙ্গীভূত করে একটি সার্বিক প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে পঞ্চায়েতের সদস্যরাও যে একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বা উদ্যোগী হয়েছিলেন এমনটা নয়, সুধীদাকে বার বার জেলায় ও ব্লকে ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের কাছে গিয়ে বিষয়গুলি বোঝাতে হয়েছে, তাঁদের কাজে অনুপ্রেরিত করতে হয়েছে। ১৯৮২

সালের সুপারিশগুলি কার্যকর করা তখনই সম্ভব হয়নি। যেমন স্থায়ী সমিতিগুলির মধ্যে 'সংস্কৃতি' বা 'লোকসংস্কৃতি' এই বিষয়গুলি নিয়ে আলাদা কোনো স্থায়ী কমিটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিলনা। তাই তাঁদের অনেক কাজকর্মের মধ্যে লোকসংস্কৃতির কাজকে ন্যস্ত বা ঐচ্ছিক কাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না। যেসব অঞ্চলে বা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সভাপতি বা প্রধানরা ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ নিয়েছেন সেখানে উৎসব হয়েছে, কর্মশালা হয়েছে, পুরানো মেলাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা গেছে, লোকশিল্পীরা উৎসাহ পেয়েছেন। কিন্তু আবার অনেক জায়গায় এসব কিছুই করা যায়নি। তবে পর্ষদের এই প্রথম কয়েকটি বছরে সরকারি বাজেট এবং কর্মসূচিতে লোকসংস্কৃতি স্বতন্ত্র গুরুত্ব পাবার ফলে নানা অনুষ্ঠানের ও সহায়তা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে তার ক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তা নতুন করে বাড়ানো গিয়েছিল। তার হৃত মর্যাদা সে কিছুটা ফিরে পেয়েছিল।

১৯৮২ সালের আলোচনা সভায় যে সুপারিশগুলি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ঃ

(১) লোকসংস্কৃতির কাজের দায়িত্বকে পঞ্চায়েতের স্তরে একটি স্থায়ী সমিতির দায়িত্ব হিসাবে ন্যস্ত করা।

(২) গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে স্থায়ী আখড়া নির্মাণে সাহায্য করা।

(৩) পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলিকে চিহ্নিত করে দলগুলির বা শিল্পীদের তালিকা প্রস্তুত করা।

(৪) আঞ্চলিকভাবে অনুষ্ঠান ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

(৫) মহিলা শিল্পীদের বিশেষ সমস্যাগুলিকে নির্ণয় করা ও তাঁদের সহায়তা করা।

(৬) বিপণনের ব্যবস্থা করা।

(৭) দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য বা শিল্পীদের উৎসাহিত করবার জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা।

কার্যত দেখা গেল কোনো কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক পঞ্চায়েত এগুলি রূপায়ণের জন্য সোৎসাহে এগিয়ে এলেও অনেক ক্ষেত্রেই আবার পঞ্চায়েতের সদস্যরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে পর্ষদের সুপারিশ মেনে শিক্ষা স্থায়ী সমিতিকে 'শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি'তে যখন রূপান্তরিত করা হল, তখন আবার পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টে গেছে।

১৯৮৭-৮৮ সালে পঞ্চায়েত স্তরে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগ্রহ জাগানোর জন্য সুধীদা সরকারের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই 'পাইলট প্রোজেক্টে' প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি ব্লক বেছে নিয়ে ১৯৮২-এর সুপারিশগুলি সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হবার পর জেলায় লোকসংস্কৃতি পর্যদের শাখাগুলির সাহায্যে ৯টি জেলার ৪৫টি ব্লকে এই কাজ শুরু করা হয়েছিল। কাজটি কিছু দূর এগোলেও ইতিমধ্যে সরকার একটি বিশেষ আদেশ-বলে প্রতি জেলায় সাধারণভাবে জেলা সংস্কৃতি পর্যদ গঠন করার ফলে জেলা লোকসংস্কৃতি পর্যদগুলি তামাদি হয়ে যায় এবং ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতির মধ্যে 'সংস্কৃতি' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবার পর পাইলট প্রোজেক্টের কাজটি আমরা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাবে না বলে মাঝপথে পরিত্যাগ করি।

জেলা সংস্কৃতি পর্যদে লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র গুরুত্ব হ্রাস পাবার ব্যাপারটি সুধীদা পছন্দ করেননি। তাঁর মত ছিল যে লোকসংস্কৃতি যেহেতু এমনিতেই অবহেলিত তাই আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে একসঙ্গে রাখলে তার উপযুক্ত মর্যাদা খর্ব হতে বাধ্য, লোকসংস্কৃতির কাজ পঞ্চায়েত স্তরে কার এক্তিয়ারভুক্ত — 'জেলা সংস্কৃতি পর্যদ' না 'শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি' — এ প্রশ্নের এখনো কোনো ফয়সালা হয়নি। জেলা তথ্য আধিকারিকরা লোকসংস্কৃতির কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে আজও এই প্রশ্ন তোলেন। কাজেই মনে হয় সুধীদার আশংকা একেবারে অমূলক ছিল না।

তাই বলে কিন্তু সুধীদা বসে থাকেন নি। যেখানে যেখানে সম্ভব জেলা সভাধিপতি পঞ্চায়েত সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষদের সহযোগিতায় ১৯৮২ এর সুপারিশগুলি কার্যকর করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। লোকসংস্কৃতির কর্মসূচিগুলি কার্যকর করার সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফল হিসাবেই ১৯৯৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার উপদেষ্টা পর্যদটি লোপ করে পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা তৈরি করেন। সুধীদা হন তার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের নীতি রূপায়ণের কাজ এই কেন্দ্রটি করবে। এরপরেই সরকারের আর একটি আদেশবলে আদিবাসী ও তফশিলি জাতি প্রধান কয়েকটি জেলায় আগে থাকতেই যে চর্চা কেন্দ্রগুলি ছিল সেগুলি যুক্ত হোলো রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে শাখা কেন্দ্র হিসাবে। এই ভাবে লোকসংস্কৃতির কাজকে পঞ্চায়েত স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করার একটি নতুন রাস্তা পাওয়া গেল। প্রতিটি জেলার জেলাসভাধিপতি পদাধিকারবলে হলেন কেন্দ্রের সাধারণ পরিষদের সদস্য।

এই সব যখন ঘটছিল তার মধ্যে সুধীদার জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে। তিনি হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে। তাঁর সুগঠিত স্বাস্থ্য দুঃসহ হাঁপানি রোগের ফলে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বয়স বা অসুখ সুধীদাকে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। কেন্দ্র গঠিত হবার পরবর্তী সময়েও তিনি বারবার করে জেলায় জেলায় ছুটে গেছেন। জেলা সভাধিপতিরা সাধারণ পরিষদের সভায় না এলে তিনিই তাঁদের কাছে গিয়ে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের কাজে তাঁদের জড়িয়ে নেবার লাগাতার চেষ্টা চালিয়েছেন। স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য ১১ জেলায় নিজে ঘুরে ঘুরে সভা সংগঠিত করেছেন। কারণ তিনি বার বার বলতেন লোকসংস্কৃতির প্রসার ও উন্নয়নের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের কোনো বিকল্প নেই। জেলায় গিয়ে অনেক সময়ে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যাতায়াতে তাঁর বয়সের অনুপযোগী কষ্ট করতেও কখনো বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি বলতেন 'মরতে হলে এই কাজ করতে করতেই মরব'।

সুইডেনে 'ফোক মিউজিয়াম' দেখে আসার পর থেকে সুধীদার একটি স্বপ্ন ছিল পশ্চিম বাংলার লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ধারা ও তার সক্রিয় শিল্পীদের জন্য কলকাতার আশেপাশে একটি লোকগ্রাম গড়ে তোলা। মিউজিয়ামে কেবল মৃত জিনিষই থাকে ; কিন্তু তাঁর স্বপ্নের লোকগ্রামকে সুধীদা ভেবেছিলেন লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ধারক ও বাহকদের একটি নিজস্ব জায়গা হিসাবে। তা কোনো বাণিজ্যিক সংস্থার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের খেয়ালে পরিচালিত হবে না। কিন্তু সেখানে লোকশিল্পীদের থাকা, জেলার সঙ্গে জেলার আদান প্রদান, অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও তাঁদের নিজের জিনিসগুলি যাতে তাঁরা নিজেরাই বিক্রি করতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকবে, সেই সঙ্গে তাঁদের গৃহস্থাপত্য, নিত্যব্যবহার্য জিনিস, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে। শুধু বাইরের দর্শকই তা দেখবেন না, লোকশিল্পীরা নিজেরাও তার মধ্য দিয়ে নিজেদের ইতিহাসকে চিনবেন। লোক-গ্রামের জন্য কালিকাপুরে জমির ব্যবস্থা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জমি পাবার প্রক্রিয়াটি এতই দীর্ঘায়িত হয় যে সুধীদা সেই প্রক্রিয়ার শেষও দেখে যেতে পারেন নি। খুবই সম্প্রতি জমিটি কেন্দ্রের হাতে এসেছে।

লোকসংস্কৃতি পর্ষদ ও পরে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছি, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে উঠতে সুধীদাই সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা কী শিখেছি? এমন অনেকে কেন্দ্রের সদস্য হিসাবে আছেন লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান ও গবেষণায় যাঁরা বহু বছর ধরে যুক্ত। কিন্তু

সুধীদার কাছে এই কেন্দ্র কেবল গবেষকদের কেন্দ্র নয়। গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হবে, কারণ সঠিক গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র লোকশিল্পীদের প্রত্যহের জীবনের প্রয়োজনকে আমরা বুঝতে পারব এবং তার পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারব। সুধীদার কাছে লোকশিল্পীরা গবেষণার বিষয়বস্তু মাত্র ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পশ্চিমবাংলার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের কাজের অংশীদার। সুধীদা বলতেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জমির বন্টন, রাস্তাঘাট ও স্কুল বাড়ি নির্মাণ বা সেচের ব্যবস্থা করে যেমন গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কিছুটা উন্নতি ঘটানো গেছে, তার পাশাপাশি চাই তার চিন্তা চেতনা ও মননের পূর্ণ স্ফূরণ। এ কাজ রাস্তাঘাট স্কুল বাড়ি বানানোর কাজের চাইতে অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ, কিন্তু কম জরুরি নয়। 'মানব জমিনে ফসল ফলাবার' এই কাজ গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে একমাত্র লোকশিল্পীরাই করতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে সুন্দর, গতিশীল ও উদ্দীপক এক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃজনের কাজ, অন্ধ সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার কাজ গ্রামের মানুষের পরিচিত ভাষার দ্বারাই সম্ভব। আমাদের কাজ তাঁদের মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা নয়, বা তাঁদের ওপর থেকে পরিচালনা করা নয়। আমরা শুধু তাঁদের শিকড়ে জল ও পুষ্টি জোগাব ;বাকি কাজ তাঁদের নিজেদেরই করতে হবে।

অনেক সময়ে কথা উঠেছে লোকশিল্পীরা তাঁদের পুরানো বিষয়বস্তুগুলিকে বদলে যাতে নতুন বিষয়বস্তুর দিকে যান সে সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের একটা ভূমিকা নেওয়া উচিত। সুধীদার বক্তব্য ছিল, নতুন বিষয়বস্তুগুলি আলোচনাসভা বা কর্মশালার মধ্য দিয়ে অবশ্যই তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু সেগুলি তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ঠিক করার স্বাধীনতা তাঁদেরই দিতে হবে। তা না হলে যান্ত্রিকভাবে সরকারি লোকেরা বলছে বলেই তাঁরা বিষয়ের বদল করতে গিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করে রাখতে বাধ্য হবেন।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সুধীদা কট্টর শুদ্ধতাবাদী ছিলেন না। লোকশিল্পীরা সুর, সাজপোষাক, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা করুক এটা তিনি চাইতেন। একই সঙ্গে নিছক জনপ্রিয়তার জন্য বা নগরসংস্কৃতির অনুকরণে কেউ আঙ্গিকে জল মেশালে তাঁর সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেতেন না। লোকশিল্পীর প্রতিভাকে আবিষ্কার করতে পারলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। মহিলা লোকশিল্পীদের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। তাঁর উৎসাহেই মহিলা লোকশিল্পীদের নিয়ে কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরে আলাদাভাবে সম্মেলন ও কর্মশালা করা হয়েছে। লোকশিল্পীরা সরকারি সহায়তার উপর নির্ভর না করে নিজেরা লোকসংস্কৃতির বিকাশের

উদ্যোগ নিচ্ছেন, এটা দেখলে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলতেন, এইখানেই আমাদের সার্থকতা।

সুধীদার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের যে কাজকর্ম, তার থেকে পশ্চিম বাংলার লোকশিল্পীরা কী পেয়েছেন? যেহেতু কেন্দ্র একটি নিছক সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, তার সঙ্গে বহু লোকশিল্পীর একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক বাধা ও ত্রুটিতে কখনো কখনো ক্ষুব্ধ হলেও এই কেন্দ্রকে তাঁরা যে তাঁদের একটি নিজস্ব সংস্থা বলে মনে করছেন, তার পেছনে ছিল কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ সুধীদার লাগাতার প্রচেষ্টা। প্রথম থেকেই তিনি জোর দিয়েছিলেন লোকশিল্পীদের দিয়ে কথা বলানোর ওপর। কেন্দ্রের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আবশ্যিক অঙ্গ মিলনসভা। সেখানে শিল্পীরাই তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির কথা বলেন। কেন্দ্রের সদস্যরা সেখানে শ্রোতা ও অনুলেখক মাত্র। প্রতিটি অনুষ্ঠানে শিল্পী ও কেন্দ্রের সদস্যরা একই জায়গায় বসে একই খাদ্য গ্রহণ করেন। এই ছোটোখাটো প্রক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পী যদি গ্রামীণ সমাজে তাঁর নিজের মূল্য নতুন করে বুঝতে শিখে থাকেন, তাহলে তা সুধীদারই স্বপ্নের ফসল। আন্তঃরাজ্য পুতুল নাচের উৎসবে অন্য রাজ্যের শিল্পীরা দেখে অবাক হয়েছেন যে ভিডিও সংস্কৃতির যুগেও গ্রামীণ এলাকায় পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পীদের আজও কত আদর। তাঁদের অনুষ্ঠান দেখতে লোক ভেঙে পড়ে। শিল্পীদের আত্মবিশ্বাস না বাড়লে গণমাধ্যমের তথাকথিত 'বিশ্বায়নে'র যুগে লোক আঙ্গিকের এই উজ্জীবন কখনো হত না।

উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা নিয়ে মালদার একটি নতুন চর্চাকেন্দ্র গঠনের উদ্দেশ্যে তিন সভাধিপতিকে নিয়ে মিটিং করে কলকাতায় ফিরেই সুধীদা শেষ শয্যা নেন ১৯৯৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান চলাকালীনই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। সেদিনকার উৎসবে আগত লোকশিল্পীরা যখন চোখের জলে সুধীদাকে বিদায় জানান তখন আত্মীয়বিয়োগব্যথাই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সুধীদার প্রিয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র যে তাঁদেরও কেন্দ্র সেই অনুভূতি হয়তো এখনো তাঁদের বজায় আছে।

লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান

# লোকশিল্পের পুনরুদ্ধারে সুভাষচন্দ্র বসু

## নেপাল মজুমদার

প্রখ্যাত মার্কসবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিদ্ সুধী প্রধান সত্যিই এক বিরল প্রতিভাধর এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শুধু শিল্প-সাহিত্যের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্রবক্তা ও ইতিহাসকারই ছিলেন না, তিনি স্বয়ং ছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টার অক্লান্ত যোদ্ধা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টি কর্মের বিস্তারিত পরিচয় বা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা ঃ — বাংলার ঐতিহ্যবাহী কবি গম্ভীরা সারি জারি আলকাপ প্রভৃতি লোকশিল্প শৈলীর পুনরুদ্ধার। তাকে নবরূপে ও ভাবে উপস্থাপিত করায় তাঁর কৃতিত্ব, সংগঠনগত ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

স্মরণ রাখা দরকার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে দেশে আসন্ন জাপ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যই সে সময় এখানে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ', 'গণনাট্য সংঘ' প্রভৃতির উদ্যোগে অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক শিল্পগুলিকেও সংগঠিত এবং নবরূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়।

কিন্তু শুধু আসন্ন জাপ আক্রমণের প্রতিরোধ বা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, জমিদার জোতদার কালোবাজারি মহাজনের শোষণ-পীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই সব লোকশিল্পকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ কালোবাজারি দাঙ্গার বিরুদ্ধে — সেই সঙ্গে দেশবাসীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় সংহতি দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার

আকাঙ্ক্ষাকেও জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছিল। সে গৌরবময় ইতিহাসের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য দেশের এইসব ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন এবং তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা এই প্রথম হয়নি। এর বহু আগে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল প্রমুখ নেতৃস্থানীয়রা এসব শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য নানা উপলক্ষে আবেদন জানিয়ে এসেছিলেন। রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে দু-একটি মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ভাবনার দিক থেকেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতীয় ধ্রুপদী ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মালদহের গম্ভীরার মতো দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুভাষচন্দ্র বসু বর্মার মান্দালয় জেল থেকে বন্ধুবর দিলীপ রায়কে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন (৯/১০/২৫) এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। সে চিঠিতে তিনি আমাদের আর্টকে তার দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা পরিহার করে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য করে তোলারও আবেদন জানিয়েছিলেন। মালদহের গম্ভীরা গানের অমূল্য সৃষ্টি সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এই পত্রের এক জায়গায় তিনি যা লিখেছিলেন (অনামী- পৃ. ৩২৭-৩১) তা খুবই প্রণিধানযোগ্য :

"কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সংগীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোটো ছোটো গন্ডীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চা হওয়াও উচিত ; কিন্তু সংগীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ন হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জীব ও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসংগীত ও নৃত্যের (Folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। . . . . . আমাদের যাত্রা, কথকতা কীর্তন প্রভৃতি কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তা হলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।" . . . .

এই প্রসঙ্গে তিনি মালদহের গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য এবং শিল্প সম্পদের প্রতি দিলীপ কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে লিখলেন ঃ

"তোমার হয়ত মনে আছে, তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে মালদায় 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সংগীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাংলার অন্যত্র ওরূপ জিনিস কোথাও আছে বলে জানিনা ; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাংলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাংলা দেশে লোকসংগীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল ও মহৎ কিছুই নেই — তার গুণই এই যে তা সহজ সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk-music ও folk-dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবে গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যারা ও-প্রকার সংগীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।"

চিঠিতে অবশ্য প্রসঙ্গত তিনি বর্মার সমৃদ্ধ লোকসংগীত ও লোকনৃত্যগুলি অনুশীলন ও অনুধাবন করবার কথাও বললেন।

উল্লেখযোগ্য, দিলীপ রায় সুভাষচন্দ্রের এই পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য তারিফ করে সেই সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্নে আরও কিছু মূল্যবান বিচার রেখেছিলেন। এসব কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে খুবই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিল্পসাহিত্যের প্রশ্নে চিন্তা বা মন দেবার কোনো সুযোগ বা অবকাশই পান নি।

এরই মধ্যে এসে পড়ে ঐতিহাসিক 'কলকাতা কংগ্রেস'। ১৯২৮ ডিসেম্বরের শেষ ভাগে কলকাতায় পার্কসার্কাস ময়দানের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে এই ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশন হয়। সকলেই জানেন সুভাষচন্দ্র হয়েছিলেন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C)।

কলকাতা কংগ্রেসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রদর্শনী বা Exhibition। এই প্রদর্শনীতে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল : মালদহের গম্ভীরা সম্প্রদায়ের গম্ভীরা গান ও নৃত্য। বলা বাহুল্য, এটা সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক আগ্রহে ও উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল। ১৮ই পৌষ (১৩৩৫) কংগ্রেস প্রদর্শনী মন্ডপে এই গম্ভীরা গান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে মালদহের গম্ভীরা সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সমবেত দর্শকবৃন্দ তথা দেশবাসীর উদ্দেশে যে লিখিত

আবেদনটি পাঠ করা হয়, সেটি পরদিন ১৯ পৌষ (৩ জানুয়ারি ১৯২৯) 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে তা যথাযথ উদ্ধৃত করা হল :

মালদহের গম্ভীরা

(গতকল্য বুধবার (১৮ পৌষ) কলিকাতা কংগ্রেসে প্রদর্শনী মন্ডপে পঠিত)

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে যে সকল নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে 'বোলবাহী' বা 'বোলাই' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রাম বা সহরে বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা অবলম্বন করিয়া নিন্দা বা প্রশংসার ছলে এই বোলবাই-এর গান রচিত হয় এবং প্রয়োজন মত লোকে অভিনেতা সাজিয়া অভিনয় কার্যটি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করে। এই বোলবাই-এর গান এ জন্য অনেক সময় বৎসরের গেজেটের মত বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত কখন কখন সমাজসংস্কার বা শিক্ষার উদ্দেশ্যেও নানা অভিনয় হইয়া থাকে। অভিনেতাদিগের অঙ্গভঙ্গী, রসিকতা গানের রচনা উচ্চ ভাব প্রভৃতিতে অনেক সময়ই মোহিত হইতে হয়। গানগুলির রচয়িতারা প্রায়ই অল্পশিক্ষিত, এমন কি নিরক্ষর। কেবল যে হিন্দুরাই এইসব গান রচনা বা অভিনয় করেন, তাহা নহে — মুসলমানগণও করিয়া থাকেন। প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্বেই মহাদেবের বন্দনাগীত হয়। এই বন্দনায় মালদহের লোক শিবকে কত আত্মীয় বলিয়া মনে করে তাহা বেশ বোঝা যায়। ইঁহাদিগের গানের সুর সম্পূর্ণ নূতন এবং মালদহবাসীর নিজস্ব। প্রত্যেক গান নৃত্যসহকারে গীত হয়, ইহা শুনিতে মধুর এবং লোক শিক্ষার ইহা এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। উৎসবের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে জনসাধারণ গম্ভীরা উৎসব হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মালদহবাসী গম্ভীরা করিয়া আসিতেছে।

*পরিশেষে বলা হয়*

এই গম্ভীরা উৎসবে জাতিভেদ নাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমানভাবে উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এই উৎসব উপলক্ষে যে সকল ব্যঙ্গ সংগীত রচিত ও গীত হইয়া থাকে. তাহাতে সমাজের ও ব্যক্তি-বিশেষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গম্ভীবা উৎসব উপলক্ষে শিবপূজা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মালদহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে তিন দিন কালব্যাপী নৃত্য গীতাদি সহ গম্ভীরা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুখের বিষয় এই গম্ভীরা ইতিপূর্বে মালদহ, দিনাজপুর, ও পাবনা উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে আহূত হইয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ ও প্রতিবর্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অক্লান্ত নির্ভীক কর্মী সুভাষ বসু, স্বদেশী যাত্রা গায়ক মুকুন্দ দাস, রাজামহারাজা ও কমিশনর, জর্জ ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি অনেকেই গম্ভীরা গীত শ্রবণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

আশা করি অদ্য হইতে এই কংগ্রেস প্রদর্শনী মন্ডপে যে সমস্ত গম্ভীরাগান গীত হইবে, তাহা উপস্থিত সজ্জন, সুধীবৃন্দ, মালদহের সুমিষ্ট আম্রের ন্যায়ই রসাস্বাদনে প্রীতি লাভ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের যাবতীয় দোষ ত্রুটি ও ধৃষ্টতা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

ইতি —

বিনীত কংগ্রেস প্রদর্শনী কর্তৃক আহূত

মালদহের গম্ভীরা সম্প্রদায়।

উল্লেখযোগ্য আমাদের সুধীদা এই কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র — যাঁর পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিরাট এক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। আফ্‌শোষ! তিনি যদি কলকাতা কংগ্রেসের প্রদর্শনীর মাঝে অনুষ্ঠিত এই গম্ভীরা গানের প্রদর্শনী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে কিছু লিখে যেতেন তাহলে তা হত খুবই মূল্যবান।

# লোকসংস্কৃতি চর্চায় ও বিকাশে গ্রাম ও শহর

**তারাপদ সাঁতরা**

বাংলার সাহিত্য, লোকভাষা, লোকশিল্প ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামজীবনের ভিন্নমুখী চিন্তাভাবনা ও কলাকৌশলের ধারা। প্রবহমান জীবনধারার প্রতি পরতে পরতে অনুষ্ঠিত লৌকিক সংস্কৃতির এই অবদান নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলার অতুলনীয় এক লোকসংস্কৃতির ভান্ডার। তাই এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য সুদূরপ্রসারী। দুঃখের কথা, গ্রাম বাংলার দ্রুত রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বহু উপকরণ ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। সেজন্য লোকঐতিহ্যের নানান বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা ও চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রূপের সন্ধান, সংগ্রহ ও চর্চার ধারা আজ ক্রমশই প্রসার্যমান।

বলা যেতে পারে, লোকসংস্কৃতি চর্চা হল মানবজীবনের সংস্কৃতি চর্চা। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে হাঁড়ি-কলসি প্রভৃতি মৃৎপাত্র, পুতুল-খেলনা, হাতিয়ার, মূর্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হলেও সেগুলির ব্যবহার ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হবে লোকসংস্কৃতির উপাদানের উপর। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাস ও সেকালের ঐতিহ্যবাহী সমাজের ধ্যান-ধারণাকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতির মতো পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর ছাড়া কোনো উপায় নেই। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত লোকসাহিত্য, লোক-উপাখ্যান, কিংবদন্তী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই আজকের বাংলার লিখিত সাহিত্য সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান অবস্থায় লোকসংস্কৃতির সন্ধান ও সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

একদা রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে সন্ধান ও সংগ্রহের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে (মাঘ ঃ

১৩০১) ছেলে ভুলানো ছড়ার সংকলন প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন, 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে থাকেন নি। বাংলার অবহেলিত ব্রতকথার সন্ধান ও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনরায় ১৯০৮ সালে পরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'মেয়েলি ব্রতকথা'র ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, '. . . বহুদিন হইল **সাধনা** পত্রিকায় বাংলার এই সকল গ্রাম্য সাহিত্য প্রকাশের জন্য উদ্যোগী ছিলাম, তখন এগুলিকে তুচ্ছ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অযোগ্য বলিয়া অনেকেই অনাদর করিতেন, এই সাহিত্য যে স্বতঃসৃত নদীর ধারার মতো সুচিরকাল হইতে বাংলার পল্লীগৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা এবং আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজ বিহিত, সুন্দর, এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারে না, এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লীজীবনযাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্তনবশত এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে — স্বদেশের প্রতি একদা ঔদাসীন্যবশত একথা তখন কেহ চিন্তা করিতেন না, এখন যে আমাদের সেই দুর্দিনের অবসান হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ স্বতঃসৃত নদীর ধারার মতো বহমান এই সব লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির যথাযোগ্য অনুসন্ধান ও নথিবদ্ধ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই আহ্বানে উৎসাহী হয়ে যাঁরা বিভিন্ন লৌকিক ছড়া, গ্রাম্যগীতি, রূপকথা, ধাঁধা, ব্রতকথা প্রভৃতি সংগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন বসন্তরঞ্জন রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, কুঞ্জলাল রায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, মুনশি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পরমেশপ্রসন্ন রায়, হরিদাস পালিত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারা লোকসাহিত্য পর্যায়ে রূপকথা, লোকসঙ্গীত, গীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সংগ্রহের যে চেষ্টা শুরু হল তার মধ্যে পূর্বে-উল্লিখিত বিদগ্ধমন্ডলী ছাড়া দীনেশচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার মৌখিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা 'গীতিকা' তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগে সংগৃহীত হয়, যা শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ও গ্রামীণ সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দের সহায়তায় সংগৃহীত এইসব গীতিকাগুলিকে দীনেশচন্দ্র গ্রন্থবদ্ধ করেন। দীনেশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

স্পষ্টতই সে সময় দেখা গেল লোকসংস্কৃতি চর্চায় দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ধারা যেমন লোকসাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্য এবং অন্যটি হল বিশেষভাবে লোকশিল্পের ধারা, যা পুতুল, খেলনা, পট, কাঁথা, চিত্রিত সরা, শিকে প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ধারা। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩১ সাল নাগাদ ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির উপকরণসহ লোকনৃত্য ও পটুয়া সঙ্গীতের উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর এই কাজে একান্ত সহযোগী হিসাবে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন লোকশিল্পের উল্লেখযোগ্য এক সংগ্রাহক সুধাংশুকুমার রায়। তিনি লোকশিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি পুস্তক রচনা ছাড়া, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্রত-আলপনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তাঁর রচিত 'দি রিচ্যুয়াল আর্ট অফ দ্য ব্রতস অব বেঙ্গল,' 'দ্য ফোক আর্ট অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'দ্য আর্টিজেন কাষ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড দেয়ার ক্র্যাফটস্' নামক প্রবন্ধটি গবেষক মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

বাংলায় তখন বিদেশী ইংরেজ শাসন ও শোষণ চলেছে। এর ফলে তাঁরা স্থানীয় কুটির শিল্পীদের দ্রব্যসম্ভারের প্রতি অবজ্ঞাবশত তদানীন্তন বিদেশী দ্রব্যের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার নানাবিধ উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী শিল্পের প্রসারে জনসাধারণের কর্তব্য ও ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই, আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বারবার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতা ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হচ্ছে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালী যুবকের মনে সেই উৎসাহ জানানো, যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্থ হয়।' রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৩৬ সালে তদানীন্তন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে স্বদেশী শিল্পের যে সংগ্রহশালাটি স্থাপিত হয়, সেটির নাম হয় কর্মাশিয়াল মিউজিয়াম, যা পরে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম নামে খ্যাত হয়। স্বদেশী বিভিন্ন কুটির শিল্পের সঙ্গে এখানে সংগৃহীত হয় বাংলার লোকশিল্পের বেশ কিছু উপকরণ।

ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত গীতিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল, তারই এক পরিপূরক রূপ দৃষ্ট হল ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এ সংগ্রহশালাটির সংগঠনে পুরো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অধ্যাপক দেবপ্রসাদ

ঘোষের উপর। প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নানাবিধ নিদর্শন যা স্থানীয় অনুসন্ধান ও উৎখননে পাওয়া গেছে সেগুলি প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত হল বাংলার প্রথাগত লোকশিল্পের নিদর্শন, চিত্রিত হাঁড়ি-সরা, পুতুল, নকশি কাঁথা ও পটচিত্র প্রভৃতি। লক্ষ করার বিষয় হল লোকশিল্পগত এমন সব তুচ্ছ জিনিস, যা আগে কোনো মিউজিয়ামের সংগ্রহে রাখার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। এর ফলে বাংলার ভুলে যাওয়া অতীত ইতিহাসের বেশ কিছু পাতা যেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল তেমনি লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শন সংগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল বাংলার লোকজীবনের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। ইতিপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দীনেশচন্দ্র সেন এবং গুরুসদয় দত্ত লোকসংস্কৃতির পথিকৃৎরূপে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, আশুতোষ মিউজিয়ামের এই সংগ্রহের সম্ভার তাকে পরিপূর্ণ করে তোলার পথেই অগ্রসর হল। আলোচ্য এই সংগ্রহশালার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হল সংগৃহীত পুতুল নিয়ে একটি চিত্রিত তালিকা গ্রন্থ।

অন্যদিকে ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল বাংলার লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শন নিয়ে অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'ফোক আর্ট অফ বেঙ্গল' নামক সচিত্র পুস্তক। লোকশিল্প এখন আর অবহেলার বস্তু নয়, বরং এই গ্রামীণ শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে একদা বাংলার কারুশিল্পী সমাজ যে বিচিত্র ভাবকল্পনার সৃষ্টি করেছিল, তার পরিচয় এইসব লোকশিল্প সংগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট হল।

এরপর দেখা গেল, হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন পরাধীন ভারতে তদানীন্তন বাংলা সরকার। ১৯৩৯ সালে অখন্ড বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের উদ্যোগে স্থাপিত হয় সরকারি শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা, যার বর্তমান ঠিকানা হল, ৪৫ গণেশচন্দ্র এভেনিউ। এখানেও প্রদর্শিত হয়, বাংলার হস্তশিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের বহুবিধ নিদর্শন, যথা কাঠ ও মাটির পুতুল, গালার পুতুল; পট, চিত্রিত সরা ও নকশি কাঁথা প্রভৃতি।

লোকসংস্কৃতি চর্চার বিকাশ শুধু শহরেই আর সীমাবদ্ধ রইল না। গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু উপকরণ ক্রমশ বিলুপ্তির কারণে, সেগুলি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির তৎপরতা শুরু হয়। হুগলী জেলার রাজবলহাটে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র পাঠাগার সংলগ্ন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামাঙ্কিত অমূল্য প্রত্নশালা নামে যে সংগ্রহশালাটি খোলা হয়, সেটিতে সংগৃহীত হয় বাংলার পট, পুতুল ও দারুভাস্কর্যের নিদর্শন প্রভৃতি।

১৯৪১ সালে অজিতকুমার মুখার্জির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ আর্ট ইন ইনডাস্ট্রি', যার পরে নামকরণ হয় 'ক্র্যাফটস মিউজিয়াম'। এখানে ভারতের

নানা স্থান বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বহুবিধ হস্তশিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের নিদর্শন পট, পুতুল, চিত্রিত সরা, ঢোকরা কামারদের সৃষ্ট পিতলের শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি।

বীরভূম জেলায় বিশ্বভারতীর কলাভবনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালা 'নন্দন'-এ সংগৃহীত হয় ধাতুমূর্তি, চিত্রিত পুঁথির পাটাসহ লোকশিল্পের নানান নিদর্শন।

১৯৫১ সালে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-বিষ্ণুপুর শাখার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন। এখানে বিশেষ করে এ জেলার নানাস্থানে প্রাপ্ত হাতে লেখা পুঁথি ও পুরাবস্তুর সঙ্গে সংগৃহীত হয় জেলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত নির্দশন, পাঁচমুড়ার ঘোড়া-হাতি ও মনসার চালি এবং গ্রাম্য পুতুল, পট, চিত্রিত পুঁথির পাটা, সেকালের রেশম শিল্পের গৌরবময় নিদর্শন বিষ্ণুপুরী শাড়ী প্রভৃতি। এখানে প্রদর্শিত লোকশিল্পের এইসব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলির মধ্যে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়।

এই শতকেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুরে স্বর্গত কালিদাস দত্ত তাঁর বসতবাড়িতে যে সংগ্রহশালাটি স্থাপন করেছিলেন, সেটিতে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যানীতে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত পুরাবস্তু ছাড়াও সংগৃহীত হয়েছিল নানাবিধ পুতুল, চিত্রিত সরা, গাজির পট, কাঠের পুতুল ইত্যাদি। শুধু লোকশিল্পের সংগ্রহই নয়, তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে প্রচলিত 'বড় খাঁ গাজির গান' ও 'ওলা বিবির গান' নামে লোকগীতিগুলি সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ ছাড়া সুন্দরবনের দেবতা বনবিবিকে নিয়েও যে লোকগাথা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কেও তিনি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালিদাসবাবু লোকসঙ্গীতের এইসব উপকরণগুলি হারিয়ে যাবার আগে সেগুলির বিবরণ যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করে লোকসংস্কৃতি গবেষণার পথ যে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

উল্লেখ্য যে, তাঁর লোকশিল্প সংগ্রহের সুবাদে স্থানীয় গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রভাবিত হন স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি সংগ্রহে, যার ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলার লৌকিক দেব-দেবী' নামক পুস্তক রচনা।

পরবর্তী সময়ে গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত শিল্প দ্রব্যগুলি নিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গুরুসদয় মিউজিয়াম'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন একদা গুরুসদয়বাবুকে বলেছিলেন, 'তুমি সত্যিই একজন জহুরি' এবং সে কথা যে অতিশয়োক্তি নয় তা উপলব্ধি করা যায় এ সংগ্রহশালায় এলে। আড়াইশোর বেশি জড়ানো পট, চারশোর কিছু বেশি কালীঘাট ও বীরভূমের পট, দু'শোর মতো নকশি

কাঁথা, শ'দুই কাঠখোদাইয়ের কাজ আর তিনশোর মতো পুতুল খেলনা প্রভৃতির সংগ্রহ বাংলার লোকশিল্পের এক রত্নভান্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আলোচ্য এই বৎসরে (১৯৬১ সালে) হাওড়া জেলার বাগনানের নিকটবর্তী নবাসন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা, পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান থেকে সংগৃহীত পুরাবস্তুর সঙ্গে এ সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে লোকশিল্পের বহু মূল্যবান নিদর্শন, পুতুল, খেলনা, জড়ানো পট, নকশি কাঁথা, মন্দিরের টেরাকোটা ফলক, মিষ্টান্নের ছাঁচ, পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ প্রভৃতি, যা আমাদের পুরনো বাংলার লোকজীবনের এক জীবন্ত সমাজচিত্র।

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব অধিকারের পক্ষে স্থাপিত হয় রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। এ রাজ্যের নানাস্থান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে এখানেও প্রদর্শিত হয়েছে মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত টেরাকোটা - ফলক, চিত্রিত পুঁথির পাটা, জড়ানো পট, কাঠখোদাই মূর্তি ভাস্কর্য, ঢোকরা শিল্পীদের নির্মিত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার। বর্তমানে এ সংগ্রহশালাটি বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর স্থানান্তরিত।

একদা গুরুসদয় দত্তের সহযোগী সুধাংশুকুমার রায়ের নামোল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তিনি দিল্লীর 'ক্র্যাফটস্ মিউজিয়াম' থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৪ সাল নাগাদ মেদিনীপুর শহরে প্রতিষ্ঠা করেন 'কুমারস্বামী ইনসটিটিউট অব এশিয়ান আর্ট' নামাঙ্কিত এক সংগ্রহশালা। সরকারি অনুদানের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে এ সংগ্রহশালাটি অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

বিগত সত্তরের দশকে কলকাতার গোলপার্কে 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাণ্ড কালচার' পরিচালিত একটি সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে বাংলার নানাস্থান থেকে পাওয়া লোকচিত্র ও লোকশিল্পের বিবিধ নির্দশন হিসাবে পট, পুতুল ও নকশি কাঁথা প্রভৃতি।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুরে অবস্থিত সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালায় দক্ষিণবঙ্গের নানাবিধ পুরাবস্তু সংগ্রহের সঙ্গে স্থান পেয়েছে লোকসংস্কৃতির বহু উপকরণ, পট, পুতুল প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত চারুকলা পর্ষদের পরিচালনায় যেমন গগনেন্দ্রনাথের চিত্র সম্ভার নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গগনেন্দ্রনাথ চিত্রশালা, তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিবৎসর শিল্পীদের যে সংক্ষিপ্ত চারুকলা পরিচয় শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার মধ্যে বিষয়ীভূত করা হয়েছে বাংলার গ্রামীণ লোককলার পরিচয়।

সম্প্রতি লোকশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল, পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের পরিচালিত সল্টলেকের কারু অঙ্গনে স্থাপিত বাংলার হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের এক সংগ্রহশালা। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৯৫) এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 'লোকশিল্প ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক এক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে সংকলিত হয়েছে শিশির মজুমদারের সম্পাদনায় 'লোকশিল্প ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি বিগত ১৯৬৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের জন্য নিবেদিত হয়। লোকসংস্কৃতি-শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে আকাদেমির পক্ষ থেকে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে প্রবীণ বহুমান্য ব্যক্তিদের রাজ্যের মুখপাত্ররূপে আকাদেমি সম্মান অর্পণ করা হয়। বিশেষ করে ১৯৯০ সাল থেকে আকাদেমির পক্ষে প্রবর্তিত হয়েছে লোকসংস্কৃতি গবেষণা অথবা ঐ বিষয়ে সৃজনশীল চর্চায় নিবেদিত একজন প্রবীণ গবেষককে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি সম্মান প্রদান, যার বর্তমান আর্থিক মূল্য কুড়ি হাজার টাকা। এ যাবৎ লোকসংস্কৃতি গবেষণায় যাঁরা এই স্মৃতি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তারা হলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, রামশঙ্কর চৌধুরী, তারাপদ সাঁতরা, সুধীর কুমার করণ, সুধীর চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু ভৌমিক ও মহম্মদ আয়ুব হোসেন।

লোকগীতি, লোকভাষা, লোকনাট্য ও লোকশিল্প চর্চায় পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল কলকাতার আকাদেমি অব ফোক থিয়েটার, অকাদেমি অফ ফোকলোর, আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতি, ফোক মিউজিক অ্যাণ্ড ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট ও লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি। আলোচ্য অকাদেমি অফ ফোকলোর এ যাবৎ লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা বিষয়ক অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে পূর্ণচন্দ্র দাস রচিত 'কাঁথির লোকাচার' গ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। ফোক মিউজিক অ্যাণ্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনসটিটিউট-এর পক্ষে প্রকাশিত হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্পাদিত লোকসংগীত বিষয়ক স্বরলিপি সহ একটি প্রবন্ধসংকলন গ্রন্থ একদা দেশ-বিদেশের বহু বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কলকাতা ছাড়া গ্রাম-শহরে লোকসংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন যেসব সংস্থা, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল, বাঁকুড়া জেলার ছান্দার-এ প্রতিষ্ঠিত 'অভিব্যক্তি'। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মধ্যে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই এরা লোকসংগীতের গানের ক্যাসেট ও স্থানীয় বিভিন্ন গ্রামসংক্রান্ত তথ্যমূলক পাঁচটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন ও কারুশিল্প

বিষয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এছাড়া লোকসংস্কৃতি চর্চায় বাঁকুড়া জেলার দোলতলায় স্থাপিত বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমির অবদান একান্তভাবেই প্রশংসনীয় এবং এ সংস্থা লোক ঐতিহ্য সম্পর্কিত এ যাবৎ পঞ্চাশটির অধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ বাঁকুড়া শহরে প্রতিষ্ঠিত 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ' তাদের মুখপত্র 'সুচেতনা' পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করা ছাড়াও এ বিষয়ে কর্মশালাও সংগঠিত করে থাকেন।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়েছে চারুচন্দ্র সান্যাল লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা। এছাড়া জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ডঃ বসুমাতারির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোকবাদ্য বিষয়ক এক প্রদর্শশালা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিক লোকনাট্য ও লোকগীতি চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত এক সংস্থা হল 'উত্তরবঙ্গ লোকযান'।

হাওড়া জেলার বীরশিবপুরে স্থাপিত 'ইউথ কয়্যার' নামক সংস্থাটি প্রতিবৎসর লোক-সঙ্গীত ও লোকনৃত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্বিকাশের উদ্দেশ্যে এই পরিষদ যেমন বিভিন্ন সময়ে কর্মশালার আয়োজন করেন, তেমনি এদের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে পুতুল-নাচ, পট-পটুয়া, গণগীতি ও পদবি বৈচিত্র্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি পুস্তিকা।

এছাড়া হাওড়ার পানিত্রাসের শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৬২) তারাপদ সাঁতরা রচিত 'হাওড়া জেলার লোক উৎসব' গ্রন্থ এবং হাওড়ার 'আলেয়া' প্রকাশনী প্রকাশ করে (১৯৮৪) 'বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার বিকাশ' নামে বিভিন্ন প্রবন্ধের এক সংকলন গ্রন্থ।

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়াও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে গ্রাম্য লোকসঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য প্রভৃতি বিষয়ের পৃষ্ঠপোষক গ্রামের মানুষজন বেশ কিছু আখড়া বা সংগঠনের মধ্যে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য আজও উজ্জীবিত করে রেখেছেন।

লোকসংস্কৃতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ প্রসঙ্গে আলোচনায় এলে দেখা যায়, বিগত ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রাজারামমোহনপুরে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে আট দিন ব্যাপী লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি বিষয়ক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে উৎসবে নানান লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যটি যথার্থভাবে প্রকাশমান হওয়ায় স্থানীয় জনমানসে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লোকসংস্কৃতির প্রসার, বিকাশ ও উন্নয়নে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় যোগদানকারী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকগণ লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম ছাড়া, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'স্পেশ্যাল পেপার' হিসাবে লোকসংস্কৃতি পড়ানো হয়।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাংলায় প্রকাশিত কোষগ্রন্থও এ যাবৎ বেশ কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হল, কামিনী রায় সম্পাদিত দু'খন্ডের 'লৌকিক শব্দকোষ' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত বরুণ কুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'। এছাড়া পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুবোধ বসুরায় ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার লৌকিক অভিধান 'মানভূমী শব্দকোষ' ; উত্তর চব্বিশ পরগণার বানীপুরের রাজ্য শিক্ষা সংস্থা থেকে প্রকাশ করা হয়েছে 'আঞ্চলিক শব্দভান্ডার — মহিষাদল' এবং মেদিনীপুর থেকে সুহৃদকুমার ভৌমিকের সম্পাদনায় বাংলা - সাঁওতাল অভিধান 'রণড়মালা' (১ম খন্ড) প্রভৃতি গ্রন্থ।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গ্রাম শহর থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও বেশ প্রশংসনীয়। অধুনালুপ্ত হলেও একদা যেসব পত্র-পত্রিকাগুলি লোকসংস্কৃতির নানান বৈচিত্রময় বিষয় পরিবেশন করেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অকাদেমি অব ফোকলোর-এর মুখপত্র 'লোকসংস্কৃতি', আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন', শঙ্কর সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'ফোকলোর' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। এছাড়া বর্তমানে কলকাতা থেকে আরও যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার তালিকা হল, সনৎকুমার মিত্রের সম্পাদনায় 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'লোকশ্রুতি', দেবাশিস বসু সম্পাদিত 'কৌশিকী' প্রভৃতি। কলকাতা ছাড়া লোকসাহিত্য, লোকশিল্প ও লোকগীতি বিষয়ক আর যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয় 'রাঢ় বীক্ষণ', উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'মধুপর্ণী', বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত 'লোকসংস্কৃতি' ও 'সুচেতনা' পত্রিকা, মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রকাশিত 'লোকায়ত', 'সুরঞ্জনা' ও আদিবাসী সংস্কৃতি বিষয়ক 'হাড়িয়ার সার্কাম'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে প্রকাশিত 'বনানী' ও 'গঙ্গারিডি

গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা', মালদহ থেকে প্রকাশিত 'জোয়ার' এবং পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'ছত্রাক', হাওড়া থেকে প্রকাশিত 'পুঁথি' প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখ্য।

বাংলার লোকশিল্প, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ইতিপূর্বে লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, হরিদাস পালিত, বিনয়কুমার সরকার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, অজিত মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুধাংশু রায়, কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ যে আলোচনার ধারা শুরু করেছিলেন তারই উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে যেসব লেখক ও গবেষকগণ লোকশিল্পের এই ধারাটিকে প্রজ্বলিত করে রেখেছেন তাঁরা হলেন, মানিকলাল সিংহ, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, সবিতারঞ্জন সরকার, আশিস বসু, সুধীর চক্রবর্তী, বিনয় ভট্টাচার্য (প্রয়াত), দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন গোস্বামী, সন্তোষকুমার বসু (প্রয়াত), শ্রীহর্ষ মল্লিক, রঘুনাথ গোস্বামী (প্রয়াত), গৌতম সেনগুপ্ত, অশোক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

লোকশিল্পের মতো বাংলার লোকসঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, লোকভাষা, লোকদেবতা ও উৎসব-পার্বন প্রভৃতি পর্যায়ে যাঁরা গবেষণা ও চর্চা করেছেন বা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অরুণকুমার রায় (প্রয়াত), পবিত্র সরকার, সুধীর করণ, প্রবোধ ভৌমিক, হরিপদ চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, তুষার চট্টোপাধ্যায়, মানিক সরকার, দুলাল চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দেব, পীযুষকান্তি মহাপাত্র, শঙ্কর সেনগুপ্ত (প্রয়াত), পল্লব সেনগুপ্ত, সনৎকুমার মিত্র, বরুণকুমার চক্রবর্তী, সুখবিলাস বর্মা, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ সিংহ, খালেদ চৌধুরী, শিশির মজুমদার, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, নির্মল দাশ, মানস মজুমদার, দিগ্বিজয় দে সরকার, দিনেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট গবেষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ্।

গ্রাম শহরে যাঁরা এই বিষয়ীভূত চর্চা ও গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের পুলকেন্দু সিংহ, শক্তিনাথ ঝা ; জলপাইগুড়ির সুনীল পাল, পরিতোষ দত্ত, বিমলেন্দু মজুমদার, মন্দিরা ভট্টাচার্য ; হাওড়ার প্রবাল রায় (প্রয়াত), শিবেন্দু মান্না, তপন কর, তপন সেন, তারাপদ সাঁতরা ; নদিয়ার মোহিত রায়, পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ; বীরভূমের অজিকুমার মিত্র, সমীরকুমার অধিকারী ; বর্ধমানের ত্রিপুরা বসু, মিহির চৌধুরী কামিল্যা, মহম্মদ আয়ুব হোসেন ; মালদহের পুষ্পজিৎ রায়, সুবোধ চৌধুরী, সুধীর চক্রবর্তী ; বাঁকুড়ার উৎপল চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, শৈলেন দাস, রামশঙ্কর চৌধুরী, শান্তি সিংহ, নমিতা মন্ডল ; মেদিনীপুরের

অনিমেষ পাল, বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, সুহৃদ ভৌমিক, সুকুমার মাইতি, শম্ভুনাথ ঘটক, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় দাস, তাপসকান্তি রাজপন্ডিত, শ্যামল বেরা, প্রদ্যোত কুমার মাইতি, তারাশিস মুখোপ্যাধ্যায় (প্রয়াত) ; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কৃষ্ণকালী মন্ডল, ধূর্জটি নস্কর, সনৎকুমার নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, অমৃত লাল পাড়ুই ; পুরুলিয়ার সুবোধ বসুরায় ; উত্তর চব্বিশ পরগণার অসীম দাস প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় লোকসংস্কৃতি চর্চায় সরকারি উদ্যোগের কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প অধিকার থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশ করা হয়েছে ড. কল্যাণকুমার গাঙ্গুলি রচিত সুচিত্রিত গ্রন্থ, 'Designs in Traditional Arts of Bengal' এবং আশিস বসু রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা', তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে মণি বর্ধন রচিত 'বাংলার লোকনৃত্য' প্রভৃতি গ্রন্থাদি। বিগত ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক যে আলোচনা চক্রটি অনুষ্ঠিত হয়, সেটিতে বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত রূপরেখা ও গতি প্রকৃতির পর্যালোচনা হয় এবং আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধগুলি গ্রথিত করে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে ১৯৭৪ সালে 'পশ্চিম-বঙ্গের লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

অনুরূপ পরের বছর ১৯৭১ সালে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে যে আলোচনা চক্রটি অনুষ্ঠিত হয় তার বিষয়টি ছিল লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প'। পরে ১৯৭৬ সালে এ আলোচনা চক্রে পঠিত প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প' নামক একটি গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া, বিগত আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি অধিকারের পক্ষে বেহালায় স্থাপন করা হয় লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শন নিয়ে একটি প্রদর্শশালা ও গ্রন্থাগার।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উন্নয়ন, লোকশিল্পীদের যথাযথ উৎসাহ প্রদর্শন ও অপস্রিয়মান লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য প্রভৃতির উজ্জীবন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র', যা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উদ্যোক্তা ও পুরোধা সুধীপ্রধান ছিলেন এই সংগঠনের মুখ্য সংগঠক ও সভাপতি। সম্প্রতি তাঁর প্রয়াণের পর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী উপেন কিস্‌কু। আলোচ্য এই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানান অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও কর্মশালার মধ্য

দিয়ে আঞ্চলিক লোকশিল্প তথা লোকসংস্কৃতির পরিচয় জনমানসে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রের পক্ষে লোককথা, লোকগীতি, লোকনৃত্য প্রভৃতি বিষয়ক দশটি গ্রন্থ এবং ঝুমুর ও বাউল গানের ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়েছে, 'লোকশ্রুতি' ও 'লোকবার্তা' নামক দুটি পত্রিকাও এই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া এই সংস্থা লোকশিল্পীদের পড়াশুনা ও চিকিৎসার এবং দুঃস্থ শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্য অনুদানও প্রদান করে থাকেন। এছাড়া লোকশিল্প-সংস্কৃতি গবেষণা ও সৃজনশীল চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্প্রতি সুধী প্রধান স্মারক পুরস্কার অর্পণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য পনেরো হাজার টাকা। এই বৎসর (১৯৯৯) মুসলিম বিয়ের গানের সংগ্রাহক ও শিল্পী মুর্শিদাবাদের মহিমা খাতুনকে ঐ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য ঝাড়গ্রাম, সিউড়ি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও আলিপুরদুয়ারে পাঁচটি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উল্লিখিত ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে লোকশিল্পের ও লোকবাদ্যের বিভিন্ন উপকরণসহ একটি প্রদর্শশালারও উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সমীক্ষা প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরুন এই বৎসর মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় সমীক্ষা কার্য শেষ করা হয়েছে। তাই লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চর্চা ও উজ্জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা যে গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতির জগৎ এক অনুসন্ধিৎসার জগৎ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনের যে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন তা লোকঐতিহ্যের মধ্যেই প্রকাশমান, তাই ইতিহাসের প্রয়োজনেই লোকসংস্কৃতির চর্চা, অনুশীলন ও সংরক্ষণ অব্যাহত থাকবেই এবং লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নেই বলে যা বলা হয়ে থাকে তারও কোনো ভিত্তি নেই।

# সাঁওতালি লোকনাট্য প্রসঙ্গে দু-চার কথা

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে মানুষের রীতি-নীতি, চাল-চলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার ও অন্তঃকরণ। মানুষ আজ নতুনতর জীবনের ডাকে সাড়া দিয়েছে, পুরাতন রীতি-নীতি ও বিশ্বাসকে সামাজিক কিংবা জাতীয় জীবন থেকে ক্রমশ মুছে ফেলছে। আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজেও এ পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। আধুনিকতার ধাক্কায় তাদের রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত কোথাও কোথাও লুপ্ত হতে চলেছে আবার কোথাও কোথাও বা অন্য রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এটাকে আর সাঁওতাল সমাজ আটকে রাখতে পারছে না। সাঁওতাল সমাজের এ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বহু কিছুই বলা যেতে পারে, তবে যাত্রা-নাটক ইত্যাদির প্রভাব যে সরল মানুষগুলোকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না এবং সাঁওতাল সমাজে আজ নাট্যচর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

নাটক অভিনয় সাঁওতাল সমাজে একটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। শুধু বলা চলে, আজকের দিনে যেভাবে নাট্যচর্চা চলছে পূর্বে সেভাবে হত না। আমরা দেখতে পাই, পূর্বে তাদের সহরায় উৎসবের (Harvest Festival) সময় ছেলেরা নানাভাবে সাজত। নাকে, মুখে, শরীরে নানারকমের রঙ মাখত, চেহারা দেখে চেনা যেত না ; সাদা পাট-শণের পরচুলা বানিয়ে মাথায় দিত, মাটির খোলা আর তালপাতার টুপি পরত, কেউ সাজত যমরাজা, কেউ বা যমরাজার চেলা, আবার অনেকে মারাঙ বুরু, জাহের এরা, মাঁঝি, জগ-মাঁঝি, পারানিক, গোড়েত, যুগি প্রভৃতি সেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে কথাবার্তা বলে লোকদের হাসাত। এ ধরণের নৃত্য-নাট্যের সাহায্যে সমাজের

ভালো-মন্দ সবকিছুই তুলে ধরা হত এবং গ্রামবাসীরাও তা উপভোগ করত। ম্যাকফাইল সাহেব লিখেছেন :

"On the Forenoon of the second day of the sohrae festival young men and boys with drums and various musical instruments pay a visit to each house in the village. Some of the party go as phakirs, others may have straw monkeys which they make perform, others pretend to be pedlars and offer to sell bits of straw or wood etc., the object being to amuse."

(Campbell's Santali-English Dictionary, P-229)

আবার আমরা দেখি, কৃষিনির্ভর সাঁওতাল সমাজে নাচগানের প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই নাচগান তাদের সমাজে কোনোরকম পেশাদারি সংস্কৃতির অংশবিশেষ নয়, বরং বলা চলে এগুলো তাদের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশমাত্র। কৃষিকাজে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের নাচগানের আশ্রয় নিত এবং সে সমস্ত নাচ গানের মধ্যে তাদের জীবন সংস্কৃতিকে জীবন্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করত। আজও তা দেখা যায় তাদের 'কারাম' নৃত্যে। কৃষিকাজ করতে গিয়ে কীভাবে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়, কীভাবে বীজধান ছড়ানো হয়, কীভাবে ধানের চারা তোলা হয়, লাগানো হয়, ধান কাটা হয়, আঁটি বাঁধা হয়, বাড়িতে বয়ে আনা হয়, ঝাড়া হয় এবং গোলাজাত করা হয় তার সমস্ত আঙ্গিক, কলাকৌশল তারা কারাম নাচের মাধ্যমে তুলে ধরে। ঠিক সে রকম আবার গ্রাম পত্তনের চিত্র অর্থাৎ কী ভাবে জঙ্গল সাফ করা হয়, গাছ কাটা হয়, জমি সমান করে রাস্তা-ঘাট তৈরি করা হয় তা নৃত্য-নাট্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বাজনার সাথে সাথে দ্রুত প্রতিটি আঙ্গিক দেখাতে হয় বলে একমাত্র ছেলেরাই এই কারাম নৃত্য দেখায়।

যাই হোক — সহরায় উৎসবে কয়েকটি দিন সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার অধিকার থাকে, অবশ্য গ্রামের জগ-মাঁঝি সে কটা দিন ছেলেমেয়েদের ওপর সতর্ক নজর রাখেন। সে সময় নাচের আখড়ায় ছেলেমেয়েদের হাসি-তামাশার বন্যা বয়ে যায়। মেয়েরা জগ-মাঁঝিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছেলেদের উদ্দেশ্যে গান গায় —

"চহঁক্ চহঁক্ চহঁক্ মে জগ্-মাঁঝি
চিরগাল চিরগাল চিরগাল মে জগ্-মাঁঝি।
কুড়িকো কো ফেরকাও আকান জগ্-মাঁঝি
কড়াকো দ হুড়কা কাক্ মে।'

অর্থাৎ জগ্-মাঁঝি, তুমি সজাগ হও। মেয়েরা নাচের তালে মাতাল হয়েছে। ছেলেদের হুড়কা দিয়ে ঘরে রাখো।

ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গানের জবাব দেয় নানা অঙ্গভঙ্গি করে —

"চহঁক্ চহঁক্ চহঁক্ মে জগ্-মাঁঝি
চিরগাল চিরগাল চিরগাল মে জগ্-মাঁঝি
কড়াকো কো বাহের আকান জগ্-মাঁঝি
কুড়িকো দ সতর দহকোম।"

অর্থাৎ জগ্-মাঁঝি তুমি সজাগ হও। ছেলেরা বাইরে বের হয়েছে। মেয়েদের চোখে চোখে রাখো।

'পাকদন' আর এক ধরণের নৃত্যনাট্য। এ নাচের সময়ে ছেলেরা কোমরে ঘুঙুর বেঁধে খালি গায়ে হাতে ছোটো ছোটো লাঠি কিংবা মুগুর নিয়ে ঘুরে কখনও লাঠি উপরে তুলে, কখনও লাঠি নামিয়ে পরস্পর আক্রমণের বিভিন্ন ভাবভঙ্গি অনুকরণ করে নাচ দেখায়। এক একবারে দু'জন করে শিল্পী এ নৃত্য-নাট্যের আসরে অবতীর্ণ হন, একজন আক্রমণকারী অন্যজন প্রতিরোধকারীর ভূমিকায়। পুরনো দিনের আদিবাসী বীর যোদ্ধাদের সাহস, বিক্রম এ নৃত্য-নাট্যের মাধ্যমে এক সময় তুলে ধরা হত আর হাটে-বাটে মেলায় এ 'পাক' নাচ দেখা যেত। পুরনো গানে পাওয়া যায় —

'কুলহি মুচীৎরে দ দীই না
পাক দীই না পীইহাকো দদনকান
জামতড়া ধুড়ি দীইকো ডিগলীউ নীগুয়েৎ
এত মতে মা লাউড়িয়ী কঁয়েতে মা পীইহাকো
জামতড়া ধুড়ি দীইকো ডিগলীউ নীগুয়েৎ।'

অর্থাৎ —

'ওগো দিদি, গ্রাম রাস্তার প্রান্তে
পাক নৃত্যকারীরা সংগ্রাম নৃত্য করছে
দিদি তারা জামতাড়ায় ধুলো ওড়াচ্ছে
ডান হাতে ওদের লাঠি, বাঁ দিকে তারা পা ফেলে,
জামতাড়ায় তারা ধুলো ওড়াচ্ছে।'

এভাবেই কৃষিনির্ভর আদিবাসী সমাজে নাচের বিভিন্ন ভাবভঙ্গির মধ্যে আদিবাসী লোকনাট্যের আঙ্গিক, রূপটুকু প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পেত। আবার দেখা যেত, কেউ ভরে পড়লে (রুম হলে) তার সে সময়ের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে আদিবাসী

লোকনাট্যের উপকরণ গ্রহণ করা হত। শ্রাবণ মাসের ডাক-সংক্রান্তির দিনে আদিবাসী ওঝা-গুরুরা তাদের তন্ত্র-মন্ত্রের ক্ষমতা জাহির করার জন্য গ্রামের কোথাও প্রতিযোগিতার আসর বসালে গুরুদের সঙ্গে শিষ্যরাও সে আসারে উপস্থিত থাকত। সে সময়ে কোনো শিষ্যের উপরে দেবতা ভর করলে তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সেই দেবতার ভাবমূর্তি ফুটে উঠতে দেখা যেত। যেমন — 'বাঘুত বোঙ্গা' অর্থাৎ ব্যাঘ্র দেবতা কারো উপর ভর করলে সে বাঘের মতো মুখ প্রসারিত করে গর্জন ও লাফালাফি শুরু করত। কেউ হয়তো তখন ছাগলের মতো চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা কবত। বাঘ তাকে ধরার জন্য লাফ দিলে সে কোনো বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করত। এরপর ছাগলরূপধারী মানুষটি মাঝে মাঝে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেই বাঘরূপধারী শিষ্য গর্জন করে উঠত। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর দুজনের ভর কেটে গেলে তারা শান্ত হত।

কখনও বা কারো উপর 'হাঁড়ু বোঙ্গা' বা হনুমান দেবতা ভর করলে সে বাড়ির চালে উঠে শসা, লাউ, চালকুমড়ো ইত্যাদি দেখে সেগুলি খাবার ভান করত। হাসি দেবতা ভর করলে কোনো যুবক তেঁতুল বা টক জাতীয় খাবার চাটতে চাটতে ভীষণ হাসত এবং হাস্যরসিকের চরিত্র তুলে ধরত। কয়েকজন ছেলে তার কাছ থেকে খাবার কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে হাতাহাতি বেঁধে যেত এবং আরো হাসির রোল উঠত।

শরৎকালে সাঁওতাল ছেলেরা দল বেঁধে 'দাঁসায়' নৃত্যগীত বাড়ি বাড়ি প্রদর্শন করে থাকে। এ নৃত্যের সাজসজ্জা ও উপকরণ দেখার মতো। মাদল, ধামসা ব্যবহৃত হয় না, তার বদলে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি 'ভুয়াং' নামক বাদ্যযন্ত্র, কাঁসর ও বাঁশি তারা ব্যবহার করে। মেয়েদের রঙিন শাড়িকে ধুতি ও পাগড়ি করে পাগড়িতে ময়ূরের পালক গুঁজে শরীরে পরে মেয়েদের অলঙ্কার। কখনও যদি দু'দলের সাক্ষাৎ ঘটে যায় তখন উভয় দলের প্রীতি সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর উভয়পক্ষই রাজি থাকলে দাঁসায় তর্কযুদ্ধ শুরু হয়। এটাও একধরণের লোকনাট্য। অঙ্গভঙ্গিসহ প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্তরের পর উত্তর দিয়ে তর্ক, গ্রামের সবাই এই তর্কযুদ্ধ দেখা ও শোনার জন্য উপস্থিত হয়। তবে উভয় দলের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ দেখা দিলে উভয় দলকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত সাঁওতাল সমাজ বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবেই জীবনযাপন করে এসেছে। সুতরাং তাদের সমাজ সংস্কৃতির ধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বহুলাংশে অজানা। এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তাও হয়নি — হলে অনেক কিছু জানা যেত। তবে, এ কথা বলতে বাধা নেই যে সাঁওতালি লোকনাট্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামই প্রতিফলিত।

# রায়বেঁশে ঃ বাংলার সুপ্রাচীন রণনৃত্য

অরুণ চৌধুরী

*কথারম্ভ*

বর এসেছে বীরেরছাঁদে / বিয়ের লগ্ন আটটা / পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে / গালেতে গালপাট্টা / শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে / আলাপ যখন উঠল জমে, / রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে / মাথায় মারল গাঁট্টা / শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে / বর হেসে কয় — ঠাট্টা।

উল্লিখিত ছড়ার লেখক রবীন্দ্রনাথ। বাংলার সুবিখ্যাত লোকনৃত্য রায়বেঁশের কথা ও তার বৈশিষ্ট্যের কিছুদিক রবীন্দ্রনাথ 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ছড়ার ছন্দে লেখা ঐ কবিতায় চিরন্তন করে রেখেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু সংখ্যক কাব্যে ঐ রায়বেঁশেদের কথা উল্লেখিত আছে। সেখানে রায়বেঁশেরা যোদ্ধা। নৃত্যকারী নয়। এ উল্লেখ আমরা পাব মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে। পাই মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে। পাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। রামপ্রসাদের কাব্যেও 'রায়বেঁশে'দের কথা রয়ে গিয়েছে।

এযুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বিশেষভাবে 'রায়বেঁশে'দের কথা উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৮৯৮-১৯৭১)। সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) রায়বেঁশে নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার বিলুপ্তপ্রায় যোদ্ধাদের লোকনৃত্য আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। অবশ্য এ নিয়ে সেযুগে (ত্রিশের দশকে) রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। তথাপি, একথা অনস্বীকার্য যে গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টায় ঐ লোকনৃত্যে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বাঁচানো এবং তার অগ্রগতি ঘটাবার জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। 'লোকসংস্কৃতি পরিষদ' গঠন ও পরবর্তীকালে 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র' গঠন ঐ উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি। প্রয়াত সুধী প্রধান ছিলেন এ দুই সংগঠনেরই সভাপতি এবং প্রাণপুরুষ।

*প্রাচীন রণনৃত্য*

বাংলার প্রাচীন রণনৃত্যের অন্যতম নিদর্শন হল 'রায়বেঁশে'। এর উদ্ভব কখন এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের স্বাভাবিক ভাবে কৌমজীবনে ফিরে যেতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক



দুই রায়বেঁশে শিল্পী — বাংলার বীরযোদ্ধা থেকে সংগৃহীত

যুগের অন্যান্য অনেক নৃত্য ধারার মতো এই নৃত্যধারারও উদ্ভব যেসব এলাকায় বাঁশ পাওয়া যেত সেই সব এলাকাতে। বাঁশ দিয়ে তৈরি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে এক গোষ্ঠীর মানুষ আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বাংলার লাঠি তার অন্যতম। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) ঐ লাঠির গুণকীর্তন করেছেন। এখনও গ্রামবাংলায় লাঠি একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। গ্রামীণ সংঘর্ষে লাঠির প্রয়োগ এখনও হয়ে থাকে। 'লাঠিয়াল' শব্দও বাংলা অভিধানে রয়ে গেছে। আছে 'লাঠিখেলা', তবে সমাজের নানাবিধ পরিবর্তনে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে লাঠির মূল্য ক্রমহ্রাসমান। সেখানে বারুদের প্রয়োগ বাড়ছে। বোমার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাইপগান, পিস্তল প্রভৃতিও গ্রামীণ সংঘর্ষে আজকাল ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষত ভূমিসংক্রান্ত আন্দোলনকে দমন করার জন্য জমিদার জোতদাররা ঐ অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, সমাজবিরোধীদের এঁরা টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনেন। আগে তাঁরা ডাকাতেন লাঠিয়ালদের, সেখানে এই পরিবর্তনের লক্ষণগুলো পরিস্ফুট। তবু, লাঠি এখনও আছে।

'রায়বেঁশে' কথার উদ্ভব 'রায়বাঁশ' থেকে। 'রায়' কথাটা এসেছে 'রাজ' থেকে। 'রাজবাঁশ' থেকে 'রায়বাঁশ', রায়বাঁশধারী যোদ্ধা 'রায়বাঁশ্যা'। প্রাচীন বাংলার রণাঙ্গনে তবকী, ঢালি, ধানুকি প্রভৃতি যোদ্ধাদের মধ্যে রায়বাঁশধারী যোদ্ধাদেরও দেখা যেত। তাঁরাই 'রায়বাঁশ্যা', ঐ সব যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র হিসাবে থাকত 'রায়বাঁশ', 'রায়বাঁশ' থেকে 'রায়বাঁশিয়া', বা রায়বাঁশ্যা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী 'রায়বাঁশ'-এর শব্দার্থ হল, 'হস্তক্ষেপ্য সশল্য বংশাদির দণ্ড, 'তোমর'। 'রায়বাঁশ ধরে খরসান', (কবিকঙ্কন চণ্ডী)। রায়বাঁশিয়া > রায়বাঁশ্যা > রায়বেঁশে -এ ভাবে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির মধ্য দিয়ে 'রায়বেঁশে' শব্দের উৎপত্তি। অর্থ — রায়বাঁশধারী যোদ্ধা, তোমরাস্ত্রধারী। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অনুসারেও রায়বেঁশের অর্থ — 'রায়বাঁশধারী নিম্নজাতীয় সৈনিক।' 'রায়বাঁশিয়াদের নৃত্য' এ অর্থও তিনি করেছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রায়বাঁশিয়া' যোদ্ধাদের 'তোমরাস্ত্রধারী' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 'তোমর' শব্দের অর্থ 'হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘ দন্ড বিশেষ'। তার অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানেও অনুরূপ অর্থ করেছেন। 'রায়বাঁশিয়া' হল বংশযষ্ঠিধারী পাইক, লাঠিয়াল। তিনি রায়বাঁশিয়া নৃত্যকে 'মন্ডলাকারে নৃত্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

আভিধানিকদের বক্তব্য থেকে ও অন্যান্য সূত্র থেকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে 'রায়বেঁশে' রায়বাঁশধারী যোদ্ধাদের রণনৃত্য। প্রাচীন বাংলায় তার প্রচলন ছিল। রায়বাঁশকে সুদূর অতীত কাল থেকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে বাংলার যোদ্ধারা।

তীক্ষ্ণাগ্র বাঁশ এবং লাঠি হাতে ঐ যোদ্ধারা শত্রুর সম্মুখীন হত। 'রায়বেঁশে নৃত্য' হল তাদেরই রণনৃত্য, যোদ্ধারা সমবেতভাবে লড়াই করে, তাই এ রণনৃত্যও অন্যান্য রণনৃত্যের মত 'সমবেত নৃত্য'। একক নৃত্য বা দ্বৈতনৃত্য নয়।

## *ইতিহাসের আলোকে রায়বেঁশে*

'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন —

"আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুন্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যেসব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তালে, নাচের ভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। গ্রামে নিম্নস্তরের মেয়েদের মধ্যে যেসব গীত ও নৃত্য প্রচলিত, বীরভূমে রায়বেঁশেদের মধ্যে, অন্যান্য জেলার লাঠিয়ালদের মধ্যে যে রণের নৃত্য আজও অভ্যস্ত, তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। লোকায়ত সেই সব নাচ ও গান উচ্চস্তরের কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করে নাই বলিয়া তাহাদের কথা কোথাও কীর্তিতও হয় নাই। তবু, সকল উপেক্ষা সহ্য করিয়া উচ্চকোটির সংস্কৃতির চাপ সহ্য করিয়া ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী স্বীকৃত ও গৃহীতও হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) অভিমতও অনুরূপ। গুরুসদয় দত্তকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, — 'আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন ঃ এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচের উৎসাহকে আপনি ভদ্রমন্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্তদৌর্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক, সার্থক হোক।'

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' নামক গ্রন্থের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

পাইক নৃত্য (পদাতিক) এখনো প্রায় সেই পদ্ধতিতে বিহার এবং বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। পাইক নৃত্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রাণশক্তিপূর্ণ।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে রণনৃত্য কালক্রমে অধিকাংশই সামরিক গুণ হারিয়ে গীতিনাট্যের গুণান্বিত হয়েছে। যেমন — কাঠিনৃত্য, তাতে তরবারির পরিবর্তে একটি সরু কাঠি নিয়ে নৃত্য করা হয় এবং মধ্যযুগের ছন্দ প্রাণ শক্তিপূর্ণ পাইক নাচের পরিবর্তে এক মেয়েলি ধরনের গীতিনাট্যের প্রবর্তন করা হয়েছে, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গীতিমূলক বিষয় এইসব নৃত্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে।

ছৌ, ঢালি, কাঠি নৃত্য, পাইক নৃত্য, সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে প্রচলিত নাটুয়া নৃত্য এবং রায়বেঁশে একই পর্যায়ভুক্ত এবং সবগুলিই এককালের রণনৃত্য। যোদ্ধারা এসব নৃত্যে অংশ নিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রণনৃত্য রায়বেঁশের পৌরুষ ভাব একসময় পরিবর্তিত হয়, নৃত্যশিল্পীরা নারীর বেশধারী হয়ে ঘাগরা পরে ঐ নৃত্য পরিবেশন করত। সাধারণ অভিজাত ও ধনাঢ্য পরিবারের বিয়ের আসরে তারা নাচত। গুরুসদয় দত্ত তাঁর লেখা 'বাংলার বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি যখন এই নৃত্য প্রথম



নারীর বেশধারিণী রায়বেঁশে শিল্পী সূত্র — 'বাংলার বীরযোদ্ধা'

দেখেন তখন তার নাম শুনেছিলেন 'রাইবিশে'। বড়লোকদের বাড়ির বিয়ের আসরে ঐ শিল্পীরা তখন নাচ দেখাত। জনশ্রুতি, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বীরভূমের এক জমিদার পরিবারের বিয়ের আসরে ঐ নৃত্যের সাথে প্রথম পরিচিত হন। তখন তিনি বীরভূমের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। ঐ নৃত্য দেখে নৃত্যশিল্পীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্যে করেন প্রখ্যাত গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানী শিবরতন মিত্র (১২৭৮-১৩৪৫)। তিনি জানালেন যে আসল নাম 'রায়বেঁশে নৃত্য', রায়বাঁশের সাথে ঐ নৃত্যশিল্পীদের সম্পর্কের কথাও তিনি প্রাচীন বাংলার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নিদর্শন বের করে দত্তমশাইকে অবহিত করান।

এই পরিবর্তনের পিছনে কতকগুলি কারণ অনুমিত হয়। এক, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতানুসারে পাইক নৃত্যশিল্পীদের তরবারি বাতিল করে কাঠি নেবার পিছনে তিনি বৈষ্ণব প্রভাবের কথা ভেবেছেন। আমার মনে হয়, কারণটি রাজনৈতিক। প্রথমে পাইকদের কথাই আলোচনা করা যাক। চুয়াড় বিদ্রোহ ও পাইক বিদ্রোহের (১৭৬৬-১৮১৬) পরে ইংরাজ শাসকরা পাইকদের উপর কড়া নজর রেখেছিল। তাদের মধ্যে ভীতিরও সঞ্চার করেছিল। যার প্রতিক্রিয়াতেই 'লাঠি' 'কাঠি' হওয়া আদৌ অসম্ভব ঘটনা নয়। তরবারি বর্জন অনিবার্য হয়ে পড়ে, রায়বেঁশেদের ক্ষেত্রেও তাই। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার বাগদি, ডোম, বাউড়ি, ভল্লা, মাল, কোপাই প্রভৃতি অন্ত্যজ হিন্দুসমাজের মানুষরাই রায়বেঁশে শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিল। এঁদের আবার অনেকের ডাকাত হিসাবেও পরিচয় ছিল। তারাশঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাস ও 'স্রোতের' কুটো গল্পের রাম ভল্লা ছিল বিখ্যাত লাঠিয়াল। আবার রাম ভল্লা 'ডাকাত', এ পরিচয়ও ছিল। 'আখড়াইয়ের দীঘি'র কালী বাগদিও এলাকার নামকরা ডাকাত ছিল। শোনা যায়, গুরুসদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রতচারী গ্রামের রায়বেঁশের শিক্ষক ধরণী বাউড়ি ওরফে ধরণীজী (১৯০৩-১৯৬৯) এককালে বীরভূমের রাজনগর থানার অনেকগুলি গ্রামের ত্রাসস্বরূপ ছিলেন। ১৯৩৪ সনে গুরুসদয় দত্ত তাঁকে 'রত্নাকর' থেকে 'বাল্মীকি'তে রূপান্তরিত করেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্রতচারী গ্রামে রায়বেঁশে নৃত্য শিখিয়েছেন। নানুর থানার জলাম গ্রামের প্রখ্যাত রায়বেঁশে শিল্পী প্রহ্লাদ মাঝির সম্পর্কিত তথ্যও তাই।

মোটের উপর, রায়বেঁশে নৃত্য আয়ত্তকারীদের গায়ের শক্তিও থাকত। কলাকৌশল জানত তারা। লাঠিতে তো দক্ষতা যথেষ্ট ছিল। ঐ কারণে তাদের কেউ কেউ ডাকাতিকে পেশা হিসাবে নিত। আরেকটা বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এরা মূলত ভূমিহীন, কিছু বর্গাদারি প্রথায় অন্যের জমি চাষ করত ; বা বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কৃষাণী প্রথায় চাষ করত। অথবা ক্ষেতমজুর বা মজুর হিসাবে কাজ করে দিন গুজরান করত, মাছ ধরার পেশাও কারুর কারুর ছিল, তবে বাগদিরা মাছধরার কাজ করলেও বাউড়ি বা ডোমেরা তা করত না ; লাঠিয়াল হবার জন্য জমিদারদের পাইক, লগদি, পেয়াদা প্রভৃতির কাজও করত। জমিদার জোতদার মহাজনদের হয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করার কাজেও এরা কোনো কোনো সময় যে ব্যবহৃত হয়নি, তা নয়। আবার জমিদার জোতদার মহাজন তথা সমাজের সামন্তশ্রেণীও নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এদের দিয়ে ডাকাতি করাত। ডাকাতির মাল সামাল করে নিজেরা সম্পত্তিবান হবার ঘটনা আকছার দেখা যায়।

এসব কারণে এদের উপর পুলিশের নজর থাকত। কৃষকদের আন্দোলনে ও গণ-সংগ্রামেও এরা জঙ্গি ভূমিকা পালন করত। এসবের জন্য বহুবার কারাবাসও এদের

অনেকের জুটত। ঘাগরা পরে নারীবেশ ধারণ করে গোপিনী সেজে লাঠি বাদ দিয়ে নাচের পিছনে এ কারণটাই মুখ্য বলে মনে হয়।

ব্রিটিশশাসনের সূচনাকাল থেকেই এই সব যোদ্ধৃ সম্প্রদায়কে সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, এরা পেশাচ্যুত হয়, তারাশঙ্কর তাঁর 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে লিখেছেন যে বাগদিরা এক সময়ে নবাবদের সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধা ছিল। বীরভূমের নলহাটি থানার পাইকপাড়া নামক একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবরা প্রয়োজন মতো সৈনিক রিক্রুট করত। ঐ সৈনিকদের রসদ সরবরাহ করতেন কায়স্থ সম্প্রদায় ভুক্ত এক ব্যক্তি। তিনি ঐ কাজ করে প্রভূত সম্পদশালী হন।

বীরভূমের রাজনগরের মুসলিম 'রাজ পরিবার'-এর ঘাটরক্ষার প্রহরী থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে কাজ করত বাগদি, ডোম, বাউড়ি ঘাটোয়াল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষরা। এরা রায়বেঁশে নৃত্যে ওস্তাদ ছিল। অন্যান্য যেসব গ্রামে রায়বেঁশের নৃত্যশিল্পীরা এখনও আছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কোনো না কোনো সামন্তপ্রভু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ওরা তাদের লাঠিয়াল বা যোদ্ধা হিসাবে কাজ করত। যোদ্ধাদের এক সময় পারিশ্রমিক হিসাবে লাখেরাজ জমি দেওয়া হত। ইংরাজ শাসনের সূচনাপর্বে তা বন্ধ হতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তার বিলোপ ঘটে। এসব কারণে এরা পেশাচ্যুত হয়ে যায় এবং রুজিরোজগারের ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়।

এসব থেকেই এদের যোদ্ধৃচরিত্র সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে প্রতিকূল রাষ্ট্রিক পরিবেশে যোদ্ধৃচরিত্র হারিয়ে ওরা নিছক নৃত্যশিল্পী হল। নাচ দেখিয়ে রোজগার করা একটা রুজিরোজগারের পন্থা হিসাবে বিবেচিত হল। নারীবেশ দেখে খেমটা নাচ দেখায় অভ্যস্ত জমিদাররা কিছুটা পরিতৃপ্ত হতেন — এই সামাজিক দিকটাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ক্ষয়িষ্ণু যুগের এই রুচিবিকৃতি ও চারিত্রিক পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয়ই সেই সময়ের পৃষ্ঠপোষক সামন্তপ্রভুদের ভূমিকা ছিল। বিদেশী শাসনের প্রতিকূলতা তো ছিলই।

### *বাংলার প্রাচীন কাব্যে রায়বেঁশে*

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ষোড়শ শতক) রচিত 'কবিকঙ্কণ চন্ডী'র আখেটিক খন্ডে 'কলিঙ্গরাজের যুদ্ধসজ্জা' অধ্যায়ে আমরা পাই, — লয়ে শত করিকাল / ধাইল মদন পাল / ঘন ঘন ফেলে খাতা লোকে। / দুঃসহ সেনার ভরে / মহী থর থর করে / কণিপতি আদিনাগ কাঁপে।। / সোনার নূপুর পায় / বীর বেড়াপাকে ধায় / রায়বাঁশ

ধরে খরসান। / সোনার মুকুট শিরে / ঘন সিংহনাদ করে / বাঁশে দিল চামর নিশান। / আশীগতা বাজে ঢোল / তের কাহন সাজে কোল / কাঁড় ধরে তিন তিন শাঁটি। / পরিধান বীরধড়ি / কানে ফটিকের খড়ি / অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি।'

ঘনরাম চক্রবর্তীর (সতেরো শতক) ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা রায়বেঁশে সম্পর্কে এরকম উল্লেখ পাই। মহামদ পাত্রের ময়না যাত্রায় পাচ্ছি, — 'রণভুঁয়া, মল্লভুঁয়া / মগধ মাগধ মিএগ / একলক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়। / ধামুকী (ধানুকী?) বাদুকী ঢালী / রায়বেঁশে কারিকালি রাহুত, মাহুত সমুদায়।'

ভারতচন্দ্রের (আঠারো শতক) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে পাই, — 'আগে চলে লাল-পোষ-খাস-বরদার। / সিপাই সকলে চলে কাতারে কাতার।। / তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল। দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল।'

রামপ্রসাদ সেনের (আঠারো শতক) কাব্যগ্রন্থেও দেখা যায়, — 'কোটি কোটি তীরন্দাজ, / যেথা বিন্দে একন্দাজ / রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।'

## *রায়বেঁশে নৃত্যের ভৌগোলিক সীমা*

বর্তমানে রায়বেঁশে নৃত্য খন্ডিত বাংলার বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ এই তিন জেলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলা যায়। বর্ধমানেরও কাটোয়া মহকুমাতেই রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলন সমধিক। তিন জেলাতেই আবার রণপা নৃত্য এখনও প্রচলিত। রণপা নৃত্যের সাথে রায়বেঁশে নৃত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এ থেকে একটা জিজ্ঞাসা জাগে যে ময়ূরাক্ষী নদী ও অজয় নদ বিধৌত যে বিভাগ, রায়বেঁশে নৃত্য কি সেখানেই সমধিক প্রচলিত ছিল? এখানকার বাগদি, ভল্লাবাগদি, ডোম, কোপাই বাউড়ি প্রভৃতি যে নৃগোষ্ঠী তাদের পূর্বপুরুষরা কি রায়বেঁশে যোদ্ধা ছিল? তাদেরই রণনৃত্য কি রায়বেঁশে?

আগে উল্লেখ করেছি যে বীরভূমে রায়বেঁশে নৃত্যে যারা পারদর্শী তাদের সম্প্রদায়গত পরিচয় হল ডোম, বাগদি ও ভল্লা বাগদি কোপাই ও বাউড়ি। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ নৃত্যের প্রচলন কম। তবে, ভুঁইমালী সম্প্রদায়, মাল সম্প্রদায়ও যে রায়বেঁশে নৃত্য জানত বা এখনও জানে, তা বীরভূমে লক্ষ করা যায়। মাল সম্প্রদায়ের কথা ভারতচন্দ্রও উল্লেখ করেছেন। 'তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।' বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার সোঁজ গ্রামের শ্রীজন্মেজয় ভুঁইমালী (৭৫) রায়বেঁশে নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে রায়বেঁশে নৃত্যের চর্চাকারী। ওঁর ঠাকুর্দা কার্তিক ভুঁইমালী, বাবা মধুসূদন ভুঁইমালী — এঁরা সবাই রায়বেঁশে নৃত্য জানতেন। শ্রীজন্মেজয় ভুঁইমালীর

উত্তরপুরুষও রায়বেঁশে নৃত্য জানে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে বীরভূমের মুসলমানরাও রায়বেঁশে নৃত্যে অংশ নেয়। বর্তমানে অবশ্য তার কোনো নিদর্শন চোখে পড়েনি। তবে, এই নৃত্যে সাম্প্রদায়িক কোনো রূপ নেই। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন যাঁদের কথা জেনেছিলেন, তাঁরা ধর্মান্তরিত বাগদি বা বাউড়ি হওয়াও অসম্ভব নয়, 'মিউজিক এণ্ড ড্যান্স অব ইস্ট পাকিস্তান' গ্রন্থের লেখক আবদুল হালিমের মতে বাংলাদেশের সীমান্তের জেলাগুলিতে রায়বেঁশে নৃত্য দেখা যায়। আবদুল হালিমের ঐ সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে রায়বেঁশে নৃত্যের ভৌগোলিক সীমা আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান এই বাংলার সীমানার বাহিরেও ছিল। বাংলাদেশেও তার প্রচলন ছিল। রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে রায়বেঁশে যোদ্ধার উল্লেখে এ সত্যই ফুটে উঠেছে অবিভক্ত বাংলার সব জেলাতেই রায়বেঁশে যোদ্ধারা ছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'দুলে বাগদিরা' মূলত যোদ্ধা জনগোষ্ঠী। 'দলপতি' থেকে 'দলুই', তা থেকে 'দুলে', এককথায় বলা যেতে পারে যে বাংলার বাগদি, ডোম, মাল, বাউড়ি, কোপাই পূর্ববাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায় যেসব কৌম থেকে উদ্ভুত, তাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। আর যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রায়বাঁশ ব্যবহৃত হত। স্থান-কালের পার্থক্যানুসারে যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে। যেমনি, নমঃশূদ্রদের মধ্যে ঢাল, লেজা (বল্ল) ব্যবহৃত হত, তা থেকে এসেছে 'ঢালি নৃত্য' লাঠিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হত। আমার ছোটোবেলা কেটেছে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত বাংলাদেশের বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার (অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মহকুমা) কোটালীপাড়ায়। কোটালী পাড়ার বর্ণহিন্দু — ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির যেসব পাড়া বা গ্রাম ছিল, তাকে ঘিরে ছিল অনেকগুলি নমঃশূদ্র প্রধান গ্রাম। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কোটালীপাড়া একটি প্রাচীন দুর্গ। সেখানকার দুর্গরক্ষক ছিল ঐ সব নমঃশূদ্ররা। তাদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম ঢালি, লাঠিয়াল অনেক ছিল। নৃতাত্ত্বিক বিচারে পশ্চিমবাংলার বাগদিরা আর ঐ নমঃশূদ্ররা একই দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। উভয়ের মধ্যেই রণনিপুণ মানুষরা ছিল।

## *রণনিপুণ ভল্লা বাগদি সম্প্রদায় ও রায়বেঁশে নৃত্য*

বাগদিদের মধ্যে অনেকগুলি ভাগ আছে। যেমন — দুলে বাগদি, ভল্লা বাগদি, তেঁতুলে বাগদি, লেট বাগদি, মেটে বাগদি বা কুলমেটে প্রভৃতি। এদের সব গোষ্ঠীর মধ্যেই রায়বেঁশে রণনৃত্যের অস্তিত্ব এখনও আছে। তবে, ময়ূরাক্ষী নদীর অববাহিকার একটা বিশেষ এলাকায় 'ভল্লা বাগদি' নামক জনগোষ্ঠী বর্তমান। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, লাভপুর থানার ময়ূরাক্ষী তীরস্থ কিছু গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার

কান্দী মহকুমার অনেকগুলি গ্রাম এবং বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার কতগুলি গ্রামে এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরা মূলত যোদ্ধা, এদের গোষ্ঠীগত পরিচয়েই যুদ্ধাস্ত্রের কথা আছে। 'ভল্ল' শব্দ থেকে 'ভল্লা'। 'ভল্ল' শব্দের অর্থ 'বল্লম'। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার ন পাড়া গ্রামের শ্রীশক্তিপদ ভল্লা (৭৫) এক কালে রায়বেঁশে নৃত্যে পারদর্শী ব্যক্তি। ওঁর বাবা প্রয়াত হরিলাল ভল্লাও রায়বেঁশে জানতেন। ওঁর শিক্ষা গুরু বলরাম ভল্লা ছিলেন রায়বেঁশে নৃত্যের বড় ওস্তাদ। শ্রীশক্তিপদ ভল্লার সাথে গত ২৩ শে জুলাই যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাতে তিনি বলেছেন যে ১১২ খানা গ্রামে ভল্লাবাগদিদের বাস। ওঁর কথানুযায়ী মুর্শিদাবাদের সাটুই - বেলডাঙ্গা পর্যন্ত বাসিন্দা ১১২ খানা গ্রামের ভল্লাদের এক সমাবেশ হয়েছিল স্বাধীনতার আগে। ঐ সমাবেশ ডেকেছিলেন ময়ূরেশ্বর থানার ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলডাঙ্গা গ্রামের রামপদ ঘোষ। তিনিও ভল্লা বাগদি, কিন্তু 'উপাধি' পরিববর্তন করে 'ঘোষ' লিখতে শুরু করেন। ভল্লা বাগদিদের সমাজের কতকগুলি সংস্কারমূলক কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ওর সাথে সাক্ষাৎকার থেকে আরও জানা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়েঞা থানার সাওড়া গ্রামে, লাভপুরের ডালকুঠি গ্রামে রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলিত। সাওড়ার শিল্পীরা ভল্লা বাগদি। ডালকুঠির শিল্পীরাও বাগদি, সম্ভবত কুলমেটে। সাওড়ার সনাতন বাগদি ও খুদিরাম বাগদি উভয়েই প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। উভয়েই ছিলেন ভল্লা বাগদি। ডালকুঠির বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন প্রয়াত বলহরি বাগদি। তাঁর পুত্র শ্রীগুরুসদয় বাগদিও রায়বেঁশে নৃত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী।

শক্তিপদ ভল্লার জন্মস্থান ন'পাড়ায় ষাটঘর ভল্লা বাগদির বসবাস। এঁরা মূলত ভূমিহীন। কিছু বর্গাদার আছে। অধিকাংশের উপজীবিকা দিনমজুরি। শক্তিপদ ভল্লারও মূল উপজীবিকা দিনমজুরি।

১৯০১ সনের আদমসুমারির রিপোর্টে ভল্লা বাগদিদের সম্পর্কে এভাবে লেখা হয়েছিল — Many of them are dacoits, thieves and club-men or lathials।

### *ডোম সম্প্রদায় ও রায়বেঁশে*

'ডোম' সম্প্রদায়ও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আকুরে ডোম, বাজুনে ডোম, পাট্‌নী ডোম, মগয়া ডোম, বাঁশের কাজ করা ডোম প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বিভাগ আছে ডোমদের মধ্যে। বোঝা যায় যে এরা অতীতে আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠী বা কৌম ছিল। পরে নানা কারণে তারা 'ডোম' নামক এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এই ডোমদের একটি অংশ — আকুরে ডোমেরা যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিল।'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের যোদ্ধা কালুডোম ঐ যোদ্ধৃ ডোম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিভূ। বাংলায় সুপ্রচলিত 'আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম সাজে' নামক ছড়াটি ডোমদের ঐ যোদ্ধাচরিত্রেরই সাক্ষ্যবাহী। কেউ কেউ বলেন, ঐ ছড়াটির বর্তমান যে পাঠ প্রচলিত তা বিকৃত পাঠ। আসল পাঠ হল, — 'আগে ডোম বাঁয়ে ডোম ঘোড়ায় ডোম সাজে' ; যা হোক, আসলে ডোমদের মধ্যে যে যুদ্ধবিদ্যার চর্চা ছিল, তা অনস্বীকার্য। ঐ ডোমদের মধ্যে আবার 'রায়বাঁশিয়া' যোদ্ধাও অনেক স্থানেই ছিল, বীরভূমের রাজনগরের রাজারা (হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই) ডোমদের যোদ্ধা হিসাবে নিয়োগ করতেন। ঘাটরক্ষা করার কাজও ডোমসম্প্রদায়ের লোকেরাই করত। এখনও রাজনগরের আশেপাশে ঐ যোদ্ধা ডোমদের বংশধররা বাস করে। গোয়ালিয়াড়া, মাধাইপুর, পদমপুর, আহম্মদপুর, কবিলালপুর প্রভৃতি গ্রামের বর্তমান বাসিন্দা 'আকুড়ে ডোম'দের অতীতের যোদ্ধাদের উত্তরপুরুষ বলেই প্রতীতি হয়। গোয়ালিয়াড়া গ্রামের ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে রায়বেঁশে নৃত্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। গুরুসদয় দত্ত যখন রায়বাঁশিয়াদের খোঁজ নিচ্ছিলেন তখন গোয়ালিয়াড়ার ডোমদের মধ্যেও তার প্রচলন বিশেষ ভাবে ছিল। গুরুসদয় দত্ত ওদের মধ্য থেকে শিল্পীদের বেছে নিয়েছিলেন।

'ডোম' সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রায়বেঁশের বিশেষ প্রচলন ছিল বীরভূমের নানুর থানার চারকল গ্রামে। গুরুসদয় দত্তের সাথে তাঁদের যোগাযোগ হয়েছিল। চারকল গ্রামের প্রবীণ রায়বেঁশে শিল্পী শিবরাম প্রামাণিক (৭০) এখনও ব্রতচারী গ্রামের অন্যতম শিক্ষক। ঐ গ্রামে এখনও রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলন আছে।

### *অন্যান্য অন্ত্যজ সম্প্রদায় ও রায়বেঁশে নৃত্য*

ভল্লাবাগদিদের কথা আগে লিখেছি। তবে, সামগ্রিক ভাবেই বাগদি সমাজে রায়বেঁশে প্রচলিত ছিল। বাগদিরা মূলত যোদ্ধৃজাতি। তবে, উপজীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে নানা কারণে। যোদ্ধৃজাতির একাংশ কালক্রমে 'ডাকাত' হয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলার উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বরিন্দ, ও অরণ্য ঘেঁষা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার অনেক স্থানেই বাগদি সম্প্রদায়কে দেখা যায় যে তাদের পূর্বপুরুষ যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গমে ছিল। এদের মধ্যে পাইক নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, রণপা নৃত্য [ *বীরভূমে এর একটা প্রকারভেদ আছে। তার নাম 'জাঙ্গি নৃত্য'। সম্ভবত জঙ্গ, যার অর্থ যুদ্ধ, তা থেকে ঐ নামকরণ হয়েছে। 'জঙ্গী'রই অপভ্রংশ 'জাঙ্গি'। জঙ্গীলাট — প্রধান সেনাপতি। 'জঙ্গডিঙ্গা' মানে রণতরি বা বৃহৎ নৌকা। জঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে . . . . . আইসে — কবিকঙ্কন চণ্ডী* ] প্রভৃতি

সবই রণনৃত্য। তার সাথে লাঠি, পাইকদেরও অন্যতম অস্ত্র লাঠি। রায়বাঁশিয়ার তো বটে। রণপাও বাঁশনির্ভর।

বাউড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যেও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী মানুষরা ছিল। পাইক নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, রণপা নৃত্য তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বীরভূমের তাঁতিপাড়ার বিখ্যাত রায়বেঁশে নৃত্যশিল্পী ধরণী বাউরির কথা আগে উল্লেখ করেছি।

এককথায় বলা যায়, সামগ্রিকভাবে নিম্নকোটির হিন্দুসমাজে রায়বেঁশে নৃত্য সহ প্রাচীন রণনৃত্য প্রচলিত ছিল। নিম্নকোটির হিন্দুদের মধ্য থেকে বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠী বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হবার পরে নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তাদের কৌম জীবনের পেশা বজায় রেখেছে। তাদের মধ্যেও নানারকম কসরত এখনও প্রচলিত। যেমন - মাদারি সম্প্রদায়, ওরা লাঠি খেলে না কিন্তু বাঁশের খেলা দেখায় যার নাম, 'মাদারি কা খেল'। এরাও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল কিনা, তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে, একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সব কৌমকেই অন্য কৌমের আক্রমণ রুখতে হয়েছে। কিংবা অন্য কৌমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে হয়েছে। সাঁওতাল উপজাতির 'নাটুয়া নৃত্য'ও এককালে রণনৃত্য ছিল। তাতে লাঠি নয়, ব্যবহৃত হত ঢাল *(সাঁওতালী ভাষায় 'ফিরি')* ও তরবারি। এখন ব্যবহৃত হয় তরবারির বদলে লাঠি। মনে হয়, সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ঐ পরিবর্তন, তরবারি ব্যবহার কার্যত নিষিদ্ধ হয়েছিল। ঢাল পাওয়া গেলেও সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে তরবারি এখন দুর্লভ বস্তু।

## *রায়বাঁশিয়াদের আওয়াজ*

রায়বাঁশিয়াদের নৃত্যের শুরুতে একটি বিশেষ ধ্বনি বা আওয়াজ দেওয়া হয়, মুখে হাত দিয়ে আ-আ ধ্বনি করা হয়। আবার নৃত্যের মাঝখানে করে ই-য়া ধ্বনি। এই দুটি আওয়াজের উদ্দেশ্য হল, — প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করা, চমকিত করা। আবার স্বপক্ষকে ঐক্যবদ্ধ করা ও উদ্বুদ্ধ করাও এর পিছনে আছে। রায়বেঁশে নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমা আছে। এই ধ্বনি তারই অঙ্গীভূত। বলাবাহুল্য, এই ভঙ্গিমা বা তার সাথে জড়িত আওয়াজেরও একটা পরিকল্পনা আছে।

## *প্রাচীন মন্দিরে রায়বেঁশে নৃত্যের ভঙ্গিমা*

বীরভূমের ইলামবাজারের একটি প্রাচীন মন্দিরে *(ষোড়শ শতক)* রায়বেঁশে নৃত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিমার পোড়া মাটির মূর্তির অস্তিত্ব লক্ষ করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী

প্রয়াত নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)। বাংলা কাব্যে রায়বাঁশিয়া যোদ্ধার বিবরণ আগে উল্লেখ করেছি। মন্দির গাত্রে পোড়ামাটিতে রায়বেঁশে যোদ্ধার রণনৃত্যপর ছবি ঐ



ইলামবাজারের মন্দির গাত্রে রায়বেঁশে শিল্পী — বাংলার বীরযোদ্ধা

নৃত্যের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে। অনুসন্ধান করলে এজাতীয় মূর্তির অস্তিত্ব হয়তো আরও অনেক প্রাচীন মন্দিরে খুঁজে পাওয়া যাবে।

*গুরুসদয় দত্ত ও রায়বেঁশে নৃত্য*

সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত বাংলার বহুবিধ লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারকারীদের অন্যতম। রায়বেঁশে নৃত্যের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩০-৩১ সনে। তখন তিনি বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর। ঐ নৃত্যের সাথে পরিচিত হবার পরে তিনি তার পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। ঐ সময়ে বীরভূম জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র সিউড়িতে একটি বার্ষিক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হত। তার সাথে মেলাও হত। মেলার নাম ছিল বড়-বাগানের মেলা। শীতকালে ঐ মেলা হত। ১৯৩১ সনের ৩১ জানুয়ারি ঐ মেলায় গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নৃত্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। ১৩৩৮ সালের ২৩শে মাঘ সিউড়ি শহরেই 'ব্রতচারী অনুচেষ্টা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গুরুসদয় দত্ত প্রথমে 'বঙ্গীয়

পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি' (১৯৩১) গঠন করেন। তারপর ১৯৩৩ সালে গঠন করেন সর্বভারতীয় 'লোকনৃত্য এবং লোকগীতি সমিতি'। ১৯৩৪ সালে গঠন করেন 'বাংলা ব্রতচারী সমিতি।' ঐ সময়ে তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে রায়বেঁশে ও ব্রতচারী চর্চার কাজ শুরু হয়। শিক্ষা বিভাগের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ তাঁর ঐ উদ্যোগকে সমর্থন করেন। বীরভূম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় ঐ কর্মসূচি চালুও হয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল রায়বেঁশে বা সমপর্যায়ের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় লোকনৃত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রচলিত হোক্। ঐ সব লোকনৃত্যের চর্চা মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকরা করলে তাদের শারীরিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। রায়বেঁশে নৃত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি কয়েকটি গীতিকবিতাও রচনা করেন। তিনি বিকৃত নাম 'রাইবিশে' পালটে আসল নাম 'রায়বেঁশে'কে স্মরণ করিয়ে দেন। অবশ্য সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। ঝানু সিভিলিয়ায় দত্ত মশাই সেটা মাথায় রেখেছিলেন। এর পরবর্তী সময়েই তিনি বাংলা সরকারের রাজনৈতিক সচিবের পদ পেয়েছিলেন।

### *জাতীয়তাবাদীরা সন্দেহের চোখে দেখলেন*

বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রায়বেঁশে, ঢালি নৃত্য, কাঠি নৃত্য সহ ব্রতচারীর বিভিন্ন দিক প্রচারের জন্য যে উদ্যোগ গুরুসদয় দত্ত নিলেন তাকে সেদিনের দেশপ্রেমিক ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারীরা খুবই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী, উভয়েরই ঐক্যমত ছিল। এককথায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবাই এর বিপক্ষে গেলেন। তাঁদের ধারণা হল যে ব্রতচারী আন্দোলনের মারফত গুরুসদয় দত্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকদের চিন্তাভাবনা ও কর্মপন্থাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই, তাঁরা একথাও ভাবলেন যে ঐ আন্দোলন প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাজের সহায়ক। ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামীরা ঐ আন্দোলনের বিরোধিতায় নামলেন। বীরভূমের সমস্ত স্বাধীনতাসংগ্রামীরা এর বিরুদ্ধে ছিলেন, মায় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর পর্যন্ত।

সেদিনের বীরভূমের রাজনৈতিক জগতে ঐ আন্দোলনের কী জাতীয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬) থেকে উদ্বৃত এই অংশে তা প্রতীয়মান হবে।

'রত্নহাটায় ঢোল বাজছে, তার শব্দ এখান পর্যন্ত আসছে, শোনা যাচ্ছে। রায়বেঁশে নাচ হচ্ছে, ছেলেরা নাচছে। ওই এক বিড়ম্বনা। (*'বিড়ম্বনা' শব্দটা লক্ষণীয়।*) ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব আসবেন, উদ্বোধন করবেন। সাহেবের বাতিক পল্লীনৃত্য, সাহেব এসে অবধি জেলায় এই নাচ নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছেন। শিব নাচেন ব্রহ্মা নাচেন, আর নাচেন ইন্দ্র, সহকারী হাকিমরা নাচছেন, রায়বাহাদুররা নাচছেন। উকিলরা নাচছেন, মোক্তাররা নাচছেন, বড় ইস্কুলের ছেলেরা নাচছেন, মাস্টররা নাচছেন, এবার তাদের পালা। পাঠশালায় ছেলেদের নাচতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হবে, মুখবুজে নাচতে হবে, কিছু বললেই সর্বনাশ, রায়পুরের ব্যোমকেশ একটা কাগজ ছাপিয়ে ছিল ওই নাচকে ঠাট্টা করে — দেশে ছড়া প্রচলিত আছে, 'আমার বিয়েয় যেমন তেমন দাদার বিয়ের রায়বেঁশে, আর ঢকাঢক মদ খেসে।'

তার ফলে ব্যোমকেশের জেল হয়ে গিয়েছে।'

উল্লেখিত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং গুরুসদয় দত্ত। 'ব্যোমকেশ' হলেন ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯)। তিনি বীরভূমের একজন সুপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বোলপুর থানার রায়পুর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি। তারাশঙ্কর যে কাগজ ছাপাবার কথা 'সন্দীপন পাঠশালা'য় উল্লেখ করেছেন তার ইতিবৃত্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেই দেখা যাক —

"১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জেল হতে বেরিয়ে এসে বিস্ময়ে হতবাক, গুরুসদয় দত্ত মশায় বীরভূমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন এবং নতুন খেলা শুরু করেছেন। স্কুলে স্কুলে ঢোল, কাঁশি, আর মাস্টার ছেলেদের ঢোল-কাঁশি বাজিয়ে তা খুনু, তা খুনু, তা খুনু তা খিনিতা, তা খিনিতা — রব আর তার সাথে সাথে শিক্ষক ও ছাত্রদের নৃত্য, পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাবিদ, বয়স্ক পন্ডিত মশাই কারো রেহাই নেই। মালকোঁচা খিঁচে গুরুসদয় দত্তের দাপটে নাচতেই হবে, শুধু তাই নয়, নানাস্তরের সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে জমিদার মহাজন কারো নিস্কৃতি নেই। দত্ত নিজে নাচছেন। তার সাথে সাথে সকলে নাচতে বাধ্য হচ্ছেন। সর্বদেহ মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। জাতির উত্থানের শুভলগ্নে একি বিস্ময়কর প্রতিবন্ধকতা, আঘাত হানতেই হবে, চুর্ণ করতে হবে গুরুসদয় দত্তের চাতুর্যপূর্ণ, অভিযান।

তখনকার দিনের রথী মহারথীদের অনেকেই জেল হতে বেরিয়ে এসেছেন। গুডবাই রাজনীতি করে নিষ্ঠাসহকারে কেউ গীতা পাঠ শুরু করেছেন, আবার কেউবা কলকাতার পলিটিকাল দাদাদের নয়া প্যাঁচ অনুসরণ করে বড়গোছের নেতা হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এদিকে গুরুসদয় দত্ত জেলার সর্বনাশ শুরু করেছেন। সেদিকে কারো খেয়াল নেই। জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত খুরি, যাঁরা আমার অন্তর্দাহ উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের কেউই এ জগতে নেই বললেই হয়।

তারাশঙ্কর বাবু আমাদের আগেই জেল হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি যে আর ওপথ মাড়াবেন না তা জেলেই বোঝা গিয়েছিল। জেলখানাতে বসে বসে লিখতেন, বাইরে এসে বোলপুরের কাছারিপট্টিতে চাটুয্যেদের এক টিনের ভাড়া ঘরে প্রেস খুলে বসেছেন। আঘাত হানবার জন্য কবিতা রচনা করা হল। 'দিদির বিয়ে যেমন তেমন / দাদার বিয়েয় রাইবেঁশে — দেখে শুনে আর বাঁচিনা / নেশার গুমোর যায় বা ফেঁসে / গান্ধী রাজার হুকুম মত / জ্বলল আগুন দেশ জুড়ে। / বীরভূম আজ বাঁধা পড়েছে গুরুদত্তের প্রেমের ডোরে। সাবাস সাবাস ভাইরা সব, মদ চালাও আজ পেট ভরে। / বারণ এবার করবেনা কেউ / সবাই যে ভাই জেল ঘরে।

ছাপাতে তো হবে, ওৎপেতে থাকা হল। তারাশঙ্কর ও তস্য ভ্রাতা পার্বতী প্রেসে থাকেন। ফাঁক তো চাই। কাছারিপুকুরের পাড়ের এক তামাকের দোকানদারকে ভার দেওয়া হল খোঁজ করবার জন্যে। একদা তারাশঙ্করও পার্বতী বোলপুরে অনুপস্থিত। কম্পোজিটরকে রাত্রিবেলায় বলা হল, 'বিয়ের কবিতা', আজই বিয়ে, তাড়াতাড়ি ছেপে দিতেই হবে, সব ঠিকঠাক, ছাপান হল গভীর রাত্রি পর্যন্ত। তারপর পূর্ব পরিকল্পনামত ম্যাটার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং কম্পোজিটরকে বলা হয়েছিল — 'টাকাটা তুমিই নিয়ে নাও বাবুদিকে দিতে হবে না।' বাজিমাৎ। এই অঘটনের ব্যাপারে আমি কিন্তু সামনা সামনি ছিলাম না। বোলপুর যাই নাই, তারাশঙ্কর বাবুর প্রেসে যাই নাই। ছেলেরা সবই করেছিল, মুদ্রিত কবিতাগুলি প্রথমত গান্ধীবাদী হংসদার কাছে (শ্রী হংসেশ্বর রায়) রাখা হয়েছিল। তিনি গোপন স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। পরদিন রাত্রেই কবিতাগুলি হংসদার কাছ হতে নিয়ে সারা জেলায় বিলি করার ব্যবস্থা করা হয় এবং তা বিদ্যুৎবেগে সুসম্পন্ন হয়।

গুরুসদয় দত্ত এই বিস্ময়কর প্রচারণায় সন্ত্রস্ত হয়ে সারা জেলা তোলপাড় করেন। কবিতা কোথায় ছাপা হয়ে প্রচারিত হল তা খুঁজতে প্রেসে প্রেসে হানা দিয়ে তারাশঙ্করকে ধরে আমার বাড়িতে বারবার হানা দেওয়া হল। তল্লাসি চলে ... আমাকে প্যাঁচে ফেলতে না পারায় গুরুসদয় দত্ত মশায় তাঁর পেটোয়া গোয়েন্দাদের দিয়ে আমার নামে রাইপুর গ্রামের রথতলায় মিটিং করার মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে নিয়ে যান এবং বিচারের প্রহসনে আমার কারাবাস হয়। একটা তৃপ্তি এই যে এই কবিতার প্রচারণায় জেলার স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং গুরুসদয় বাবুর রাইবেঁশের প্যাঁচ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থেও এই ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন। তারাশঙ্কর প্রদত্ত বিবরণ থেকে একথাও জানা যায় যে ব্যোমকেশ লিখিত ঐ কবিতা ছাপাবার জন্য তার বোলপুরস্থিত প্রেসের জামানত জব্দ করা হয়, যার

পরিণতিতে ঐ প্রেসের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। ঐ ঘটনা প্রেস-মালিক তারাশঙ্করের জীবনের বিরাট গতিপরিবর্তনের সূচক হল। তিনি জেলা ছেড়ে কলিকাতা অভিমুখী হন। তাই, তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে ঐ ঘটনা ছিল একটা সন্ধিক্ষণ।

জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা সি.পি.আই (এম)-এর সাংসদ ডাঃ শরদীশ রায় (১৯১৭-৮৫) একবার এক ঘটনা প্রসঙ্গে সেদিনের রাজনৈতিক জগতের ঐ ধারনার কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলার অতিবামপন্থী অন্দোলনের ইতিহাসকার ডঃ অমিয় সামন্তও একই কথা লিখেছেন, 'In the early thirties a clever District Magistrate by and large successfully kept the landed gentry off the surging tide of the non-cooperation and the civildisobidience movements by engaging them often under duerss in the revival and propagation of a medieval folk dance of Bengal known as Bratacharies''

রায়বেঁশে নৃত্য তথা ব্রতচারী নিয়ে সেদিন বীরভূমের রাজনৈতিক জগতে যে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, তার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। সেদিনের রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যায়ামাগার করতেন। শরীরচর্চার আয়োজন ছিল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে একটা কৌশলও। গুরুসদয় দত্ত তা ভাঙার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। রায়বেঁশে নৃত্যের ক্ষেত্রে লাঠি থাকলেও তাঁর প্রবর্তিত ব্রতচারীতে লাঠির বদলে প্রচলিত হয়েছিল 'কাঠি'। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ লাঠি খেলা না শিখে 'কাঠিনাচ' শিখুক্, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। বলাবাহুল্য, তার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ ছিল। সে রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ নয়। তা বাদ দিয়ে দেশপ্রেম এবং 'বাঙালীর গৌরবগাথা'। যাক, এ প্রসঙ্গ আলাদা।

*কয়েকজন রায়বেঁশে শিল্পী*

প্রবন্ধের শুরুতে বীরভূমের কয়েকজন প্রখ্যাত রায়বেঁশে নৃত্যশিল্পীর কথা উল্লেখ করেছি। এদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে গুরুসদয় দত্তের সংযোগ ঘটে ছিল। তাঁর প্রভাবও পড়েছিল। ধরনী বাউড়ি ও বলহরি বাগদি তাঁদের অন্যতম। বলহরি বাগদির উত্তরপুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে গুরুসদয় দত্ত তাঁকে অন্যান্য জেলাতেও নিয়ে গিয়েছেন, গুরুসদয় দত্তের প্রভাবে বলহরি বাগদি তাঁর তিনপুত্রের নামকরণ করেন এভাবে গুরুচরণ, গুরুসদয় ও গুরুপ্রসাদ এঁরাও রায়বেঁশে নৃত্য জানেন। চর্চা করেন এঁদেরই দুইজন জীবিত শিল্পী যথা শক্তিপদ ভল্লা ও জন্মেজয় ভুঁইমালীর ছবি এ সাথে দেওয়া

হল। তাঁরা যে এককালে শক্তিমান ছিলেন, তা আজ বার্ধক্যের দিনেও চোখে পড়ে।



শক্তি ভল্লা (খাঁদু), নোয়াপাড়া, ময়ূরেশ্বর

লাভপুর থানার জলাম গ্রামের প্রহ্লাদ মাঝিও অতীতে রায়বেঁশের প্রখ্যাত শিল্পীদের একজন। বলহরি বাগদির 'গুরু' ছিলেন তিনি। বলরাম ভল্লার কথা উল্লেখ করেছি।

*আজকের কথা*

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার "রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ" প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে বাংলার লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সাথে লোকনৃত্যের অন্যতম নিদর্শন রায়বেঁশে নৃত্যের ধারাটির পুনরুজ্জীবনের দিকে নজর দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে লোকগীতি, লোকনাট্য

ও লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারারও চর্চা বেড়েছে। এককথায় রায়বেঁশে নৃত্য সহ অন্যান্য লোকনৃত্যের শিল্পীদের মনেও অভূতপূর্ব উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলিও এব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে 'রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র' নামক সংস্থাও এক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এ সম্পর্কিত ভাবনার অগ্রদূত হিসাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় প্রয়াত সুধী প্রধানের নাম। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন নবজাগৃতির ভগীরথ তিনি।

রায়বেঁশে নৃত্য নিঃসন্দেহে বাংলার লোকনৃত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তার শুষ্কপ্রায় ধারায় কীভাবে প্রাণসঞ্চার করা যেতে পারে, তা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনা চিন্তা ও বাস্তবানুগ পরিকল্পনাগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।

।। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ।।

(১) *The folk dances of Bengal* — Gurusaday Dutta

(২) *গুরুসদয়* — অমিতাভ চৌধুরী

(৩) *বাংলার বীরসৈন্য রায়বেঁশে* — গুরুসদয় দত্ত

(৪) *সঞ্চয়িতা* — রবীন্দ্রনাথ

(৫) *আমার সাহিত্য জীবন* — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬) *সন্দীপন পাঠশালা* — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) *কবিকঙ্কণ চন্ডী* — ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য একাডেমি সংস্করণ

(৮) *ধর্মমঙ্গল* — একাডেমি সংস্করণ ঘনরাম চক্রবর্তী

(৯) *অন্নদামঙ্গল* — ভারতচন্দ্র রায়

(১০) *রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী*

(১১) *বঙ্গীয় শব্দকোষ* — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২) *Dist gazateer* — Birbhum, 1951. Edited by Asoke Mitra

(১৩) *যে কবিতা লিখে জেলে যেতে হয়েছিল* — ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় — *ধূসরমাটি, শারদ সংকলন* ১৩৯০

(১৪) *প্রসঙ্গ ঃ রায়বেঁশে ও তার পুন(র্জ্জীবন প্রচেষ্টা* — অরুণ চৌধুরী *গণনাট্য, শারদ সংখ্যা*, ১৯৯৪

(১৫) A.Halim — *Music and Dance of East Pakistan, a profile,* — Ed. by S. S. Hussain

(১৬) *চলন্তিকা* — রাজশেখর বসু

# লোকনাট্য বোলান

## মোহিত রায়

লোকনাট্য বোলান রূপসী বাংলার চিরায়ত চলমান ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ এবং লোকমানসের ফসল — যা আজও সমাজের জীবনকে পূর্ণতা দেয়। জীবনকে পরিপূর্ণতা দেবার প্রয়োজনেই বোলান লোকনাট্যের অনুষ্ঠান গ্রামীণ জনজীবনে হয়ে থাকে। নানা বাদ্যবাদনে মুখরিত নৃত্যগীতে উত্তাল বোলান লোকনাট্যে অপরকে আনন্দ দেওয়া বড় কথা নয়, নিজেদের আনন্দের প্রশ্নই সবার আগে আসে। সোজা কথায় বলা যায় — বোলান লোকনাট্যের পালা অনুষ্ঠান পেশাদারি নয়, মনের স্বত উৎসারিত প্রকাশ। তাই এই অনুষ্ঠানের মূলে ছিল না বাইরে থেকে ধার করা অনুকরণের স্পৃহা। এখানেই বোলান লোকনাট্যের প্রাণশক্তি। স্বতঃস্ফূর্ততায় স্বাভাবিকতায় উদ্ভূত প্রসারিত হয়েছিল বোলান লোকনাট্য। জনসামাজিক জীবনে বোলান পালার বিকাশ, তাই এই লোকনাট্য বিশেষ চেষ্টার ফসল নয়, জীবনবিমুখ অনুষ্ঠান নয়, জীবনধর্মী জীবনমুখী লোকায়ত অনুষ্ঠান। ব্যক্তি চৈতন্যের সঙ্গে সমাজচৈতন্যের সংমিশ্রণ বোলান লোকনাট্য। ব্যক্তি ব্যষ্টি সমষ্টির সৃষ্টি হলেও বোলান কালপ্রবাহে জনসমাজের লোকসাংস্কৃতিক সামগ্রী। লোকজীবন ও লোকবৃত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ-সম্পর্কযুক্ত লোকনাট্য বোলান।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী বোলান বিশেষ্যপদ (বোলা + অন)। তিনি বোলান শব্দের বহুবিধ অর্থ তুলে ধরেছেন। বোলান অর্থে কথা বলা, প্রতিবচন, উত্তর। যেমন — 'ঘরে গেল্যা না দিয়া বোলান' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) বা 'ডাকিলে বোলান ন দেও' (বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল)। বোলান অর্থে সম্ভাষণ বোঝায়। যেমন — 'হাসিয়া বোলান দিব সুন মোর বোল' (গোরক্ষবিজয়), 'বোলান দিউক' (মীনচেতন, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২) বা 'আজি কেন না করে বোলান' (মনসামঙ্গল)। আবার, 'বুলা' শব্দের অর্থ — ভ্রমণ, পর্যটন বা ভ্রমণ করানো,

দ্বারে দ্বারে ঘুরানো, বিচরণ করা। নানা বাংলা অভিধানে 'বোল' শব্দের অজস্র অর্থ আছে — বাক্য, বুলি, কথা, কথিত বিষয়, সান্ত্বনা বাক্য, অভিযোগ বাক্য, নিন্দার কথা, যুক্তিসঙ্গত বাক্য, ভাষা, বাঁশির গৎ, শিশুর অস্ফুট বাক্য-ভাষা, সম্মতিসূচক বাক্য, আদেশ, উপদেশবাক্য, রব, ডাক, স্বর, সুর, বাক্যনিঃসরণ, বাদ্যের গৎ, গুঞ্জন, ভূষণধ্বনি, ধ্বনি, কঠোর বাক্য, মন্তব্য বাক্য, কথায় ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা, কাউকে বলা, অভিমত প্রকাশ করা, জিজ্ঞাসা করা, উচ্চারণ করা, উত্তর করা, অভিহিত করা, প্রচার করা, প্রার্থনা করা, বর্ণনা করা, গর্জনপূর্বক উচ্চারণ, বাদ্যধ্বনিতে প্রকাশ করা ও চেঁচাইয়া বলা প্রভৃতি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২-১৯৩৯) সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে 'বোলান' শব্দের অর্থ ঃ বোল, বাক্য, উত্তর, সাড়া, ডাকানো, বলতে প্রবৃত্তি দেওয়া, বলানো, কহানো ('যে বোলায়েন তাহা লিখি' — চৈতন্যভাগবত)। তিনিও 'বুলা' শব্দের অর্থ করেছেন ঃ ভ্রমণ, সঞ্চরণ ('যথা তথা বুলা চলা, মণ্ডল গ্রামে বাটী' — কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। 'বালা' অর্থে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে ঃ 'শিবের গাজন উৎসবে যারা (প্রধানতঃ নমঃশূদ্রগণ) বেতের ছড়ি লইয়া নৃত্য করে ও গান গায়।' 'সন সন্ন্যাসী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস, শিব শিব বলিয়া ডাকে ঘন ঘনে' — শিবের গাজন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)।

সুকুমার সেন (১৯০০-৯২) লিখিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' অনুযায়ী ঃ ছড়া কেটে ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান ধর্ম ও শিবের গাজনে গাওয়া হত। এই ছড়া আর্যা বা তর্জা নামে পরিচিত। বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলত, তাকে বলা হয় দাঁড়া কবি। ধর্মঠাকুর বা শিবের গাজনে উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে যে তর্জা বলত, তার বিশিষ্ট নাম বোলান।

পঞ্চানন মণ্ডল বোলান সম্পর্কে লিখেছেন (শুভশ্রী, শারদ সংখ্যা, ১৩৮০, বহরমপুর) ঃ "বোলান হচ্ছে যোগশিক্ষা ঘটিত প্রশ্নোত্তর পালা। 'বোল' শব্দ থেকে বোলান। প্রাকৃতে 'বোল্ল' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে একই অর্থে। দেবোপাসনায় বা যজ্ঞকার্যে এই রকম ছড়া কাটাকাটি খুব প্রাচীন প্রথা। অশ্বমেধযজ্ঞে অধর্বর্যু আর ঋত্বিকের মধ্যে এই রকম ব্রহ্মোদ্য হত। এর ভাব যাই হোক, ভাষায় শ্লীলতার গণ্ডি সর্বত্র মানা হত না। পরবর্তীকালে 'বাকোবাক্যে'র নিদর্শন রয়েছে মহাভারতের বনপর্বে বক - যুধিষ্ঠির সংবাদে। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতেও এর নিদর্শন আছে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মপূজার বাইরে, বোলানের নিদর্শন পাওয়া যাবে নাথপন্থীদের কড়চায় নিরঞ্জন নাথ পন্থী শৈবযোগীদের কড়চায়। বাঙ্গালা বোলান ও প্রহেলিকার বা পরোক্ষ উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। . . . . ."

গাঙ্গেয় উপত্যকা-অঞ্চল রাঢ় ও ঝাড়খণ্ড, এখানে আজও আদিম অস্ট্রিক সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত। এই ধারায় ধর্মঠাকুর — প্রাক্-বৈদিক, প্রাক্ আর্য ও প্রাক্-বুদ্ধ। ধর্মঠাকুরের বোলান নানা বিবর্তনে আজও প্রচলিত। ড. অমলেন্দু মিত্র (১৯৩০-৯১) তাঁর 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে ধর্মঠাকুরের বীরভূম অঞ্চলে পূজায় অনুষ্ঠানে বোলান-এর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য, রাঢ়ে ধর্মঠাকুর এখন শিবরূপে পূজিত কিন্তু গঙ্গার পূর্বদিকে শ্রীচৈতন্য প্রভাবে ধর্মঠাকুর নারায়ণরূপে পূজিত। তাই, বোলান অনুষ্ঠানে ধর্মঠাকুরকে কোথাও বেলপাতায় আবার কোথাও তুলসীপাতায় পূজা করা হয়। ধর্মঠাকুরের ব্রাহ্মণীকৃত রূপ শিব ও নারায়ণ করা হয়েছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৪) মনে করেন ঃ 'গাজনোৎসব দুর্গোৎসবের মত পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। . . . . গাজনোৎসবে বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনের স্তর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত।'

গাজন সংস্কৃত গর্জন শব্দের নাকি বিবর্তিত রূপ। গাজন অর্থে ধর্মরাজের উৎসব বা চড়কপর্বে শিবের উৎসব। চড়ক সংস্কৃত চক্র শব্দের স্বরাগমে চকর, বর্ণবিপর্যয়ে চরক বা চড়ক — চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে অনুষ্ঠেয় শিবের ব্রত বা পার্বণ বিশেষ।

নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) সংকলিত 'বিশ্বকোষ' অনুযায়ী ঃ পৌরাণিক কাহিনীতে আছে শৈব প্রধান বাণ রাজা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতিকামনায় বন্ধুবর্গের সঙ্গে শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত হয়ে স্বীয় গাত্ররুধির দিয়ে শিবকে তুষ্ট করেন, তদনুসারে শিবভক্তেরা এই দিনে শিবপ্রীতির জন্য উৎসব করে থাকে। এই উৎসবের অঙ্গ শিবপূজা, শিবের প্রতীক সিন্দুরলেপিত কাঠের পাটপূজা, শিবভক্তিসূচক গান, কৃচ্ছ্র সাধন — পবিত্র ও উপবাসী থেকে সন্ন্যাসব্রত, বড়শীবিদ্ধ, বাণফোঁড়া, বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, আগুনঝাঁপ আর চড়কে ঘোরা যেন আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন। বাংলার প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (১৮৫৪-৫৯) গাজন-চড়কের এই আত্মনির্যাতন বন্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং পরে ১৮৬৩ সালে আইনবলে নিষিদ্ধ হয় কাগজে কলমে।

বোলান লোকনাট্য প্রাচীনত্বে খ্যাত। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)-কালে নবদ্বীপে কি বোলান গান প্রচলিত ছিল? বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' এ আছে ঃ

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় - গায় শিবের কথন।

আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।।

— অর্থাৎ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যগৃহে একজন 'শিবের গায়ন' (শিবকাহিনীমূলক গানের গায়ক) এসে নাচগান করেছিল। সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও এই নাচগান বোলান গান বলে অনুমিত হয়।

আবার, পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যেও বোলান গানের অনুরূপ ইঙ্গিত আছে ঃ 'শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে / হাততালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে।।' অর্থাৎ শিববেশধারী একজন গীত সহযোগে শিবনৃত্য করছেন। এই শিবনৃত্য গীতও বোলান বলেই অনুমিত হয়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে ঃ 'বোলান বুলিতে গেল ময়না বসতি'।

বোলান উল্লেখ না করেও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৮৭-১৯৬৪) তাঁর 'শান্তিপুর পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে 'ধর্ম ও সমাজ' অধ্যায়ে লিখেছেন যে শান্তিপুরে চড়ক বা গাজনে সপ্তাহব্যাপী শিবের পাটার গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে ছড়াগীত হত, তার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত, কেউ উত্তর দিতে না পারলে যিনি ছড়া বলতেন তিনিই উত্তর দিতেন। এই অনুষ্ঠানও বোলান বলেই মনে হয়।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)-র আদিনিবাস নদিয়া জেলার করিমপুর থানার বাগচী-যমশেরপুর গ্রামে। তিনি বোলান সম্পর্কে লিখেছেন ('পল্লীকথা', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২ সংখ্যা, ১৩২২ সন) ঃ "চৈত্র সংক্রান্তির সময় . . . . একপ্রকার উৎসব . . . . দেখা যায়। তাহাকে বুলান কহে। চণ্ডাল জাতীয় জনগণ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। নূপুর ইত্যাদি ভূষণে সজ্জিত হইয়া তাহারা নৃত্য সহকারে কৃষ্ণবিষয়ক ছড়াগীতি গৃহে গৃহে গাহিয়া বেড়ায়। ঢাকের বাজনার সহিত তখন 'শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন গো মা নন্দরাণী, কানুরে লইয়া যাব গোঠে' ইত্যাদি গীতে তিন দিন ধরিয়া গৃহস্থগৃহ মুখরিত হয়।"

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ঃ 'চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষ্যে যাহারা সন্ন্যাসী বা ভক্তা হইয়া থাকে, তাহারা গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক সময় তর্জার মত ছড়া বলিত এবং নানা পৌরাণিক বিষয় লইয়া গান রচনা করিয়া গাহিত, তাহাকেই সাধারণতঃ বোলান গান বলে' (বাংলার লোকসাহিত্য, ৩ খণ্ড)।

শিবকেন্দ্রিক গাজন চড়ক উপলক্ষ্যে বোলান নাচগান হলেও বোলান গানে কৃষ্ণলীলাসহ রামায়ণ মহাভারত ও নানা পৌরাণিক কাহিনীও উপজীব্য বিষয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য

সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন ঃ 'বোলান গানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতীতও রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের বিবিধ প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী দীর্ঘ পালার আকারে লৌকিক সুরে গীত হয় — পরিবেশিত হয়।

চৈত্র মাস শিবের বিবাহমাস। চৈত্রমাস শিবের জন্মমাসও। বোলান পালায় আছে ঃ 'চৈত্রমাস মধু শিবের জন্মমাস / সাধুসন্ন্যাসী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস।'

গাজন চড়ক উৎসব লোকায়ত জনজীবনে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উৎসবেরই অঙ্গ বোলান বা ধর্মীয় কৃত্যের সাংস্কৃতিক দীপ্তি বোলান। বোলান গ্রামের তথাকথিত শিক্ষারহিত মানুষের সমবেত সাংস্কৃতিক প্রয়াস। এই সব মানুষের অনেকেরই হয়ত লিখন সামর্থ্য নেই, পঠন সামর্থ্য নেই, আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর অর্থাৎ সাক্ষর নয়, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় জীবনের অর্জিত শিক্ষায় তারা প্রত্যেকেই স্বশিক্ষিত স্বগঠিত স্বজীবী মানুষ। তাই তারা তাদের জানার জগতের পরিমণ্ডল থেকে অর্থাৎ নিজ গ্রামীণ পরিমণ্ডল থেকেই পালার বিষয়বস্তু গ্রহণ করে থাকে। ভরা চৈত্রের বসন্ত দিনের সহজ সরল বিনোদনের উদ্দীপনামণ্ডিত লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বোলান। বছরের অন্য সময় বোলান হয় না। তাই বোলান শৈব আবহের লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান-কেন্দ্রিক, ধর্মীয় উপলক্ষের সাময়িক অনুষ্ঠান।

বোলানের পোষকও গ্রামের জনগণ। গাজন চড়কের সন্ন্যাসী বালাদের যেমন চাল ডাল আনাজপাতি ফল ও নগদ টাকাপয়সা গ্রামের নরনারীরা দিয়ে থাকে, তেমন বোলান নাচগানের দলকেও গ্রামেরই মানুষ অনুরূপ চাল ডাল আনাজপাতি ফল ও নগদ টাকা পয়সাসহ জলখাবার (মুড়ি চিড়ে গুড় বাতাসা কদমা চিনি ছাঁচ আর ঘরে পাতা দই) দিয়ে থাকে। কোনো দাবি করতে হয় না, চাইতে হয় না, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই শ্রোতারা এসব বোলানদলকে দিয়ে থাকে। এই ভাবেই ধারাবাহিকভাবে চলেছে গ্রামীণ সংস্কৃতির গ্রামীণ মানুষের পোষকতা, সমর্থন, সহায়তা, আনুকূল্য।

অধুনা চাষবাসের পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একদা কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলায় সাধারণত রুক্ষ শুষ্ক চৈত্রমাসে চাষাবাদের কাজ কম থাকত। বোরো ধান ও রবি ফসল ফাল্গুন মাসের মধ্যেই চাষের জমি থেকে তোলা হয়ে যায়। কৃষিনির্ভর গ্রামজনজীবনে তখন অবসর। চৈত্রসংক্রান্তির সময় গাজনচড়ক উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান এবং অংশত অন্যান্য কৃষিপ্রধান এলাকা প্রায় সর্বত্র ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হয়। গাজনচড়ক উপলক্ষেই গ্রামের লোকায়ত মানুষ তখন বোলান নাচগান লোক নাট্যে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকে। গ্রামবাংলার প্রধান উৎসব গাজন চড়ক। গাজনের অর্থ অনেকের মতে গ্রামের জনসাধারণ (গা + জন), আবার গাজনচড়ক

বৌদ্ধসংস্কৃতির বিবর্তিতরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। বোলান নাকি বালার গান। গাজনে সন্ন্যাসীদের বলা হয় বালা। গাজনের সন্ন্যাসী-বালাদের পরনে থাকে লাল ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অধিকাংশই নিরক্ষর, তবু তাদের বোলান গান মুখস্থ থাকে।

বুলা (ভ্রমণ অর্থে) ধাতু থেকে বোলান হবার কথাও বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে বোলান পালার দল অনেক গ্রাম পরিক্রমা করে বা নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করে। আবার, বোল (অর্থাৎ ডাক বা সাড়া) শব্দ থেকেও বোলান হতে পারে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নদিয়ার গ্রামে বোলানকে স্বরসঙ্গতিতে অনেকে বলে বুলান।

গাজন-চড়ক উৎসবে দলবদ্ধ সন্ন্যাসী বা বালা নদীতে বা পুকুরে স্নান করে পূজা করেন তেলসিন্দুরচর্চিত শিবপ্রতীক পাটাকে (ক্ষুদ্রাকৃতি নৌকার মতো)। পূজাস্থলে যাওয়ার পথে হয় পথবন্ধন অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসী বালারা পথবন্ধন মুক্ত করে পূজাস্থলে যান। পথবন্ধনে সন্ন্যাসী-বালাদের নানা প্রশ্ন করা হয় গানে, উত্তর দিতে হয় গানে। এই প্রশ্ন-উত্তর-প্রত্যুত্তর হল বোলান। উনিশ শতকের সূচনায় মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২-১৮২০) রচিত 'করুণানিধানবিলাস' কাব্যে বোলানের কথাসহ পথবন্ধনের উল্লেখ আছে।

ব্রতচারী আন্দোলনের জনক গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর 'The Folk Dances of Bengal' গ্রন্থে বোলানকে 'Didactic Motive' লোকনৃত্যগীত বলে উল্লেখ করেছেন : 'The word Bolan means recitation and the dance derives its name from the fact that one of the dancers chants or recites the story or ballad . . . . The dancers stand in two lines joined at right angles forming an L .......... The songs relate to Krishna Lila, Ramayana and Mahabharata stories. The compositions are often crude being the work of rustic dancers themselves, who generally belong to the poorest working classes.'

বাংলায় বোলান সম্পর্কিত একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ শ্রীহর্ষ মল্লিক রচিত, 'বোলান কথা' বোলান বিষয়ে প্রচুর তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

বোলান-অধ্যুষিত নদিয়া জেলায় ভৌগোলিকভাবে উত্তর ও পূর্ব দুই অঞ্চলে দুই পৃথক ধারার বোলান লোকনাট্য প্রচলিত। নদিয়ার উত্তরাংশে নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, তেহট্ট ও করিমপুর থানার বোলান লোকনাট্যের সঙ্গে নদীয়ার পূর্বাংশে কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি থানার বোলান লোকনাট্যের পার্থক্য আছে। আবার উত্তরাংশের বোলানের সঙ্গে

মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার বোলানের সাদৃশ্য আছে। উত্তরাংশের বোলান পরিবর্তনশীল, তুলনায় পূর্বাংশের বোলান অপরিবর্তনীয়, তবে বিবর্তিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে নদিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র অভিন্ন প্রণালীতে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয় না। উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের কৃষিকার্যের মধ্যে পার্থক্য আছে।

বোলান ভাবমূলক নয়, আখ্যান বা পালামূলক। গাজন বা চড়কের উল্লেখ্য অংশ গাজুনে সন্ন্যাসীদের আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন ঃ বাণফোঁড়া, ঝাঁপান, ভর, পাটভাঙা, মশান, শবনৃত্য, কাঁটাঝাঁপ ও জিবফোঁড়া প্রভৃতি। গাজুনে সন্ন্যাসীরা (ভক্তা বা বালা) চৈত্রমাসের শুরু থেকে সংক্রান্তির পূর্বদিন পর্যন্ত লালশালুতে ঢাকা সিন্দুরলেপিত বানপাট (নিম বা বেলকাঠের দুই থেকে তিন হাত দৈর্ঘ্যের নৌকাকৃতি প্রতীকী লোকায়ত শিব, উপরে ত্রিশূল প্রোথিত) মাথায় করে ঢাক-ঢোল-কাঁসি-সানাই বাদ্যযন্ত্রের আবহসঙ্গীতে বোলান গান গাইতে গাইতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য ভেরিয়র এল উইন বর্ণিত লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতীকী পদ্ধতির (Symbolic Method) আভাস মেলে বোলানেও। গ্রামাঞ্চলে ভরা চৈত্রমাসে তুলনামূলকভাবে বৎসরের অন্য সময়ের থেকে চাষবাদের কাজ বিশেষ থাকে না। বোলান লোকনাট্যে অংশগ্রহণকারীরা সকলেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা কেউই পরশ্রমভোগী নয়।

বোলান পালায় কাহিনী পৌরাণিক, লোককাহিনী, মহাকাব্যাশ্রয়ী বা সামাজিক (সমসাময়িক ঘটনানির্ভরও) হলেও একটি মূল বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয় বলে আমার মনে হয়েছে। বোলান পালাগানে কোনও অলৌকিক বিষয় থাকে না, বস্তুত লোকায়ত জীবনেই অলৌকিকতা নেই। অধিকাংশ বোলান গানে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণীগত চেতনা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষণীয়। পৌরাণিক কাহিনীতে ক্ষমতাধরেরা একজনের পক্ষ নিয়েছে, লোককথায় রাক্ষস ভয় দেখিয়ে রাজকন্যাকে বন্দী করে ঘাড় মটকিয়ে মুণ্ডু খেয়েছে, জমিদার জোর করে প্রজাদের নির্যাতন করছে — তাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছে, মহাজন প্রতারণা করে সুদ নিয়ে শোষণ করে মানুষকে দেউলিয়া করেছে আর জোতদার জমি দখল করে চাষীকে সর্বস্বান্ত করেছে। মানুষ জোট বাঁধছে — কোথাও লড়াইতে সফল হচ্ছে, কোথাও বা বিফল। মানুষের ভয়ের শিকল ভাঙার কাজের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে বোলান পালায়। লোকায়ত জীবনচর্যায় মূল কথা ঃ মানুষ সত্য, মানুষ মুখ্য। বোলান গানে তার ইঙ্গিত শোনা যায়। তবে বোলান পালায় কোনো জটিল জীবনজিজ্ঞাসা থাকে না, পালাও হয় সহজবোধ্য।

নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ - হাঁসখালি থানায় বোলান বালাকি নামেও পরিচিত। বোলান-বালাকি লোকনাট্যে রীতিগত অভিন্নতা বর্তমান। শব্দগতভাবে সাদৃশ্য তো আছেই।

আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' তৃতীয় খণ্ডে বালার্খি গানের উল্লেখ করেছেন, বালাকির কথা বলেন নি। নদিয়ায় বালাকি প্রচলিত থাকলেও বালার্খি গানের প্রচলন নেই। বালাকি শব্দটি অর্থবহ। নদিয়ার বোলান গান গায় বালকেরাও। বোলান গানের বন্দনাংশেও শোনা যায় ঃ

এসো মা গো সরস্বতী বসে মা গো রথে,
বুলান বোলিতে হবে বালকের সাথে।
যে বুলান বলিবা মা গো তাই বলিব আমি —
দশের মাঝে ভাঙ্গলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি।

— গায়কের মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান বিন্যস্ত হল। এখানে একপক্ষ বোলান গায়ক বালক। বালকের গান থেকে বালাকি শব্দটি প্রচলিত হতে পারে।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার চূর্ণি নদী তীরবর্তী কৃষ্ণপুর-শিবনিবাস-চন্দননগর গ্রাম এলাকার বোলান-বালাকি পালাগান রচয়িতারা প্রায় সকলেই চূর্ণি নদির খেয়াঘাটের মাঝি পাটুনি সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার কৃষ্ণপুর গ্রামের ঘোষ উপাধিধারী গোপ সম্প্রদায়ভুক্তেরাই বোলান পালায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নদীর কাছাকাছি গ্রাম এলাকার মানুষ বোলান লোকনাট্যের সঙ্গে জড়িত। পদ্মা থেকে উৎপন্ন কুমার নদ, কুমার নদ থেকে ভৈরব নদ, ভৈরব নদ থেকে মাথাভাঙা নদী, এই নদী কৃষ্ণগঞ্জে দুইভাগে বিভক্ত, একাংশের নাম ইছামতী, অপর অংশ চূর্ণি। এই সব নদীতীরবর্তী এলাকায় বোলান গান প্রচলিত। আবার, তেহট্ট থানায় জলঙ্গী নদীতীরবর্তী এলাকায় ও কালীগঞ্জ-নাকাশিপাড়া থানায় ভাগীরথী নদী তীরবর্তী এলাকায় বা অদূরবর্তী এলাকায়, বোলান গান সমধিক প্রচলিত।

নদিয়ার ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি অধ্যুষিত শাক্তদেবীর প্রাধান্যমণ্ডিত গঙ্গাতীরবর্তী তথাকথিত রক্ষণশীল এলাকারূপে পরিচিত কালীগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চলে বোলান লোকনাট্যে এক পৌরাণিক পালায় আমি দেখেছি — যে কৃষ্ণ সেজে অনবদ্য বোলান গান করে — সে ধর্মে মুসলমান। এই সব এলাকার বোলান লোকনাট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসামান্য নির্দশন। এক একটি গ্রামের বোলান দলে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই — হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তরুণেরাই অংশগ্রহণ করে — ভালো গানের গলা থাকলে ও ভালো গান গাইতে পারলেই হল। সম্প্রীতির এই ভাবনাপ্রয়াস আরোপিত বা লোকদেখানো নয়, একান্তই সহজ স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ও আন্তরিক। তবে এই সব এলাকায় অনেক গ্রামে বোলানের দল থাকলেও দলভুক্তেরা সকলেই গাজুনে সন্ন্যাসী

হয় না। তাই বোলান কোনও কোনও গ্রামে হয়ে উঠেছে লোকায়ত ধর্ম কাঠামোতে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। উল্লেখ্য, নদিয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার গঙ্গা (ভাগীরথী) ও অজয় নদীর সঙ্গমস্থলে বল্লভপাড়া প্রাচীন জনপদ, এখানে চড়ক অনুষ্ঠানে আজও সন্ন্যাসীদের স্বেচ্ছাপীড়নের দর্শনীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে — নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বোলান লোকনাট্য গীতিকাহিনীর সূচনায় থাকে ভগবতী, সরস্বতী ও গণেশের বন্দনাংশ, তাতে রচয়িতার ও অংশগ্রহণকারীদের নামধামাদির পরিচয় ভণিতায় পাওয়া যায়। তারপর শুরু হয় পালা। দশ থেকে পনের জন অংশগ্রহণ করে। সকলেই পুরুষ। সুন্দরদর্শন তরুণ নারীচরিত্রে নারীসজ্জায় সজ্জিত হয়েও গান করে থাকে। অধুনা কালীগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে মহিলারাও বোলান গানের দলগঠন করেছেন, দলে কোনো পুরুষ নেই। বোলান কোনো গ্রামেই পুরুষ নারীর মিশ্র অনুষ্ঠান নয়।

বোলান লোক্নাট্যে অংশগ্রহণকারীরা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বা আগে পিছে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান করে। মূল গায়েন প্রথমে পংক্তি বলেন সুরসহযোগে, পরে সহগায়েনেরা একই সুরে পুনরাবৃত্তি করেন সম্মিলিতভাবে, শেষ পংক্তির পুনরাবৃত্তি করে ধুয়ো ধরেন সহগায়েনেরা। বোলান লোকনাট্যে একক অভিনয়ে চরিত্রের রূপায়ণ হয় না। একটি পালায় অনেকগুলি চরিত্র থাকে, সহগায়কেরা সকলেই মূল গায়কের গানের কথা সমবেতভাবে বলে থাকে। বোলান উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক। সাধারণ নাটকে যেমন অভিনেতা তার চরিত্রানুযায়ী কথা বলে, অন্য চরিত্র তার উত্তর দেয়, বোলান লোকনাট্যে সে সুযোগ নেই। সাধারণ নাটকের সঙ্গে বোলান লোকনাট্যের পার্থক্য এই খানেই।

বোলান লোকনাট্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ঃ বড়ো ও ছোটো ঢোল, কাঠের ও পোড়ামাটির অঙ্গের ঢাক, চেরাবাঁশের তালযন্ত্র ঝাঁঝরি, গঙ্গ, সারিন্দা, ঝুমঝুমি, করতাল (নানা আকারের), মাদল, সানাই, আড়বাঁশি, হুঁকোযন্ত্র (ঝমঝম আওয়াজ করে), মোষের সিং-এর শিঙা, পাতার বাঁশি ও পোড়ামাটির বড়ো হাঁড়ি প্রভৃতি। অধুনা হারমোনিয়াম ডুগি তবলা সংযোজিত হয়েছে। সাজপোশাক সাধারণ, তবে অধুনা সাজপোশাকে তথাকথিত 'মেকআপ' সংযোজিত হয়েছে।

নদিয়া-মুর্শিদাবাদে প্রচলিত রংপাঁচালি লোকনাট্যের সঙ্গে বোলানের সাদৃশ্য আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাত্মও হয়ে গেছে। রং পাঁচালিতে অভিনয় মুখ্য। রং পাঁচালিকে অনেকে পঞ্চরস বলে থাকে। গঙ্গার পশ্চিমাংশে রাঢ় অঞ্চলে যেমন রং পাঁচালির, গঙ্গার পূর্বাংশে বাগড়ি অঞ্চলে তেমনি পঞ্চরসের প্রাধান্য দেখা যায়। রং পাঁচালি ও পঞ্চরস অশ্রাব্য অশিষ্টও থাকে। মূকাভিনয়ও এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

বোলান লোকনাট্যের প্রকারভেদ ঃ ছলবোলান (ঢোল-কাঁসি বাদ্যবাদনসহ), ডাক বোলান (ঢোলক - মন্দিরা বাদ্যবাদন সহ), পোড়ো বোলান (মড়ার মাথার খুলি নিয়ে বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সদ্যমৃত্যের নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য সহযোগে), সাঁওতালি অনুসূচিত উপজাতিদের বোলান (মাদল-বাঁশি বাদ্যবাদনসহ), পালাবন্দী বোলান ও রণপা বোলান (রাঢ় অঞ্চলে সমধিক প্রচলিত)। ছল বোলান রংপাঁচালি নামে অধুনা প্রচলিত। পোড়ো বোলান শ্মশান বোলান নামে সমধিক প্রচলিত। এছাড়া আছে দাঁড়া বোলান। দাঁড়া বোলানই হল পালাবন্দী নৃত্যগীত। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য, পোড়ো বোলানে মৃতের পুনরায় জীবনসঞ্চারে যাদুবিশ্বাস ক্রিয়াশীল। পোড়ো বোলানে ব্যক্তির মৃত্যুর শোক সমুদয় সমাজের শোকে পরিণত করবার চেষ্টা করা হয়। একদা নদিয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার গঙ্গাতীরবর্তী জুড়ানপুর শ্মশানসংলগ্ন গ্রামে পোড়ো বোলান প্রচলিত ছিল, এখন আর হয় না। এই এলাকায় শাক্তাচার-তন্ত্রাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত আজও।

বোলান লোকনাট্য সমষ্টিকেন্দ্রিক, একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক লোকায়ত অনুষ্ঠান নয়। বোলান গোষ্ঠী অনুষ্ঠান, গোষ্ঠীজীবনেই বোলানের উদ্ভব ও বিকাশ। কয়েকজনের দলগত এই অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় — নিয়মের নিগড়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালিত-পরিচালিত হয়। লোকশিল্পীরা হৃদয় উজাড় করে উদাত্তকণ্ঠে বোলান গীত পরিবেশন করে থাকে। বোলানের ভাব-ভাষা-ভঙ্গির সনাতনী রূপ থেকে কালের কুটিলা গতিতে বর্তমান প্রজন্মের বোলান লোকশিল্পীরা ক্রমেই নিঃসৃত হচ্ছে। ভাষার প্রকৃতি ও রূপের পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। সিনেমা বিশেষত হিন্দি সিনেমা ও সাম্প্রতিক দূরদর্শনের অগভীর হিন্দি কার্যক্রমের প্রভাবে প্রভাবিত ও অবক্ষয়িত হচ্ছে বোলান লোকনাট্য। অতীতে গ্রামবাংলায় কৃষিকার্য ছিল মূলত প্রকৃতিনির্ভর, কৃষিকার্যে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল না। অধুনা কৃষি প্রকৃতিনির্ভর নয়, কৃষিতে কৃষিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানভিত্তিক নানা যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষককে যন্ত্রমুখী যন্ত্রনির্ভর হতে হচ্ছে। বাড়ছে জীবনযন্ত্রণাও। বোলান পালা আজ আর শুধুমাত্র ঢোলকাঁসিতে হয় না, রকমারি যন্ত্রের ব্যবহার বোলান পালায় দেখা যাচ্ছে। সনাতনী ঐতিহ্যমণ্ডিত বোলান পালা ক্রমেই অপসৃত হচ্ছে গ্রামজীবন থেকে। অবশ্য, অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তথা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র নানা লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ও কর্মশালাদির মাধ্যমে বোলান লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা করছেন।

প্রকৃত লোকশিল্পী বাউলের সঙ্গে যেমন তথাকথিত শখের বাউল বা বাউলাঙ্গের গান গায়কের মৌলিক পার্থক্য আছে, তেমন বোলান লোকনাট্যেও অধুনা শখের শিল্পীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা, কৃত্রিমতায় আকীর্ণ হচ্ছে বোলান অনুষ্ঠান। লোকসংস্কৃতি তথা লোকশিল্পীদের সঙ্গে প্রকৃত সংযোগহীন মতলববাজেরা

এইসব নকল বোলান-লোকশিল্পীদের সুসজ্জিত মঞ্চে হাজির করাচ্ছেন — নিজেরা হচ্ছেন আলোকিত, আর্থিক পুষ্টও।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বোলানকে সূর্যোৎসব বলে উল্লেখ করেছেন ঃ 'গাজনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক এবং অভিন্ন — সর্বত্রই তাহা সূর্যোৎসব'। — (বাংলার লোকনৃত্য, ২ খণ্ড)। নদিয়ার কালীগঞ্জ থানার গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বোলান পালায় বন্দনাংশে সূর্যবন্দনা আমি শুনেছি, বন্দনায় সূর্যকে বারবার মিত্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

নদিয়া জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্নস্থানে ওঁরাও মুণ্ডা আদিবাসী অনুসূচিত উপজাতিদের বাস, গাজনের সময় তারা সহরুল (সারহুল) উৎসব করে, তারাও বোলান গানের মতো পালাগান করে।

বোলান কেন লোকনাট্য? বোলান পালায় আছে নাটকের পূর্বাভাস। নাটকে থাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কুশীলব। নাটকের এক একটি দৃশ্যে কুশীলবেরা পরস্পর কথা বলেন। আবার শুধু কথা নয়, থাকে কুশীলবের নানা শারীরিক তৎপরতা, ক্রিয়াকলাপ, অঙ্গভঙ্গি আর অঙ্গ সঞ্চালন অর্থাৎ Action ও Gesture। বোলান পালায় এসব থাকে না, বোলান পালার প্রত্যেক কুশীলবের কথা বা বক্তব্য সম্মেলক গানে গীত হয়। যেমন, একটি রামায়ণী পালায় মূল গায়েন গাইলেন ঃ 'তখন রাম বলে, ভাইরে লক্ষ্মণ চলেছ কুথাই?' সঙ্গে সঙ্গে সহগায়েনেরা ঐ পদটিরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। আবার, রামের এই প্রশ্নের উত্তর দেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের উত্তর মূল গায়েন গানেই দেন, তখন সহগায়েনেরা আবার ঐ পদ গায়। মূল গায়েনের একটি পদ বলার পরই দোহারিরা যৌথকণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করেন। একই পদ্ধতিতে পালার কুশীলবের বক্তব্য গানে গীত হয়। আবার যেমন, 'রাম বলে - দেশে চল - ও ভাই লক্ষ্মণ,' পরের পদ 'লক্ষ্মণ বলে - শক্তিশেলে মরো মরো উঠতে পারি না এখন'। পালার সূচনায় বন্দনাংশেও আছে ঃ 'বন্দ মাতা দুঃখেরি কন্যা / আদ্যাশক্তি ভগবতী বেদে আছে জানা / ভগবতী বলে - দুখের কথায় কাজ নাই / বন্দি ভগবতী — বোলান শুরু করি তাই।' বোলান লোকনাট্যে এককের কথা থাকে না। প্রশ্নমূলক গান সকলে মিলে গায়, উত্তরমূলক গানও সকলে মিলে গায়। বোলান লোকনাট্যের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য এখানেই। নাটকে কুশীলব চরিত্রানুগ সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কথা বলে। কিন্তু বোলানের গায়েনেরা চরিত্রানুগ সজ্জিত হয় না, সাধারণ ধুতিপাঞ্জাবির একই পোশাক পরে গান করেন। অধুনা অবশ্য পাকা সড়কসংলগ্ন উচ্চবিত্ত - মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত 'নাগ্রাম - না শহর' জনবহুল অঞ্চলে বোলান পালায় সাজসজ্জায় চরিত্রেরা সজ্জিত হয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

বোলান গানে সমসাময়িক সমাজের কথাও থাকে। খরা আর ঝরা নিয়ে গ্রামের জনজীবন। একবার নিদারুণ খরার সময় নদিয়ার বোলান দলের গানে শুনতে পাওয়া যায় খরাপীড়িত মানুষের আর্তি ঃ

খরা দিনে মরা গাঙ্গ,
শিব খায় গাঁজা ভাঙ্গ।
শিবের জল গাঙ্গে পড়ুক,
গাঙ্গে গাঙ্গে বান ডাকুক।।

পণপ্রথার বিরুদ্ধেও বোলানগানে সমাজচেতনাশ্রয়ী কথা শুনতে পাওয়া যায় ঃ

লাগসই জামাই মিলবেই দিলে নগদ বেশি,
সোনার গয়না দিতে পারলে হয় যে বেজায় খুশি।
মেয়ের বেলায় কান্নাকাটি, ছেলের বেলায় হাসি,
ভোজ খাওয়াতে টাকা খরচ, কাটতে হয় যে খাসি।
পণের নিয়ম মানবো না আর, অমত করো সবে,
ছেলের মা-বাপ, মেয়ের মা-বাপ — এক হবে যে কবে?

গ্রামের চাষের ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ দীর্ঘদিন ধরে অচল, সারানো হয় না। বোলান গানে শোনা যায় প্রতিবাদী কণ্ঠ ঃ

জল বিনে শুকিয়ে গেলো খেতের চারা গাছ,
টিউকল বাবুর হুশ নাই — ঘোলাজলের মাছ।
সারাবার কথা বলে বলে সকলে হয়রান,
আকাশপানে চেয়ে আছি — কবে আসবে বান!
সাহেববাবু জিপে এলে ছাড়বো না কেউ আর,
একবার ঠকি, দুবার ঠকি, ঠকবো না বারবার।

— বোলান পালায় অংশগ্রহণকারীরা যে প্রায় সকলেই কৃষিজীবী, উপরের অংশ তারও প্রমাণ। টিউকলবাবু হলেন ডিপটিউবওয়েলের অপারেটর এবং সাহেববাবু হলেন ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার অর্থাৎ বি.ডি.ও।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বা পরাধীনতার বন্ধন শৃঙ্খলমোচনের ক্ষেত্রে বোলান পালার ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। আমাদের অন্যায় অবহেলায় এইসব উদ্দীপক দেশাত্মবোধক বোলান পালা গানের লিখিত রূপ সংগৃহীত হয় নি। শুধু তাই নয়, নদিয়া জেলার

বোলান অধ্যুষিত এলাকা নীলবিদ্রোহের জন্য খ্যাত, নীলবিদ্রোহেও বোলান গানের ভূমিকা ছিল, অথচ নীলবিদ্রোহ বিষয়ক কোনো বোলান গান উদ্ধার করা হয়নি। মোহগ্রস্ত ইতিহাসকারদের বর্ণিত তথাকথিত ডাকাত, আসলে সংগ্রামী কৃষকনেতা বিশ্বনাথ, মেঘাই সর্দার প্রমুখ সম্পর্কে কড়চা লোকমুখে আজও প্রচলিত, কিন্তু তাঁদের জীবনকথার বোলানগান আজ আর পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নীলবিদ্রোহ ও কৃষকসংগ্রাম বিষয়ক বোলান গান একসময় নিশ্চয়ই গ্রামজীবনে প্রচলিত ছিল, কালের করাল গ্রাসে আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে — স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নতুন প্রজন্মের বোলান গায়কদের মধ্যে ঐ বিষয়ক গানের প্রচলন আর নেই।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নানা অঙ্গের শৈলীর লোকনাট্যের মতো বোলান লোকনাট্যের লোকশিল্পীরাও বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত, গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত বোলান লোকনাট্য ধারার লোকশিল্পীরা আজ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর সংগ্রাম করে চলেছেন। মানুষের জীবনের আজকের দিনের শূন্যতার রন্ধ্রপথে যেমন মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়ের অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশ ঘটেছে তেমনি বিক্ষত বর্তমানে লোকশিল্পীদের জীবনেও ঘটেছে। লোকশিল্পীদের তীব্র ও ব্যাপকভাবে লড়াই করতে হচ্ছে আধুনিক সর্বগ্রাসী বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিরুদ্ধে। তাই, নানা সামাজিক বিবর্তনের ধারায় বোলান লোকনাট্যের সমাতনীরূপ আর মেলে না। তথাকথিত অগভীর স্থূল সমসাময়িকতার আলেয়ার হাতছানিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অগভীরতার চক্রান্তের জালে আটকে পড়ছে — জনবিমুখ সামাজিক খোলসে আবৃত হচ্ছে বোলান লোকনাট্যের নিজস্ব শৈলী বা আঙ্গিক। জনপ্রিয়তার আকর্ষণে এমনভাবে বিজড়িত হয়ে পড়েছে যে যেন কানু ছাড়া গীত নেই।

অধুনা এক শ্রেণীর ভুঁইফোড় গবেষক কখনও বা পোশাকি শিক্ষার তকমাধারী পরজীবী কোনো গ্রামে হঠাৎ গিয়ে মাত্র কিছুক্ষণ থেকে বোলান পালা শুনেই ঘরে বসে অজস্র ভুলে ভরা গবেষণা নিবন্ধ লিখে ফেলছেন (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি দাক্ষিণ্যও লাভ করছেন)। পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করছেন, কেউ কেউ আবার গান টেপরেকর্ডিং করে ফটো তুলে দূরদর্শন আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করিয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে লোকশিল্পীদের প্রতারিত করছেন, লোকশিল্পীদের শহরে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন, বাহবা কুড়াচ্ছেন, আত্মপ্রচার করছেন। অবশ্য আসল বোলান লোকশিল্পীদের অনেকেই সঠিক চিনতে না পেরে নকল বা শখের বোলান গায়কদের নিয়ে হৈচৈ করছেন। এই সব মানুষেরা হল সামাজিক শোষকশ্রেণীভুক্ত, তাঁরা লোকায়ত জনজীবনের সংস্কৃতিকে গ্রাস ও অধিকার করার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত,

ব্যাপৃত লোকসংস্কৃতিকে শোষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণে। চিরকালের সুযোগভোগী সুবিধাবাদী দুর্বুদ্ধিজীবীদের ফাঁকি-মেকি-চালাকির প্রেক্ষিতে হীন অপপ্রয়াস।

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মতো বোলান লোকনাট্যের প্রকৃত পোষক হন জনগণ আর জনগণের সঙ্গে বোলান লোকনাট্যের সংযোগ আজও অবিচ্ছিন্ন। বোলান লোকনাট্যের আবেদন আজও অবিচ্ছিন্ন। বোলান লোকনাট্যের আবেদন আজও জনমনে অক্ষুণ্ণ। এখনও বোলান লোকনাট্যের আসরে প্রচুর জনসমাগম ঘটে — উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। গতিশীল বোলান লোকনাট্য আজও লোকসমাজে সমধিক আদৃত — উপভোগ্য। সামাজিক বিকাশে কল্যাণে ও চেতনাসঞ্চারে বোলান লোকনাট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নানা অন্তরায়ের মধ্যেও বোলান লোকনাট্য আজও শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে স্বমহিমায় উজ্জ্বল প্রাণবন্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত। আজও বোলান লোকনাট্য গ্রামবাংলার লোকজীবনের দর্পণ।

বোলান পালা পুরুষানুক্রমিক শ্রুতিনির্ভর। অবশ্য অতীত লিখিতরূপ না পাওয়া গেলেও এখন লিখিত রূপ পাওয়া যায়। বোলান পালায় বিষয়ের গৌরব তেমন নেই, মামুলি কাহিনীর গীতিরূপ অধিকাংশ বোলান পালায়। কাব্যরস বা ছন্দের বাঁধুনি থাকে না। সহজ সরল অভিব্যক্তির প্রকাশ থাকে। পুনরাবৃত্তিমূলক একঘেয়েমি বেশি, বৈচিত্র স্বল্প। ফলে, ক্রমেই সাংস্কৃতিক অবসন্নতা আসছে। বোলান পালা কাহিনীমূলক গীতিধর্মী এবং নৃত্যময়। লোক মুখে মুখে বোলান গান প্রচারিত হয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বোলান চর্চা-গবেষণায় উল্লেখ্য হলেন বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদের একদা সহ-সম্পাদক প্রাবন্ধিক - গবেষক হারাধন দত্ত। তাঁর আদি নিবাস নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে। এই অঞ্চলের বোলান প্রাচীন, অধুনাও সুপ্রচলিত। কৃষ্ণপুর সংলগ্ন প্রাচীন জনপদ শিবনিবাস (নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত ও নদিয়ারাজদের অন্যতম রাজধানী জনপদ, এখন পরিত্যক্ত) গ্রামে বোলান গান সংগ্রহ করে হারাধন দত্ত সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর সংগৃহীত বোলান সহজবোধ্য, সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুষ্ট-ব্যক্ত। শিবনিবাস-কৃষ্ণপুর-পারচন্দননগর অঞ্চলে প্রচলিত বোলান গানের বন্দনাংশে ভণিতায় রচয়িতাদের নাম জানা যায় ঃ প্রহ্লাদ পাটিনী, হেমন্ত, হরিদাস, দ্বিজ নগেন্দ্র, কেশবচন্দ্র দাস, অর্জুনচন্দ্র দাস ও গঙ্গাধর প্রমুখ। হারাধন দত্ত বোলান গান বিষয়ে রচনাদি লিখেছেন ঃ 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৬৪ / 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৬৬ / 'সমাবেশ', ২ সংখ্যা, ১৯৬২ / 'Folklore', Nov-Dec 1961 / 'সারস্বত', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩। তাঁর কথায় 'গীতাখ্যান সমূহ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যজীবন হতে গৃহীত। এই সমস্ত ... চিরায়তকাল থেকে বাঙালীর ধর্মপিপাসা

চরিতার্থ করে আসছে। প্রকৃতিজাত কল্পনা কৌশলে, ভাবের আবেগে, পল্লীকবিরা কৃষিক্ষেত্রে নৌকাচালনে এই সব সঙ্গীত রচনা করেছেন। গৃহস্থজীবনের সুখদুঃখের আর্তি আবেগ কবিজীবনে যে পুলক শিহরণে আন্দোলিত হয় — তাঁদের নির্বাচিত গীতকাহিনীতে তার প্রতিফলন দেখি। এই গীতসম্পদগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পল্লীকবিরা নিরক্ষর হলেও মূর্খ নন। ধর্মশাস্ত্রে তাঁদের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার দিকটি তাঁদের রচিত গানগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের গ্রথিত গীতে উচ্চ অঙ্গের শব্দবিন্যাস আছে। . . . . গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বহু গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার গানগুলিকে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা দান করেছে। . . . . গানগুলি নানা হাতে ও গায়কদের স্বেচ্ছাচারে রূপান্তরিত হয়েছে। . . . . সকল গান পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নি। বহু স্থলে লাইনে ছাড় দেখা যাচ্ছে। নূতন হাতের প্রলেপে ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত হয়ে সঙ্গীতগুলির মৌলিকত্ব নষ্ট হয়েছে।' তিনি মনে করেন যে, শ্রীচৈতন্যের নববৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে নদিয়ার বোলান গান বৈষ্ণবরসসিক্ত হয়েছে, হরিভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত (২ ও ৩ সংখ্যা, ১৩১১ / ১ ও ২ সংখ্যা, ১৩১২) 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' রচনায় গ্রামবাংলার পল্লীকবিদের রচিত পল্লীগীতি আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩১৬ সন) হরিদাস পালিত লিখিত 'আদ্যের গম্ভীরা' প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য।

আমরা নদিয়া জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের বুদ্ধীশ্বর ঘোষের সৌজন্যে বোলান গানের ৬০ বছরের প্রাচীন ও তৎপরবর্তীকালের 'গানের খাতা' গুলির বোলান গানের সঙ্গে হারাধন দত্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত বোলান গান মিলিয়ে নিয়ে একটি বোলান লোকনাট্যের বন্দনাংশ প্রকাশ করছি (বোলান গানের খাতার বানান ও শব্দ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে) ঃ

**বন্দনা**

এসো গো মা সরস্বতী কি বলিতে জানি
প্রথমে বন্দিবো আমি মায়ের চরণ দুখানি।
এসো গো মা সরস্বতী স্কন্ধে দে মা পা
গলায় দে মা সুরের ধ্বনি কণ্ঠে সুরসাধা।
এসো গো মা সরস্বতী বসো গো মা রথে
বুলান বোলিতে হবে বালকের সাথে।
যে বুলান বোলিবা মা গো তাই বোলিবো আমি

দশের মাঝে ভাঙ্গলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি।
বন্দনা করিতে আমার হবে অনেকক্ষণ
একেবারে বন্দে গাবো যতো দেবতাগণ।
এ বন্দনা করিতে আমার যে দেবতা এড়ায়
লক্ষ লক্ষ প্রণাম হই সেই দেবতার পায়।
শুনো শুনো সভাজন করি নিবেদন
প্রথমে বন্দিবো হরগৌরীর চরণ।
নবদ্বীপে বন্দে গাবো নদের বুড়ো শিব
চারদিকে বেড়া গঙ্গা মধ্যে নবদ্বীপ।
নবদ্বীপে বন্দে গাবো বেড়া নবদ্বীপ
খড়ে গঙ্গা যুক্তি করে ভাঙ্গলো নবদ্বীপ।
গিরিমাখা বস্ত্রখানি খড়ি উড়ে যায়
এখান থেকে প্রণাম হই সেই দেবতার পায়।
নবদ্বীপে বন্দে গাবো চৈতন্য গোসাঁই
হরি বলে বাহু তুলে নাচে দুটি ভাই।
উত্তরে বাহিনী গঙ্গা দক্ষিণেতে রসি
যাহা গঙ্গা গয়া কাশী গোলোক বারাণসী।
দরশনে মুক্তি মায়ের পরশিলে হয়
বিমানেতে স্বর্গে যেতে যম দাঁড়ায়ে রয়।
ভূমণ্ডলে এসে মা গো অধমে করলে পার
সাগর রাজার বংশ ধনি করিলে উদ্ধার।
সংসারেতে এসে মাগো ভিন্ন করে নিলে
হাজার বছর শিবনাথের জটার ভিতর ছিলে।
জ্ঞান থাকিতে বাড়ির কর্তা মনে হয় পর
আগে বলি মৃত্যু সরা বাড়ির বাহির কর।
গঙ্গার কিনারে লয়ে পুড়ায়ে কর ছাই
কোথায় রইলো পিতামাতা কোথায় রইলো ভাই।
ভাই বলো বন্ধু বলো কেহো কারো নয়

অসময়ে আছেন সেই কৃষ্ণ দয়াময়।
কালীঘাটে বন্দে গাবো কালীর চরণ
যাহার পূজা নিশিযোগে করিতো রাবণ।
উড়িষ্যাতে বন্দে গাবো ঠাকুর জগন্নাথ
কে কোথায় দেখে তোমায় ওগো দীননাথ।
শ্রীক্ষেত্রে যেতে ভাই পথে বড় দুখ
তাহার জনম আর হবে না — না দেখলে চাঁদমুখ।
বাগনা পাড়ায় বন্দে গাবো ঠাকুর গোপেশ্বর
তাহার মহিমা দেখো জগৎ ভিতর।
বৃন্দাবনে বন্দে গাবো মদনগোপাল
রাখাল বেশে চরিয়ে ছিলো নবলক্ষ পাল।
গুপ্তিপাড়ায় বন্দে গাবো গুপ্ত বারাণসী
বৃন্দাবনচন্দ্রের হাতে আছে সোনার বাঁশি।

. . . . .　　. . . . .　　. . . . .　　. . . . .

. . . . .　　. . . . .　　. . . . .　　. . . . .

# লোক নাট্য ঃ লেটো গান

## মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

'লোকনাট্য' বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লোকনাট্য অভিনীত হয়, তা হল কেষ্ট যাত্রা, পালাবন্দী বোলান, কুশান গান, খন গান, বিষহরা, আলকাপ, গম্ভীরা, মৈষাল বন্ধু, বনবিবির পালা, চোর-চুরনী পালা, একদিল-সত্যপীর গীতিনাট্য, মুসলিম বিয়ের গানের লোকশিল্পীদের একান্তে অভিনীত "কাপ" এবং লেটো গান ইত্যাদি। এক সময় রাঢ়-বাংলার মুসলমান সমাজের একাংশ ও হিন্দু তপশিলভুক্তদের সামান্য অংশের মধ্যে লেটো গানের বহুল প্রচলন ছিল। পূর্বের সেই লেটো গান এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে 'ছ্যাঁচ্ড়া - আলকাপ - পঞ্চরস - গীতনাট্য যাত্রা'র মধ্যে তার কিছু অস্তিত্ব আছে। এখানে লোকনাট্যের অন্যতম অঙ্গ 'লেটো গান' আলোচিত হল।

*লেটো গান উদ্ভবের প্রেক্ষাপট*

রাঢ়-বাংলার মুসলমান সমাজের বিশেষ এক কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে উদ্ভব ঘটেছিল লেটো গানের। আর এর সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল হিন্দু সমাজের তপশিল শ্রেণীভুক্ত কিছু মানুষ। লেটো গান উদ্ভবের প্রেক্ষাপট হল : এ দেশে বাণিজ্যব্যপদেশে জলপথের মধ্য দিয়ে ইসলামি সন্ত ইত্যাদির দ্বারা সঞ্চার ঘটেছিল ইসলাম ধর্মের। প্রথমত এ দেশের নীচুস্তরের এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রহণ করেছিল ইসলাম। এক নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারা বসবাস করে আসছিল স্বগ্রামেই। ইসলাম ধর্মে নৃত্য গীত ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যে কোনো মানুষ অবসর সময়ে চায় একটু চিত্ত বিনোদন। এরা যখন হিন্দু-বৌদ্ধ-নাথপন্থী ইত্যাদি ছিল, তখন দেখত বা নিজেরাই করত বোলান গান, সং, ঝাঁপান গান, কবির গান, ছড়া-পাঁচালি, হাপু, চণ্ডী-

মনসা-ধর্মের গীত ইত্যাদি। ইসলাম গ্রহণের পর এ সব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। চন্ডী-মনসা-ধর্মের গীতের অনুকরণে "সত্যপীরের গান", "একদিল গান" ও "মানিক পীরের গান" ইত্যাদির প্রচলন হলেও এসব ছিল ধর্মের মোড়কে বাঁধা। স্থানে স্থানে "ইমাম যাত্রা" [ *কেষ্টযাত্রার অনুকরণে*] প্রচলন হলেও তাও ছিল ধর্মের মোড়কে বাঁধা, তাই তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনে বোলান গান হতে হাস্যরসাত্মক সং ও পালা, একক গান, তরজা কবিগান হতে চাপান উতোর গান, ঝুমুর গান হতে প্রেমসঙ্গীত, হাস্যরসাত্মক গীত এবং ফকিরী ও মারফতি গীত ইত্যাদির সংমিশ্রণে এক নতুন গানের উদ্ভব হল। হাত ঢোল, ডুবকি তবলা বাঁয়া, বাঁশি, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর, খঞ্জনি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে শুরু হল গানের অনুশীলন। কৃষিজীবী যুবক, রাখাল, উৎসাহী স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভদ্রজন দু'একজন যোগ দিল। পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দু সমাজের তপশিলভুক্ত কিছু যুবক কৃষিশ্রমিক ও রাখাল বালক যোগ দিল। এই ভাবে বিচ্ছিন্ন পুরাতন গানের ধারা একত্রিত হয়ে এক জমাট রূপ লাভ করল। যারা নৃত্য গীত অভিনয় করত সমাজে তাদের বলা হত "নট-নাটুয়ানেটে"। তাদের গীত, তাই নাম হলো "নটের গীত"। আর এই নটের গীত বা গান হতে এল "নেটো গান" বা 'লেটো গান"।

*লেটো গানের প্রবর্তকদের সন্ধান*

লেটো গানের উদ্ভব প্রথম কোথায় হয়েছিল এবং কোনো ব্যক্তি এসব প্রাচীন গান একত্রিত করে নতুন রূপ দিয়েছিল, তা বলা মুশকিল। কেউ কেউ বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বঁড়েয়া থানার এঘরিয়া গ্রামের গ্রাম্য কবি মুনশি আহমদ হোসেন ছিলেন লেটো গানের প্রবর্তকদের অন্যতম। বীরভূম জেলার নানুর থানার আত্কুল গ্রামের লেটো ওস্তাদ, নজরুলসান্নিধ্যপ্রাপ্ত মরহুম শেখ আব্দুল ওয়াজেদে মাস্টার লেটো গান প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কাজি বজলে করিম ছিলেন লেটো গানের আদিগুরু। তবে সঠিক ভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

*লেটো গানের বিররণী*

বর্তমানে লেটো দল গুলি 'রথযাত্রার' পর সুবিন্যাস করে। টাকার ব্যবস্থা, দল গঠনের জন্য নটনটী গ্রহণ ইত্যাদি করে। এই সময় নটনটীগণ দল বদল করে। টাকা কড়ারের হেরফেরে এক দলের নটনটী অন্য দলে চলে যায়। তারপর চৈত্র মাসে পাথর চাপড়ি (বীরভূম) র দাতা মহবুব শাহের মেলা শেষ হলে নটনটীগণ মুক্ত হয়।

প্রতিদলে এক জন করে দলনেতা থাকে। এই নেতা দল গঠন করে, নটনটী ঠিক করে। এই দলনেতা লেটোর নটনটী হতে পারে, আবার নাও পারে। তবে যারা লেটোর দল গঠন করে, তাদের অধিকাংশ নট বা নটী। তার পর দল চলে ঐ নট বা নটীর নামে। যেমন "কে রায়ের দল", "নীহার বালার দল" ইত্যাদি। বর্তমানে নামকরণ করা হয়েছে "রামকৃষ্ণ অপেরা", "মামনি অপেরা" ইত্যাদি।

প্রতি লেটো দলে ওস্তাদ থাকে একজন। 'ওস্তাদ'কে সকলেই মান্য করে। এই ওস্তাদ লেটো শিল্পীদের নাচ, গান অভিনয় শিক্ষা দেয়। ওস্তাদের পরিচালনায় চলে দল। কোনো কোনো দলে দলনেতা ও ওস্তাদ একই জন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে দলনেতা ওস্তাদ নিয়োগ করে।

লেটোর আসরে গান পরিচালনা করা ওস্তাদের অন্যতম প্রধান কাজ। কোনো স্থানে লেটো গানের আসর বসবে। ওস্তাদ সাজঘরে বসে সকল শিল্পীদের নিয়ে আলোচনা করে নেয়। গোটা দল কীভাবে আসরে গাওনা করবে তা সাজঘরে ঠিক করে দেয় ওস্তাদ।

সকল লেটো দলের নট-নটীদের মধ্যে অলিখিত একটি বিধিব্যবস্থা আছে, তাহল, কোনো গ্রামে দল গাওনা করতে গিয়েছে। দল মালিক, ওস্তাদ ও নট নটীগণকে দেওয়া হয়েছে একটি আস্তানা। গাওনার অনেক আগে প্রথম সংকেত বাঁশি বাজানো হবে, নটনটীরা যে যেখানেই থাকুক, চলে আসবে আস্তানায়। এর কিছু পরে বাজবে দ্বিতীয় সংকেত বাঁশি। বাকি নট-নটী যারা বাইরে দু'এক জন ছিল, তারাও চলে আসবে আস্তানায়। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হলে বাজবে শেষ সংকেত বাঁশি। অবশিষ্ট নটনটীগণ যে যেখানেই থাকুক চলে আসতে হবে আস্তানায়। নচেৎ ওস্তাদ তাকে কৈফিয়ত তলব করবে।

আসর শুরুর প্রাক্‌মুহূর্তে বাদ্যকারগণ ওস্তাদের সঙ্গে চলে যাবে লেটোর আসরে। ওস্তাদের নির্দেশমতো যথাস্থানে বসবে বাদ্যকারগণ। তারপর বেজে উঠবে সমবেত বাদ্য। দর্শক শ্রোতাগণ উন্মুখ হয়ে উঠবে। বাদ্য ধ্বনি শেষ হলে ওস্তাদ বাঁশি বাজাবেন। আসরে ঢুকবে বন্দনাকারিণী নটীর দল। বন্দনাগীত গেয়ে তারা চলে যাবে। আবার বাজবে সংকেত বাঁশি, এক এক করে ঢুকবে একক গায়ক, সঙ্গী গায়ক, ডুয়েট গায়ক, হাস্যরস-গীত গায়ক বা গায়িকা ইত্যাদি। নাচে গানে জমে উঠবে আসর। তারপর শুরু হবে হাস্যরসাত্মক সং (নাটিকা) এবং সবশেষে পালা। বন্দনা হতে পালা পর্যন্ত লেটোর আসরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে ওস্তাদ। লেটো গানের আর একটি অলিখিত বিধি হল, আসরে কোনো নটনটীর গান দর্শকের পছন্দ হলে দর্শক গণ বলবে "এনকোর", "এনকোর"। গানশেষে ঐ নট বা নটী আসর হতে একটু বেরিয়ে এসে আবার ঢুকে

যাবে আসরে এবং গাইবে সেই পূর্বের গান। গান শেষ হলে ঐ নট বা নটী আসরের একপাশে টাঙানো বড় কাংনাই জিলিপিগুলির একটি ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাবে। এটা তার প্রাপ্য।

*লেটোর আসর*

গ্রাম্য মেলায় বা গ্রামে উন্মুক্ত মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে তার নীচে তৈরি করা হয় লেটো আসর। আসরের চারি দিকে বসে যায় দর্শক শ্রোতা। আসরের অদূরে থাকে লেটো শিল্পীগণ। আসর হতে সাজঘর পর্যন্ত দর্শক শ্রোতাদের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ করা হয়। এই পথ দিয়ে নট নটীরা আসরে প্রবেশ ও প্রস্থান করে।

নট নটীদের জন্য আসরের একদিকে টাঙানো থাকে রূপোর একাধিক পদক, ক্বচিৎ একটা সোনার পদক ও একাধিক বড়ো বড়ো কাংনাই জিলিপি। জনপ্রিয় শিল্পীগণ গান শেষে ঐ জিলিপি ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে। উত্তম গায়কগায়িকাদের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয় রূপোর পদক। অতি উত্তম অভিনয়কারী নট বা নটীকে পুরস্কার দেওয়া হয় সোনার পদক।

*লেটোর সং ও পালা*

দু'পাঁচটা গানের পর লেটোর আসরে 'সং' দেওয়া হয়। সং এক প্রকার হাস্যরসাত্মক নাটিকা। এর মধ্যে সামান্য আদিরসের স্পর্শও থাকে। গ্রাম্য সমাজজীবনের ঘটনা থেকে এর বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়। ইহা নাচ ও গান বহুল।

লেটো গানের শেষে যে পালা অভিনীত হয়, সেই পালার বিষয়বস্তু হল গ্রাম্য সমাজ জীবনের ঘটনা। রূপকথা, রূপকথাও গ্রাম্য ঘটনার মিশ্রণ, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক।

দুখুমিয়া যে ভাবে পালাগুলোর অভিনয় ব্যবস্থা করেছিলেন সে ব্যবস্থা এখনও চলে আসছে। যে গল্প নিয়ে পালাটি সাজানো হবে, পালার সকল নটনটীকে ওস্তাদ গল্পটি শুনিয়েছেন, কোন্‌খানে কী গান থাকবে, কে কে গান গাইবে, তাও বলেছেন। গানগুলো নট-নটীরা সুরে তালে বাজনায় কণ্ঠস্থ করে নেয়। তারপর নটনটীদের গান সহ ঐ গল্প শোনাতে হয় ওস্তাদকে, প্রতি নটনটী সংলাপ নিজে নিজে তৈরি করে নেয়। এরপর অভিনয়কারী সব নটনটীর পালাটি মুখস্থ হয়ে যায়।

লেটো দলে যেসব পালা অভিনীত হত বা হয় তা হল রাধা বিনোদ, কমলা উদ্ধার, দস্যুবাহারাম, কুলসুম, বাবলুর মা, সুদখোর, রাজা জয়চাঁদের ধর্মপরীক্ষা, শিবশক্তি,

মহাসমর, বনের মেয়ে পাখী, হরিদাসী মেথরানী, রত্নমালা ও মাটির কেল্লা ইত্যাদি। এই পালাগুলি সবই দুখুমিয়ার রচনা। অন্য পালাও আছে।

*বাদ্যযন্ত্র*

লেটোদলে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা হল হাতঢোল, বাঁয়া-তবলা, হারমোনিয়াম, ডুগি, জুড়ি, সাইড ড্রাম, ডুব্‌কি, ঝাঁঝ, বাঁশের বাঁশি, ফ্লুট কর্ণেট, বেহালা, করতাল, খঞ্জনি, ঘুঙুর ও জলতরঙ্গ ইত্যাদি।

*সাজসজ্জা*

নটনটীদের সাজসজ্জার জন্য প্রতিদলে শাড়ি, ধুতি, জামা, প্যান্ট, পাজামা, ব্লাউজ, রাজা মন্ত্রী ইত্যাদির রয়েল ড্রেস, তরবারি, ছোরা, খাঁড়া, তীরধনুক, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি নকল অস্ত্র, মুকুট, স্নো, পাউডার, হিমানি, রুজ, লিপস্টিক, নানাবিধ রং, টিপ, নানাবিধ নকল গহনা এবং আরও অনেক দ্রব্য থাকে। নট-নটীরা নিজে নিজে সাজে অথবা পেন্টার নট-নটীদের সাজিয়ে দেয়।

*কুশীলব*

লেটোদলের কুশীলবদের নানাপ্রকার নাম আছে - সখী, বাই, ছোক্‌রা, সংদার, পাঠক, বিবেক ইত্যাদি। নবাগত কিশোর শিল্পীকে বলা হয় বেঙাচি। মাষ্টারকে বলা হয় ওস্তাদ। বহিরাগত অস্থায়ী নটনটী, যারা টাকার বিনিময়ে এসে কোনো দলে গান নাচ অভিনয় করে যায়, তাদের বলা হয় আসামী। যারা রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি ইত্যাদির অভিনয় করে তাদের বলা হয় পাঠক।

*লেটোদলে প্রথম মহিলা নটী*

প্রথমত প্রতি লেটো দলে কিশোর ও যুবাগণ মেয়ে সেজে নাচ গান অভিনয় করত। এখনও দু একটি লেটোদলে কিশোর যুবারা মেয়ে সেজে নাচ গান অভিনয় করে।

লেটোদলের প্রথম মহিলা নটী হল বর্ধমান জেলার রায়না থানার উচালন গ্রামের সাঁওতাল কিশোরী শ্রীমতী লক্ষ্মী মান্ডি। ঐ গ্রামের লেটোওয়ালা কাজেম আলির দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ওস্তাদ ছিল আম্বিয়া মাষ্টার। এরপর ঐ একই দলে নটী হয়ে আসেন বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার গুসকরা -শিবদের শ্রীমতী নীহারবালা দত্ত। পরে আসেন বজবজের সুশীলাবালা দাসী, রেণুকাবালা দাসী ও লক্ষ্মীবালা দাসী, এঁরা

বিভিন্ন দলে নাচগান অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মান্ডি ও লেটোসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী নীহারবালা দত্ত বেঁচে আছেন।

*লেটো দলে দুখুমিয়া*

মশহুরনামা কবি কাজি নজরুল ইসলাম। প্রথম জীবনে কিশোর বয়সে তাঁর গুরু ও চাচা কাজি বজলে করিমের অনুরোধে বেঙাচি লেটো শিল্পীরূপে লেটোর দলে এসেছিলেন। তখন ঐ দলের ওস্তাদ ছিলেন কাজি বজলে করিম। এ ছাড়া তিনি দলের গোদা কবিও ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় দুখুমিয়া একাধারে ভালো লেটো শিল্পী ও ভালো লেটো গান, সং, প্রশ্ন ও উত্তরমূলক সং এবং বিবিধ পালা রচনা করে গিয়েছেন, এবং গুরুর অনুরোধে তিনি নিমশার লেটো দলের ওস্তাদ হয়েছিলেন। তাঁর রচিত অনেকগুলি বিখ্যাত গান ও কবিতা যে প্রথমে তিনি লেটোর দলেই রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ মিলেছে। তাঁর রচিত বিভিন্ন ঢঙের লেটোগান, হাস্যরসাত্মক সং ও পালা ইত্যাদি প্রবীণ লেটো শিল্পীদের কণ্ঠে কণ্ঠে আজো পথপরিক্রমা করছে।

*লেটো গানের ক্রম পরিণতি*

লেটো গানে, প্রথম দিকে 'খেস্‌সা' ও 'ধাপসা' গান যুক্ত ছিল। এখন এ গান বিলুপ্ত। প্রথমত লেটো গান ছিল নাচ, গান, সং, কবিগান ও প্রশ্ন ও উত্তরমূলক সংবহুল। পরে শুধু নট পালা ও সং অভিনয় করত দু-একটা দল। এ দলকে বলা হতো 'বঁদলেটো দল', অর্থাৎ বাঁধা লেটোদল। বর্ধমান বীরভূমে কিছু কিছু বঁদ লেটো দল ছিল। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কাঁটা ডিহির শ্রীকার্তিক মাঝির একটি বঁদ লেটোর দল ছিল। তাঁরা জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা এখন আর এই দলটি নেই, উঠে গেছে।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের কোনো কোনো অঞ্চলে লেটো গানকে ভেঙে "ছ্যাঁচ্‌রা" গানের উদ্ভব হয়েছিল। এ গান ছিল একক, ডুয়েট ও ছোটো ছোটো নৃত্য-গীতি-নাটকসমন্বিত, আদিরসের পরিমাণ ছিল বেশি।

পরে 'ছ্যাঁচ্‌রা' ভেঙে হয় 'আলকাটাকাপ'। পরে 'আলকাটাকাপ' ভেঙে হয় 'আলকাপ'। উত্তর মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত লোকনট ঝাঁকসু তাঁর প্রতিভা ও শিক্ষায় এই আলকাপ দলকে নতুন রূপদান করে গিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার ধারাপথে এ গান উক্ত উত্তর মুর্শিদাবাদে বেশ জনপ্রিয়। তাঁর দুইকন্যা আলকাপ গানের সফল নটী।

'আলকাপ'কে ভেঙে উদ্ভব হয় 'পঞ্চরস' গানের। পঞ্চরস গান আদিরসাত্মক। এখন 'লেটো-আলকাপ-পঞ্চরসের' দলে এসেছে প্রচুর মহিলা শিল্পী।

পঞ্চরসের রসে যখন বাংলার একশ্রেণীর শ্রোতা রসসিক্ত, তখন তাদের অগোচরে, সীমান্ত এলাকা দিয়ে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-২৪ পরগনা অঞ্চলে লেটোগানে অনুপ্রবেশ করেছে বাংলাদেশি 'নৃত্য গীতি নাট্য'। এদের অধিকাংশ শালা বাংলাদেশীয়। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশি নটনটীরা এখানে অভিনয় করে যাচ্ছে।

*লেটোগানের কিছু নমুনা*

একক প্রেম পিরীতের গান :—

(১)

নয়না গাঁয়ের নয়ন মণি, সে যে রূপের রানি গো।
তাকে দেখেছিলাম হাটের পথে, তার নামটি নাহি জানি গো।।
নীলাম্বরী ছিল তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া,
যৌবন উচ্ছলে পড়ে বসন ছিঁড়িয়া,
তাকে দেখব বলে পাড়ি দিলাম ভরা গাঙে পানি গো।।

ইসলামি গান :—

(২)

আমিনা দুলাল নাচে, হালিমার কোলে।
তালে তালে সোনার বুকে, সোনার তাবিজ দোলে।।
কাঁদলে পরে মুক্ত ঝরে,
হাসলে পরে মানিক পড়ে,
ও তাঁর কচি মুখে, খোদার কালাম আধ আধ বোলে।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান :—

(৩)

কালা তুমি ছল করে, অবলা মজাতে চাও।
বাঁশির সুরে এনে তুমি, এখন বলো ফিরে যাও।।
জয় রাধা শ্রীরাধা পিয়ারি,
কী বাঁশি বাজালে হরি,
এখন কেন বংশীধারী, সরল প্রাণে দাগা দাও।।

হাসির গান :—

(৪)

আগে রস ছিল দিদি, তখন রস গড়িয়ে গেছে।
আমার রসে কত জনা চিড়ে মুড়ি ভিজিয়ে খেয়েছে।।
(রসে) প্রেমের গাঙে বান বইত,
কত প্রেমিক সাঁতার দিত,
হাবু ডুবু খেয়ে মরত, এখন রসে পাক ধরেছে।।

বর্তমানে রাঢ় বাংলায় বর্ধমান-বীরভূমে স্বল্প কয়েকটি লেটোর দল আছে যাঁরা লেটো গানের প্রাচীন ধারাকে সজীব রেখেছেন। আর বেঁচে আছেন নজরুল পরবর্তী কালের কিছু লেটো শিল্পী, যাঁরা আজও দুখুমিয়ার গান, সং ও পালাকে ধরে রেখেছেন নিজ নিজ কণ্ঠে। এঁরা হলেন লেটো সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী নীহারবালা দত্ত, আলি আহ্মদ দফাদার, শেখ জিও জান আলি এবং মানিক খান প্রমুখ।

প্রবন্ধে পরিবেশিত লেটোগানগুলি দুখুমিয়ার রচনা। প্রথম তিনটি গান সংগৃহীত হয়েছে দুখুমিয়ার সান্নিধ্য প্রাপ্ত, বীরভূম জেলার নানুর থানার আতকুল গ্রামের লেটো ওস্তাদ মরহুম শেখ আব্দুল ওয়াজেদের ও চতুর্থ গানটি উক্ত জেলা ও থানার সাজিনোর গ্রামের জনাব মানিক খানের নিকট হতে। শেষ গানটি দুখুমিয়া রচিত লেটোর পালা 'স্বামীর অভিশাপ' বা 'বাবলুর মা' পালার গান।

লেটো গান প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার 'দুখুমিয়ার লেটো গানের সন্ধানে' শিরোনামে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে আছে 'লেটো গানের ধারাবাহিক ইতিহাস', চুরুলিয়ার ইতিহাস ও দুখুমিয়ার বাল্য জীবন এবং প্রবন্ধকার সংগৃহীত দুখুমিয়ার বিভিন্ন ঢঙের প্রচুর লেটো গান, একাধিক প্রশ্ন ও উত্তরমূলক সং, হাস্যরসাত্মক সং এবং একাধিক লেটোর পালা।

# 'আলকাপে'র কথা

নির্মলেন্দু ভৌমিক

।। এক ।।

মূলত মালদহ-মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, দিনাজপুরের অংশ বিশেষে এবং বাংলাদেশে রাজশাহী অঞ্চলে আলকাপ গানের প্রচলন দেখা যায়। এইসব অঞ্চলে এই বিশেষ ধরনের গান (লোকনাট্য) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বছরের যে কোনো সময়েই এবং কারণে ও অকারণে এই গীতির অনুষ্ঠান হতে পারে বা হয়ে থাকে। এই চলনভূমির যারা সাধারণ অধিবাসী, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তারাই এর ধারক-বাহক-পোষক। মূলে 'আলকাপ' যাই হোক-না কেন, সাধারণ মানুষ একে 'আলকাপ গান' বা শুধুই 'আলকাপ' বলে জানে। আসলে আমাদের দেশের মানুষেরা নাটককে গান থেকে কোনো দিনই বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারে নি। নাটকও এখানে 'পালা গান' ছাড়া আর কিছু নয়।

সম্প্রতি এই 'আলকাপ' সম্পর্কে শিক্ষিতজনের বিশেষত লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচক - গবেষক - সংগ্রাহক -সমীক্ষকগণের সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। কাজেই এর আখ্যা-অভিধার নাম-বিশেষত্ব, এর উদ্ভব-বিবর্তন এবং গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে নানা কৌতুহলও দেখা যাচ্ছে। সে বিষয়ে তাঁরা যে সচেতনতা ও সক্রিয়তা প্রদর্শন করছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার্হ। যদিও কেউ কেউ এই সচেতনতা ও সক্রিয়তার পেছনে কোনো গূঢ় গোপন স্বার্থ সাধনার ইঙ্গিত পাচ্ছেন, এবং বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ তির্যক দৃষ্টিতে দেখতে চাইছেন, — আমরা কিন্তু তা মনে করি না। আমরা এই প্রয়াসকে সাধুবাদ দিই ও অভিনন্দন জানাই। শুধু তাই নয়। পূর্ববর্তী আলোচক - গবেষকগণের সংগ্রহ সঞ্চয় অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে এই নিবন্ধ লিখছি। হয়তো সর্বত্র তাঁদের সঙ্গে আমাদের

মতের ঐক্য হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে — বিভিন্ন মত ও মতান্তরের বন্ধুর পথ বেয়েই মূল সত্যে গিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হবে।

লোকসাহিত্য বা অলিখিত সাহিত্যের যেহেতু কোনো লিখিত বিবরণ বা ইতিহাস থাকে না, সেই হেতু তার উৎস-উদ্ভব-ইতিহাস-বিবর্তনের পথরেখা অন্বেষণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অপেক্ষা এখানে নানা পরোক্ষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। নানা মত পথের মধ্যে সমন্বয় সামঞ্জস্যের দৃষ্টি করে নিতে হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে যাচাই করতে হয়। আমাদের বাঙলা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা-সমীক্ষায় প্রায়ই 'লোকনিরুক্তি' (Folk etymology / popular etymology) প্রাধান্য পায়। তার মূল্য যে নেই, তা নয় ; তবে তাকে দেখতে হবে একটি পারিপার্শ্বিক দিক থেকে। এসব ক্ষেত্রে আমরা একটি Holophrastic বা সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিকোণ অবলম্বনের পক্ষপাতী।।

।। দুই।।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে প্রাক্তন অধ্যাপক Alan Dundes লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা-সমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের কথা বলেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন — 'Meta-folklore'। অবশ্য এ দলে আরো কেউ কেউ আছেন। মূলত এই অভিধাটি ভাষাবিজ্ঞান থেকে নেওয়া, — ভাষাবিজ্ঞানের একাধিক অভিধা লোকসংস্কৃতির গবেষণায় গৃহীত হয়েছে। Meta-folklore-এর মূল কথা হল, লোকসাধারণ এবং লোকমনস্তত্ত্বের আলোকেই লোকসাহিত্যের বিচার করা, ". . . We may suggest metafolklore to refer to folkloristic statement about folklore." এই প্রকার মতবাদের পেছনে আছে (১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Dundes এটির প্রচার করেন) তাঁরই মার্কিন লোককথা নিয়ে গবেষণাকর্মের প্রাক্তন অভিজ্ঞতা। লোকমনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তিনি বিশেষ লোকগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিশেষ লোককথা বলে এলেন (একে 'Story plantation' বলে), পরে সেই লোককথাটির যখন feed-back নিতে গেলেন, তখন তাদের মন-জীবনমূল্যবোধজাত সেই লোককথার পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করলেন। এই পথ-পদ্ধতিরই পরিণাম Meta-folklore পদ্ধতির উদ্ভাবন। এতে একটি বিশেষ কালে, একটি বিশেষ লোকমানস কোনো বিষয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তারই Synchronic দিকটি ধরা পড়ে। সমাজবিজ্ঞানের একটি functional aspect এতে অনুসৃত হয়।

'আলকাপ' অভিধার উৎস ও অর্থ অন্বেষণের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। 'আংশিক' এজন্যেই বললাম — এতে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজেরাই যেভাবে পদটিকে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে, তার বিচার করা। প্রচলিত ধারণা, মালদহের 'গম্ভীরা' গানের অবক্ষয়ের পর্বে, কিন্তু সেই ধারারই অনুবর্তন করে আলকাপের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু সেই উদ্ভবকালের পূর্বে, Pre-existence বা পূর্বাস্তিত্বরূপে পদটিকে আমরা পাচ্ছি। এবং, লোকমানস, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকমানস, নানা বিচিত্র অর্থে পদটির প্রয়োগ করেছে। ক'টি দৃষ্টান্ত এই :

১. মানভূমে প্রচলিত একটি বাক্যে : 'তর হঁয়েছে যত শত আলকাপ' (*মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ, জানুয়ারী, ১৯৮৪। পৃ. ১৮। ডঃ রেখা সিংহ*)। শ্রীমতি সিংহ এখানে 'আলকাপ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : কোনো 'বিদ্‌ঘুটে বা বিচিত্র আচরণ'।

২. 'মাঞ্জুর মা' নামে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র *(৩য় খন্ড, ২য় সংখ্যা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)* একটি গীতিকায় (চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত) পাই :

মাঞ্জুর মা'র মনের আলকাপ রে
আরে ভালা বাচেনে করত বিয়া।। — পৃ. ২২

সম্পাদক এখানে 'আলকাপে'র অর্থ করেছেন — 'অভিলাষ', অর্থাৎ ইচ্ছে বা বাসনা।

৩. কিংবা, কাঠের পুতুলের নৃত্য-অভিনয় প্রসঙ্গে একটি ছড়া : যা দেখায় নি বাপের বাপে / তাই দেখাল কাঠের কাপে'।

'কাপ' / 'আলকাপ' সম্পর্কে ওপরের তিনটি দৃষ্টান্তের কোনোটির সঙ্গেই কোনোটির মিল নেই। তবে এগুলির মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট অর্থ খুঁজে নিতে হবে। 'বিদ্‌ঘুটে' বা 'বিচিত্র আচরণ' বলতে কি সং বা হাস্যকৌতুকের কোনো ইঙ্গিত আছে? 'কাঠের কাপে'র মধ্যে অবশ্য কাঠ-পুতুলের নৃত্য-অভিনয়টি মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণটিতে দীনেশচন্দ্র সেন যে 'অভিলাষ' বলেছেন, তাকে কিছুতেই আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে মেলানো যায় না। হয়তো শব্দটির একটি বিশেষ আঞ্চলিক অর্থ ছিল, আমাদের কাছে আজও যা অজানা। শুধু এইটুকু অনুমান আজ করা যেতে পারে, 'আলকাপ' শব্দের আরো অর্থ ছিল, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক বাংলা অভিধানেও যা ধৃত হয় নি।।

।। তিন ।।

'আলকাপ'-এর প্রতিশব্দ বা সমনাম রূপে উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলা থেকে আর দুটি শব্দ মিলেছে। 'রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকায় রঙ্গরস' *(অলকা বৈশাখ, ১৩৪৭ / পৃ. ৬৮৪-৬৯১)* নামে একটি সুলিখিত নিবন্ধে, তখনকার একজন লোকসাহিত্য গবেষক তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "আলকাপের গান নামে রঙ্গকৌতুকপূর্ণ একটি গান অনেকদিন হইতে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। এই গানের মধ্যে হিন্দী ভাষাও কতকাংশে দৃষ্ট হয়। ... "আলকেচ' শব্দের মূলগত অর্থ 'রঙ্গ'। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম-কলহ লইয়াই উক্তগানটি রচিত। ..."

এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমত, 'আলকাপে'র বদলে 'আলকাচ', এবং তার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ 'আলকেচ' পাই। অর্থাৎ 'কাপ'-এর বদলে -কাচ-, -কেচ- পাই। 'আলকাপ'কে যাঁরা একটি আরবি শব্দ বলতে চান *(কোনো আরবি অভিধানেও এটি মেলে নি),* তাঁরা এই সমনাম ও প্রতিশব্দরূপে এ দুটিকে লক্ষ করুন। 'আলকাপ'ই কি আদি ও অকৃত্রিম রূপ, নাকি 'আলকাচ' বা 'আলকেচ'। দ্বিতীয়ত, এটি মিলেছে রংপুর থেকেই, যে উত্তরবঙ্গের 'গম্ভীরা' গানকে 'আলকাপে'র উৎস বলে থাকেন কেউ কেউ। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, 'গম্ভীরা'ই 'আলকাপে'র জননী, তবে সেই 'গম্ভীরা'রই অপর পরিণতি আলকাচ-আলকেচ? তৃতীয়ত, এর মধ্যে মাঝে মাঝে হিন্দি ভাষার প্রভাব লক্ষ করছেন আলোচ্য নিবন্ধের লেখক। এই হিন্দি প্রভাবের কারণ কী? গম্ভীরারই অপর পরিণতি যদি মালদহেরই 'ডোমনি' হয়ে থাকে এবং যে 'ডোমনি'তে পার্শ্ববর্তী বিহার-মিথিলার প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়, 'আলকাচ - আলকেচে'র মধ্যেও কি সেই একই কারণে হিন্দি প্রভাব পড়েছে? দেখা গেছে হাস্যরস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে কখনো, কখনো হিন্দি প্রভাব পড়ে। কেবল 'ডোমনি'তেই এটি সীমাবদ্ধ নয়। যেমন কিনা পশ্চিমবঙ্গের নাটকাদিতে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য উপভাষা, ওড়িয়া-প্রভাবিত মেদিনীপুরের উপভাষা গৃহীত হয়।

এইখানে উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গে *(বাংলাদেশে)* একটি শব্দ পাওয়া গেছে, 'আলকাচ', 'সং' অর্থে *(বাঙলা দেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ডিসেম্বর, ১৯৭৩ / প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)*। একটি উদাহরণ দিয়েছেন, "কি এক আলকাচ আসি খাড়া অইল।" জেলার নাম উল্লেখ করেন নি, ভাষা দেখে মনে হয় উত্তরবঙ্গের কোনো জেলা। অপর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ফরিদপুর থেকে, সেখানে এটি একটি 'গালাগালি' অর্থে প্রযুক্ত [ *যেমন, কাউকে সং-বলা?* ]। 'আলকাচ'-এর অর্থ নির্ণয়কালে শহীদুল্লাহ্ হিন্দি 'আলকসিয়া' ( = *'অলস' অর্থে* )-র কথা বলেছেন। আমাদের মতে, কাচ + ইয়া =

কাচিয়া, 'কাসিয়া'। কেননা, উত্তরবঙ্গে স-কারীভবন (Asibilization) প্রচলিত আছে। এই অভিধান মতে বাংলা দেশের পাবনা - রাজশাহীতে 'আলকাপ' অভিধাই চলিত আছে, একটু ভিন্ন অর্থে। পরে সে আলোচনায় আসছি।

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধে একটি আলকাচ / আলকেচ গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত করেছেন। ইতিহাসের খাতিরে এখানে সেটির উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

"বাপের বাড়ী যাইবার জন্য স্ত্রী তাহার শাশুড়ীর নিকট মিনতি জানাইতেছে। পুরুষ তাহাতে বাদ সাধিতেছে —

আমি দিব না যাইতে, শরীর শুকাবে
রাখাল পহরা দিলাম হো।।

"তখন স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর দরদ লইয়া ঠাট্টা করিতেছে — তাহার অবস্থা অপেক্ষা তাহার বাপের অবস্থা সচ্ছল।

কীসের এত টান রে মুন্সা, কিসের এত টান।
আমার বাড়ি দেখিয়া আশি —
কেতে না গোলার ধান।। . . .
বাবার খাটে দুইজনা চাকরা হো।।

"পুরুষটি প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, তাহার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল নয় — তাহার বাপ পরের চাকুরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

তোর বাপ নাই খায় ভাত।
তোর বাপ হইয়াছে হাবাত,
আমি জানি কি না জানি, করিস না ফুটানি
তোর বাপটা পরার চাকরা হো।।

"স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর বাক্যের অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, সে তাহার বাপের বাড়ী যাইয়া পিঠা খাইয়া আসিয়াছে।

বাদ্ বলিস ঝুটা রে মুন্সা, বাদ বলিস ঝুটা
আমার বাপের বাড়ীত খাইয়া আইলি গরাগরি পিঠা।।
পিঠাতে কেতেনা আছে মিঠা।
মিঠাতে খেতে পারি নাই পিঠা।।

"পুরুষটি তখন আবার রঙ্গ করিয়া বলিতেছে যে, তাহার শ্বশুরবাড়ীতে একদিন যাইয়া পিঁড়িতে বসিয়া তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। মুড়ি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আকর লাগিয়া তাহার দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছিল।

আমার মন টলে না শ্বশুর বাড়ী যাইতে —
শ্বশুর বাড়ী গেইলাম ভাইরে, বসতে দিলে পিঁড়া
পিঁড়ার কাঁটা নাগি' আমার কাপড় গেল চিঁড়া।
শ্বশুর বাড়ী গেইলাম ভাইরে, খেতে দিল মুড়ি।
মুড়ির আখর লাগি' আমার দন্ত গেল নড়ি ।।

এই প্রসঙ্গে তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'বলভাই' [ *তুলনীয় : 'বোলবাই'* ] নামে আর এক রঙ্গের গানের নিদর্শন দিয়েছেন। এটিতে এক শৌখিন বড়োলোকের কন্যার সঙ্গে এক পথিকের রঙ্গ-কৌতুকময় আলাপনের খণ্ডদৃশ্য আছে। যাই হোক, তিনি যে আলকাচ/আলকাচের নিদর্শনটি এখানে দিয়েছেন, অনুমান হয় এগুলিই আলকাপ গানের অকৃত্রিম ও আদি নিদর্শন। রঙ্গ-কৌতুকই এ সবের মূল কথা। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হল, স্বামী-স্ত্রীকে এখানে Tied pair বা Adjacency pair রূপে দেখা। লোকসাহিত্যের যা একটি প্রাচীন ও প্রচলিত Motif, সেখান থেকেই শিষ্ট সাহিত্যে এই রীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত, গম্ভীরা-আলকাপ-বোলান-ডোমনি-সর্বত্র এই Tied pair এক অপরিহার্য দিক। পশ্চিমবঙ্গে এখন লোকনাট্যের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যাপক-জীবন্ত-ঐশ্বর্যময় ধারা হল উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের ধারা। কাজেই, এই ধরনের জুটি-চরিত্র বা জোড়া-চরিত্রের ভূমিকা উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

এইখানে অবিভক্ত রংপুর জেলার সন্নিহিত আর দুটি জেলার কথা বলি — জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর। জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, রংপুরেরই ফকিরগঞ্জ থানাকে নিয়ে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই দুই জেলার আত্মীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। জুটি-চরিত্র বা জোড়া-চরিত্র প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির *(এবং কিয়দংশে দিনাজপুরের)* 'চোর-চুন্নী' *(চোর এবং চোরনী)* এখানে স্মর্তব্য। জলপাইগুড়িতে কালী পূজার সময়ে রাজবংশিগণ এই গান বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে করে থাকে *(দ্র 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীত', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত,* ১৯৭৮)। চোর এবং তার স্ত্রীর সঙ্গীতময় সংলাপ এ গানের মূল দিক। রংপুরের আলকাচ/আলকেচের মধ্যে যেমন স্বামি-স্ত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ দেখা যায়, জলপাইগুড়ি-দিনাজপুরের 'চোরচুন্নী'র *(দিনাজপুরে 'চোক-চুন্নী' বা 'চ'ক চুন্নী', 'নটুয়া চোক-চুন্নী' বলা হয়)* মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাই। এই Tied Pair ই গম্ভীরার

'ডুয়েট' গানে এবং আলকাপ (কাচ), ডোমনি-তে মেলে। এখানে কেউ কারো কাছে ঋণী নয়। এ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এবং শিথিল অর্থে সমগ্র লোক সাহিত্যেরই সাধারণ উপকরণ ও Motif। এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করছি।।

।। চার ।।

'আলকাপ' এই পদটি যে দুটি শব্দের সমাহার অনেকেই তা লক্ষ করেছেন, — সম্ভবত প্রয়াত বিনয় ঘোষ মশাই এটি সর্বপ্রথম লক্ষ করেছেন *(পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ৩য় খণ্ড। জানুয়ারি, ১৯৮০। প্রকাশভবন। পৃ. ৬৮-৭২)*। 'আল + কাপ' — এই দুটি শব্দের সমাহার বলে অভিধাটির পরিচয় দিয়েছেন। তারপর অনেক আলোচকই এই পৃথক দুটি শব্দের অর্থ ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন — বিনয় ঘোষেরই পথ-রেখা অনুসরণ করে। 'আল' শব্দের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন (তীক্ষ্ণ-তীব্র-ধারালো কোনো পদার্থ) এবং সেটিকে ভিত্তি করে 'আলকাপ' পদের যে অর্থ তিনি নির্দেশ করেছেন, বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তা মেলে না। তিনি প্রসঙ্গত 'যাত্রা আলকাপ'-এর কথা তুলেছেন, যার কোনো সংজ্ঞা-পরিচয় তিনি দেননি। তবে, এটুকু জানিয়েছেন, 'যাত্রা-আলকাপ' ১৯৫০-এর দশকে কিশোর-বালকদের দেখা অভিভাবক গণ অনুমোদন করতেন না। এর থেকে পরোক্ষে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের 'যাত্রা-আলকাপ' বালক-কিশোরদের পথ্য ছিল না। তাঁর ব্যাখ্যা-মন্তব্য পড়লে 'তীক্ষ্ণ-তীব্র-ধারালো' শব্দগুলিকে 'কাপ' শব্দের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করতে হয়। 'কাপ' শব্দের অর্থ ধরেছেন 'সং', এবং সেই সং-এর বিশেষণ উল্লিখিত শব্দগুলি।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'কে ভিত্তি করে 'কাপ' অর্থে 'সং'-এর তিনি পর-পর চারটি অর্থও নির্দেশ করেছেন। অতঃপর তাঁর মন্তব্য : "সং কথার এই আভিধানিক অনেক অর্থের মধ্যে দুটি উপাদান প্রধান — প্রথমটি 'অভিনয়', দ্বিতীয়টি 'হাস্যকৌতুক'। বস্তুত নানাবিধ লোকানুষ্ঠানে 'সং-এর শোভাযাত্রা' থেকে অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' কথার ব্যবহার চলিত হয়েছে [ *অর্থাৎ বিনয় ঘোষ মনে করেন, সং-এর অভিনয়মূলক শোভাযাত্রা থেকে 'যাত্রা' এবং তারপর 'যাত্রা-আলকাপে'র সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অভিধাটিকে একটি সমাসবদ্ধ পদ রূপে দেখতে চান, যার ব্যাসবাক্য এই রকম হতে পারে : যাত্রাযুক্ত আলকাপ, কিংবা যা যাত্রা তাই আলকাপ* ]। তা ছাড়া, 'যাত্রা' কথার অর্থ 'অভিনয়' হতে পারে না [ *বিনয় বাবুর স্মরণ থাকা উচিত ছিল, 'যাত্রা' অভিনয় না হলেও নাটক অর্থেই প্রচলিত* ]. . 'আলকাপ' কথার শব্দার্থ হল

হাস্যকৌতুকোদ্দীপক অভিনয় এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপও তাই। আলকাপের বর্তমান আনুষ্ঠানিক রূপ বহু প্রাচীন লোকায়ত ধারা থেকে ক্রমোদভূত এবং উৎস সন্ধান করতে হলে আদিবাসীদের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্তর পর্যন্ত যেতে হয়। . . ." — পৃ. ৬৯। তিনি এই শেষ প্রসঙ্গটির উল্লেখমাত্র করেছেন, কিন্তু সেই উৎসে নিজে যাবার চেষ্টা করেন নি, দুর্ভাগ্য সেটাই।

'আল' ও 'কাপ' যে সংযুক্ত দু'টি শব্দ, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সংশয়টা এই দুয়ের পৃথক দুটি অর্থ নিয়ে। 'আল'-এর পর কেবল 'কাপ' নয়, 'কাচ / কেচ' ও মিলেছে। কাজেই আমাদের আলোচ্য দাঁড়ালো তিনটি শব্দ : আল, কাপ, এবং কাচ (কেচ)। এই তিনটি শব্দের নিজস্ব অর্থ এবং তিনটির মধ্যে দুটি কোন অর্থে আল'-এর সঙ্গে যুক্ত জড়িত, সেটাই এখন বিবেচ্য। কাপ-এর আগে কাটা-ও পাই, যেমন, 'আলকাটা কাপ'। 'কাপ কাটা' একটি ইডিয়ম রূপেও পেয়েছি। যেসব, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে গোপাল দাসের লেখা একটি গম্ভীরা গানের বন্দনা-অংশে ছিল *(লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা। জুন, ১৯৮২ / ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ। পৃ. ৬০)*

> লম্বা কোঁচা জুতা-কোতা, ছাইমাখা যার বাপ রে —
> নবাবিতে বাদশাহিতে গণশার কাটা কাপ রে।।

'কাপ কাটা' (তুলনীয় : ছড়াকাটা) মানে কাপ করা। পূর্বোক্ত 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধানে' পাই : রাজশাহীতে 'কাপ করা', ন্যাকামি করা। উদাহরণ : 'গুরুজনের সামনে কাপ করা উচিত নয়।' রাজসাহীতেই 'কাপ ধরা' মানে 'ভান করা'। রংপুরে তেমনি পাচ্ছি — 'আলকাটা', ভান করা অর্থেই। দেখা যাচ্ছে 'আল' এবং 'কাপ' উভয় শব্দের সঙ্গেই 'কাটা', 'ধরা' প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

'কাপ' মধ্য বা অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলাতে বেশ ব্যবহৃত হয়েছে। 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'অন্নদামঙ্গলা' থেকে তার উদাহরণ অনেকেই দিয়েছেন, কাজেই আমরা তার পুনরাবৃত্তি করছি না। কিন্তু এ বিষয়ে একটি বিতর্কও আছে। হরিচরণ 'কাপট্য' থেকে 'কাপ' শব্দের উদ্ভব ধরেছেন, শহীদুল্লাহ সেখানে সংকল্প > প্রা. কপ্প. > কাপ ধরেছেন। অর্থ : 'সন্দেহ'। তারপর অর্থপ্রসারে, মধ্য বাংলায় 'ছদ্মরূপ'। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এবং শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'বাংলা দেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এ *(বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ডিসেম্বর ১৯৭৪ ( জুন, ১৯৮৪)* ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' 'কাপ' শব্দের দুবারের ব্যবহারে দু'রকম অর্থ দেওয়া হয়েছে, এটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম অর্থ : বিশেষ্য : ভান, কপটতা, ছলনা। ভারতচন্দ্রে : 'লোকে বলে পাপ কাপ ক'দিন লুকায়।' আর দ্বিতীয় অর্থটি সংস্কৃত 'কাপট্য' জাত। 'কৌতুককারী' অর্থে।

ভারতচন্দ্রে : 'কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।' একই ভারতচন্দ্রের রচনা থেকে দুই অর্থে 'কাপ'-এর এই দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'আলকাপ' পদের অর্থ শহীদুল্লাহ-ও একাধিক দিয়েছেন, এবং একই জেলা থেকে। যেমন, রাজশাহীতে বিশেষ্যরূপে এর অর্থ 'গ্রাম্যগান বিশেষ' ; আবার সেই রাজশাহীতেই, বিশেষ্য রূপে এর অর্থ : 'তামাশা'। পাবনা জেলাতে তেমনি বিশেষ্য রূপেই এর অর্থ : 'গম্ভীরা গান'। এই শেষোক্ত অর্থ থেকে গম্ভীরা ও আলকাপের সংযোগ কেবল দৃঢ়ই হয় না, গম্ভীরার প্রতিশব্দ রূপে এখানে আলকাপকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থে এটির প্রয়োগ ঘটেছে বটে, তবে সেই সব বিভিন্ন অর্থের মধ্যে যোগসম্বন্ধও নির্ণয় করা কঠিন নয়।

মালদহে পদটির অর্থ — ঠাট্টা, তামাশা। [ *লক্ষণীয়— মহারাষ্ট্রে লোকনাট্যকে 'তামাশা' বলে, যা মূলত একটি আরবি শব্দ* ]। 'মালদহের গ্রাম্য শব্দ' *(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ ১ম সংখ্যা। পৃ. ৯৩)* প্রবন্ধে আমরা পেয়েছি 'আলকোটান', স্ত্রীলিঙ্গে 'আলকোটানী', অপরের 'নিন্দাকারী' অর্থে।

এইবার আমাদের কথা বলি। 'চলন্তিকা'য় রাজশেখর বসু 'আলি' শব্দের একটি অর্থ দিয়েছেন : শ্রেণী, মালা। উদাহরণ দিয়েছেন 'গীতালি', অর্থাৎ গীতের মালা, একাধিক গীতের সমষ্টি যা। আলি > আইলা > আ'ল (স্বরলোপ, Vowel elision) সহজেই করা যায়। তাহলে 'আলকাপ' পদের অর্থ দাঁড়ায়, যে কাপে একাধিক গীতির সমাহার বা গীতিমালা থাকে। বস্তুতই তাই আলকাপের আদিরূপ যদি দুটি জুটিচরিত্রের গানে-গানে সংলাপকে *(গানে-গানে দুই চরিত্রের সংলাপকে বলে 'eclogue')* বোঝানো হয়, তবে 'আল' শব্দটিকে মূলত সেই অর্থে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

এইখানে 'কাটা' শব্দের কথা বলি। পূর্বে 'কাটা'-কে একটি ইডিয়ম রূপে দেখে এসেছি। এইবার এটিকে বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত বিশেষ একটি অর্থে গ্রহণ করা যায়। 'কাটা'কে যদি 'যুক্ত' বা 'জড়িত' অর্থ গ্রহণ করি, তখন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যেমন ডোরাকাটা বাঘ, ডোরাযুক্ত বাঘ। ডোরাকাটা শাড়ি। বুটিকাটা শাড়ি, বুটিদার শাড়ি। অতএব, 'আলকাটা কাপ' অর্থ : বহু একাধিক গীতিমালা যুক্ত যে 'কাপ'। যাঁরা আকুল (এলোমেলো) অর্থে > আউল > আওল > আল-এর উদ্ভবে বিশ্বাসী, তাঁরা এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

'আল' শব্দকে 'গীতিমালা' রূপে গ্রহণের সপক্ষে আর একটি যুক্তি এই : আজ আমরা লোকসাহিত্যের যে বর্গটিকে 'ছড়া' নামে চিনি, সেই ছড়া শব্দটি ঠিক এই অর্থে বেশি

দিন হল চালু হয়নি। বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে প্রবাদ-ছড়ার কোনো পৃথক প্রতিশব্দ নেই। সবই 'শ্লোক' শব্দজাত শোলোক, শিলুক, শিলংকা-ছিল্কা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়। 'ছড়া' শব্দটির অর্থ হল সমষ্টি *(এক ছড়া কলা, এক ছড়া ধান বহু কলা বা ধানের সমষ্টি। এক ছড়া মালা, ফুলের মালা হলে বহু ফুলের সমষ্টি, সোনার মালা হলে একই ডিজাইন বা নকসার সমষ্টি)*। উনবিংশ শতাব্দীতে কবি-তরজা-পাঁচালির আসরে ছড়া বলা হত। কিন্তু কখনোই সেই ছড়া একটি মাত্র থাকত না। তা পরপর বলে যাওয়া হত ; এবং প্রতিযোগিতামূলক হলে দুই পক্ষেই পর পর বহু ছড়া বলা হত। ছড়া এবং গান পর পর বলা হত। ছড়া শব্দের প্রচার-প্রসার তখন থেকেই। ছড়া শব্দের প্রথম প্রয়োগ মূলত কবি-তরজার আসরে, তারপর তা শ্লোক-শব্দজাত শব্দাবলীকে হঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমন, 'রূপকথা' এসে 'উপকথা'কে হঠিয়ে দিয়েছে। তখনকার দিনে ছড়া বা গান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পর পর মালা রূপে গীত-কথিত হত। ছড়াকাটাকাটি ছিল (to cap verses) তখনকার একটি বিশেষত্ব, এবং তাতেও থাকত পর পর একাধিক ছড়া, সঙ্গে একটি একটি করে গানও। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সঙ্গীত ও ছড়া সংস্কৃতির পটভূমিকায় 'আল' শব্দের এই অর্থ (মালা, শ্রেণী) গ্রহণযোগ্য কিনা গবেষকগণ ভেবে দেখবেন।

গম্ভীরা-আলকাপ-ডোমনি, কোনোটাই কেবল একটিমাত্র অনুষ্ঠানের গান নয়। সব কটিরই নানা পর্যায় আছে। 'বন্দনা' দিয়ে শুরু, তারপর নানা পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করে পালাতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। বলা যায়, এই সব স্তর বা পর্যায়ের সমষ্টি বা 'মালা' যেন এই ধরনের সব কটি গান। তবে কেবল আলকাপের ক্ষেত্রেই কেন এই 'মালা' প্রাধান্য পেল? মনে হয়, যে দুটি চরিত্রের পর পর গান নিয়ে আলকাপ গানের সূচনা হয়েছিল, তাকে স্মরণে রেখেই এই নাম এসে গেছে। মনে রাখতে হবে, কেবল 'আল' কখনোই ব্যবহৃত হয় নি। সঙ্গে 'কাপ' বা 'কাচ / কেচ' ব্যবহৃত হয়েছে। 'কাপ' বা 'কাচ' / কেচটিই মূল বা প্রধান। এই জন্য কাপকারীকে 'কাপ্যা', 'কাইপ্যা', 'কেইপ্যা' (কাপ + ইয়া) বলা হয়।

আগেই বলেছি, আলকাপ একটি সমাসবদ্ধ পদ। আমরা এই সমাসবদ্ধ পদটিকে এইভাবে ব্যক্ত করতে পারি : ক. যা আল, তাই কাপ : অভেদ সম্বন্ধে একার্থবোধক দুই পদের (বিশেষ্য + বিশেষ্য) কর্মধারয় সমাস। খ. আলযুক্ত কাপ, মধ্যপদলোপী সমাস। কিংবা, আল কাটা (= যুক্ত) কাপ। আল, কাপ এবং কাচ — এই তিনটি বিশেষ্য পদ এখানে জুটেছে। এক একটি কখনো সমার্থক, কখনো আনুষঙ্গিক অর্থে। যেমন, জাপানী 'Kabuki' [ Ka = song ; Bu = dance : Ki = art ]।

'কাচ'ও পরপদরূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে : আলকাচ, কালীকাচ, যুগীকাচ, হরগৌরীকাচ, শেষে পাই 'ডোমকাচ'। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত তাঁর 'গ্রামের স্মৃতি' প্রবন্ধে *(প্রবাসী। আশ্বিন, ১৩৫৫। পৃ. ৫২৩-৫২৮)* জানাচ্ছেন, পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে যে 'কালীকাচ' তিনি দেখেছেন, তাকে "কালীর সং বা নাচ" বলা হত। মশালের আলোয়, নিশুতি রাতে তা অনুষ্ঠিত হত। 'কাচ'কে এখানে সরাসরি 'সং' বলা হয়েছে। সমধাতুজ কর্ম রূপে (cognate object) পাই — 'কাচ কাচা'। অর্থাৎ কাচ-রূপ ধারণ করা। কাপ বা কাচ কখনো ইডিয়ম রূপে, কখনো সমধাতুজ কর্মরূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে — বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগুলির পরিচয়ের ব্যাপকতার দিকটি।

জনৈক বাংলাদেশি গবেষক, হাবিবুর রহমান, তাঁর 'বাংলা দেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ' *(বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৮২। পৃ. ১৩২-১৩৩)* বইতে যখন বলেন, "আলকাপ হিন্দু প্রভাবিত গম্ভীরার মুসলিম সংস্করণ", তখন মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির আলোকে এই উক্তিকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি এবং দুই বাংলার অনেক গবেষকই 'কাপ' কথাটিকে একটি আরবি শব্দ *(যার অর্থ তিনি দিয়েছেন 'ন্যাকামো' বা 'কৌতুককরা')* বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ কোন্ অভিধানে এই অর্থ প্রদত্ত হয়েছে, তার উল্লেখ করেন নি।

শহীদুল্লাহ্ যে সংস্কৃত 'কল্প' শব্দ থেকে, প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে, বাঙলায় 'কাপ' শব্দের উদ্ভব প্রদর্শন করেছেন, মনে হয় সেটাই যথার্থ। কাপ এবং কাচ সমার্থক ; দুটি শব্দই সং-এর অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয় বটে, তবে 'কাচ'-এর সঙ্গেই 'সং'-এর প্রয়োগ পরিমাণে বেশি। 'সং' কিন্তু নানা রকমের ছিল এবং বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বের করা হত। চৈত্র সংক্রান্তিতে, ঢাকার রথযাত্রায়, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের 'চোর-চুন্নী' গানের সময়, বর্ধমানে ভাদু বিসর্জনের দিন কিংবা বীরভূমে ভাঁজো পরবে *(ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে)* পুরুষদের সং, পুরুলিয়াতে 'রোহণ' বা 'রোহিণে'র সং *(= কাপ। জ্যৈষ্ঠ মাস, রোহিনী ন( ত্রযুক্ত( মাস। এই মাসের ১৩ তারিখে অনুষ্ঠেয়। পু( যেরা গাছের বাকল, পাতা দিয়ে মুখোস তৈরি করে মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ-কৌতুক করে)* প্রভৃতি। পশ্চিম দিনাজপুরের ব-খেলায় কৌতুক নক্শা ধর্মিতা ; বীরভূমের লেটো গানের অন্তর্ভুক্ত 'লেট্যে সঙেল' *(তুলনীয় : উত্তরবঙ্গের 'নটুয়া' পদ। সং + ল)* ; এ ছাড়া ছিল যাত্রার সং *(মূল যাত্রা আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোনো সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে সং। সং থাকত দু' রকমের। এক, তারিফ বা প্রশংসার সং, আর নিন্দা বা কৌতুকের সং। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জানিয়েছেন, এই তারিফের সংকেই বলে — 'মট্রু' (মালদহের প্রখ্যাত গম্ভীরা শিল্পীর নাম কি তারই প্রতিধবনি?)* ; গ্রামের জমিদার

বাড়ীর বিয়ে ইত্যাদিতে বের করা সং *(যেমন, শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে)*। অর্থাৎ বাঙালির দুটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য : যে কোনো ঘটনাকেই অবলম্বন করে ছড়া রচনা করা *(ইউরোপেও এ ধরনের রচনার প্রচলন আছে। একে 'Occasional verse' বলে। এবং আঞ্চলিক ভাষাতেই তা রচনা করা, যার নাম — 'Dialect verse')* ; দ্বিতীয়ত, যে কোনো ঘটনাকেই অবলম্বন করে সং বের করা। কথায় বলে — 'রং, ঢং, সং'। সত্যিই এ দুটি সর্বার্থেই বঙ্গজীবনের অঙ্গ। সং আবার দু'রকমের : মানুষ সং, পুতুল সং *(বর্ধমানের কোনো কোনো অঞ্চলে। কৃষ্ণনগর থেকে এ জন্যে পুতুল তৈরি করিয়ে আনা হয়, গোরুর গাড়িতে স্থাপন করে তা গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। স্থানীয় ভাষায় একে বলে 'থাকা')*। মানুষ সং বহুলই মূক থাকে *(তুলনীয় : ব্যালে নাচের মূকাভিনয়)*, কখনো বা সে চলিষ্ণু, কখনো একক, কখনো সমবেত, কখনো অভিনয় রত *(স্মরণীয় 'সং-যাত্রা', সং-এর শোভাযাত্রা)*। সং-এর সঙ্গে ছড়াও যুক্ত। সং যখন চলমান, তখন তার টীকা-মন্তব্য Reference -এর জন্য ছড়া বলা বা গাওয়া হয় *(এসব ছড়ার নিদর্শনের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা', এপ্রিল, ১৯৭৯)*।

কাচ-কাপ-সং অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে গেছে, সঙ্গত কারণেই তা হয়েছে। এগুলি বাঙালির লোকজীবনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত। সে কথাটিই বোঝাবার জন্য ওপরের কথাগুলি বললাম। হয়তো অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাইয়ের লেখা একটি প্রবন্ধ *(Probable Persian influence on Folk Dramas of Northern Bengal : Folk lore, Vol. 2-3 ; January, 1978)* দ্বারা কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রাণিত হয়ে থাকবেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের লক্ষ করা উচিত ছিল, উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের ধারাটির পেছনে আছে মূলত আনুষ্ঠানিক কারণ, এবং তা সম্পূর্ণই দেশজ। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবি-ফারসির প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকার্য, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা স্বীকার্য নয়। তিনি যাকে 'Probable' বলেছিলেন, পরবর্তী কোনো কোনো গবেষক তাকেই 'নিশ্চিত' একটি ব্যাপার বলে মনে করেছেন। মালদহের গম্ভীরা গানের অবক্ষয়ের নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেই অবক্ষয়ের ফলেই তা বাংলা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে Relocated হয়েছে *(দ্র. পূর্বোক্ত হাবিবুর রহমানের গ্রন্থ)*, এমন কথা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। জারি এবং 'গাজির গীতে'র মধ্যেও তো লোকনাট্যের অনেক নিদর্শন মেলে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সেগুলি এসেছে, তার জন্য অন্য কোনো প্রভাবের প্রয়োজন হয়নি। যশোহর জেলাতে গাজির গীত নমঃশূদ্ররাও গেয়ে থাকে।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' *(প্রথম খণ্ড / ভাদ্র, ১৩৭৩ / পৃ. ১২০)* গ্রন্থেও 'আলকাপ' সম্পর্কে সরাসরি মন্তব্য করেছেন ঃ "ইহা প্রধানতঃ মুসলমান কৃষক সমাজেই প্রচলিত ; সেইজন্য ইহার নামটিও মুসলমান

সমাজ হইতেই আসিয়াছে।" 'আলকাপ' নামটি 'মুসলমান সমাজ হইতেই' আসিয়াছে, আমাদের উপরে উদ্ধৃত তথ্যের আলোকে তাঁর এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণীয় সে ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

।। পাঁচ ।।

লোকসাহিত্যের একটি বড়ো লক্ষণই হল — লোকজীবন, সমাজ, মন ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার বিবর্তন ও বিবর্ধন। এ এক অপ্রতিরোধ্য ব্যাপার। চার দশক আগে প্রান্ত - উত্তরবঙ্গের 'চোর-চুন্নী' গান ছিল নীতিসংলাপময় দুটি উক্তি। একটি চোরের, অপরটি চোরনীর। এখন এ গান আখ্যানের আকার নিয়ে বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ পালাগানের দিকে ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছে। আলকাপও তাই। মূলত তা ছিল গান, এখন ভূমিকা রূপে কয়েকটি পর্যায় শেষ করে পালাবন্দি আখ্যানের দিকে তার পরিণতি লক্ষ করা যাচ্ছে। 'আলকাপ' বলতে এখন লোকনাট্যেরই একটি সমনাম বোঝায়। কিংবা, অঞ্চল বিশেষে গিয়ে তা ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়েছে। দুই বাঙলা থেকে এর দুটি নিদর্শন এখানে তুলে ধরছি।

একটি বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 'কাঠুরিয়ার আলকাপ' *(লোকসাহিত্য সঙ্কলন ৪১। লোকনাট্য। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫। মোহাম্মদ সাহদুর-সম্পাদিত। পৃ. ৫-১৮)* ; অপর নিদর্শনটি বীরভূম এবং সন্নিহিত অঞ্চলে আলকাপের সমনাম-প্রতিশব্দরূপে 'ছেঁছর / ছ্যাঁচড়' গান। ডঃ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত প্রবন্ধে 'তারাশঙ্কর : রাঢ়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি'তে *(লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। 'শতবর্ষে তারাশঙ্কর' বিশেষ সংখ্যা। পৃ. ৩১০-৩৪৪)* এই 'ছেঁছর / ছ্যাঁচড়' গানের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মূল অবলম্বন তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে এই বিশেষ ধরনের গান সম্পর্কে তারাশঙ্করের মন্তব্য : "শ্রমিক ও শ্রমিক চাষীদের গান বাজনার দল। পশ্চিম বাঙলার এই ধরনের দলকে বলে ছ্যাঁচড়ার দল।" অর্থাৎ মালদহ থেকেই যদি আলকাপ গানের উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তা একদিকে রাজশাহী অঞ্চলে গিয়ে লোকনাট্যের রূপ নিয়েছে ; বীরভূম এবং সন্নিহিত অঞ্চলে গিয়ে তা 'ছ্যাঁচড়' গান নাম পেয়েছে। একই আলকাপ গানের দুই ভিন্ন পরিণতি দেখা যাচ্ছে। এই ভিন্ন পরিণতির মধ্যে কোনো যোগাযোগ লক্ষ করা যায় কিনা, এবার তাই আলোচ্য।

'কাঠুরিয়ার আলকাপ' প্রসঙ্গে সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদুর জানিয়েছেন, আলকাপের 'অভিনয় অংশ' ছাড়া আরো চারটি অংশ আছে : ক. বন্দনা ; খ. খেমটা ; গ. গান ;

ঘ. 'ফার্স' বা রঙকৌতুক। বলা বাহুল্য, এই পর্যায় বিভাগ মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গেও মেলে। মোহাম্মদ সাইদুর তাঁর সংকলনে 'অভিনয় অংশ'টিকেই প্রধান অংশ ধরে 'কাঠুরিয়ার আলকাপ' অংশ ছেপেছেন। যদিও তিনি বলেছেন, ফার্স বা রঙ-কৌতুকের গান এবং খেমটা গানের সঙ্কলন পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, কার্যকালে তা দেওয়া হয়নি। তা দেওয়া হোক বা না হোক, সেটা আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। আমাদের উদ্দিষ্ট 'অভিনয় অংশ'টিকেই 'আলকাপ' বলে উল্লেখ করবার প্রবণতাটি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য অংশ অপ্রধান বা গৌণ হয়ে উঠেছে, 'অভিনয় অংশ'ই শেষে আলকাপ নামে পরিচিতি ও প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, 'কাঠুরিয়ার আলকাপে'র আখ্যান আসলে একটি পরিচিত রূপকথা। সাধারণ লোকনাট্যের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য নেই। যদি 'আলকাপ' এই অভিধা বর্জন করাও হত, তাতে লোকনাট্য হিসেবে এর কোনো ক্ষতিই হত না। ফলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, লোকনাট্যেরই প্রতিশব্দ বা সমনাম — 'আলকাপ'। গ্রাম-বাংলার লোকনাট্য বলতে 'পালা' বা 'পালাগান'কে বোঝানো হয় ; এবং, উত্তরবঙ্গেরই রংপুর জেলাতে তাকে 'ছোকরা-নাচা গান' *(রাজশাহীর আলকাপ গানের যে অংশকে 'খেমটা' বলা হয়েছে, ছোকরারাই 'খেমটা' সাজে)* বলা হয়। সেখানে সেই 'পালাগান'কেই যখন সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদুর 'আলকাপ' নামে চিহ্নিত করেন, তখন বুঝতেই হবে পালা বা পালাগানেরই সমনাম সেখানে আলকাপ হয়ে গেছে। এটিকে 'কাঠুরিয়ার পালা' বললে কিছুই যেত বা আসত না। সেখানকার দর্শক-শ্রোতারাও সমনামের এই বিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আলকাপ গানের Form টি মোটামুটি এক ; উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় এতে আছে একাধিক পর্যায় বা পর্ব ; এবং, দুটি ক্ষেত্রেই সবার শেষে আছে পালাবন্ধি গান, যা আসলে আখ্যানের উপস্থাপন। কিন্তু লক্ষণীয়, বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে শেষ পর্বটিই প্রাধান্য পেয়েছে, অর্থাৎ অংশই সমগ্রের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে, ভাষা - বিজ্ঞানের ভাষায় এখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে। আবার, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলে যখন সেই আলকাপকে 'ছ্যাঁচড়' বলা হয়, তখনও সমগ্র আলকাপ গান একটিমাত্র অংশে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গটি একটু বিস্তৃত হবার অপেক্ষা রাখে।

ডঃ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে 'ছ্যাঁচড়' গানের পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ "অভিনয়ই আলকাপের মুখ্য ভাগ, সঙ্গে কিছু নাচ, গান, ছড়াও স্থান পায়। নাচ-গান, শাস্ত্র-পুরাণ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, অশ্লীলতা — সব মিশে থাকে বলে বীরভূমে এর অপর নাম — ছ্যাঁচড়া" অর্থাৎ এখানে রঞ্জিত বাবু ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে

বিচার না করে এই পরিভাষিক শব্দটির অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে Folk etymology বা লোকনিরুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন।

আলকাপের বিভিন্ন পর্যায় বা পর্বের মধ্যে 'ফার্স' বা 'রং' *(আসলে 'রঙ্গ' থেকে আগত)* একটি পর্যায়, এই অংশই ছিল আদি আলকাপ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে এবং রাঢ়ের অংশ বিশেষে এই অংশটির নাম 'চাঁচর', 'ছ্যাঁচড়' অভিধার উদ্ভব সেই শব্দটি থেকেই। গোটা উত্তর ভারতেই শব্দটির প্রচলন আছে, অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গে। অভিধান মতে এর অর্থ : দোল পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে আগুন জ্বালিয়ে খেলা, নেড়া পোড়ানো। এটি একটি তদ্ভব শব্দ, সংস্কৃত 'চর্চরী' থেকে আগত। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' আছে : সংচর্চ্চরী > চংচরী > বাং চাঁচরী, চাঁচর। হিন্দীতে চাচর, চাচরি। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে : 'চাঁচরী খেলাওঁ মোত্রঁ'। 'চাঁচর' উপলক্ষে যে খেলা-তামাশা, অর্থের এবং প্রসঙ্গের প্রসারে তাইই আলকাপের অন্যতম পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। এখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে যে কেউ কেউ 'ধামালি' ও জাগ গানের প্রভাব দেখেছেন (যথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন দাস। (দ্র. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ)। সেই 'ধামালি'র অন্তর্নিহিত রঙ্গকৌতুকের সঙ্গে এই 'চাঁচর' তুলনীয়। দ্বিতীয়ত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'দুষ্ট প্রতারক' অর্থে 'আছিদ্দর' কথাটি পাওয়া যাচ্ছে, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে এখনও মেলে (যেমন, একটি বিয়ের গানে : 'আছিদ্দরের বেটাটা')। শব্দটির Aphetic রূপ অর্থাৎ আদিস্বর লোক-জাত রূপ হল 'ছিত্বর'। 'চলন্তিকা' অভিধানে পাই : ছিত্বর > ছেঁচড়, ছ্যাঁচড়। 'কাপ' শব্দের যে নানা অর্থ পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি, তার অন্যতম একটি অর্থরূপে ছেঁচড় / ছ্যাঁচড়কে গ্রহণ করা যায়। তবে, 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' এ বিষয়ে ভিন্ন ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে : সূচক > চোর > ছেঁচড়, ছেঁচড়া। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত 'গোপীচাঁদের গান' থেকে 'ছেছড়ি বেটি'। অর্থ : খল, নীচপ্রকৃতি, ধূর্ত। হিন্দীতে : ছিছোরা ছিছোড়, তুল : ছেঁচড়া। হরিচরণের মতে, সূচক > ছুচকা, ছিঁচকা 'কাপ' শব্দের অন্তর্নিহিত এভাবেও এখানে লক্ষ করা যায়।

আসলে ডোমনি - বোলান - আলকাপ সবেরই গঠনভঙ্গি কিছু Incondite, শিথিলবদ্ধ, এলোমেলো। অনেকগুলি পর্ব পর্যায়ের যোগফল বলেই এমনটা মনে হয়। এ জন্যেই আবার কেউ একে বলতে চান 'পঞ্চরসে'র গান। পাঁচের অপর অর্থ হল, এই গীতিধারার পাঁচটি পর্ব বা পর্যায়। এ জন্যই রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় মশাই একে 'পাঁচ মিশেলি ব্যঞ্জন' বলেন ;কিংবা কেউ বলেন : আকুল > আউল, এলো, এলোমেলো। মধ্যযুগের বাঙলা

সাহিত্যের গঠনরীতির দিকে দৃষ্টি দিলে এমন কথা তাঁরা বলতেন না। ধরা যাক, মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপনরীতির দিকটি। মূল আখ্যানের ক্ষেত্রে কবিরা কখনই সহজে এবং সহসা এসে পড়তেন না। স্বর্গখন্ড মর্ত্যখন্ডের বিভাজন তো ছিলই ; বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ, সৃষ্টি পত্তন, আত্মবিবরণী প্রদান : এবং যখনই যে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে, সেই ব্যাপারে বিস্তীর্ণ, বিশদ তালিকা প্রদান *(যেমন, ফুল তুলতে গিয়ে যাবতীয় ফুলের তালিকা সঙ্কলন; রন্ধনের ক্ষেত্রে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের তালিকা উপস্থিত করা),* নাবীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা, বারমাস্যা, ইত্যাদি। এছাড়া ছিল নানা প্রকারের ধুয়া গান। বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য ও সমান্তরাল ধারার কাহিনী-ঘটনা-সংবাদের উল্লেখ। ফলে গঠনরীতিতে একটু সংহতির অভাব সেখানে থাকতই। এই মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই বাঙলার লোকনাট্যের কায়া নির্মিত হয়েছে, আলকাপও তার ব্যতিক্রম নয়।

আলকাপের গঠনরীতির মধ্যে কেউ কেউ দিনাজপুরের 'খন' গানের প্রভাব লক্ষ করেছেন *(দ্র. 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা' আষাঢ়, ১৩৮২। ডঃ সনৎকুমার মিত্র। পৃ. ১০৭-১০৮)*।

।। ছয় ।।

এইখানে বাঙলার লোকনাট্যের আর এক বিশেষত্বের কথা বলি। বাংলার লোকনাট্যগুলি একদিকে যেমন অঞ্চলভিত্তিক, তেমনি সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকগোষ্ঠীভিত্তিক। এই লোকগোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা বাংলার লোকনাট্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। অঞ্চলের এবং লোকগোষ্ঠীর ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে এক এক অঞ্চলে ও গোষ্ঠীতে একই লোকনাট্যের নানা সমনাম ও প্রতিশব্দের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি আবার অঞ্চল ও লোকগোষ্ঠীকে ভিত্তি করে অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস-ছোটোগল্পও লিখেছেন। আলকাপের প্রসঙ্গটি নিয়েও একাধিক উপন্যাস লিখিত হয়েছে। সেই সেই ঔপন্যাসিক তাঁদের পর্যবেক্ষণ দিয়ে আলকাপ গানের আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত বিশেষত্বকে তুলে ধরেছেন।

যেমন তারাশঙ্কর। তিনি যেমন রাঢ়ের বিশেষ অঞ্চলের ঝুমুর গানের ধারা নিয়ে 'কবি' উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি তাঁদের অঞ্চলের আলকাপকে তাঁর কোনো কোনো রচনায় স্থান দিয়েছেন। পূর্বোক্ত রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম', 'চাঁপা ডাঙার বৌ' প্রভৃতিতে আলকাপের পরিচায়ন লক্ষ করেছেন।

তারাশঙ্করের স্বগ্রাম এবং বীরভূমের কোনো কোনো অঞ্চলে আলকাপের যে আঞ্চলিক পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাকেই তিনি তাঁর কথাশিল্পের উপকরণে পরিণত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ সব তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মাত্র। 'কবি'তে যেমন তিনি ঝুমুরের দলের সংস্কৃতিকেই উপন্যাসের মূল বস্তু করে তুলেছিলেন, আলকাপকে তিনি সেই পর্যায়ে উন্নীত করেন নি। 'পঞ্চগ্রামে' তিনি বলেছেন : 'মুসলমানদের কাছে আলকাটার কাপ . . . দল।' শ্রমিক ও শ্রমিক চাষীদের গান বাজনার দল। একেই গবেষক 'ছ্যাঁচড়ার দল' আখ্যা দিয়েছেন। এই মন্তব্য থেকে যে কথাটি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, তা হল অভিধারূপে 'আলকাটার কাপ' এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে তার প্রচলন। 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকরে' অধ্যাপক আশুতোষ ভট্যাচার্যও ঠিক এই কথা বলেছেন (পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি), কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, এগুলির গান-অংশে "উচ্চভাবমূলক রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিষয়ক" দিকও আছে। কাজেই কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় দিয়ে আলকাপ গানের চরিত্র-পরিচয় নিরূপণ করা ঠিক নয়। হয়তো তা কেবল বীরভূম বা কতকাংশে মুর্শিদাবাদে দেখা যায়, হয়তো তারাশঙ্কর তাঁর নিজ অঞ্চলে তাইই দেখেছেন, — কিন্তু তার জন্যে গোটা আলকাপকেই একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়কেন্দ্রিক বললে আলকাপেরই পরিচয় সত্য হয়ে ওঠে না।

ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপ দলের অনেক অজানা তথ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি প্রবন্ধাদিও লিখেছেন *(দ্র. 'দেশ' সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৮৩)*। স্থানাভাবের জন্য তাঁর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম না বলে মনে আক্ষেপ থেকে গেল।

বরং, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' *(ফাল্গুন, ১৩৫৪)* উপন্যাসটির কথা বলি। আলকাপের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, আলকাপের বিষয়বস্তুর বিবর্তনের ক্ষেত্রে, এই উপন্যাসটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। আলকাপ গানকেই এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য করে তোলা হয়েছে। ভৌগোলিক পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে — দিনাজপুর জেলার *(অবিভক্ত)* দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে, যেখানকার মুচিসম্প্রদায়ের মধ্যে *(রবিদাস, রুইদাস)* এই গান চলিত ছিল। আর কালগত পরিবেশ, — একটি রাজনৈতিক পরিবেশ, একজন রবিদাস-সম্প্রদায়ের সংবেদনশীল কবির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার আভাস কিভাবে এসে পড়ছে, তারই বিবরণ। লেখক ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন : "বইয়ের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাঙলায় বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তিযুগ আর গণ আন্দোলন আসবার যুগ।" এই গণ-আন্দোলনেরই একটি উপায়রূপে এই উপন্যাসে আলকাপ গানকে গ্রহণ করা হয়েছে। আলকাপ গানে সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনার প্রথম যুগের একটি সাহিত্যিক দলিল হিসেবে উপন্যাসটিকে

গ্রহণ করা যায়। অনেক আলকাপ-শিল্পী যে আজ রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতি 'কমিটেড' হয়ে পড়েছেন, সেটাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রয়াত বিনয় ঘোষ তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে আলকাপ গানের দু'টি বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : এক, আলকাপগানের অশ্লীলতা, প্রসঙ্গটির কথায় পরে আসছি ; আর দুই, আলকাপ গানের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। আলকাপের মধ্যে যে 'সামাজিক জীবনের বাস্তবতা' দেখা যায়, তা যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিতে হয়, সেটা তিনি অনুমোদন করেন না। রাজনীতির উপস্থিতিকে তিনি "এক অস্বাভ . র উপাদান" বলে মনে করেন। পূর্বতন আলকাপ যখন এসব মুক্ত ছিল, সেই আলকাপকেই তিনি "অনেক ভাল, গাইতে ও শুনতে" বলে মনে করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক "আন্দোলনের পোষ্টার ধর্মী আলকাপের" চেয়ে "ছড়া গান সম্বলিত" আলকাপকে তিনি ভালোবাসেন। বিনয় ঘোষের এই মন্তব্যের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যা র 'বৈতালিক' উপন্যাসের আখ্যানটি মিলিয়ে পড়লে এই উক্তির মূল পটভূমিকা পরিস্ফুট হবে।

এই উপন্যাসে আলকাপ সম্পর্কে যে তথ্যা মেলে, তা এই · আলকাপ-শিল্পীকে 'আলকাপওয়ালা' এবং 'আলকাপওয়াল' দুইই ব . হয়েছে। যাত্রাদলের তুলনায় আলকাপদল গড়া সহজ — খরচপত্র নেই, সাজসজ্জার বালাই নেই। মন্তব্য : "আলকাপের পালা বাঁধা শক্ত নয় খানিকটা রসিকতা আর প্রচুর গান থাকলেই দলের নাম হয়ে যাবে। আশেপাশে দল নেই বললেই চলে, অথচ চাহিদা আছে প্রচুর।" আসরে শিল্পীর 'গলায় চাদর' থাকবে। জগবন্ধু নামে এক চরিত্র আলকাপগানের পরিচয় দিচ্ছে এই বলে : ". . . আলকাপ? আলকাপ মানে জানেন না? রসের গান, কেচ্ছার গান"। তারপর সেই জগবন্ধুই এর পরিচয় বিশদ করে .

"সমাজের যে সব গলদ আর ত্রুটি - বিচ্যুতি আছে, রসিকতার সঙ্গে বিদ্রূপের কড়া চাবুক মিলিয়ে সেগুলোকে পরি. শেন করা হয়। দরকার হলে বাস্তব নর-নারী পর্যন্ত বাদ পড়ে না — তা সে যতই ক্ষমত ালী হোক — সমাজে যা খুশী প্রতিপত্তিই তার থাকুক।" তবে শুধু আক্রমণই নয়, লঘু কৌতুক হালকা হাসি ও কাহিনীর আকারে নাচে এবং গানে শুনিয়ে দেওয়া হয়। বংশী মাস্টার, যিনি একজন 'অ্যাবস্‌কন্ডার', তিনিই নায়ক যোগেনকে শেখালেন — আলকাপ গানের মধ্যে কীভাবে মহাজনের অত্যাচারের 'প্রতিবাদ' করতে হয়। যে কবি-শিল্পী এ কাজ করেন, তাঁদের তিনি 'চারণ', বৈতালিক আখ্যা দিয়েছেন। সরস্বতী পূজো উপলক্ষে সেখানে এবার আলকাপ গান হবে। কিন্তু এবার আলকাপের বিষয়বস্তু আলাদা। বলাই নামে এক চরিত্র সেই পরিবর্তিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে আশঙ্কাময় বিস্ময় প্রকাশ করেছে এই বলে : "আলকাপ গান হামরা যিটা জানি, সিটা তো কাপ। রং হেবে (হবে), তামাশা হেবে। মানুষ মজা করিবে,

হাসিবে। কিন্তুক্ তুমার ই গান দেখি হামার ডর ধরোছে দাদা।" কিন্তু এর আগে আলকাপ ছিল কৌতুক - তামাশার। যেমন,

হায় হায় কলির কান্ড — কিবে চমৎকার
মা'র পরনে ছিঁড়া কাপড়, বৌয়ের গলাত্ রত্নহার।।
আপন ভাইয়ক পর করিয়া,
ফুরতি করে শালাক লিয়া -
বাপক্ কহে নকর ওার।
হায় গো, কলির কান্ডদাদা, - কিবে চমৎকার।।

।। সাত ।।

লোকনাট্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্যরস। এই হাস্যরসের সূত্র ধরেই, পিছু-পিছু Coprology বা অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা ঘটে। হাস্যরস পরিবেশন, তা যেভাবেই হোক না, বিশ্বের সকল দেশের লোকনাট্যের মূল ও স্থূল বিশেষত্ব। এরই মাধ্যমে গণ-ক্ষেপণ (communication) ঘটে। এই 'লোকহাসানিয়া' চরিত্রটির ওপরেই লোকনাট্যের সুনাম-সাফল্য নির্ভর করে। হাস্যরস প্রাধান্য পায় বলেই হুগলি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকনাট্যকেই 'ভাঁড়যাত্রা' (তুলনীয় : গুজরাটের 'ভাঁড়ের যাত্রা') বলা হয়। সংস্কৃত নাটকের 'বিদূষক' চরিত্রের সঙ্গে লোকনাট্যের 'লোকহাসানিয়া' চরিত্রের প্রকার-পরিমাণগত তফাত আছে। এসব চরিত্রের বেশ-বাসও হাস্যোদ্দীপক। অনেক কমেডি ও প্রহসন নাটকে যে হাস্যরসাত্মক চরিত্র থাকে, সেগুলির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনাতে সে দেশের লোকনাট্যের প্রভাব থাকে। লোকনাট্যের নানা আঙ্গিকও শিষ্ট সাহিত্যের নাটকে গৃহীত-প্রযুক্ত হয়ে থাকে *(দ্র. বাংলাদেশি গবেষক সৈকত আসগর [ তাঁর মূল নাম মোহাম্মদ আসগর আলী সরকার ]-এর 'আধুনিক বাঙলা নাটকে লোকনাট্যের আঙ্গিক'। ঢাকা, ১৯৯৪)।*

আলকাপেও একজন 'লোকহাসানিয়া' চরিত্র থাকে, আলকাপ গানে একে বলে 'ল্যাবার' বা 'লাবব্যার'। 'ডোমনি' পালাতেও এই চরিত্রটিকে মেলে *(দ্র. সুবোধ চৌধুরী 'ডোমনি' জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ. ৯৮, ১০৬)*। তবে আলকাপের 'ল্যাবার' এবং ডোমনির 'ল্যাবার'-এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। আলকাপের 'ল্যাবার' নায়িকাবেশী ছোকরা রঙ্গকৌতুক করে, আখ্যানের মধ্যে তার ভূমিকা সক্রিয় নয়। কিন্তু 'ডোমনি' পালাতে তার ভূমিকা সক্রিয়তর : "কোনো কোনো সময় বিনা আহ্বানেই একজন কেউ উঠে পাত্রপাত্রীর

কথাবার্তার মাঝখানে তার নাক গলিয়ে দেয়। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি সাধারণত বিদূষক *('ল্যাবার' বা জোকার)*-এর ভূমিকা পালন করে থাকে। এরাই শেষ সমাপ্তি ঘটায়।" কিন্তু ভূমিকা সক্রিয় হলেও হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলকাপের 'ল্যাবার' বা 'লাবব্যার'-এর গুরুত্ব অধিক বলে মনে হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই 'ল্যাবার' শব্দের মূল অর্থ কী। এ বিষয়েও 'লোকনিরুক্তি'র অভাব নেই। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' একটি তদ্ভব শব্দ পাওয়া যাচ্ছে : 'লাফা' < সং 'লাপ'। মারাঠিতে পাওয়া গেছে 'লাফা'। অর্থ : গল্প, অতিরঞ্জিত গল্প। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে : বিক্রমাদিত্যের লাফা, অর্থাৎ বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্প। আমাদের মতে : লাফা + কার > লাফাকার > লাব্‌বার, যে সব কিছুকে অতিরঞ্জন করে দেখিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করে থাকে। কিংবা, আর একটি বিকল্প অনুমান : সংলাপ + কার > লাপকার > লাব্‌বার। এরপর লাবার, ল্যাবার। 'লাপ' শব্দের অপর একটি অর্থ : কথন, প্রহেলিকাবিশেষ এবং তার ভাষী যে। যেন অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রহেলিকাবৎ ভাষায় কোনো বিষয় প্রসঙ্গকে যে তুলে ধরে।

আলকাপের আসরে হাস্যপরিবেশনের আর একটি দিক হল — 'টেলার'। যেমন হাওড়ার পুতুলনাচের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যগীতাদি পরিবেশিত হয়, আলকাপের আসরেও তেমনি অভিনয় ও নাচের ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো হাস্যরসাত্মক কাহিনী পরিবেশিত হয়, তাকেই বলে 'টেলার'। এই 'টেলার'-এর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তা সুযোগ-সুবিধেমতো উপস্থাপিত হতে পারে। এমন কি, কেউ কেউ জানিয়েছেন, টেলার-এর সঙ্গে মূকাভিনয়ও থাকতে পারে।

এই টেলার-এর অর্থ কী? মনে হয়, ইংরেজি Trailer থেকে এটি আগত, যার আভিধানিক অর্থ হল, বিজ্ঞাপনরূপে প্রদর্শিত আগামী চলচ্চিত্রাদির অংশ। এই 'অংশ' বা টুকরোটাই এখানকার উদ্দিষ্ট। দৈনিক ও সামাজিক জীবন থেকে তুলে নেওয়া টুকরো টুকরো ছবি। মূকাভিনয় নাটকের একটি বড়ো দিক, অনেক নাটকেই মূকাভিনয়ের দৃশ্য মেলে *(যেমন, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী')*। প্রতীক-সংকেত সৃষ্টি করবার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ফরাসী 'Tableau Vivant' (ফরাসী ভাষায় এর অর্থ জীবন্ত ছবি, চিত্র)-র কথা বলা যায়। অর্থাৎ চিত্রবৎ নীরব-নিশ্চল হয়ে অভিনয় করে যাওয়া।

সং (< স্বাঙ্গ) নীরব থাকে, সে মূক। সং-এর প্রতিশব্দ 'কাপ', এর অর্থও আগে বলে এসেছি। 'টেলার'-এর সঙ্গে তুলনীয় বোলানের 'হাপু-হারু-হাবু' গান, যা মূলত ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হাস্যরসাত্মক খন্ডগীতি। ইউরোপে একদা নাটক চলাকালে দুই

দৃশ্যের মাঝখানে ছোটো- ছোটো কাহিনী বা একই কাহিনীর খানিকটা করে অংশ গুঁজে দেওয়া হত, এবং এমনি করেই 'ফার্স' বা প্রহসনের উৎপত্তি হয়। এই বিভিন্ন দিকগুলি মিলিয়ে নিলে আমরা নাট্য জগতের এক আদি ও প্রাচীন স্তরে গিয়ে উপনীত হই।।

।। আট ।।

আলকাপের উপস্থাপন রীতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল আলকাপই নয়, আলকাপের মাতৃসমা গম্ভীরা এবং বোলান, ডোমনি সবের মধ্যেই একই উপস্থাপন রীতির অনুসরণ দেখা যায়। এই রীতি অতি প্রাচীন এবং আগেই বলেছি, তার জন্ম মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নিহিত আছে। বলা যায়, এই রীতি বাঙালির এক জাতীয় রীতি। জাতীয় রীতিই যদি না হবে, তবে বঙ্গের সর্বত্র যুগ-যুগ ধরে, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রায় অভিন্ন রীতির অনুবর্তন কেন দেখা যাবে। এইবার মঙ্গলকাব্যের রীতির সঙ্গে তারও পূর্ববর্তী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উপস্থাপন রীতির কথা বলছি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে আছে একাধিক রীতির মিশ্রণ। এই জন্যে এর মধ্যে কেউ পেয়েছেন 'ধামালি'-কে, কেউ দেখেছেন ঝুমুরকে। কেউ দেখেছেন জাগ-গানকে। কেউ দেখেছেন, মূল গায়নকে একবার করে প্রসঙ্গিক শ্লোক বলে, সেই অনুযায়ী কাহিনীর খেই ধরতে। কোনোটাই মিথ্যে নয়। বরং অভাব হল, বড়ো-বড়ো গবেষকদের স্মরণ করিয়ে দিতে লজ্জা হয়, সবগুলিকে সমন্বিত করে দেখার। এটাই বঙ্গের নিজস্ব রীতি। সেটাই একদিন কবিগানেও গৃহীত হয়েছিল। অখন্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিতে না দেখার ফলে, ঝুমুরকেও আমরা কেবল রাঢ়বঙ্গ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। অথচ কীর্তনের মাধ্যমে এই ঝুমুর যে একদা শ্রীহট্ট-পূর্ববঙ্গের আনাচে-কানাচে গিয়ে পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে সচেতন থাকি না। এইখানে, এক পুরাতন ও প্রাক্তন প্রসঙ্গের কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কারের পর দাবি উঠেছিল, এ পুঁথি আসাম-প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা ও সঙ্গীত-সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবিত, অতএব তা সেই অঞ্চলেরই সাহিত্য-সম্পদ্। এখানেও দৃষ্টিকোণের সেই সামগ্রিকতা, অখন্ডতার অভাব।

এক কলি করে মূল গানটি গাওয়া, কিংবা আকারে তা ছোটো হলে পুরোটাই এক ফেরা গেয়ে নিয়ে, সেই গানেরই টীকা-মন্তব্য রূপে আরো একটি কলি যোজনা করা, অর্থাৎ গান এবং মন্তব্যের অন্তরমূলক আবর্তন (Alternant) মধ্যযুগীয় এক বিশেষ রীতি। কথকতার কথক ঠাকুরের ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য যোজনা, টুসু গানে *(এবং তার দেখাদেখি*

*কোথাও ভাদু গানেও)* রং-ছড়া *(নামান্তর-'রেগ')* যোগ, কীর্তন গানের 'আখর' *( < অ( র)* এবং প্রাক্‌চৈতন্য যুগের 'ভনিতা'য় *(চৈতন্যোত্তর যুগের 'ভনিতা' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শাসনে ব্যাপকতা অনেকটাই হারিয়ে বসেছিল)* নানাভাবে, নানা শিথিল অর্থে এই রীতির অনুসরণ দেখি। টীকা মন্তব্য Interpretation রূপে যে গান ছড়া যোজিত হত *(বা এখনও হয়ে থাকে)* তার 'তাল' কিন্তু মূল গানটি থেকে দ্রুততর। প্রান্ত - উত্তরবঙ্গের তুক্কা-মনঃশিক্ষা প্রভৃতি ভক্তিমূলক গানে এখনও মূল গানটি এক ফেরা গেয়ে নিয়ে পরে সেটাই আবার দ্রুত লয়ে গাওয়া হয় ; যেন এই দ্রুতলয়ে গেয় দিকটি মূল গানেরই, এক শিথিল অর্থে, Interpretation। জলপাইগুড়ি জেলার 'ঢাড়ি' *(> ঢুঁড়, খুঁজে বেড়ানো, তারপর বেড়ানো, পাড়া বা গ্রাম প্রদক্ষিণ)* গানে যে 'মরি'র পদ *(এই জন্য একে 'মরিসুরিয়া' গান বলে)* যোজন করা হয়, তাও দ্রুতলয়ে প্রায় ছড়ার মতো গাওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া কবিগানে এই Interpretation -এর দিকটি কেমন করে পড়ে, তার একটি উদাহরণ দিই।

উপেন্দ্রকিশোর সোম তাঁর 'কবিগান সংগ্রহ' *(সৌরভ চৈত্র, ১৩২৯ / পৃ. ১৮১-১৮৩)* প্রবন্ধে ময়মনসিংহের কবিগানের একটি পর্যায় রূপে 'ডাকমাল্‌সী' [ তুল ঃ 'ডাক-বোলান' ] গানের পরিচয় দিয়েছেন। একটিতে দেখা যায়, পুত্রশোকাতুরা যশোদা নারদকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে নিজের উদ্বেগের কথা বলছেন। অতঃপর মূল গানটির 'ঝুমুর' :

আয় আয় গোপাল, আয় আয় কোলে
একবার ডাক রে মা বলে।
(আমায়) ছেড়ে যেও না রে বাপ, দিয়ে মনস্তাপ —
(দিয়ে) দুঃখিনীরে বিসর্জন জলে।।

বিজয়নারায়ণ আচার্য তাঁর 'তিনটি টপ্পা' *(সৌরভ আষাঢ়, ১৩২২ / পৃ. ২৮৬-২৮৮)* প্রবন্ধে ময়মনসিংহের টপ্পাগানের উপস্থাপন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই সব টপ্পাগানের ফাঁকে ফাঁকে কোনো বাস্তব বা প্রাত্যহিক জীবন থেকে সংগৃহীত কাহিনী-ঘটনা নিয়ে গান বেঁধে আসরে গাওয়া হয়। যে গানটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তার বিষয় হল, পুজোর সময় জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রী তার কাছে শাড়ির জন্য বায়না করছে। টপ্পা গানের বিভিন্ন অঙ্গ বা স্তবক হল : "চিতান', 'পারাণ,' 'মিল', 'মহড়া', 'অন্তরা', 'মিল'। পর্যায় বিন্যাস অনেকটাই কবিগানের অনুরূপ। একটি টপ্পা বা কবি গানের মধ্যে যেমন পর্ব-বিন্যাস, একদিনের গোটা আলকাপ গানে (বোলান, ডোমনি প্রভৃতিতেও) তেমনি একাধিক স্তরের উপস্থাপন। কাজেই এই দিক থেকেই আমরা বহুগীতির সমাহার অর্থে যেমন আলি > আল বলেছি, তেমনি বহু পর্যায়েরও

সমাহারকে এই অর্থে গ্রহণ করেছি। ওপরের এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, বাংলার পালাগান কখনোই অবিমিশ্র নয় ; একাধিক বিষয়প্রসঙ্গ পর্যায় স্তবকের মিশ্রণ সেখানে থাকবেই। এটাই বাঙালির জাতীয় রুচির বিশেষত্ব। এই দিক থেকেই আলকাপ গানের উপস্থাপনকে দেখতে হবে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যেও এই ধরনের রীতির প্রভাব দেখা যায়। এও আসর করে উপস্থাপিত হত। কাব্যের প্রারম্ভেই বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন — 'সভাপতি আর সভাসদজন আলাপ মতীঞঁ তোক্ষ্মাতে'। এই সভাজন আসলে দর্শক - শ্রোতা। মঙ্গলকাব্য থেকে আলকাপ, ডোমনি পর্যন্ত যে কোনো পালাগানে যে 'বন্দনা' পাওয়া যায় তা আসলে এই সভাজনের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ রচনা করা। ভাগবত, গীতগোবিন্দ এবং একটি প্রচলিত কাহিনীর মিশ্রণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনী। যে যে ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে, সংস্কৃত শ্লোক বলে নিয়ে বাংলায় সেই ঘটনার বিবরণ। এও এক দিকে একটি সাহিত্যিক রীতি অন্যদিকে দর্শক - শ্রোতার সঙ্গে সেতুবন্ধন। এটাই 'ধুয়া' রূপে বিভিন্ন মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্যে গৃহীত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র Interpretation-কে 'চিত্রডোর' বলা হয়েছে *(ডঃ সুকুমার সেন এ নিয়ে আলোচনা করেছেন)।*

আলকাপের যে বিভিন্ন পর্যায়গুলি তা অঞ্চলভেদে ঈষৎ ভিন্ন। বন্দনা, ছোকরার নাচ, ছড়াগান, কাপ এবং শেষে পালাবন্দি কোনো অভিনয়। কোথাও বৈঠকি গান থাকে, কোথাও থাকে বিভিন্ন দেব ও গুরুর প্রতি জয়ধ্বনি। কোথাও থাকে 'টেলার', কোথাও থাকেও না। কিন্তু আসরবন্দনা, কাপ বা আলকাপ এবং শেষে পালা থাকেই। কাপ বা আলকাপ অংশই প্রাচীন অংশ। সেই অংশের শিল্পীকেই বলে 'কাপ্যা', 'কাইপ্যা', বা 'কেইপ্যা'। আবার কোথাও তার সহকারী রূপে থাকে সংদার, সংলা, সঙেল।

আলকাপের দুটি প্রধান অংশ — গান এবং ছড়া। করুণাময় গোস্বামী তাঁর 'সঙ্গীত কোষ' *(বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫)* গন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন *(পৃ. ৪৭)* : "গান অংশে থাকে নানাবিধ পৌরাণিক বিষয়। ... আলকাপের ছড়া অংশ গাইবার সময় মাঝে মাঝে ছড়া কাটা থামিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যে কৌতুকরসপূর্ণ গান গাওয়া হয়, তাকে আলকাপের রঙ বলা হয়।" প্রায় এই একই মন্তব্য অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর'-এ *(ভাদ্র, ১৩৭৩ / পৃ. ১৩৭)* করেছেন। তিনি যে আলকাপের 'ডাক ছড়া'র কথা বলেছেন, কার্যত তা আলকাপের বন্দনাগান। হাস্যকৌতুক যে কোনো গানেই মেলে। যে ঝুমুর গান খণ্ডগীতি ছিল, কালক্রমে তাতে প্রশ্নোত্তরমূলকতা যেমন এসে গেছে, তেমনি তাতে ঠাট্টা প্রহেলিকাও এসে গেছে। ঠাট্টা-রসিকতা করা হয় বলে সেগুলিকে বলে 'ঠাট-ঝুমুর' *(ঝুমুর গান*

*লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৭ / পৃ. ২৯৬ ৩০০ / উৎপলা গোস্বামী)*। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, ভনিতাসহ অনেকে 'পালা-ঝুমুর'ও লিখেছেন।

অর্থাৎ বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যই হল, খন্ডগীতিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে পালা-গীতির দিকে নিয়ে যাওয়া। যে আলকাপ একদা কেবল দুটি পুরুষ-নারীর রঙ্গকৌতুকময় গান মাত্র ছিল, নানা পর্যায় এবং স্তরের সংযোজন করে তাকে পূর্ণ এক রাত্রির খোরাকে পরিণত করা হয়েছে। জারিগানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। 'জারি গানের গীত পদ্ধতি' *(বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬ / পৃ. ২২-৫২)* নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে এস্. এম. লুৎফর রহমান এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অর্থাৎ এ একেবারে গ্রীক নাটকের আদিস্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথমে ছিল কোরাস ও একটি চরিত্র, তারপর দুটি, তারপর আরো, — এইভাবে নাটকের আকৃতি বড়ো হতে থাকে।

যে গম্ভীরা ছিল চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বিষয় তারই কাছে প্রাণ ও দীপ্তি সংগ্রহ করে এক একটি ভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের গান / পালাগানের উদ্ভব হয়েছে। উপস্থাপনেও তাই আঞ্চলিক এবং গোষ্ঠীগত প্রয়োজনে ঈষৎ পরিবর্তন এসে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অভিন্ন মনস্তত্ত্বের কারণে মূল ও ভিত্তিস্থানীয় সাদৃশ্য অব্যাহতই আছে। বর্ধমানের কাটোয়াতে কার্তিকপুজোর একটি বিশেষ আঞ্চলিক গুরুত্ব আছে। কার্তিকের লড়াই হয় সেখানে। এই আনন্দোৎসবকে বর্ধিত করবার জন্য, অতএব, সেখানেও আলকাপ গান রচিত হতে বাধা নেই ; এবং, যখনই যেকারণেই রচিত হোক না, কাঠামো ও উপস্থাপনরীতি মোটামুটি অভিন্নই থাকে।

।। নয় ।।

অতএব, আলকাপ ক্রমবর্ধনশীল, চিরবর্ধনশীল, জৈব পদার্থের মতো ক্রমেই বেড়ে যাওয়া তার চরিত্র ধর্ম। শুধু আলকাপ কেন, লোকসাহিত্য মাত্রেরই এই গুণ-ধর্ম বিশেষত্ব থাকে। আবার, লোকসাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখার উদ্ভবেতিহাসের আলোচনা করতে বসা বিড়ম্বনা মাত্র। আলকাপেরও উদ্ভব-কথা আলোচনা করা বৃথা। কী হবে নানা অনুমান করে! লোকসাহিত্যের কোনো শাখারই আজ আর বিশুদ্ধি নেই। বিষয়-প্রসঙ্গ উপকরণের আজ এমনই মেশামেশি ঘটে গেছে যে পশ্চিমি গবেষকরা আজ cross-genre comparison-এ আগ্রহী-উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে এখনও ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রীতি আছে, কবিগানেও একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা

করা হত। ধাঁধা ও কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে গান রচিত হত, তা কবিগানের উদ্ভবের মূলেও কাজ করে থাকতে পারে। একটি বিশেষ কালে এক-একটি শাখার যে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, চারদিক থেকে নানা বিষয়-প্রসঙ্গ উপকরণ নিয়ে তা কেমন করে গড়ে বেড়ে উঠছে, — সেটা পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করাটাকেই কেউ কেউ প্রাধান্য দিচ্ছেন। তবু, এ কথা মেনে নিয়েও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বিবর্তনের দিকটিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না কোনো মতেই।

কাজেই, ঠিক কবে, কার দ্বারা আলকাপের উদ্ভব হয়েছে, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে সে গবেষণা যদি গৌণ হয়ে পড়ে, তাতে আলকাপ গানের একটা দিক অন্ধকার থেকে গেল বটে, কিন্তু গবেষণার অপর দিকটিও আছে : নানা সাংস্কৃতিক দিক ও উপকরণ কিভাবে এতে এসে জুটেছে, কিভাবে বঙ্গীয় জাতীয় মানস ও রুচি তাকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে, কিংবা, বঙ্গের অন্যত্র কীভাবে সেই উপকরণ - বিষয়গুলির সামগ্রিক ও অখন্ড দিকটি এর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে সামঞ্জস্য লাভ করেছে, সেটাও গবেষণার একটি বিশেষ দিক। অর্থাৎ বিষয়টিকে একটি পূর্ণ ও সমগ্র সংস্কৃতির আলোকে, Culture Complex বা 'সংস্কৃতি মন্ডলে'র পটভূমিকায় দেখা। আলকাপের গানের বেলায় পৌরাণিক বা উচ্চস্তরের সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু ছড়ার বেলায় ঠিক তার বিপরীত দিকটি ধরা পড়ে। এই বিপরীত ব্যাপার কেন ঘটে? 'বন্দনা' অংশে ভাষাগত যে পরিমন্ডল দেখা যায়, 'কাপ' অংশে অকস্মাৎ তার অবনমন ঘটে। অথচ, সেই সব উচ্চতর সংস্কৃতিজাত দিকটিকে অস্বীকারও করা হয় না। 'বৈতালিক' উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মূল গায়েনের গলায় চাদর থাকে, — অর্থাৎ সে এক সৌম্য ও শুচিবেশ ধারণ করে ; অথচ তারই সহযোগীরা নগণ্য বেশে আসরে উপস্থিত হয় ; আলকাপের মধ্যে যে পাঁচ / ছ'টি পর্যায় আছে, তার কোনোটিই অপরটির সঙ্গে যুক্ত, অন্বিত নয় ; একটির অপরিহার্য পা[illegible]ত রূপে অব্যবহিত পরের পর্যায়টি আসে না ; এই অসংলগ্নতা ও শিথিলবদ্ধতা দর্শক শ্রোতাদের মনে কিছু মাত্র বিরক্তির সৃষ্টি করে না ; বরং তারা তা বিশেষভাবে উপভোগই করে থাকে। কেন তা করে? একি তাদের জাতীয় শিল্পরুচির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাকে অবশ্যম্ভাবী এক দিক রূপে গ্রহণ করে সেভাবেই নিজেদের রুচিকে গড়ে নিতে বাধ্য হয়েছে? সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণাটি কি তাহলে একটি জৈব ধারণা থেকে কোনো Super-organic স্তরে গিয়ে ঠেকেছে? গবেষকগণ লক্ষ করেছেন, বিশ্বজোড়া লোককথার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ Motif-এর আনাগোনা থাকবেই, কেউ বা তাকে Epic Laws বলেছেন। গম্ভীরা-আলকাপ-ডোমনি-বোলান-গাজির গীতের মধ্যেও এমনি কোনো নীতি বা সূত্রকে আবিষ্কার করা যায় কি, — যা দিয়ে বাঙালির 'সংস্কৃতি-মন্ডল'টিকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায়?

# বাংলার পুতুল নাচ

## সুশান্ত হালদার

একদিন পার্বতীর হাবভাব দেখে শিবের মনে হল তাঁর মনে বাৎসল্যের সঞ্চার হয়েছে। তিনি তখনই সূত্রধরকে কয়েকটি পুতুল তৈরি করে আনতে বললেন। সূত্রধর আদেশ পালন করলে প্রাণহীন পুতুলগুলোর মধ্যে শিব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রাণবন্ত পুতুলগুলো নিয়ে পার্বতী মনের সুখে খেলা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। হর তখন পুতুলের প্রাণ হরণ করলেন। সূত্রধর জাত শিল্পী ; মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন এই পুতুল। নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর আঁতের টান কোনো অংশে কম নয়। তাই শিবের কাছ থেকে নিষ্প্রাণ পুতুলগুলো চেয়ে নিয়ে সুতো লাগিয়ে নাড়াচাড়া করেই আনন্দে মেতে উঠলেন। অনুরূপ আরেকটি কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে। একদিন, মর্ত্যধামে প্রিয়বাহন নন্দীপৃষ্ঠে শিব-পার্বতী পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। পথে একটি সুন্দর বিপণি তাঁদের চোখে পড়ল। বেশ বড়ো বড়ো রকমারি পুতুলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে পুতুলকারিগর। পার্বতী কারিগরের সৃষ্টি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুতুল কুটিরের কাছে গিয়ে পার্বতী জিজ্ঞেসা করলেন, কারিগর, তোমার সন্তান-সন্ততি কটি? কারিগর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জবাব দিলেন, মা, হতভাগার সে কপাল হয়নি। পার্বতী দুঃখ পেলেন, শিবকে অনুরোধ করলেন এর বেদনা বিদূরিত করা হোক। শিব বললেন, দেখো পার্বতী, এর ছেলে মেয়ে হবে না, কিন্তু একে এমন এক বিদ্যা দেবো যা দিয়ে ও ওর তৈরি পুতুলগুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে। সেই থেকেই না কী ভারতে পুতুলনাচের পত্তন। কিন্তু কতদিন আগে? পন্ডিতদের মধ্যে কেউ বলছেন ৫ হাজার, কেউ বলছেন ৩ হাজার বছর আগে এর পত্তন। সত্যিমিথ্যে জানিনে, তবে একথা নিঃসন্দেহ যে ভারতে পুতুলনাচের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং বেশিরভাগ পন্ডিত এ বিষয়ে একমত যে একদিন এই ভারত থেকেই নাকি পুতুল নাচ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ইংরেজীতে যাকে বলে পাপেট (PUPA.Latin.), পাপেট্রি, পাপেট শো বা পাপেট থিয়েটার, বাংলায় এক কথায় তার নামই পুতুলনাচ। পোষাকি নাম পুতুল নাটক বা পুতুল যাত্রা। ঐতিহ্যবাহী (Traditional) অথবা সমকালীন (Contemporary) যাই হোক না কেন, মোটামুটি ৪ ধরনের পুতুল নাচ প্রচলিত। যথা ঃ (১) ম্যারিয়োনেট (Marionnette.French.) বা স্ট্রিং পাপেটের বাংলায় জনপ্রিয় নাম তারের পুতুল নাচ ; (২) রড পাপেট বা ডাঙের পুতুল ; (৩) গ্লাভ বা হ্যান্ড পাপেটের আটপৌরে নাম বেনী পুতুল আর (৪) স্যাডো পাপেটকে বলে ছায়াপুতুল নাচ। বাংলায় প্রথম তিন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচের চল রয়েছে অনেকদিন আগের থেকে, ছায়া পুতুলের ছায়া চোখে পড়েনি আজো। বিংশ শতাব্দীর ৫০ এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা বাংলায় ছোটো বড়ো মিলিয়ে সমকালীন পুতুলনাচ দলের সংখ্যা একেবারে নগন্য নয়। যদিও বেশির ভাগ দল কলকাতায়, তবে মফঃস্বলেও কিছু রয়েছে, পুতুল নাচ নিয়ে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কমবেশি প্রদর্শন কর্মে ব্রতী। এরা মূলত রড ও গ্লাভ পাপেট করলেও স্ট্রিং বা স্যাডো মাধ্যম নিয়েও কাজ করে। বাংলায় উল্লেখযোগ্য সমকালীন পুতুলনাচ দলের তালিকা নিম্নরূপ ঃ (১) পুতুল রঙ্গম, (২) দি পাপেটস, (৩) সি এল টি (চিল্ড্রেনস্ লিটল থিয়েটার, অবন মহল), (৪) সিপিটি (ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার), (৫) ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, (৬) পিপিটি (পিপল্স্ পাপেট থিয়েটার) , (৭) পুতুল গোষ্ঠী, (৮) ছোট্ট পুতুল দল, (৯) তালবেতাল পাপেট থিয়েটার, (১০) লিটল পাপেট থিয়েটার, (১১) ইন্ডিয়ান পাপেট থিয়েটার, (১২) রাহেলস্ লিটল থিয়েটার, (১৩) পাপেটরিয়ম — হাওড়া, (১৪) নালন্দা পাপেট থিয়েটার, (১৫) ডল্স্ থিয়েটার, (১৬) বর্ধমান পাপেট থিয়েটার এ্যান্ড কালচারাল সেন্টার, (১৭) ঝাড়গ্রাম পাপেট থিয়েটার, (১৮) মুর্শিদাবাদ পাপেট থিয়েটার, (১৯) ফিঙ্গার পাপেট, (২০) কাঠ পুতলি (২১) জোনাকি পাপেট থিয়েটার ও (২২) কথাবলা পুতুল প্রভৃতি।

সমকালীন পুতুল নাচের পত্তন, প্রদর্শন ও বিকাশে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে চিত্রশিল্পী প্রতিভাধর চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮)-এর কথা। মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে বাসকালে বাচ্চারা তাঁকে ঘিরে ধরে গল্প শুনতে চাইত — তখন তাঁর গল্প না বলে উপায় থাকত না। এই ভাবেই শিশু মনোরঞ্জন কল্পে কাঠ, নারকোল মালা, সুতো প্রভৃতি সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে পুতুল নাচের পুতুল তৈরি শুরু। পরবর্তী সময়ে তিনি পুতুল নাচের পালা রচনা করে পুতুল নাচ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ৫০ এর দশকের শেষের দিকে তিনি তাঁর পুতুলনাচ দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তিনি সহায়তা গ্রহণ করেন সাবেকি পুতুল নাচিয়েদের। শিশু-

মনের উপযোগী রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী ও চিরায়ত লোককথা ছিল তাঁর রচিত পালার বিষয়। এর পরেই 'পুতুল রঙ্গম'-এর প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শৈল চক্রবর্তী এবং 'দি পাপেটস'-এর প্রাণপুরুষ শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য। এঁরা আর কেউ আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে বর্ষীয়ান আজো যাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের কথা ; মনে পড়ে সিপিটির কর্ণধার সুরেশ দত্ত, পিপিটির প্রাণ পুরুষ হীরেন ভট্টাচার্য, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী আর ভি. বালসারার কথা। তাঁদের অবদান নিয়ে বিস্তৃত অন্যত্র আলোচনার অবকাশ রয়েছে - রয়েছে বাসনাও।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলায় তিন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের প্রচলন রয়েছে ; (১) তারের পুতুলনাচ (২) ডাঙের পুতুলনাচ আর (৩) বেণী পুতুলনাচ।

*তারের পুতুলনাচ*

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে বীথী, সূত্রধার, পাঞ্চালিকা, বাজিকর ও অন্যান্য উৎস থেকে গবেষকরা একথা প্রমাণ করেছেন যে এই জাতের পুতুলনাচই নাকি সবচেয়ে পুরোনো। ড. সুকুমার সেন পর্যন্ত মনে করেন যে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আসলে ছিল পুতুল নাচের পালা।

তারের পুতুল নাচের কথা উঠলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রাজস্থানের কাঠপুতলি। অবশ্যই এর কারণ আছে। রাজস্থানের ভাট্ (ভট্ < সং-ভৃত্ ; তুলনীয় : ইং - BARD) বা চারণ সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমে একচেটিয়া অধিকার এই লোকশিল্প মাধমে।

এখনো শতবর্ষ পূর্ণ হয়নি, সামান্য কিছু বাকি। অখন্ড বাংলার বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমায় (বর্তমান বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র জেলা) খেজুরতলার রাধাপাগলের (মতুরা) মেলায় এসেছিল রাজস্থানের কাঠপুতলি। এই পুতুল নাচের সার্থক ও স্বাঙ্গীকৃত অনুকরণ থেকেই বর্তমানে নদিয়ার মুড়াগাছা কলোনি - ঘরানার তারের পুতুলনাচের উদ্ভব ও বিকাশ। বর্ষীয়ান পুতুল নাচিয়ে মুড়াগাছা কলোনির জিতেন হালদার (বয়স ৯০) জানাচ্ছেন 'ওদের ঐ পুতুল নাচ দেখে মনের মধ্যে একটা আগ্রহ জম্মাল কী করে এই পুতুল নাচের দল করা যায়? কথায় বলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ঠিক তাই। আমরা খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামে কালিপদ মালাকার নামে একজন সুদক্ষ শোলার কারিগরের সন্ধান পেলাম। সেখানে গিয়ে তাঁর নিকট সবিশেষ আলোচনার পর তিনি আমাদের শোলার পুতুল তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। তৈরি হল পুতুল, গঠন হল ১১ জন সদস্য নিয়ে আমাদের পুতুল নাচের দল। ঐ দলে অভিনেতা

হিসেবে ছিলেন (প্রয়াত) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। সুর শিল্পী ছিলেন (প্রয়াত) শশিভূষণ মন্ডল, ঢোল বাজাতেন আমার দাদা (প্রয়াত) যজ্ঞেশ্বর হালদার, নৃত্যশিল্পী হিসেবে ছিলেন আমার আর এক দাদা তারিণী হালদার (প্রয়াত) আর আমি ছিলাম তাঁর সহকারী হিসেবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুতুল নাচানোর দক্ষতা অর্জন করলাম।... তারপর দেশ বিভক্ত হবার পর মুড়াগাছা কলোনিতে পুনর্বাসন পেলাম। কিন্তু তখন এখানকার জমিগুলো ছিল চাষের অনুপযোগী, তাই জীবন-জীবিকার উদ্দেশ্যে বেছে নিলাম এই তারের পুতুল নাচকে। বহু চেষ্টায় বহুকষ্টে কয়েকজন মিলে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার প্রয়াত ইন্দ্রভূষণ চক্রবর্তীকে দিয়ে কিছু পুতুল তৈরি করে ভারতমাতা পুতুলনাচ নামে একটি দল গড়ে তুললাম। এই দলে আমিই ছিলাম মুখ্য নৃত্যশিল্পী হিসেবে, গান ও অভিনয় করতেন আমার এক সতীর্থ (প্রয়াত) নীলকান্ত চক্রবর্তী।' উল্লেখ্য পুতুলের সঙ্গে সুতো লাগানো 'ছাট' (কন্ট্রোল)-এর সাহায্যে উপর থেকে পুতুল পরিচালনা করা হয়। কেমন ছিল এই তারের পুতুল নাচ? জানাচ্ছেন বগুলার কাছাকাছি গ্রাম হলদিপাড়ার পুতুল নাচের মাস্টার সতীশ চন্দ্র সমাদ্দার।'... ঘরের বারান্দায় পুরাতন কাপড় দিয়ে ঘিরে মঞ্চ তৈরি করল। সন্ধ্যায় মঞ্চের সামনে মাস্টার হারমোনিয়ম নিয়ে বসলেন, তার পাশে ঢোলক ও করতালবাজিয়ে এবং দোহারগণ বসলেন।... পালা হবে সীতাহরণ। দর্শকগণ বসলেন আঙিনার উপরে, সামান্য একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে দিয়েছে তার নীচে।... পালা আরম্ভ হ'ল। রাবণ মঞ্চে প্রবেশ করল — পুতুলটি নাম অনুযায়ী খুব ছোটো ; শাড়ীর পাড় এবং সামান্য জরি দিয়ে হাতে রাজপোষাক তৈরি করে রাবণকে পরানো হয়েছে। আরম্ভ হলো সংলাপ, মাস্টার বললেন — তুমি কে? নাচিয়ে তাল পাতার বাঁশীতে (পরবর্তী সময়ে বাঁশের চটার বাঁশি) উত্তর দিলেন পি.পি.পি.। মাস্টার পুনরায় জিজ্ঞেসা করলেন — ও তুমি রাবণ। সীতাকে হরণ করবে? পুনরায় পাতার বাঁশীর জবাব পি.পি.পি। ঐ তালে তালে রাবণ পুতুলটি অঙ্গ ভঙ্গিমা করছে সুতোর টানে। এমনি করে পালা শেষ হল, দর্শকেরা খুব ভাল বলল। তখন আমার মামা জিতেন হালদার বললেন যে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও তবে এই পুতুলনাচ দলটি ভালোভাবে তৈরি করা যায়। তুমি অভিনয় ও গান করলে নতুনত্ব হবে এবং দর্শকেরাও ভালভাবে নেবে।....তখন আমি প্রস্তাব দিলাম যে এই পুতুলনাচ নতুন করতে হবে, যেমন, পুতুল বড়ো করতে হবে, পোষাকাদি নতুন করতে হবে, মঞ্চ বড়ো করতে হবে, কারণ, মাস্টার বাজিয়ে নাচিয়ে তারা মঞ্চের ভিতরে থাকবে, নাচিয়ের মুখের বাঁশি বাদ দিতে হবে। নাটকগুলির অভিনয় হবে এক কণ্ঠে, যেমন যুবক যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বালক - বালিকার কণ্ঠ মিলিয়ে। তাতে দর্শকের মনে সাড়া জাগবে ঠিক পুতুল অভিনয় করছে। তখন একজন বললেন এই অসম্ভব মাস্টার কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম যে আমি করব। তখন ১১ জন অংশীদার হয়ে পুতুলনাচ দল গঠন করা হল — নাম দেওয়া হল নিউ ভারতমাতা পুতুল নাচ।' প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রথম দিকে এই পুতুল নাচের আটপৌরে নাম ছিল 'পুত্‌লা বাজি' আর পুতুলগুলোকে বলত 'কেতুপুতুল'।

এইভাবেই ওপার বাংলা থেকে সেদিন যাঁরা কেবলমাত্র শখ ও আনন্দের জন্যে পুতুলনাচ হাতেকলমে শিখেছিলেন তাঁরাই দেশভাগের পর নদিয়া জেলার হাঁসখালি থানার (রানাঘাট মহকুমা) মুড়াগাছা কলোনিতে পুনর্বসতি পেয়ে চলে আসেন এবং বিনোদন ও পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু করেন তারের পুতুলনাচ। বগুলার নিকটবর্তী মুড়াগাছা কলোনি থেকেই নদিয়ার বগুলা, দত্তপুলিয়া, কুশবেড়িয়া, বরবেড়িয়া কলোনি, বরনবেড়িয়া, হলদিপাড়া, পূর্বপাড়া, দুর্গাপুর ও কাঁঠালিয়া গ্রাম, কুচবিহার, মালদহ, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের 'রাজবংশী পুতুল'ও আসলে ঐ একই ধারার তারের পুতুলনাচ। 'দখিনা পথ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংস্কৃতি মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন — পুতুল নাচ' শীর্ষক প্রতিবেদনে অমৃতলাল পাড়ুই লিখেছেন 'বাংলা ১৩৮০ সালে জয়নগর থানার দাড়া গ্রামে, বর্তমানে কুলতলি থানার জামতলা ও জালাবেড়িয়া গ্রামে বাংলা ১৩৫৫ সাল থেকে কৃষ্ণযাত্রার দলে গান করার বদলে পুতুল নাচের দিকে ঝুঁকে কেউ প্লাসটিক পুতুল কিনে, কেউ উলু ও চেঁচকো ঘাসের পুতুল তৈরি করে সুতোর তার ঝুলিয়ে পুতুল নাচ দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সোলা ও খড় দিয়ে তৈরি হল পুতুলের দেহ ও মুখের ওপর মাটি দিয়ে প্রলেপ দিয়ে রঙ করা হল। একে একে এ অঞ্চলে এই তারের পুতুল নাচের দল বাড়তে লাগল।' স্বনামধন্যা প্রয়াত কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য ঃ বিশ্বের আর কোথাও নাকি এমনটি দেখা যায় না। একই সঙ্গে এতগুলি ঐতিহ্যবাহী তারের পুতুলনাচ দলের অস্তিত্ব ভূ-ভারতে আর কোথাও বর্তমানে নেই। কারণ সত্তরের দশকে দেখেছি এক মুড়াগাছা কলোনিসহ বগুলার আশেপাশের গ্রামে প্রায় ১০০টি তারের পুতুল নাচ দল ছিল।

আরেকটি বিষয়ে এই পুতুলের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তারের পুতুলের মাথা-দেহ সব তৈরি করা হয় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে, পা থাকে না। জলাশয়ে স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন জলজ গুল্ম ফুলশোলা (Aeschynomere aspera. Latin.) ময়দার আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে। পুতুলগুলো বেশ বড়ো বড়ো (১৮" থেকে ২০" পোষাক ধরলে ২৮" থেকে ৩২" পর্যন্ত) — প্রমাণ মাপের,

রাজস্থানের মতো ছোটো ছোটো নয় ; দেখতেও বেশ সুন্দর, ঠিক মানুষের আদলে। এই ধরনের পুতুল বিশ্বের আর কোথায়ও দেখা যায় না। অবিশ্যি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকটি গ্রামে সামান্য কয়েকটি দল কাঠের পুতুল ব্যবহার করে। পুরুলিয়ার একটি দল শোলা ভিন্ন অন্যান্য সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে ছৌনাচের পুতুল বানিয়ে তারের পুতুল নাচ দেখায়। আরো উল্লেখ্য, বাংলার পুতুলনাচ চিরকাল ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংস্কারমুক্ত এবং অসাম্প্রদায়িক। তারের পুতুলনাচ দলগুলো বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বছরের প্রায় ৮ মাস ৬০/৭০টি রকমারি পালা দেখিয়ে বেড়ায় সারা পূর্ব ভারত জুড়ে। এইসব পালার আখ্যান বস্তু রাজস্থান থেকে পৃথক, মূলত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলেও গ্রামবাংলার অমর লোকগাথা, লোককাহিনী ও লোকনাট্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। আবার হালফিল রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিককালে ভিডিও ও 'বোকাবাক্সে'র সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে শুধু দুটো পয়সা অর্থাৎ বেঁচে থাকা (?) বা দর্শকরুচির অছিলায় ছায়াছবি বা যাত্রার মঞ্চসফল বা হিট নাটকগুলো অনুকরণের দুঃখজনক প্রবণতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে, এই সব পালার কোনো মুদ্রিত রূপ আজো চোখে পড়ে নি।

নানান ধরণের কাজের জন্যে এক একটি দল ১০ থেকে ১৮ জন লোকশিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মী সমন্বয়ে গঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী তারের পুতুল সহ ডাঙ্ ও বেণীপুতুল নাচ দলের এই সব অখ্যাত ও অজ্ঞাত লোকশিল্পী — গ্রামীণ গীতিকার, সুরকার, পালাকার ও পুতুল নাচিয়েদের নীরব সাধনা ও প্রতিভা আজো যথাযথ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় নি — নিঃসন্দেহে এটি বড়োই পরিতাপের বিষয়। এঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও দারিদ্র্য সীমানার অনেক নীচে। এঁদের প্রায় সবাই তপশীলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত খেতমজুর বা সামান্য কৃষিজমির মালিক। বিস্ময়ের কথা, একমাত্র নদিয়া জেলাতেই ৫ হাজার মানুষ এখনো এই লোকশিল্প তথা মুমূর্ষ জনপ্রিয় লোকনাট্য মাধ্যমের উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। শত সহস্র লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা সয়ে সয়েও উপেক্ষিত লোকনাট্যের শক্তিশালী একটি ধারা ঐতিহ্যবাহী তারের পুতুল নাচ, ডাঙ, বেণী পুতুল নাচের শিল্পীরা তাঁদের সাধনা — লোকশিল্পের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন আজো নীরবে - নিভৃতে। অনুমান, বর্তমানে বাংলায় এখনো কোনোক্রমে অনধিক ৫০টি তারের পুতুল নাচ দল টিকে আছে (?) কেবলমাত্র জনগণের আশীর্বাদে - পৃষ্ঠপোষকতায়। ভাবতে অবাক লাগে, ১৯৮২ সালের আগে পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় না রাজ্য সরকার, এমন কি শহরের বেশির ভাগ বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক বুদ্ধিজীবী বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ পর্যন্ত এঁদের খবর জানতেন না। যাই হোক, তবুও এই পুতুল নাচিয়েরা নিদারুণ দারিদ্র্য ও

নামমাত্র লেখাপড়া অথবা নিরক্ষরতার অন্ধকারে এক চরম অভিশপ্ত জীবন যাপনের গ্লানি বহন করেও আজো গ্রাম বাংলার প্রথাবিমুক্ত ও বয়স্ক শিক্ষাদানের সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্রত পালন করে চলেছেন। এই অজ্ঞাতকুলশীল পুতুল নাচিয়েরা প্রতি বছর কম করেও প্রায় কোটি নর-নারীর জন্যে নামমাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে সুলভ চিত্ত-বিনোদনের সাথে সাথে জাতীয় সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণে পবিত্র চিরায়ত মূল্যবোধের মঙ্গলালোক সহ লোকশিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে চলেছেন সীমিত সামর্থ্য পাথেয় করে বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।

*ডাঙের পুতুল নাচ*

অমৃতলাল পাড়ুই প্রাগুক্ত নিবন্ধে জানিয়েছেন ঃ 'বাংলার ১২৮০-৮২ সাল নাগাদ মন্দিরবাজার থানার রাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের জনৈক উদ্ভব ব্যাপারী কোনো এক খেয়াল বশতঃ খড়ের পুতুল তৈরি করে মজার মজার ঘটনা দেখাতেন বহু লোকের সামনে। কোনও কথা ছিল না, শুধু বিচিত্র ধরনের পুতুল নাচানোর কায়দা ছিল, প্রবেশ প্রস্থান ছিল। (তুলনীয় মুর্শিদাবাদের মদন মোহন নন্দী সম্প্রদায়ের আদি ডাঙের পুতুল নাচ - এতে লোকবাদ্যের তালে তালে নৃত্যই প্রধান - কোন সংলাপ নেই : নিবন্ধকার)। এই মজাদার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে যাত্রা ধরনের কথা মনে কার ওই গ্রামের জনৈক গোবিন্দ আজলদার ঢোল-সানাই বাজিয়ে পুতুলনাচের জন্য দল তৈরি করেন। ধীরে ধীরে যজ্ঞডুম্বুর বা তেপল্‌তে গাছের হালকা কাঠ দিয়ে পুরাণ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র অনুসারে তৈরি হল পুতুলের মাথা, ধড় এবং ধড়ের সঙ্গে লাঠি লাগিয়ে কোমরে বাঁধা কেঁড়েতে রেখে নাচানোর ব্যবস্থা করা হল। মাথাটার সঙ্গে একটা কাঠি ধড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে রাখা হল সেটি দরকার মতো ঘোরানো ফেরানোর জন্যে। হাত দুটির বগলের দিকে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে রাখা হল যাতে দরকার মত টানলে হাত নাড়াচাড়া করানো যাবে। মাথাটি তৈরীর সময় সৌন্দর্য করার জন্য কিছু মাটি লাগিয়ে রঙ মাখানো হল। পোষাক পরানো পুতুলের ধড়ের ওপর, মাথাতে প্রথমে কাপড় জড়ানো হত, পরে বাবরী চুল লাগানো হল। তারপর একে একে পুতুল নাচানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে কথা বলা আরম্ভ হল — কিছু পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে অভিনয়ের মতো। বিভিন্ন সঙ্ দেখিয়ে কথার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাকেও বোঝাবার চেষ্টা করা হত — প্রথমে যাঁরাই পুতুল নাচাতেন তাঁরাই মুখে মুখে কথা বলে অভিনয় করতেন, গায়ক হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। অন্যান্য বাদ্যকারগণ সঙ্গত করতেন। মোটামুটি বাংলা ১৩৫০ সালের পর থেকে যাত্রার পালা নিয়ে কয়েকজন শিল্পী অভিনেতা দাঁড়িয়ে বই দেখে অভিনয় করেন। গায়ক মাস্টার নিজেই হারমোনিয়াম

বাজিয়ে বসে গান করেন আর অভিনয় ও গান অনুযায়ী পুতুলধরিয়ে শিল্পীগণ পুতুল নাড়ান বা নাচাতে থাকেন। ১৩৭০ সালের কাছাকাছি সময় মাইক্রোফোন যোগে পুতুল নাট্যাভিনয় চালু হয়। পুতুলকেই দর্শকরা দেখতে পান আর শিল্পীদের দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা পর্যন্ত আড়াল করে পুতুল নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়। দেখা গেল এই পুতুলগুলি সব কাঠের তৈরি এবং নাচানো বা পরিচালনা করা হয় নীচের দিক থেকে। প্রমাণ মাপের ১ থেকে ২ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন পুতুলগুলি তৈরি করেন স্থানীয় কারিগর বা পুতুল নাচিয়েদের কেউ কেউ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই দলের সংখ্যা সর্বাধিক ; কলকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদে এখনো অনধিক ২৫টি দল (১২ থেকে ২০ জন শিল্পী) অনিয়মিতভাবে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে মেলায় উৎসবে আমন্ত্রণ পুতুল নাচ দেখিয়ে থাকে। এই দলের লোকশিল্পীদের বেশির ভাগ তপশীলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং প্রায় সবাই প্রান্তিক কৃষক ; অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নীচে। দল ও শিল্পীদের অবস্থা ক্রমাগত দুর্দশাপন্ন হতে বসেছে — অনুষ্ঠান ও প্রদর্শন তুলনামূলক ভাবে কমতির দিকে।

*বেণীপুতুল নাচ*

দস্তানা বা হাত পুতুলের মানে বুঝি, কিন্তু বেণী পুতুল কেন? এই ধারার জনপ্রিয় শিল্পী রামপদ ঘোড়ই জানালেন "পুতুলের বেণী গলায় জড়িয়ে পুতুল নাচিয়েরা ডুগডুগি বাজিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে 'ভিক্ষা' করতে বেরোন। তাছাড়া নাচানোর সময় মেয়ে পুতুলের বেণী আন্দোলন যথেষ্ট দৃষ্টি নন্দন। তাই এই নামকরণ"। একজন শিল্পী সবার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে দু'হাতে দুটি পুতুল (একটি পুরুষ অন্যটি স্ত্রী চরিত্র) তুলে ধরে দক্ষতার সঙ্গে নাচিয়ে নাচিয়ে নিজেদের বাঁধা গান গেয়ে বা সংলাপ বলে অনুষ্ঠান করেন। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ সঙ্গে ঢোলক বাজনার ব্যবস্থাও রাখছেন। মেদিনীপুর (দক্ষিণ) জেলার কাঁথি মহকুমার ভূপতি নগর থানার পদ্মতামলী, ইক্ষুপত্রিকা, বাসুদেব বাড়িয়া, পটাসপুর থানার মঙলামোরো এবং খেজুরি থানার রসুলপুরে প্রায় ১০০ জন এখনো বেণীপুতুল নাচিয়ে জীবিকার্জন করেন। ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচিয়েদের মধ্যে এঁদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় - সবদিক থেকেই। এঁরা সবাই প্রায় দিন মজুর - তপশিলি জাতিভুক্ত 'হাড়ি' সম্প্রদায়ের। এঁদের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে। পুতুলের মুখ পোড়া মাটির প্রতিমার আদলে, হাত দুটি কাঠের, দুই হাতেই ঘুঙুর বাঁধা থাকে। সমকালীন গ্লাভ পাপেটের সঙ্গে এইখানেই বড়ো গরমিল। রামপদর বাবা প্রয়াত আশুতোষ ঘোড়ই (পদ্মতামলী) বহুদিন আগে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন : বৃটিশ আমলের একেবারে শুরুতে গোরা সৈন্যরা গ্রামে গঞ্জে ঘোরার সময় ঘরের মেয়ে-বউদের সঙ্গ

কামনা করত, নইলে অকথ্য অত্যাচার চালাত। প্রথমদিকে গ্রামের মানুষ ভয়ে পালিয়ে বাঁচতেন। কিন্তু কতদিন এভাবে চলে। তাঁরা অবশেষে সবাই মিলে এক ফন্দি আঁটলেন। পাকা তালের আঁটি শুকিয়ে ফুটো করে চোখ এঁকে আঙুল ঢুকিয়ে তুলে ধরে নাচাতেন সবাই মিলে গানবাজনার সাথে সাথে। এইসব কায়দায় নাচগান করে তখনকার মতো গোরা সাহেবদের নাকি ভোলানো সম্ভব হয়েছিল। সেই থেকেই বেণী পুতুল নাচের পত্তন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই অসম যুদ্ধের ঘটনা ঐতিহাসিক; খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা - সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। সরকার উদ্যোগে নদিয়া জেলার স্বরূপগঞ্জে পূর্বাঞ্চল রাজ্য সমুহের পুতুল নাচ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। সেখানে আলোচনাচক্রের জবাবি ভাষণে রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ বর্তমানে লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রয়াত সভাপতি সুধী প্রধান বলেছিলেন, পুতুল নাচের সমস্যা দূরীকরণে সরকারের উদ্যোগ অবশ্যই প্রয়োজন। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে, লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন জনগণ। জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনকেও তাই গুরুত্ব দিতে হবে। পুতুল নাচের আঙ্গিক বিষয়বস্তু যুগোপযোগী গ্রহণীয় করে তুলতে হবে।



পুতুল প্রদর্শনী কক্ষে (বাঁ দিক থেকে) প্রবীন মাস্টার নীলকান্ত চক্রবর্তী, বর্ষীয়ান পুতুল নাচিয়ে জিতেন হালদার, প্রথম মহিলা নৃত্য শিল্পী সুমিত্রা মিস্ত্রী, সুধী প্রধান ও সুশান্ত হালদার

# উত্তরবাংলার লোকনাট্য

## পুষ্পজিৎ রায়

মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত মোট ছটি জেলা প্রশাসনিক বিচারে জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মালদহ, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার — এই ছ'টি জেলাকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। আয়তনের দিক থেকে এই উত্তরবঙ্গ এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গের সিকিভাগ। উত্তরে সিকিম-ভুটান, পশ্চিমে বিহার-নেপাল, পূর্বে আসাম, দক্ষিণে গঙ্গা, দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ।

পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির ভিন্নতা ও ঐক্যের প্রেক্ষাপটে আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের সম্পর্ক। এক সময়ে বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহারের রাজারা অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে দিয়ে ভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী ও আগ্রহীদের বসতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ব্রিটিশ আগমন এবং চা-বাগিচা পত্তন অনেকটা রূপান্তর সাধন করে। জমিদারী ও রাজন্যপ্রথার বিলোপ, স্বাধীনোত্তর কালে উদ্বাস্তু আগমন, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে আবাসন, যন্ত্রসভ্যতার প্রচলন, — এইসব মিলিয়ে উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ঘটতে থাকে।

বিচিত্র জনসংমিশ্রণের মর্মভূমি থেকে উৎসারিত হয়েছে উত্তরের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা। এই ধারার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে লোকনাটক। মালদহ জেলার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হচ্ছে, — গম্ভীরাগান, আলকাপ গান, ডোমনী গান, খনগান, নাটুয়া প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে খনগান, বন্ধুয়ালাগান, মহীপালের গান, নাটুয়া, লক্ষ্মীয়ালা, রামবনবাস প্রভৃতি। দার্জিলিং জেলায় কোনো কোনো এলাকায় রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীমূলক 'নাটুয়া' পালার কথা জানা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার লোকনাটক হিসেবে

ধামগান, চোরচুরনির পালা, মেচেনিপালা, ভেড়াচোবার গান, ফাঁসগান বা পালাটিয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার জেলায় বিষহরা, কুশান পালা, দোত্‌রা পালা, মৈষালবন্ধুর পালা এবং ইমান যাত্রার পালা (কারবালাকাহিনী ভিত্তিক লোকনাট্য) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা উত্তরবাংলার লোকনাটকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করব।

### *গম্ভীরা*

#### *নামকরণপ্রসঙ্গে*

চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস পর্যন্ত মালদহ জেলায় এই গানের আচার-অনুষ্ঠান ও পরিবেষণার প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণভাবে 'গম্ভীরাগান' বলা হলেও, 'গম্ভীরা', 'গম্ভীরার গান' নামটিও প্রচলিত। 'গম্ভীরা' কথাটির মানে হচ্ছে 'দেবালয়', 'শিবের মন্দির', 'মন্ডপ' এবং 'মন্ডপ-লাগোয়া উঠোন'। শিবপূজার জন্য নির্দিষ্ট আসর ছাড়াও নাচ-গান ইত্যাদির জন্য যে আসর সাজানো হয়, — তার সামগ্রিক নাম হচ্ছে 'গম্ভীরা'। আবার, গ্রামীণ দেবতার থান, গাজনঘর, গাজন উৎসব অর্থেও 'গম্ভীরা' শব্দের ব্যবহার আছে। নিভৃত, গভীর প্রকোষ্ঠের নামও 'গম্ভীরা'। প্রসঙ্গত, 'গম্ভীর' শব্দের অর্থ স্মরণ করা যেতে পারে, — 'গম্ভীর' মানে শিব, শিবালয়, দেবালয় এবং পদ্মফুল। বর্ধমান জেলায় 'রাঢ়ীয় শিবের গাজনে' 'গম্ভীরা' শিবালয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গম্ভীরা-কে 'আদ্যের গম্ভীরা'-ও বলা হয়। 'গম্ভীরা' অর্থে একসময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী আদ্যাদেবীর ভজনগৃহ বোঝাত। এই আদ্যা হচ্ছেন, — অতীশের আর্যতারা, বজ্রতারা, চন্ডী, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী। এই আদ্যাই চন্ডিকা রূপে শিবের পত্নী।

#### *উৎস-অনুসন্ধান*

পৌন্ড্রবর্ধনভুক্ত বরেন্দ্রভূমি ছিল বৌদ্ধমতাদর্শের বড়ো পীঠস্থান। সেই বিচারে মালদহ জেলা এবং লাগোয়া এলাকায় ছিল বৌদ্ধদের বড়ো সাধনক্ষেত্র। অনুমান করা হয় যে, নানান গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত বৌদ্ধ মতাদর্শের সঙ্গে শৈবভাবনার সংযোগ ঘটে। মিলন-মিশ্রণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিবপূজার প্রচার প্রসার ঘটতে থাকে, এই শিবপূজার স্বতন্ত্র ধারার নাম হয় 'গম্ভীরা পূজা'। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও শক্তির উপাসকগণ শিব বা গম্ভীরকে 'মহাকাল', 'মহাদেব' বা 'লোকেশ্বর' নামে উপাসনা করতেন। গম্ভীরার

আচরণগত বিধিব্যবস্থার ভেতরে হিন্দু-বৌদ্ধ-শৈব ভাবনার মিশ্রণ অতি স্পষ্ট। বিবর্তনের বিচিত্রপথে চলতে চলতে, লৌকিক দেবতা শিবের 'গাজন' কোনো এক সময়ে মালদহ এলাকায় 'আদ্যের গম্ভীরা'-য় রূপান্তরিত হয়েছে।

*কৃষি সম্পর্ক, সমাজ সম্পর্ক ও বিধিবিধান*

গম্ভীরাপূজা ও গম্ভীরা উৎসবের আচার-আচরণগুলির মধ্যে ঘটভরা, ফুলভাঙ্গা, ফল-ভাঙ্গা, শস্যবপন, কিসি, ঢেঁকি চুমানো প্রভৃতি কৃষি সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে প্রচলিত। উৎপাদনের সরঞ্জাম, উৎপাদিত শস্য এবং শস্যগুলি সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকরণের কথা সুস্পষ্ট। শস্যোৎপাদন ও শক্তিসাধনার এই ধারা বাংলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত গোর্খাজনগোষ্ঠীর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। বিধি-বিধানগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

*প্রশাসনিক সংগঠন*

গম্ভীরা শুধু উৎসব নয়, এক সময় রীতিমতো একটি প্রশাসনিক সংগঠন হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। গ্রামে গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন গম্ভীরা থাকলেও, সম্মিলিত আদি গম্ভীরা যেখানে ছিল, তাকে 'ছত্রিশ্রী গম্ভীরা' বলা হত। ছোটো ছোটো গম্ভীরার মূল পরিচালক বা মন্ডলদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন 'ছত্রিশ্রী বৈঠক'। সেই বৈঠকে 'প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ' স্বদেশের হিতকামনায় কর্মসূচি গ্রহণ করা হত। সম্পূর্ণভাবে ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করা হত। গম্ভীরার মধ্য দিয়ে এই বোধটি অন্তত তৈরি হত যে, ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র হলেও, সমাজবদ্ধভাবে মানুষ এক। গোপনে নৈতিক অপরাধ করলেও শেষ পর্যন্ত সেকথা আর গোপন থাকে না। গম্ভীরায় সেই সব গোপন কথা, অপরাধের কথা অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হত। যথারীতি শাস্তিরও ব্যবস্থা হত। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সব রকম ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত ছিল গম্ভীরা।

*প্রচলনকাল*

আনুষ্ঠানিকতার সীমা অতিক্রম করে গম্ভীরা গান সর্বসাধারণের দরবারে যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন দেখা যাচ্ছে বৎসরের সব ঋতুতে, সব সময়ে গম্ভীরার আসর অনুষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে, বিধিবিধান বা রিচুয়াল ভিন্ন একটি পর্ব, আর পালাগান পরিবেশণ হচ্ছে ভিন্ন আর এক পর্ব।

*বিষয়বস্তু*

প্রধানত কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষ নিজ নিজ সুখদুঃখের কথা নিবেদন করে মহাদেবের নিকট। সামাজিক-রাজনৈতিক ছোটো-বড়ো ঘটনা সহ প্রাকৃতিক বিষয় — কোনো কিছুই বাদ থাকে না। বিষয়ের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

*আসর*

এক সময় গম্ভীরা মন্ডপের সাজ সজ্জায় বিশেষ বিশেষ আয়োজন করা হত। মন্ডপের অলংকরণে বিশেষভাবে পদ্মফুল ব্যবহৃত হত। রং বেরঙের বাতি ঝাড়বাতির প্রচলন ছিল। নক্‌শাদার পট ও 'রামকেলী বস্ত্রে' আসর সাজানো হত। আসরের জন্য অবশ্য চাঁদোয়া ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত আছে।

*উপস্থাপনা*

গম্ভীরা গানের সূচনা পর্বটির নাম 'বন্দনা'। এই পর্যায়ে শিবকে আহ্বান জানানো হয়, শিব উপস্থিত হয়ে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং সমস্যাদির সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্থান করেন। পরবর্তী পর্যায়ের নাম 'চার-ইয়ারি'।

চারটি চরিত্র আসরে প্রবেশ করে নানান সমস্যার কথা বলেন। এঁদের মধ্যে একজন থাকেন 'উচিত বক্তা'। পরের পর্যায়ের নাম 'ডুয়েট'। দু'টি চরিত্র বিশেষ একটি বিষয় পরিবেশন করেন। সর্বশেষ পর্যায়ের নাম - 'রিপোর্ট' বা 'বর্ষবিবরণী'। প্রধানত এই চারটি পর্যায়ে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। এছাড়াও, কোনো কোনো বিষয় অবলম্বনে একাধিক চরিত্র সমন্বয়ে স্কেচ্‌ধর্মী পালা উপস্থিত করা হয়। যেমন, 'নেতার নিকট গান' — একটি প্রচলিত পালা।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পর্যায়গুলি অখন্ড একটি পালার মতো পরস্পর একসূত্রে গাঁথা নয়। সমগ্রভাবে নির্দিষ্ট কোনো একটি কাহিনীর 'কমপ্যাক্ট' বাঁধুনি এখানে নেই। নিজস্ব বৈচিত্র্যে খন্ড খন্ড ঘটনা উপস্থাপনায় স্বতন্ত্র গতিশীলতা বিদ্যমান।

*গান*

গানগুলি একটানা গাওয়া হয় না। গুরুত্ব অনুসারে গানের কোনো কোনো অংশ সরসভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পর্যায় অনুসারে গানের আলাদা আলাদা সুর আছে। প্রচলিত পর্যায় ছাড়াও আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক 'ছুটগান' গাইবার রীতি আছে। একটি

পর্যায়ের শেষে, অন্য পর্যায়ের শুরুতে, এই 'ছুটগান' পরিবেশিত হয়। আসরের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গানের বিশেষত্ব বোঝাবার জন্য গায়ক ও রচয়িতারা নিজেদের মধ্যে বিষয়বস্তুর 'মুদ্দা' স্থির করেন। গানের বিষয়বস্তুর প্রধানতম উদ্দেশ্যটিকে বলা হয় 'মুদ্দা'। অর্থাৎ কোনো একটি গানের প্রধান প্রতিপাদ্যের নাম হচ্ছে - 'মুদ্দা'।

*সংলাপ*

গদ্য সংলাপ এবং গীতি সংলাপ — দু'রকম সংলাপের ব্যবহার আছে। গদ্য সংলাপগুলি গীতি অংশের মতো পূর্ব-প্রস্তুত নয়। সম্পূর্ণত তাৎক্ষণিক। কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে শিল্পীদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকে। এক্ষেত্রে অভিনেতাদের চমৎকার উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

*নাচ*

গান ও সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে দলগত এবং একক-দু'রকমের নাচ হয়ে থাকে। আসরের একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে টুকরো টুকরো নাচ পরিবেশনের রেওয়াজ আছে। আসরে পালার অঙ্গ হিসেবে যে নাচ পরিবেশিত হয়, সেই নাচের সঙ্গে 'বড়ো তামাসা'-র মুখানাচের পার্থক্য বিস্তর। মুখানাচের বিশেষত্ব স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য।

*সঙের গান*

পুরনো রীতি অনুসারে গম্ভীরা উৎসবের তৃতীয় দিনে বিকেল বেলায় সঙের গান বের করার প্রথা প্রচলিত আছে। এখনও জেলার কোনো কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট দিনে দু'একটি সঙের দল বের হয়। সারা বছরের বিশেষ বিশেষ খবর প্রচার করাই সঙের দলের প্রধান কাজ। ছোট ছোট স্তবকে রচিত প্রধান প্রধান সংবাদগুলি গেয়ে শোনান মূল গায়েন, সহায়তা করেন দোহারের দল। কৌতূহল উদ্দীপক এই গানগুলি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।

*সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী*

এক সময়ে গম্ভীরা গানকে 'কোঁচ-পলের গান' বলা হত। পৌন্ড্র বা পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। দেশি-পলি-রাজবংশী-নাগর-ধানুক-চাঁই প্রভৃতি সম্প্রদায় বরাবর যুক্ত। কুন্ডু-তিলি কুন্ডুরাও কোনো কোনো এলাকায় বিশেষভাবে যুক্ত। আধুনিককালে

সবাই অংশ নিয়ে থাকেন। মালদহ জেলার মুসলমান সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে এই গম্ভীরায় যুক্ত ;— সুফী মাস্টার (মহম্মদ সুফী), মেরাজুদ্দীন, শমীর খলিফা, আবদুল মজিদ, সোলেমান ডাক্তার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। গানের বাণীতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা-পেশা-খাদ্যাভ্যাস-পোষাক-পরিচ্ছদ-আত্মীয়-সম্পর্ক-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

*গম্ভীরার নাট্যধর্ম*

সূচনাপর্ব থেকে এই আনুষ্ঠানিক লোক আঙ্গিকটিতে নাট্যধর্ম দেখা গেছে। গম্ভীরা উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'বড়ো তামাসা'। 'বড়ো তামাসা'র পরে 'বোলবাই' বা 'বোলবাহি' নামে পালাধর্মী গান গাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রধানত আঞ্চলিক ঘটনাদির ভিত্তিতে রচিত এই পালাগুলি পরিবেশিত হত। বোলবাহি বর্তমানে অবলুপ্ত। কিন্তু, গম্ভীরা গানের ঐতিহ্য বহন করছে বর্তমানের পালাধর্মী প্রকরণ। প্রকৃতপক্ষে, নাট্যধর্মী বোলবাহি গানের গর্ভে জন্ম নিয়েছে গম্ভীরাগানের পালাধর্মী রূপটি।

*নমুনা নিদর্শন*

প্রথমত 'বন্দনা' পর্যায়ের একটি গানের কথা লক্ষ করা যাক ঃ

বৈশাখ মাসে শিবঠাকুর কার্পাস বুনিলেন
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ......

শিববন্দনা প্রসঙ্গে এখানে কৃষিকর্মের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। গানের বিভিন্ন অংশে 'কার্পাস', 'সুতা', 'তাঁতবোনা' — প্রভৃতির উল্লেখ তাৎপর্যমন্ডিত। জানা আছে যে, মালদহ-দিনাজপুর এলাকা পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তির অংশ — বরেন্দ্রভূমি, এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে উন্নত ধরণের বস্ত্র উৎপাদনের ঐতিহ্য আছে। দেশ-বিদেশের রপ্তানির কথাও বহু প্রচলিত।

জাতীয় জীবনের নানা ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্য ও বিবর্তনের নানা তথ্য পাওয়া যায় গম্ভীরাগানে। লৌকিক মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণাটি সহজ স্বাভাবিকভাবে বিধৃত আছে গানে। যেমন ঃ

ওরে হায় কি পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁ-র আমলে (শিবো হে)

তখন গরিবদুখী আছিল সুখী

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

এখন আট সেরের দর ছুটে না
প্যাটে দু'বেলা ভাত জুটে না

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

তেত্রিশ কোটি ভারতের লোকে
বাবা বোম্ বাবা বোম্ কহে তোকে (শিবো হে)
তাদেরকে ভুলে আজ সাগর পারের
লোকগুলানের করলি গণ্যমান্য . . . . . . .
(কি কলি হে দশ দৈন্য)
এই আদিনা-পাভুয়া-গৌড়-রামকেলী
এসব নগর ছিল কি সমৃদ্ধশালী
আজ সেসব নগর করলি কি তুই
বাঘ-ভালুকের বাস অরণ্য! . . . . . . (অংশ)

জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, স্বজাতি প্রীতি এবং বিদেশী শাসকদলের প্রতি ক্ষোভের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এরকম আরও অনেক গানে। স্বাধীনতা উত্তর আশা-ভঙ্গের বেদনা, দেশনায়কগণের জনবিরোধী ভূমিকা, দুর্নীতিপরায়ণতার কথা অকপটভাবে গীত হয় গম্ভীরা গানে। স্থানীয় বিষয়সহ জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয় নির্বাচন গম্ভীরাগানের বিশেষ একটি বিশেষত্ব। জাতপাতভিত্তিক সংকীর্ণভাবনার বিরুদ্ধতায় গম্ভীরা শিল্পী বরাবর নির্দ্বিধচিত্ত, এই বিষয়ে একটি নিদর্শন ঃ

ও ঠাকুর, কিসে গেল ছোঁয়া
বল, হৈ ঠাকুর, বলতো একবার শুনি
তোমার কিসে গেল ছোঁয়া?

কাচ্চা চামড়া কাটি হামরা নাম তাই মুচি
আর, সেই জুতা পইর‍্যা চেয়ারে বইস্যা
খাও সন্দেশ লুচি . . .

হয়ে তোরা মহাজ্ঞানী

হে ঠাকুর, ক্যামনে গেল ছোঁয়া পানি?

. . . .

(অংশ)

তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠদের সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতাবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষের তীব্র অন্তর্জ্বালার অভিপ্রকাশ ঘটেছে এখানে। সেই সঙ্গে পশ্চাৎপদ লোকায়ত সমাজে বিদ্যমান আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। লৌকিক ঐতিহ্যে লালিত জীবচেতনার কাছে শূন্যগর্ভ শিক্ষার অপূর্ণতার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

লোকশিক্ষা, মূল্যবোধরক্ষা এবং নৈতিকতার প্রতিষ্ঠায় গম্ভীরাশিল্পীরা এক সময় সমগ্র সমাজজীবনে অভিভাবকত্ব করেছেন। সংকীণ বিচার-আচার দূরীকরণে, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারবর্জনে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও সম্প্রীতি সুরক্ষায় ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন। শত শত গান ও পালা-য় এই বক্তব্যের সমর্থনে নিদর্শন পাওয়া যাবে।

উভয় বাংলার জনপ্রিয় এই লোকনাটকটির সংগঠনশৈলীর অপর এক বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করা দরকার। সেটি হচ্ছে — গঠনমূলক সমাজ-ভাবনায় দুর্লভ সাংবাদিক স্বভাব, এই সাংবাদিক স্বভাবটি ঐতিহ্যনিষ্ঠ এক ধারার সৃষ্টি করেছে। মনে রাখা দরকার, সাধারণ মানুষের ভালোমন্দ বিচার বিবেচনার সহায়ক, চিন্তাভাবনার সংগঠক এরকম লোক-মাধ্যমের গুরুত্ব অনেক, সন্দেহ নেই।

*'মেয়েদের গম্ভীরা' বা ভাজোইগানের পালা*

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদহের অনেক গ্রামে শস্যোৎপাদনমূলক উৎসব ভাজোই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানকালে (ভাদ্রমাসে) অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেয়েরা অন্তঃপুরে নৃত্যগীত অভিনয়াদি করতেন। অভিনীত সেই পালাগুলিকে 'মেয়েদের গম্ভীরা' বা ভাজোই গানের পালা' বলা হ'ত! অভিনয়কালে পুরুষেরা উপস্থিত থাকতেন না। গ্রামীণ নারী সমাজের নিজস্ব উদ্যোগে রচিত ও প্রযোজিত লোকনাটকের নিদর্শন দুর্লভ। সাধারণ নারীর সৃষ্টিমূলকতার উল্লেখ্য নিদর্শন হিসেবে মেয়েদের গম্ভীরার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী।

*শেষকথা*

আরাধ্য দেবতা শিবকে নিয়ে সাধারণ ভক্তবৃন্দের ব্যঙ্গবিদ্রূপ রঙ্গরসিকতার ধারাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিব-কে 'নানা' বা 'নানা হে' বলে সম্বোধন করা হয়। আঞ্চলিক

উপভাষায় 'নানা' অর্থে দাদু বা ঠাকুরদা। লৌকিক সমাজে দাদু-নাতিতে রঙ্গরসিকতার অবকাশ আছে। অন্যান্য লোকনাটকের মতো গম্ভীরা গানে ধারাবাহিক একটি অখন্ড কাহিনী থাকে না। এই লোকনাটকটি বক্তব্যধর্মী, বিষয়ভিত্তিক, কখনোই আখ্যায়িকা মূলক নয়। প্রতিবছর নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গান বাঁধা হয়।

নান্দনিক বিশেষত্বের কথাও স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। সাজসজ্জা, প্রতিবেশ সৃজন, গদ্যসংলাপ-গুলিতে বুদ্ধির দীপ্তি, ব্যঞ্জনাগর্ভ বাক্‌চাতুর্যের বিস্তৃতি বিশ্লেষণ করা দরকার। এ জেলার মান্য 'ফোনেটিক প্যাটার্ন' গদ্যসংলাপের শিল্পগুণ বর্ধিত করেছে অনেক। প্রচলিত অনেক লোকগল্প, চূর্ণকগল্প গম্ভীরার আসরে বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

গম্ভীরা শিল্পীর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধ ছিল। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ চাপে শিল্পীদল কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। বিগত ১৯৭০ সাল পরবর্তী অস্থির প্রেক্ষাপটে এইসব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপের সূচনা ঘটেছে। আর একটি সমস্যা হচ্ছে, মটরবাবু-বিশুবাবু-নিরুবাবুর মতো বুদ্ধিদীপ্ত রসিক অভিনেতার সংখ্যা ইদানীং বড়োই কম। সুফী মাস্টার-ইন্দ্রদমন-গোপীনাথ, সতীশ ডাক্তার-সোলেমান ডাক্তারের মতো বড়ো গীতিকার পালাকার আর কোথায়?

তবু, প্রাণশক্তির প্রবলতায় ঐতিহ্যের প্রবাহটি আজও বহমান। নানা রকম রূপান্তরের ভেতর থেকে লোকায়ত সংস্কৃতির নিজস্ব শক্তিটিই এই প্রবাহকে সঞ্জীবিত ও প্রাণিত করছে।

*আলকাপ গান*

মালদহ জেলার গম্ভীরা গানের পরে জনপ্রিয় লোকনাটক হিসেবে আলকাপের নাম উল্লেখযোগ্য।

*নামকরণ ও উৎসপ্রসঙ্গ*

আলকাপ গানের উৎস-বিবর্তনের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার মনাকষা বা মোনাকয়সা গ্রামনিবাসী কিংবদন্তি পুরুষ বোনা কানার নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মোনাকয়সা গ্রামটি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত। আলকাপ মূলত রঙ্গব্যঙ্গধর্মী লোকনাট্য। মালদহ-মুর্শিদাবাদ এলাকায় প্রচলিত আঞ্চলিক

উপভাষায় 'কাপ' অর্থে রঙ্গব্যঙ্গমূলক কথাবার্তা বোঝানো হয়। নক্শাধর্মী এই লোকনাট্যে পরিহাস-রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সূক্ষ্ম 'হুল্' বা 'আল্' থাকে ; 'আলকাপ'-এর সামগ্রিক ধরণ বা গঠনশৈলীতে এই বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়।

মালদহ জেলার কালিয়াচক - মানিকচক থানার কোনো কোনো এলাকায় আলকাপ গানকে 'ছাঁইছুঁই' গান বলা হত। 'ছাঁইছুঁই' গানে একজন 'ছোকরা' ও একজন 'জোকার' থাকত। সামাজিক জীবনের নানারকম বিষয় নিয়ে 'পাল্টাপাল্টি' গান হত। 'ছাঁইছুঁই'-এর এই পাল্টাপাল্টি গানের ধারা পরবর্তীকালে আলকাপ গানের প্রতিযোগিতামূলক গানে রূপান্তরিত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, গম্ভীরা গানের রঙ্গব্যঙ্গধর্মী 'সঙ্' গান থেকে এই লোকনাট্যের উদ্ভব। গম্ভীরা-তে রঙ্গরসিকতা বা 'কাপ'-এর প্রচলন ছিল। আলকাপ গানের গবেষক ড. দিলীপ ঘোষ তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে জনৈক প্রবীণ শিল্পীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। প্রবচনধর্মী এই মন্তব্যটি হচ্ছে ঃ

চৈত্রমাসের চৈত পরবেতে।
আলকাপ সৃষ্টি গম্ভীরা-তে।।

মালদহ জেলায় একসময় আলকাপ গানের প্রচলন ছিল ব্যাপক। প্রচলিত অসংখ্য পালায় 'বন্দনা' পর্যায়ে 'শিববন্দনা' ও 'ছড়া'-য় ('ছার্‌রা'-য়) শিবের উদ্দেশ্যে অনেক বিষয়ে আবেদন-নিবেদনজ্ঞাপনের নির্দশন পাওয়া যায়। ইংরেজবাজার থানার কদমতলা গ্রামের ফেলু সরকার, দুখু মন্ডল, শ্রীচরণ মন্ডল, তামো শেখ (মকবুল) এবং জালুয়াবাথাল গ্রামের মানান ঘোষ, শিবু দাস, নাথু পরামানিক প্রভৃতি প্রবীণ লোকশিল্পী বলেন, আগে গম্ভীরায় আলকাপ গানের আসর হত। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে ভারতের স্বাধীনতালাভের সময় কালেও (১৯৪৭ খ্রীঃ) গম্ভীরায় আলকাপ গানের আসর হত। তারপর, ধীরে ধীরে এই শাখার অনুশীলন হ্রাস পেতে থাকে।

*প্রচলন এলাকা*

মালদহ-দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-নদিয়া এবং বর্ধমানে এই পালাগানের জনপ্রিয়তা আছে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় এখনও প্রচলিত আছে। মালদহ মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন বিহারের বারহারোয়া-রাজমহল-সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় এই পালাগানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

*সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী*

রঙ্গমূলক প্রহসনধর্মী এই লোকনাট্যের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত। নির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই। আঙ্গিকটি একান্তভাবে আনুষ্ঠানিক।

*ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদি*

প্রধানত ঢোল করতাল বাঁশি ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে ফ্লুট-কর্ণেট-হারমোনিয়াম-তবলা-নাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ধারা লক্ষ করা যায়।

*পোশাক-পরিচ্ছদ*

কাহিনী অনুযায়ী চরিত্রের সাধারণ সাজসজ্জার ব্যবস্থা থাকে। বিশেষভাবে 'ছোক্‌রা' বা 'জোকার' বা 'লাব্বার' নামক বিদূষক চরিত্রের সাজসজ্জায় নজর দেওয়া হয়।

*পর্যায় বিভাগ ঃ পরিবেষণা*

প্রধানত এই কয়েকটি পর্যায়ে আলকাপ পালা পরিবেশিত হয় ঃ

১. বন্দনা
২. খেমটা নাচ, বট্‌কি গান বা বৈঠকি গান
৩. ছড়াগান
৪. কাপ
৫. মূল পালা

প্রধান প্রধান এই পর্যায়গুলি ছাড়াও 'ছোটো আলকাপ' নামে কিছু 'ছুটপালা' অভিনয়ের ধারা দেখা যায়। বিশেষ একটি খন্ড ঘটনা অবলম্বনে অল্প সময়ের জন্য 'ছোটো আলকাপ' পরিবেশিত হয়। মূল পালার কাহিনীর সঙ্গে এই খন্ডদৃশ্য পরিবেষণার কোনো সম্পর্ক নেই। বিরতির সময় বৈচিত্র্যের জন্য নাচ সহযোগে কিছু 'ছুট' গান গীত হয়। কোনো কোনো দল গম্ভীরা গানের 'ডুয়েট' গানও পরিবেশণ করে। মূল পালা ছাড়াও আলকাপের আসরে 'বোল কাটাকাটি' নামে আকর্ষণীয় একটি পর্যায় পরিবেশিত হয়। এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। যে কোনো বিষয় অবলম্বনে

তরজা গানের মতো সুদীর্ঘ বিতর্ক চলতে থাকে। আলকাপের এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান মালদহ-মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামে গ্রামে বিশেষভাবে লোকপ্রিয় ছিল।

অন্যান্য লোকনাটকের মতো আলকাপ পালার লিখিত কোনো পূর্ণাঙ্গরূপ থাকে না। কাহিনী অনুসারে প্রধান প্রধান গানগুলি আগে লিখিত হয়। গানের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় সংলাপের ব্যবহার থাকে। সংলাপগুলি একান্তভাবেই তাৎক্ষণিক। গীতিসংলাপের ব্যবহার আছে। গীতি সংলাপগুলি পূর্বপ্রস্তুত।

আলকাপ গানের দলনেতা বা রচয়িতা পরিচালককে 'মাস্টার' বা 'খলিফা' বলা হয়। যেমন সিরাজ মাস্টার, কলিমুদ্দীন খলিফা প্রভৃতি।

*আলকাপের রূপান্তর ঃ 'পঞ্চ রস'*

আলকাপ পালার প্রকৃত রূপ এখন আর বিশেষ দেখা যায় না। ১৯৬০-৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত কিছু পালার অনুশীলন হ'ত। কালিয়াচক থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত সুজাপুর, রাজনগর, বীরনগর, বৈষ্ণবনগর থানার ধূলাউড়ি, গোলাপগঞ্জ, চরি অনন্তপুর এবং ইংরেজবাজার থানার মহদীপুর, চন্ডীপুর প্রভৃতি এলাকায় একসময় ব্যাপক অনুশীলন ছিল।

বর্তমানে, আলকাপের গর্ভজাত ভিন্ন এক লোকনাটকের প্রচলন দেখা যায়। এই লোকনাটকটির নাম 'পঞ্চরস'। হালকা ও চটুল ফিল্‌মি ধাঁচে 'পঞ্চরসের' কাহিনী রচনা করা হয়, ফিল্‌মি নাচগানসহ সেই কাহিনী পরিবেশণ করা হয়।

আলকাপের লোকায়ত স্বভাবটি 'পঞ্চরসে' পাওয়া যায় না।

*বিষয়বস্তু*

আলকাপ গানের উন্মেষপর্বকে আঞ্চলিক উপভাষায় 'ছাঁইছুঁই' বলা হয়। 'ছাঁইছুঁই' গানের বিষয়বস্তুতে সামাজিক পারিবারিক উপাদান ছিল প্রচুর। এইসঙ্গে পৌরাণিক বিষয়ও পরিবেশিত হত। একসময় রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীর ব্যাপক চাহিদা ছিল। পরবর্তীকালে আলকাপ পালায় রাজা হরিশ্চন্দ্র, সাবিত্রী, সত্যবান প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় যুক্ত হয়েছে। জনপ্রিয় কিছু লোককাহিনীও পালার আকারে পরিবেশিত হত। স্থানীয় বা দূরবর্তী, চাঞ্চল্যকর কোনো সত্য ঘটনার প্রেক্ষিতে পালা রচনার রেওয়াজ ছিল। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে (১৯৪০-৪৫) পরিবেশিত সামাজিক একটি পালায় গ্রামীণ মানুষের লেখাপড়া শেখার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা খুব সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছিল।

পালাটি 'ছোট আলকাপের' উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ। কালিয়াচক থানার মোথাবাড়ি-কাগ্‌মারী-গোপালপুর-রাজনগর-বীরনগর এবং মানিকচক থানার চৌকি ধরমপুর প্রভৃতি এলাকায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মানিকচক থানার গোপালপুর এলাকার অন্যতম গীতিকার পালাকার ছিলেন ক্ষীরোদমোহন ঠাকুর। তাঁর একটি পালায় নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন লক্ষ করা যায়। আদিরসাত্মক, স্থূলরুচির পালা হিসেবে কিছু একদেশদর্শী অভিমত থাকলেও, লোকায়ত জীবনভাবনার ইতিবাচক উপাদানের কথা বিস্মৃত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক পালায় সামাজিক অসাম্যজনিত বেদনা ও যন্ত্রণার কথা পরিস্ফুট হয়েছে। দারিদ্র্যের অসহায়তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পরিধি থেকে মানবিক অধিকারের খোলা আকাশে নিঃশ্বাস নেওয়ার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে অনেক গানে।

### *খনগান*

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, 'খন' গান হচ্ছে — উৎসবের গান, উৎসব কালের গান, অবসর অবকাশ বা বিরামকালের গান ; মালদহ জেলার গাজোল থানায় এই গানকে খোজাগরি, খজাগরি, কোজাগরি খনগান বলা হয়ে থাকে। কোজাগরি পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজাভিত্তিক উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবের সময় বিশেষভাবে খনগানের আয়োজন করা হয়। কৃষিনির্ভর এইসব এলাকায় চাষবাসের প্রচলিত ধারা অনুসারে আমন ধান রোপণের পরে কিছুটা অবসর, অবকাশ বা বিরাম লক্ষ করা যায়। কিছুকাল আগে পর্যন্তও এইসব এলাকায় একফসলি ধানচাষ হত। এইসময়ে দুর্গোৎসব এবং আরও কিছু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেইসব উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সময়ে, বিরাম-বিশ্রামের অবকাশে সৃষ্ট ও পরিবেশিত পালাগানকে 'খনগান' বলা যেতে পারে।

খনগানের 'খন' শব্দটির অর্থ এবং তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রচলিত অর্থছাড়াও, 'খন' শব্দটির অর্থ, প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ হিসেবে যা জানা যায়, তা হচ্ছে — উৎসব, উৎসবের কাল, অবকাশ, অবসর, বিরামকাল, আনন্দ প্রভৃতি। মালদহ জেলার বরিন্দ এলাকার গাজোল ও হবিবপুর থানা এলাকায় কোথাও কোথাও স্থানীয় আঞ্চলিক লোকভাষায় 'ফসল' ও 'নতুন ফসল' অর্থে 'খন' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

অপর অর্থে আনন্দের জন্য, আনন্দলাভের জন্য, আনন্দ উপভোগের জন্য, আনন্দ বিতরণের জন্য, আনন্দ-বিনোদনের জন্য যে গান, তার নাম 'খন' গান হওয়াই স্বাভাবিক।

দুই দিনাজপুর এবং দিনাজপুর সংলগ্ন মালদা জেলার পূর্ব ও উত্তরাংশে এই লোকনাট্য ধারার প্রচলন দেখা যায়। খনগান বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন - 'শরীগান, খন-পাঁচালী, রঙ পাঁচালী, এবং পাঁচালী নামে পরিচিত। দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনো কোনো এলাকায় 'খন' গানকে 'জংলাগান'ও বলা হয়।

খনগান পালার প্রধান চরিত্রের নামের শেষে, 'শরী' বা 'শোরী' যুক্ত করে কখনও কখনও খনপালার নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন - মিনতিশরী, পুন্নিমাশরী প্রভৃতি। নামের শেষে এই 'শরী' যুক্ত করার ধারাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বিষয়টি বিশেষ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার, তা হচ্ছে গাজোল, হবিবপুর থানা এবং সংলগ্ন দিনাজপুরের কেউ কেউ মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে 'বোলবাহি' গানকেই 'খনগান' বলা যায়। 'বোলবাহি' ইদানীংকালে অবলুপ্ত। গাজোল থানার মাঝরা অঞ্চলের কামালপুর গ্রামের গোপাল সরকার এবং পাইল গ্রামের ইন্দ্র মন্ডল এই অভিমত সমর্থন করেন। এঁরা দুজনেই 'বোলবাহি' পালাগানের প্রাক্তন শিল্পী, বয়স সত্তর বছরের মতো।

প্রধানত, দেশি পলিসহ ব্যাপক অংশের রাজবংশী সম্প্রদায় এই লোকনাট্য ধারার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে, নানান মিলন-মিশ্রণের ফলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ যুক্ত থাকেন। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও যুক্ত থাকেন।

আসর, বাদ্য, সাজসজ্জা প্রভৃতি অন্যান্য লোকনাট্যের মতো। দলের মূল গায়েনকে কোচবিহারের দোত্‌রা পালার মতো 'গীদাল' বলা হয়। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ইসলামপুর-করাদীঘি-রায়গঞ্জ-ইটাহার-কালিয়াগঞ্জ-দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি-তপন এবং মালদহ জেলার বামনগোলা-হাবিবপুর গাজোল প্রভৃতি এলাকায় 'খন' গানের প্রচলন আছে। প্রচলন এলাকাটি বেশ বিস্তৃত।

*ডোমনিগান*

মালদহ জেলার আর একটি জনপ্রিয় লোকনাটক হচ্ছে ডোমনি গান। শস্যোৎপাদনমূলক আচার-আচরণ ও বিধিনিয়মের অঙ্গ হিসেবে এই লোকনাটকের প্রচলন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মানিকচক ও রতুয়া থানা এলাকায় নববর্ষ উৎসব বা 'শিরুয়া' পরবের সঙ্গে ডোমনি গানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। নতুন বছরের প্রথম দিনে এলাকা পরিক্রমা করে, গান গেয়ে নতুন ফসল ও অর্থ সংগ্রহ করার রীতি ছিল। 'শিরুয়া' পরবের শিরুয়া

মেলায় ডোমনি গানের অনুষ্ঠান ছিল অপরিহার্য। দোল উৎসব বা 'হোলি' উৎসবের পর থেকে হত আয়োজন-উদ্যোগ।

গঙ্গা তীরবর্তী দিয়ারা এলাকায় — বিশেষত মানিকচক ও রতুয়া থানা এলাকায় এক সময় ডোমনি গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কালিয়াচক ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কোনো কোনো এলাকায় অল্পবিস্তর অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই আঙ্গিকটির সঙ্গে যুক্ত। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও (১৯৫০ খৃঃ) বিভিন্ন দলের মধ্যে উদ্দীপনাময় প্রতিযোগিতার আসর অনুষ্ঠিত হত। আসর, সাজসজ্জা এবং বাদ্যযন্ত্রাদি — অন্যান্য লোকনাট্যের মতো।

বেহুলা কর্তৃক ডোমনির ছদ্মবেশধারণ, চম্পক নগরে গমন, বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা প্রভৃতি লৌকিক কাহিনীর অভ্যন্তরে ডোমনি গানের উৎস নিহিত আছে বলে অনেকেই মনে করেন। বৌদ্ধ নৈরাত্মা তথা 'ডোম্বী' দেবীর সঙ্গে এই ডোমনির সম্পর্ক-সূত্রের কথা অনুমান করা হয়। এই দেবী সম্ভবত ডোমসম্প্রদায়ের উপাস্যা ছিলেন। কালক্রমে, গম্ভীরাগানের 'শিব', 'শিবোহে' বা 'নানা'-র মতো 'ডোমনি' বা 'ডোমানিয়া' (আঞ্চলিক বি-ভাষায়) নামে প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

ডোমনারীর ('ডোম্বী') নানা গুণ ও নৃত্যগীতপরায়ণতার কথা চর্যাপদে উল্লিখিত আছে। ১০, ১৪, ১৮, ১৯ ও ৪৭ সংখ্যক পদে 'ডোম্বী' বা 'ডোমনি'-র উল্লেখ আছে। ডোমনির প্রেমাসক্তি, ডোম-ডোমনির বিয়ে, 'সাঙ্গা', নাচ গানের কথা, ডোমনির চাঙারি বিক্রয় প্রভৃতি উপাদান ডোমনি গানের বিষয়বস্তুতে পাওয়া যায়। ডোমনির সঙ্গে উচ্চবর্ণের পুরুষদের অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত ও মিলনের কথা কাহ্নপাদের পদে (১৮ ও ১৯ সংখ্যক) অভিব্যক্ত হয়েছে।

ডোমনি পালাগানের কাহিনী উৎস প্রসঙ্গে সেন বংশের বিখ্যাত রাজা 'নিঃশঙ্ক শঙ্কর' গৌড়েশ্বর বল্লাল সেনের (১১১৯-১১৬৯) নামে প্রচলিত একটি কাহিনীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জানা যায়, বল্লাল একদা মৃগয়া করতে যান এবং বনের ভেতরে ডোমজাতীয়া এক সুন্দরী নারীকে দেখেন। এই সুন্দরী ডোমনারীর রূপে মোহিত হয়ে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

বয়োবৃদ্ধ বল্লালের এহেন কর্মে রাজ্যে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। পুত্র লক্ষ্মণ সেন সহ সভাসদবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কুল-পুরোহিত ভীম ওঝা গৌড়নগরের কালিয়াগ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। অনুমান করা যায়, গৌড়নগর সন্নিহিত উক্ত কালিয়া-গ্রাম বর্তমান কালিয়াচক। কালিয়াচক ও মানিকচক একান্তই সংলগ্ন এলাকা। এই এলাকায়

প্রচলিত ডোমনি গানের ডোমনি চরিত্রে উক্ত কাহিনীর মিশ্রণ ও প্রভাব প্রতিফলন স্বাভাবিক।

পার্শ্ববর্তী থানা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় নিকটবর্তী নয়পুকুরিয়া গাঁয়ে 'মা ডোমনি'-র থান। এই থানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত কিংবদন্তির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। কিংবদন্তিটি এরকম ঃ

> জনৈক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী ব্যক্তি দেশভ্রমণে বেরিয়ে নয়পুকুরিয়া গাঁয়ে হাজির হন। সেখানে পরমা সুন্দরী এক যুবতীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাঁশের 'ছিলকা' তৈরিতে পটুত্ব দেখে তাঁর সন্দেহ হয় এবং খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে, রূপবতী কন্যাটি আসলে ডোমের ঘরের মেয়ে। ডোম সম্প্রদায় অন্ত্যজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই পরিস্থিতিতে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী ব্যক্তিটি ডোমকন্যাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেন এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে যান। দুঃখে শোকে ও অবমাননায় ডোমকন্যা পাথর হ'য়ে যান। সেই সময় থেকে নয়পুকুরিয়া গাঁয়ের পাথরের থানটি 'মা ডোমনি' বা 'মা ডুমনি'-র থান নামে পরিচিত।

প্রধানত তিনটি পর্যায়ে এই পালাগান পরিবেশিত হয় ঃ

১. আসর বন্দনা

২. ছোকরা নাচ বা নাচারি

৩. মূল পালা।

ছোকরা নাচ বা নাচারি পর্যায়ে 'জোকার' বা 'লাব্বার' নামে একটি বিদূষক চরিত্র থাকে। মূল পালার মাঝে, বিরতির সময় এই বিদূষক নানারকম রঙ্গরস পরিবেষণ করে।

মূলপালা ছাড়াও ডোমনি গানে 'ছুটপালা' নামে ছোটো ছোটো খণ্ড দৃশ্য উপস্থাপনার রীতি আছে। আলকাপ গানের মতো ডোমনি গানের বড়ো আকর্ষণ 'ছোকরা'। বর্তমানে ভালো ছোক্‌রা পাওয়া যায় না। বিগত ১৯৮০ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত মাত্র একজন দক্ষ ছোক্‌রা পাওয়া গেছে — মানিকচক থানা এলাকায়। রতুয়া- মানিকচক — এই দুই থানা মিলিয়ে চার-পাঁচ জন মাত্র গীতিকার পালাকার পাওয়া গেছে।

একান্তই আঞ্চলিক বিভাষা 'খোট্টাবুলি'-তে পরিবেশিত। ভাষাগত কারণে ভিন্ন এলাকায় রসগ্রহণে কিছুটা সমস্যা হয় ; এজন্য কোনো কোনো এলাকায় গান পরিবেশনার সময় মিশ্রিত 'বাংলা বুলি' ব্যবহার করা হয়।

*নটুয়া পালাগান*

মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, রতুয়া এবং মানিকচক থানার বিভিন্ন গ্রামে 'নটুয়া' পালাগানের সামান্য প্রচলন দেখা যায়। সাধারণভাবে 'নটুয়া' বা 'নাটুয়া' গান নামে পরিচিত এই লোকনাট্যকে কেউ কেউ 'ঝুমরা' 'ঝুমরিগান' নামে অভিহিত করে থাকেন। বর্তমানে, রতুয়া থানার দেবীপুর অঞ্চল এবং মানিকচক থানার মথুরাপুর অঞ্চলে এই নটুয়া গানের কিছু অনুষ্ঠান লক্ষ করা যায়।

প্রধানত যাদব বা গোয়ালা ঘোষ সম্প্রদায় বা 'আহীর' সম্প্রদায়ের মধ্যে এই লোকনাট্য ধারার প্রচলন দেখা যায়। এছাড়া চাঁই, চাঁইমণ্ডল, তিয়োর, তেলি, সাহা-তেলি ও খাড়ওয়াড় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নটুয়া গানের প্রচলন আছে।

জানা যায় যে নতুন বৎসরের শুরুতে এই পালাগান পরিবেশণার আনুষ্ঠানিক রীতি ছিল ; অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে পালা গানের সূচনা হত। প্রচলন এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই পালা পরিবেশণার প্রথা ছিল।

খোলামেলা মাঠে বা বড়ো বাড়ির উঠোনে আসর বসে। চারদিকে থাকে দর্শকসাধারণ। বাদ্যকার দোহারগণ আসরের মাঝামাঝি বসে আবহ প্রস্তুত করেন। সাধারণত তিনটি পর্যায়ে পালা পরিবেশিত হয় ঃ (১) বন্দনা, (২) লাঠিখেলা ও অন্যান্য দৈহিক কসরৎ, (৩) মূল পালা গান। 'বন্দনা' পর্যায়ে প্রধানত কমলা মাঈ বা কমলা দেবীর বন্দনা করা হয়। দৈহিক কসরৎমূলক অন্যান্য খেলাধূলার পরে মূল পালার কাহিনী শুরুর আগে বা পালার বিরতির সময় কিছু মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করার ধারা প্রচলিত আছে। মুখোস নাচের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড ঘটনা পরিবেশিত হয়, — ঘটনাগুলি অধিকাংশই সামাজিক বিষয় অবলম্বনে সজ্জিত। যেমন - বুড়াবুড়ি, বাঘনাচ, সাহেব নৃত্য, সিপাহী-পুলিশ-দারোগা-চোর-বণিক প্রভৃতি। দু'একটি ক্ষেত্রে কালী প্রভৃতি নাচের কথা জানা যায়। কখনও বা গম্ভীরা গানের মতো 'ছুট গান' সহ 'ছোকরা'-নাচের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মূলপালা অংশের পূর্বে উপস্থাপিত দৈহিক কসরৎ প্রদর্শন পর্যায়ে বাদ্যহিসাবে সাধারণত ঢাকের ব্যবহার দেখা যায়। এই সঙ্গে বড়ো আকারের ঢোলও বাজানো হয়। শিল্পীর সাজসজ্জার বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। মালকোঁচা মারা আঁটোসাঁটো ধুতি হাঁটুর উপর পর্যন্ত পরিধান করা হয়, পাগড়ির ওপর থাকে সোলা-র তৈরি 'কলকা', পাগড়ি-র কাপড়ের রং লাল, সোলার এই 'কলকা' সম্পর্কে এলাকায় যাদুবিশ্বাস প্রচলিত। পাগড়ি থেকে যদি কোনো কারণে 'কলকা'-খুলে পড়ে যায়, তাহলে তা অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। সাজসজ্জার অপর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে শিল্পীর কোমরে বাঁধা থাকে চামড়ার তৈরি ফিতের মতো লম্বা পুরু কোমরবন্ধনী, কোমরবন্ধনীতে নানা আকারের কড়ি

বসানো থাকে। পালা গানের সঙ্গে সাধারণভাবে যে বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢোলক-জুড়ি-হারমোনিয়াম, বাঁশি, তবলা প্রভৃতি। বর্ণাঢ্য সাজসজ্জার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়।

*ধামগান*

জলপাইগুড়ি জেলার জনপ্রিয় লোকনাটক হচ্ছে ধাম গান।

পবিত্র স্থানে বা থানে বা ধামে যে গান গাওয়া হয়, তাকে বলা হয় ধাম গান। সাধারণত পৌষ-ফাল্গুন মাসে, মেলায় বা বৃহৎ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে ধামগান পরিবেশিত হয়। এ জেলার কোনো কোনো এলাকায় লোকনাট্যধর্মী এই পালা গানকে 'রঙ পাঁচাল' বলা হয়। এই পালা গানের সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক উৎস সম্পর্কে বিতর্ক আছে। পৌষ-ফাল্গুন ছাড়া অন্যান্য সময় ধামগান গীত হয় না, তা-ও বলা যাচ্ছে না। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা ও সন্নিহিত এলাকায় ধামগানের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

অন্যান্য লোকনাট্যের মতোই ধামগানের আসর বসে। বাদ্যযন্ত্র ও সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। কনসার্ট বাদ্য ও সখীনৃত্য বা দুই 'ছোক্‌রা'-র নাচের পর 'বন্দনা' পর্যায় শুরু হয়। পালাদার পরিচালককে বলা হয় 'গীদাল' বা 'গীতাল'। বন্দনা-র অংশ হিসেবে 'গীদাল' মুখ্য শিল্পীদের সঙ্গে দর্শক সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেন ; শিল্পীবৃন্দ আত্মপরিচয় দিয়ে পালায় অভিনীত নিজ নিজ ভূমিকার কথা দর্শক সাধারণকে জানান।

গদ্য সংলাপ ও গীতি সংলাপ — দু'রকম সংলাপের ব্যবহার দেখা যায়। গানের সঙ্গে নাচের ব্যবহার আছে।

সাধারণত সামাজিক বিষয় অবলম্বনে ধামগানের পালা রচিত হয়। স্বভাবতই শোষণ-বঞ্চনা-আনন্দ-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকে পালার কাহিনীতে। সাম্প্রতিক বিষয় নির্বাচনের প্রবণতাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজগঞ্জ থানা এলাকার নবানু রায় (কেবল পাড়া), শিশুরায় (কালার বাড়ি), গুদাম সিং রায়, শচীন রায় (মন্থনী পাড়া), কেন্দেলা রায়, কমল দেবনাথ (তাঁতি পাড়া) প্রমুখ সাম্প্রতিক কালের (১৯৮৪-'৮৫ খ্রীঃ) বিখ্যাত পালাকার-পরিচালক।

*চোরচুন্নির গান*

প্রধানত জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাসজাত এক বিশেষ ধরণের পালা গানকে 'চোরচুন্নির গান' বলা হয়ে থাকে। মহালয়ার দিন কোনো চোর যদি কোনো

গৃহস্থের বাড়ি থেকে কোনো জিনিস চুরি করতে পারে এবং পরবর্তী অমাবস্যার সময় (কালীপূজার রাতে) সেই জিনিস ফেরৎ দিতে পারে, তাহলে সেই চোরের পক্ষে সেই বছরটা হবে 'শুভ'। অর্থাৎ চোর ধরা না পড়ে চুরি করতে পারবে। ঋতু পরিক্রমার বিচারে, এই সময়টা কখনও বছর শুরুর সময় হিসেবে পরিগণিত ছিল। অগ্রহায়ণ মাসের নামের মধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চোর-চুন্নির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের দারিদ্র্যের কথা, সমস্যার কথা, প্রাসঙ্গিক চাষবাস-ফসলের কথা এই লোকনাট্যে বিবৃত হয়। উপায়হীন হয়ে 'চোর'-কে চুরি করতে হয়।

নানা রঙ্গরসে পরিপূর্ণ এই কাহিনীটি উপভোগ্য। সাজপোষাক পরে সঙ সেজে কখনও বা মুখোশ পরে চোরচুন্নির দল এলাকা পরিক্রমা করে। পরিক্রমায় সংক্ষিপ্ত আকারে পালা পরিবেশনার ধারা দেখা যায়। প্রধানত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কালীপূজার সময় এই পালা গান প্রচলিত।

তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে এটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় আঙ্গিক। এর উৎস-সূত্রে কৃষি-উৎপাদনসংক্রান্ত আচার-আচরণাদি লক্ষ করা যায়। গীতিসংলাপবহুল এই পালাগানে যৌথ বা সম্মিলিত 'ছোক্রা' নাচের প্রচলন আছে। আগে ছেলেরাই ছোকরা-নাচে অংশ নিত। এখন মেয়েরাই নাচে অংশ নেয়। এলাকা পরিক্রমায় বাড়িবাড়ি ঘুরে নাচ-গান করে গৃহস্থের নিকট থেকে চাল-ডাল সব্জি ও নগদ পয়সা-কড়ি সংগ্রহ করা হয়।

চোরচুন্নি পালাগানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকার বিবরণ প্রদান। দাম্পত্য-জীবনের সমস্যার কথা প্রসঙ্গে এলাকার চাষবাস-ফসল, ঘটনা-দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক-সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৈবদুর্বিপাকের কথা জানা যায়। গম্ভীরা গানের 'রিপোর্ট' পর্যায় বা বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। জলপাইগুড়ি এলাকায় অধুনালুপ্ত 'খাসপাঁচালি' লোকনাটকের সঙ্গে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার। এলাকায় বাস্তবে কোনো অনৈতিক ঘটনা ঘটে থাকলে সেই ঘটনা অবলম্বনে লোকনাটক অভিনীত হত। এর ফলে সাধারণ্যে কলঙ্কজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত না - হওয়ার জন্য সতর্কতা প্রচলিত হত। ঐক্যবদ্ধ ও সংহত সমাজ গঠনে লোকায়ত এই আঙ্গিকগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

*দোত্‌রা পালা*

ব্যবহৃত প্রধান বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে একটি লোকনাট্য ধারার নাম প্রচলিত হয়েছে, এই বিশেষত্ব অন্য লোকনাট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়না। দোত্‌রা পালা কোচবিহার জেলার

লোকপ্রিয় এক লোকনাট্য। পালার প্রধান কুশীলব বা প্রধান গায়ক-অভিনেতা বা গীদালের হাতে অবশ্যই এই দোত্‌রা বাদ্যযন্ত্রটি থাকবে। বাদ্যের নাম 'দোত্‌রা' বা 'দোতারা' হলেও এই বাদ্যের চারটি তার থাকে। সাধারণত সামাজিক জীবন থেকে দোত্‌রা পালার কাহিনী নির্বাচন করা হয়। আঞ্চলিক লোককথা-উপকথা নির্ভর সামাজিক কাহিনীর মধ্যে মৃত্তিকারসের পরিচয় থাকে বলে এলাকায় লৌকিক মানসিকতায় এগুলি বিশেষভাবে আদরণীয়। রূপধনকন্যা, মরিচমতি, দুব্‌লাবালী, বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, মধুমালা মদনকুমার, রহিম বাদ্‌শা প্রভৃতি পালা বিশেষভাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। গীতিসংলাপ বহুল এই লোকনাট্যের প্রচলন এলাকা প্রধানত কোচবিহার জেলা হলেও জলপাইগুড়ি জেলার অনেক এলাকায় অনুশীলন উপস্থাপনার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত দু'ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা ধরে পালার অভিনয় চলে, ক্ষেত্রবিশেষে চার পাঁচ ঘন্টা ধরে অভিনয় হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক মাটি-মানুষ-প্রকৃতির সতেজ উপস্থিতি দোত্‌রা পালায় আজও বিদ্যমান, এই কারণে স্থানিক আবেদনের স্বাদগন্ধ এখনও পাওয়া যায়। লোকনাটকের conventional illusion অনেকটা অপরিবর্তিত আছে।

### *কুশান পালা*

কোচবিহার জেলার কুশান পালাও বেশ জনপ্রিয়। পুরান কাহিনী আশ্রিত অনেক পালার খ্যাতি ছিল। যেমন - লবকুশ পালা, দানী রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি। বেহুলা ভাসানী পালা ও বিষহরি পালা এই কুশান লোকনাট্য ধারার অন্তর্গত। অবশ্য পালা পরিবেশনার কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। কুশান পালার প্রধান গায়কের অঙ্গে নামাবলী থাকে। মূল গায়ককে 'গুরু' বলে সম্বোধন করার রীতি এখনও প্রচলিত আছে। অন্যান্য লোকনাট্যে এই রীতি দেখা যায় না।

### *শেষকথা*

উত্তরবাংলার প্রধান প্রধান লোকনাটকগুলির সাধারণ পরিচিতিমাত্র উল্লেখ করা হল। এগুলির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব, পারস্পরিক সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্য, উপস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্নতা ইত্যাদি আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বিশেষত, লোকনাট্যসমূহের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং ভাষাবিভাষা উপভাষার পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, লোকনাটকগুলির প্রচলন এলাকার, সংশ্লিষ্ট বিশেষ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তির একটি সাধারণ রূপরেখা প্রস্তুত করা দরকার।

আমরা লক্ষ করেছি, দক্ষিণ দিনাজপুরের 'ঢাকোশরী'- খনপালায় গ্রামীণ মোড়লের পীড়নে অসহায় দরিদ্র কৃষকের যন্ত্রণার কথা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহপ্রসঙ্গে লোকায়ত রীতিনীতি, পণ, গোঁসাই বা গুরুর দুষ্কর্মের ঘটনা, চৌকিদারি ট্যাক্স, কাচারি-ফৌজদারি-দারোগা-আসামী ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণযোগ্য। 'দোত্‌রা গান'-এর বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী-পালায় অনুরূপ দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের পাশাপাশি ধনশালী রাজার অধীনে চাকুরির যন্ত্রণার কথা অভিব্যক্ত। দুব্‌লাবালী পালায় আর্থিক অসাম্যের বেদনা, বেকারত্বের জ্বালার বিষয় বিধৃত হয়েছে। মানুষের পারিবারিক সামাজিক - আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও অন্তরঙ্গ সখ্য, বন্ধুত্ব, মিতালির মূল্য জীবনের বড়ো এক সম্পদ। এই মানবিক, মধুর সম্পর্কের কথা 'বন্ধুয়ালা' বা 'বন্ধুপুছা' লোকনাট্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। খন গানের 'মায়াবন্ধকী' পালায় কৃষকের দারিদ্র্য চূড়ান্ত সংকটপূর্ণ সংঘাত তৈরি করেছে, কৃষক তার নিজের স্ত্রীকে মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে খাদ্য সংগ্রহে ('চাউল') বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো লোকনাটকে শোষিত কৃষক সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার, সংঘবদ্ধতার, প্রতিবাদঘোষণার এবং সংগ্রামের (তেভাগা) অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

সারা বাংলার লোকনাট্যসমূহের পাশাপাশি উত্তরবাংলার লোকনাট্যগুলির গুরুত্ব বিশেষভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্যনিষ্ঠ ধারাবাহিকতায় এগুলি বিশেষ প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই।

## *সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা*


১. *How Music Expresses Ideas* - SYDNEY FINKELSTEIN
২. *The Rajbansis of North Bengal* - CHARU CHANDRA SANYAL
৩. *বাংলার লোকসাহিত্য* (বিভিন্ন খণ্ড) - আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪. *উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য* - শিশির মজুমদার
৫. *পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা* - সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী
৬. *লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ* - দিগ্বিজয় দে সরকার
৭. *ডোমনি* - সুবোধ চৌধুরি
৮. *লোকশ্রুতি* - (বিভিন্ন সংখ্যা)
৯. *লেখা ও রেখা*
১০. *গণনাট্য* - (বিভিন্ন সংখ্যা)
১১. *আরণ্যক*।
১২. *জোয়ার*।

# কণ্ঠ হতে গান কে নিল

**শক্তিনাথ ঝা**

*ভণিতা*

'চিত্রা' কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।"(১৩০১, ভাদ্র)

রবীন্দ্রনাথের পরিচালক সত্তা তার মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে, নিজ বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে তাকে নিজের বক্তব্য হিসাবে প্রকাশ করতেন। বিষয়টি অন্তর্জগতের। কিন্তু তখন বহির্জগতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছিল। খ্রিস্টান মিশনারীদের একাংশ, ইংরেজ শাসক আমলাকর্মচারীরা ভারতের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নির্দিষ্ট পটভূমিকা ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মুদ্রিত গ্রন্থে প্রয়োজনীয় রূপান্তর এবং ব্যাখ্যান্তে সাম্রাজ্যনিয়ন্ত্রণে এবং শাসন কার্যে ব্যবহার শুরু করেছিলেন। ভারতীয় জনগণের বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে এখানে একমাত্রিক রূপ দেওয়া হয়। ভারতীয় জনগণ প্রাচীন প্রথা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, লোকসংস্কৃতি ভারতীয় জনচিত্তকে ব্যাখ্যা করার জন্য ইংরেজ শাসকেরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন্। সরকারি নির্দেশে, মৌখিক ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব আদি সেন্সাস রিপোর্ট, ভূমিরাজস্ব বিবরণী প্রভৃতিতে বিপুল পরিমাণে সংগৃহীত, সম্পাদিত এবং মুদ্রিত হয়। সম্পাদনার মাধ্যমে এগুলিতে যথেচ্ছ সংশোধন বা রূপান্তর ঘটানো ছিল শাসকদের কাছে বৈধ।[১]

সিপাহি মহাবিদ্রোহের পর, ব্রিটিশ অপশাসনের দায় মুছে ফেলার জন্য, ঔপনিবেশিক শাসকেরা লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। জাতবর্ণের এক অচলায়তনকে,

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিভাজনকে, ভাববাদী আচার ধর্মকে ভারতীয় সমাজের চালিকা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জাত-বিষয়ক প্রবাদাদি সংগ্রহের বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এ সমস্ত প্রবাদকে সম্পাদিত ও পরিবর্তিত করে দেখানো হয় যে অনেক 'জাত' ঐতিহ্যগত কারণে অপরাধী, দাঙ্গাবাজ, অসামাজিক বিদ্রোহী। জাতিগত এ ঐতিহ্যের দায় শোষিত ভারতীয় জনগণের। সমাজের নিরীহ মানুষদের রক্ষার জন্য তাদের পূর্ণ সম্মতিতে ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্যতা স্বীকৃত হয়। সংস্কৃত প্রবাদাদিকে শাসকেরা বিচার-ব্যবস্থায়, সৈন্য-নিয়োগে ব্যবহার করতেন। কিন্তু জাত বর্ণের বিরোধী প্রবাদ বা সংস্কৃতিগুলিকে রিজলের মত চতুর তাত্ত্বিকেরা সুদূর অতীতের, জাতবর্ণ অদৃঢ় ছিল যে যুগে, তার ছায়াপাত বলে অগ্রাহ্য করে, জাতবর্ণ ভাষায় খন্ডিত, বিভক্ত ভারতীয় সমাজকেই বর্তমান ও ভবিষ্যত হিসাবে তুলে ধরতেন।[২]

ইংরেজ শাসকদের ভারতীয় লোকসংস্কৃতিচর্চার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন Temple : "The practices and beliefs included under the head of Folk-Lore make up the daily life of the natives of our great dependency, control their feelings and underline many of their actions. We foreigners cannot hope to understand them rightly unless we deeply study them, and it must be remembered that close acquaintance and a right understanding begets sympathy and sympathy begets good government".[৩]

ব্যবহারকারী, উদ্ভবের বিশিষ্টতা, স্রষ্টাদের জীবনতত্ত্ব থেকে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যকে ছিন্ন করে, ইংরেজ শাসকেরা এগুলিকে ভিন্ন অর্থে এবং উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু করেছিলেন। তাঁদের মুদ্রিত উপাদানগুলিকে সরকারি ঐতিহাসিকেরা যথার্থ, খাঁটি, 'deepest feelings of real India', 'National manners and opinions' হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। এভাবেই তারা কেড়ে নিয়েছিলেন ভারতীয় লোকসমাজের বাক্যরচনার অধিকার এবং সেগুলি ব্যাখ্যার কর্তৃত্ব।[৪] উচ্চবর্ণের পদস্থ ভারতীয় আমলারা লোক সংস্কৃতির সংগ্রহ এবং ইংরেজদের অনুকূলে ব্যবহারের সহায়ক ছিলেন।

উনিশ শতকের য়ুরোপে লোক সাহিত্যকে অঞ্চলবিশেষের জাতিসত্তার শুদ্ধতম, অবিমিশ্র জাতিগত সংস্কৃতির প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। অতীতের ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে ছিলেন অনেকে লোকসাহিত্যে। গ্রীম ভাইয়েরা জার্মানীর এক গর্বিত অতীতকে খুঁজে পেয়েছিলেন লোককথায়। ফিনল্যান্ডে Kalevala মহাকাব্য বাইবেলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ফিনল্যান্ডে Kalevala Day পালিত হয় ; স্কুলে অবশ্যপাঠ্য হয় লোকসাহিত্য। স্বতন্ত্র, উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যে লোক সাহিত্যের ব্যবহার এ সময় চিহ্নিত করা যায়। সোবিয়েতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে ফিনজাতীয়তাবাদীরা Kalevala কে ব্যবহার করেছিলেন। আইরিশ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছিলেন। য়ুরোপে গণতন্ত্রী, ফ্যাসিস্ট, রাজতন্ত্রী এবং সর্বশেষে মার্কসবাদী বিপ্লবীরা নিজ তত্ত্বদর্শনের অনুকূলে লোকসাহিত্যকে ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করতে থাকেন।[৫] এগুলি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসময়ে এবং পরে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের অনেকে, যেমন Crooke এবং Temple য়ুরোপীয় লোকসংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারা ইংলন্ডের Folk-Lore পত্রিকায় লিখতেন। Crooke উত্তরকালে ইংলন্ডের Folk Lore Society-র সভাপতি হন। বিদেশি সংগ্রাহকেরা প্রথম পর্বে লোকসংস্কৃতির অনুবাদ, দ্বিতীয় পর্বে সংগ্রহ ও মুদ্রণ শুরু করে। দেশিয় শিক্ষিত লোকেরা এ বিষয়ে তাদের সহায়তা করতেন। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভারতীয়দের কেউ কেউ প্রাক্‌ইংরেজ আমলের স্বাধীন ঐতিহ্য হিসাবে, ইংরেজবিরোধী মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার শুরু করলেন।[৬] লাঠিখেলা এবং কুস্তি ইত্যাদি দেহচর্চার অনুশীলন শুরু করলেন বঙ্গের বিপ্লবীরা। শাসকদের প্রযত্নে গুরুসদয় দত্ত সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে তরুণদের ফেরাবার জন্য দেহচর্চামূলক ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করলেন।[৭] লোকসংস্কৃতিকে জাতীয়তার পক্ষে ব্যবহারের প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের মতো, অনেকেই জানতেন। ১৯২১, ২৪শে মে রবীন্দ্রনাথ যখন সুইডিশ একাডেমিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন সেখানে চলেছিল জাতীয় লোকসংস্কৃতি উৎসব। এ আন্দোলন অবশ্যই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।[৮]

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক জাতীয়তাবাদী[৯] য়ুরোপীয় মতবাদ এবং সম্পাদনা ও ব্যাখ্যার কর্তৃত্বপরায়ণতা ভদ্রলোকেরাও অনুসরণ করেছিলেন। ক্রমে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আত্মীকরণ এবং আত্মসাৎ করে ভদ্রলোকেরা এক কৃত্রিম 'লোকসংস্কৃতি' সৃষ্টি করলেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমবিভাজনের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে ভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে ধর্মীয় উৎসব বা কর্ম বা সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় গান ; গানের কথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সুর ; আদি স্রষ্টা থেকে শিল্পগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুদ্রণের, রেকর্ড করার, প্রচার মাধ্যমের সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষিত নাগরিকদের একাংশ লোকগীতি রচনা শুরু করেন ; লোকগীতির গায়ক হিসাবে খ্যাত হন। পন্ডিত ও গবেষকগণ লোকসংস্কৃতির সংগ্রাহক, সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা হওয়ায় ক্রমে কথা, সুর এবং ব্যাখ্যার কর্তৃত্ব হারায় লোক সমাজ। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কপিরাইটকে স্বীকার করেন, কিন্তু লোকশিল্পের চর্চায় তাঁরা কপিরাইট অগ্রাহ্য করে সেগুলি নিজস্ব সৃষ্টিতে পরিণত করতে দ্বিধাহীন।[১০]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ, লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশে উদ্যোগ নেয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২২ এর বৈশাখ থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য 'হারামণি' বিভাগ চালু করেন। 'হারামণি'র উদ্‌বোধন হয়, গগন হরকরার 'কোথায় পাবো তারে' (রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এ গান), দিনেন্দ্রনাথের করা স্বরলিপি এবং গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দিয়ে। গানটি অবশ্য ১৩০২, ভাদ্র, ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] এখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গান সংগ্রহ করে পাঠাতেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে অবিনাশচন্দ্র নামে এক পত্রলেখক চমৎকার আলোচনা করেছেন, "এই সব গ্রাম্যগান একরকম বেওয়ারিশ মাল। যে যেভাবে ইচ্ছা ইহাদের উপর নিজ নিজ কেরদানী জাহির করে। গানের পদ তো পরিবর্তন করেই, এমন কি রচয়িতার নামেরও গোলমাল করিয়া বসে এবং এক গানের পদ আনিয়া অন্য গানের সহিত যোগ করিয়া দেয়।"[১২]

*প্রথম প্রস্তাব*

য়ুরোপ এবং উত্তর আমেরিকাকে আমরা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, বস্তুবাদী, ধর্ম সম্পর্কে সেক্যুলার বলে ভেবে থাকি। অন্যদিকে ভারতের জনগণকে অধ্যাত্মবাদী এবং পারলৌকিক চিন্তায় মগ্ন ভাববাদী বলে চিহ্নিত করা হয়। ঔপনিবেশিক ভারততাত্ত্বিকেরা দেশের শিল্পায়ন এবং প্রগতিকে ব্যাহত করে, দেশকে পশ্চাদ্‌পদ রেখে শাসন শোষণকে অব্যাহত রাখার এক চক্রান্ত হিসাবে এ তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় জনজীবনের সব কিছুকে, অর্থ-সমাজ-রাজনীতিকে ধর্মের অধীন করে দেখায়। ধর্মকে ভারতসংস্কৃতির বহু উপাদানের মধ্যে একটি হিসাবে গণ্য না করে, একমাত্র করে তুলে এক ধর্মীয় জটিলতা সৃষ্টি করে। ভারতীয় সংস্কৃতির পট থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল নিরীশ্বরবাদী এবং জাতিভেদবিরোধী ঐতিহ্যগুলিকে। বস্তুবাদী, ইহবাদী, নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা অজ্ঞতার ভান করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয় কুমার সরকার, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ গবেষকবৃন্দ ঔপনিবেশিক তত্ত্বসমূহ খন্ডন করে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতসংস্কৃতির বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, চিকিৎসাদির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যসমূহকে তুলে ধরেন। তাঁরা নিরীশ্বরবাদী জাতপাতবিরোধী লোকায়ত, বৌদ্ধ-জৈন-আজীবকদের এবং ভক্তিআন্দোলনের যুক্তিবাদী অংশের সাহায্যে ভিন্ন এক ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান ভারতবর্ষেও এ সমস্ত মতবাদীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু বিব্রত শাসকশ্রেণীর অনুগত বুদ্ধিজীবিরা এবংবিধ গোষ্ঠী বা মতবাদকে ক্ষুদ্র, গৌণ, অপ্রধান, obscure, উপ/অপ সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে। যদিও বিপুলসংখ্যক মানুষ এ সমস্ত মতবাদকে সমর্থন করে।

এ. জান. ক্যায়সার লিখেছেন যে কবীর মোল্লা এবং পুরোহিত, আচারসর্বস্ব হিন্দু ও ইসলামধর্মকে কঠোর সমালোচনান্তে এগুলি ত্যাগ করে অনুগামীদের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভক্তি-আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এ কারণে যে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকাংশই পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সঙ্গে একত্রে বাস করতে চেয়েছে। উপরতলার ধর্মীয় ভেদাভেদকে তারা গুরুত্বহীন মনে করেছে। সাধারণ মানুষ কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ছাপ পছন্দ করেনি।[১৩]

প্রাচীনকাল থেকে বহু সাধক এবং গোষ্ঠী, যেমন, বেসরা, সুফি, চিস্তিয়া, দরবেশ, কলন্দর, বৈষ্ণব, বীরশৈব, কাপালিক, অঘোরী, বামাচারী তান্ত্রিক, ভক্তিবাদী দল সমূহের কেউ কেউ জাত ও সম্প্রদায়কে অস্বীকার করত। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জৈবিক অচ্ছিন্নতার দৃঢ় প্রত্যয়ে লেখা হয়েছিল,

দোনো ভাই হাথ পাগ দোনো ভাই কাণ
দেনো ভাই নয়ন হে হিন্দু মুসলমান।।[১৪]

মির্জা গালিব বলেছিলেন ঃ

My Creed is oneness, my belief is
abandonment of rituals
Let all communities dissolve and constitute a faith.[১৫]

এ সমস্ত ইহবাদী, প্রতিবাদী, নাস্তিক মতবাদে নিহিত ছিল সমাজবিপ্লবের বীজ। এ বিপ্লবী সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন মণিভদ্রসুরী (১৫ শতক, তিনি এর বিরোধী)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যতিরিক্ত জগৎ ও তত্ত্ব অস্বীকার করলে প্রচলিত সমাজকাঠামোর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়। দরিদ্র জগতের ধনরত্নে তার অধিকারের কথা ভাবে, দারিদ্র্যের অবসান চায়। দাসতন্ত্র ভেঙ্গে দাস হতে চায় স্বাধীন। অপ্রার্থিত হীনবৃত্তিতে কেউ আটকে থাকতে চায় না। নর-নারীর, গরিব-ধনীর, দাস-প্রভুর পার্থক্য বিলুপ্ত হলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিলোপ সমাসন্ন হয়।[১৬]

পলাশীর যুদ্ধের অনতিকাল পরে ইংরেজ শাসনশোষণের বিরুদ্ধে বেসরা মাদারী, অন্যান্য ফকির এবং লৌকিক গিরি পুরী সন্ন্যাসীরা এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল (১৭৬৫-১৭৯৬)। উত্তরকালের বঙ্গীয় কৃষকবিদ্রোহে বাউল ফকিরেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ময়মনসিংহের 'পাগল' (বাউল) গুরুদের সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রকৃতি নির্ণয় বা যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে (১৯১৪-১৯২০)

নীলকর ও জমিদারবিরোধী আন্দোলনে ইসলামি সমাজ এবং আউল-বাউলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজক্ষ্যাপার অন্যতম শিষ্য বিলাসরাম আগরওয়ালা এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। নদিয়ার শিকারপুরে 'ক্ষেপা ঠাকুর' হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং আউল কালাচাঁদের নেতৃত্বে কীর্তনের দল নীলকরবিরোধী বিশাল শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। এ বিক্ষোভে এবং ধর্মঘটে শিকারপুরের নীলকুঠি বন্ধ হয়ে যায়। এ আন্দোলনে ছিল অনন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য।[১৭] উড়িষ্যার 'মালিকা' বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়ে অশেষ নিপীড়ন ভোগ করেছিল। পুরীর গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্য বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ছিলেন।[১৮] ১৯২০ এর নাগপুর কংগ্রেসে বহু নাগা সাধু উপস্থিত ছিলেন। তারা অসহযোগ আন্দোলনকে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় এবং তা যথাযথভাবে পালন করে। "The Sadhus represent a homegrown organic patriotism, free of sophistication of urban nationalism and allied with the common man".[১৯] জয়দেব কেন্দুলির মহান্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকেই সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের মধ্যে সশস্ত্র গোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। এরা প্রয়োজনে ভক্ত, সমাজ, নিজ গোষ্ঠী বা অনুগৃহীত শাসককে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেন। হিংসা এবং অহিংসা দুটিকেই তাঁরা জীবনে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। বৈদিক যুগ থেকেই সমাজের প্রান্তে ঋষিরা পারিবারিক জীবন যাপন করতেন। সর্ববিধ তান্ত্রিক সাধনায় নারীকেন্দ্রিকতা ছিল। এ সমস্ত সাধুর নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল — চিকিৎসা ও ব্যবসার সঙ্গে ছিল অনেকের যোগ। সাধকদের বড়ো অংশটি সমাজ সংলগ্ন এবং জনকল্যাণে যুক্ত ছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পদ, জাতবর্ণব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ইংরেজ আমলে সমাজবিজ্ঞানীরা সাধকদের বহু বৈচিত্র্য অস্বীকার করে ভারতীয় জনগণকে গৃহস্থ এবং জীবনবিমুখ, ত্যাগী, এ দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করলেন। কামিনী-কাঞ্চন-সংসার ত্যাগী, পরলোক, ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন, জীবনবিরোধী উদাসীন সন্ন্যাসীর একটি মডেল নির্মাণ করা হল। ভারতীয় সাধকদের জীবনবাদী ইতিবাচক মূল্যবোধগুলি কৌশলে হল আচ্ছাদিত। সংসারী, সশস্ত্র, বৃত্তি নিবিষ্ট, স্বদেশী আন্দোলন কারী বা নারীসঙ্গী সাধকেরা জাল বা ভ্রষ্ট সাধু বলে চিহ্নিত হলেন।

*দ্বিতীয় প্রস্তাব*

বাংলার বাউলফকিরদের বিষয়ে ইংরেজ সংগ্রাহক এবং সরকারী ঐতিহাসিকদের অনন্য অমনযোগ এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাউল ফকিরদের

স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা কোনো ইতিবাচক দিক তাদের বিবরণে নেই। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যেই তারা বাউলদের হিন্দু এবং ফকিরদের মুসলমান বলে অত্যন্ত হীনবর্ণে তাঁদের চিত্রিত করেছেন।[২০]

উইলসন বাউল ফকিরদের কোনো উল্লেখ করেন নি। হান্টার দুটি ক্ষেত্রে বাউলদের উল্লেখ করেছেন। রাজশাহীতে তারা পৌরাণিক হিন্দু, জাত্যাচারী শ্রেণীর। নাড়া এবং বাউলেরা যুক্তভাবে বৈরাগী বা জন্মসূত্রে বৈষ্ণব বলে চিহ্নিত হয়। চব্বিশ পরগনায় তারা ছ'শ্রেণীর *(সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি)* বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের অন্যতম গোষ্ঠী। অনেকেই মুণ্ডিত মস্তক এবং গায়ক। উৎসবাদি এবং আচারে পৃথক হলেও এরা বৃহত্তর হিন্দু বৈষ্ণবদের অন্তর্গত।[২১] আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশগণ জাত না সম্প্রদায়? বিষয়টি হান্টার এবং রিজলের লেখায় অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী তথ্যে পূর্ণ।[২২] হান্টার হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণবদের জাত অস্বীকার করার তথ্য দিয়েছেন, কিন্তু এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন নি।[২৩]

রিজলে বাউলদের বলেছেন, "A Low class of mendicant Vaishnabas"। শুধু নীচু নয়, গঞ্জিকাসেবন, শিথিল যৌনতা এবং দেহের বর্জ্যপদার্থ ব্যবহারের দায়ে রিজলে বাউলদের অভিযুক্ত করেছেন।[২৪] ১৯১০-১৯২৫ পর্যন্ত জেলা গেজেটিয়ারে বাউলদের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৯১৬ এর রাজশাহী গেজেটিয়ারে, ওম্যালি, 'নাড়ার ফকিরদের' নাচগান, গঞ্জিকা ও দেহের বর্জ্যপদার্থ ব্যবহারের আলোচনা করেছেন। এসমস্ত ফকির যে নিজেদের মুসলমান বলে, ওম্যালি তা উল্লেখ করতে ভুলেন নি।[২৫] জেমস ওয়াইজ তার রচনায় নানা ধরণের বেসরা ফকিরদের পরিচয় দিয়ে শরিয়তের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য নিরূপন করেছেন। বেসরা গোষ্ঠীগুলি স্বপাক খায়, নেশা ও গান-বাজনা করে।[২৬] W. Crooke সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত মাদারী প্রমুখ বেসরা ফকিরদের বিবরণ দিয়েছেন। এ সমস্ত মানুষ ভস্ম মাখে, নেশা করে, এমন কি অঘোরী হয়ে দেহের বর্জ্যপদার্থ ও মৃতদেহের মাংস পর্যন্ত খায়। এঁরা বাইরে থেকে দেখা এবং অতিরঞ্জিত শ্রুত তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন এ সমস্ত সাধকদের বিষয়ে।[২৭] এঁদের বর্ণনায় —

(১) বাউলেরা হিন্দু বৈষ্ণবের অন্তর্গত উপ বা অপসম্প্রদায়। ফকিরেরা বেসরা হলেও ইসলামের অন্তর্গত।

(২) হান্টার বলেছেন যে তত্ত্বগত ভাবে বাউলেরা জাতিভেদ মানে না ; তাদের দলে মুসলমানের অনুপ্রবেশও বাঁধিত নয়। কিন্তু বাউল বা ফকিরদের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে এরা কেউ গুরুত্ব দেন নি। বরং তাদের হিন্দু বা

মুসলমান হিসাবে দ্বিধাবিভক্ত করে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এ গোষ্ঠীগুলির যথার্থ সামাজিক ভূমিকাকে অন্তরাল করা হয়েছে। জাতি, ভাষা, লিঙ্গ, উপসাম্প্রদায়িক অনৈক্যের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করে রিজলে ইসলামিদের একটি সম্প্রদায় এবং 'জাতি'র প্রবণতাযুক্ত গোষ্ঠী বলে প্রতিষ্ঠা করলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি।[২৮] বাউল ফকিরদের মধ্যে তত্ত্ব, সাধনাগত ঐক্য, সর্বভারতীয় ভক্তিবাদীদের সঙ্গে যোগের কোনো তথ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা দেননি। ফলতঃ গিরিপুরী-মাদারীদের বহিরাগত প্রতিপন্ন করা হয়েছিল সহজতর। আদর্শায়িত সন্ন্যাসের মানদন্ডে এদের নেশা, যৌনতা, অপরিচ্ছন্নতা, দেহের বর্জ্যপদার্থের ব্যবহারকে 'নোংরা' প্রতিপন্ন করে জাগানো হয়েছিল সামাজিক ঘৃণা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৮৮৪ নাগাদ বহরমপুর শহরে, ক্ষ্যাপা কৃষ্ণদাস নামক এক সাধককে, জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত-মাংস এবং দেহের বর্জ্যপদার্থ ভক্ষণের অপরাধে বিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন। বিচারের রায়টি উদ্ধার করা গেলে জানা যেত যে সাধকের মূল অপরাধ কী ছিল?[২৯] সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সাংস্কৃতিক নীতির অনুগত ঐতিহাসিকেরা বাউল ফকিরদের কোনো সামাজিক গুরুত্ব, ইতিবাচক দিক বা কল্যাণকর ভূমিকার উল্লেখ করেন নি। তাঁরা ভাববাদী, পরলোকচিন্তায় মগ্ন, জাতপাতবর্ণ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, বাল্যবিবাহ পণ-কুল-সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি চালিত অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক ভারতীয় সমাজ চিহ্নিত করছিলেন। জীবনবিমুখ ভাববাদ, অহিংসা এবং পারলৌকিক ধর্মচিন্তাকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোত হিসাবে গুরুত্ব দিলেন পাশ্চাত্য ভারত-তাত্ত্বিকেরা। বাউল ফকিরদের তারা এ মডেলের অন্তর্গত করে দেখালেন। আমাদের প্রগতিশীল চেতনা এবং সমাজসংস্কারের অভিপ্রায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান হিসাবেই প্রচারিত হত। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যেই যে আচার, শাস্ত্র, ভাববাদ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ, সর্ববিধ অমানবিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছিল, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকা খন্ডিত হয় বলে এগুলি আচ্ছাদিত অথবা উপেক্ষিত হল। ১৯০১ সালে সেন্সাসে ভারতে একজনও নাস্তিক বা স্যেকুলার হিসাবে গণিত হয় নি। সরকারি নথিপত্র থেকে ধর্মদ্রোহীদের মুছে ফেলা হল। ঔপনিবেশিকদের সাংস্কৃতির নীতির এরা পরিপন্থী ছিল। এটি সর্বজনজ্ঞাত বিষয় যে ভারতীয় সেন্সাসে জনগণ ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতবর্ণের উঁচু বা নিম্ন ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়ে গণিত হতেন।[৩০]

বাউল ফকিরেরা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারী আচার ধর্ম এবং সন্ন্যাসকে পরিহাস করে। মানুষ দৈব পরিচালিত নয়, সক্রিয় চেষ্টায় মানুষ নিজের জীবনকে পরিচালনা করে বলে এ গোষ্ঠীগুলি বিশ্বাস করে। অহেতুক হিংসার পক্ষপাতী না হলেও এরা অন্যায় উৎপীড়ন এবং বৈরীদের সশস্ত্র উপায়ে ধ্বংস করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। আনুমানিক ঈশ্বর, কল্পিত

পরলোক এরা প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য করে। অথচ ইংরেজ তাত্ত্বিকেরা এদের ভাববাদী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা উদাসীন সুফি ফকিরের দলভুক্ত করলেন। জাতপাত, বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে অগ্রাহ্য করতেন বৈষ্ণব সমাজের একাংশ। যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক জাত হারিয়ে বৈষ্ণব হতে পারত। এ প্রতিবাদী বৈষ্ণবেরা সেন্সাসে, জন্মসূত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে "জাত বৈষ্ণব" তালিকায় স্থান পেল। জাতবর্ণ অগ্রাহ্য করার অপরাধে, ২৪ পরগণার জেলা-বিবরণে ও সেন্সাসে এদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল অস্পৃশ্য হিন্দুদের নিম্নভাগে। ফকিরেরাও বাউলদের মতো অনাচারী, উন্মার্গগামী, obscure, minor 'ধর্ম সম্প্রদায়' হিসাবে বর্ণিত হল। সংসারের মধ্যে বিশিষ্ট জীবনযাপনকারী এ সাধকদের ঘরছাড়া উদাসীনদের দলে ফেলা হল। যারা ভাববাদ ও জাতবর্ণের প্রতিবাদী, তাদের ভাববাদী, জাতিভেদ চলিত সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত দেখিয়ে, সমাজ কাঠামোর উদভাবিত মডেলটিকে রাখা হল অটুট। বিভেদমূলক সাংস্কৃতিক নীতির ফলে সংস্কৃতায়ন/ইসলামীকরণ এর প্রতিক্রিয়ায় বৈষ্ণবদের একাংশ দাবি করল ব্রাহ্মণত্ব ; বেসরা ফকিরদের একাংশ দাবি করল ইসলামি সুফি এবং সৈয়দদের উত্তরাধিকার।

*তৃতীয় প্রস্তাব*

বাঙালি গবেষকদের অন্যতম অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) উইলসনের অনুসরণে লৌকিক সাধকদের নিয়ে রচনা করেন, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' *(১ম খন্ড ১৮৭০, ২য় খন্ড ১৮৮৩)*। এ গ্রন্থের তথ্যাদির একাংশ লোক মারফত সংগৃহীত, লেখকের ক্ষেত্রসমীক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। ফলত তথ্যাদির অপূর্ণতা ও পরস্পরবিরোধিতা অনেক। তিনি বাউল ইত্যাদি গোষ্ঠী কল্পনা করে তাদের হিন্দু বৈষ্ণব সমাজভুক্ত করেছেন। এদের কোনো ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকার প্রসঙ্গ নেই এ গ্রন্থে ; আছে জুগুপ্সিত অনাচারের বিবরণ। তিনি দরবেশ ও ফকিরদের মধ্যে হিন্দু সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের দেখেছেন। কিন্তু বাউলের মধ্যে পান নি কোনো মুসলমান সমাজভুক্ত মানুষ। অথচ লালনাদির গান তখন খ্যাতি পেয়েছে। রক্ষণশীল ইসলামিগণ 'বাউল ধ্বংস' শুরু করেছেন।[৩১] এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের মন্তব্য, 'ব্রাহ্ম অক্ষয় কুমার দত্ত, হিন্দুদের প্রতি মিশনারীর অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন।[৩২]

বাউল বৈষ্ণবেরা বাঙালি ইংরেজি শিক্ষিত সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংরেজিতে কেদারনাথ বসু ১৯টি গৌণ বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বিবরণ দিয়েছেন বোম্বাই-এর নৃতত্ত্বের পত্রিকায়। ভদ্রলোকেদের দৃষ্টিতে এরা ঘৃণিত, ইতরদের মধ্যে এ মতগুলির প্রসার। কর্তাভজাদের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সহঅবস্থান দেখেছেন। গোষ্ঠীগুলির

যৌন শিথিলতা এবং অনাচারের বিবরণ আছে ; ইতিবাচক ভূমিকার কোনো উল্লেখ নেই।[৩৩]

উক্ত পত্রিকায় বাঙালি মুসলমান ফকিরদের নিয়ে নিবন্ধ লিখেছিলেন মৌলবি আব্দুল ওয়ালি। এ সমস্ত গুপ্তগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ গোপন কথা জানতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কাজি কেরামতুল্লার, 'মনোরঞ্জনের উচিত কথা' (১২৯৬) এবং অন্য লোকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বন করেছেন। রোগহর ক্ষমতা, সুললিত গান, বিচিত্র অভ্যাস ও উৎসবের অন্তরালে এসব গোষ্ঠীর ঘৃণ্য, কদর্য জীবনের গোপন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনেই লেখকের উল্লাস। নিবন্ধের একাংশ অশ্লীলতার কারণে মুদ্রিত পর্যন্ত হয় নি। তার বর্ণিত সাধকেরা ফকির এবং মুসলমান। কিন্তু এ মতবাদ 'Satanic belief', সমাজের নীচু তলায় প্রচলিত। এরা শরিয়ত মানে না, কোরাণের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে, দেহের বর্জ্যপদার্থ ও যৌনযোগের সাধনা করে। বিভিন্ন জাত বর্ণ এমন কি ব্রাহ্মণদেরও লেখক ফকিরগোষ্ঠীতে দেখেছেন। সিরাজ, লালন, শা শের আলি প্রভৃতি পদকর্তার উল্লেখ করেছেন তিনি। ফকিরদের অসাম্প্রদায়িকতা বা কোনো ইতিবাচক মূল্যবোধের দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি নীরব।[৩৪]

জে. এন. ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বৈষ্ণবভাবাপন্ন, গুরুবাদী, নারীসঙ্গী বাউল এবং সমধর্মী দলগুলির আলোচনা করেছেন। সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবেরা এদের পতিত মনে করে। এদের অনেকে বিশিষ্ট বেশ, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ভিক্ষা করে। গ্রাম্য জনতা উপভোগ করে এ গান ; শহরেও এ গান আকর্ষণ করে নাগরিকদের। তখন একদিকে বাউল গানের বর্ধমান জনপ্রিয়তা ; অন্যদিকে হিন্দু ও ইসলামি সমাজে শুরু হয়েছে বাউল ধ্বংসের আন্দোলন। তখন প্রাদুর্ভূত হয়েছে 'শখের বাউলেরা'। বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিলেও বাউলেরা আসলে নাস্তিক (Godless sect)। এদের মতবাদে মূর্তিপূজাবিরোধী এবং বহু প্রগতিশীল মতবাদ থাকলেও কদর্য সাধনা এবং অসামাজিক যৌনতা ধ্বংস যোগ্য। "গোস্বামী, মৌলবি এবং মিশনারিরা এদের সুপথে নিয়ে এলে, সবার ধন্যবাদ পাবে।"[৩৫] নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ'-এ বাউল বৈষ্ণব, দরবেশ ফকিরেরা নীচ এবং অসৎ চরিত্র।[৩৬] রামকৃষ্ণদেব বাউল-কর্তাভজাদের গান শুনেছেন, সাধনা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু নারীসঙ্গী এ সমস্ত সাধক সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্যের অভাব নাই। ব্রাহ্ম প্রচারক এবং গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিকে বাউলদের চারচন্দ্রভেদাদির সমালোচনা করেছেন ; অন্যদিকে আবার বাউল ফিকিরচাঁদকে ব্রাহ্মসভায় নিয়ে গেছেন।[৩৭]

বাউল, ফকির, দরবেশ, কর্তাভজা ইত্যাদি নানাপ্রকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) পাঁচালিতে। নারীসঙ্গী অনাচারী বৈষ্ণবদের থেকে এরা পৃথক। এদের সাধনার আদর্শ শুদ্ধ। বাউল ফকির হিন্দুসমাজভুক্ত সাধকসাধিকা। জয়দেব,

বাঘনাপাড়া, রাণাঘাটের যুগলকিশোরের *(আড়ংঘাটায়)* মেলায় এরা সমবেত হয়।[৩৮] প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ ও বৈরাগীতলা, মালদহের রামকেলি, রাজশাহীর খেতুরি, নদিয়ার ঘোষপাড়া, বীরভূমের পাথরচাপড়ি প্রভৃতি কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন মেলাগুলি ছিল অসাম্প্রদায়িক সাধকদের মিলনভূমি। শাস্ত্রাচার ব্যতিরেকে এখানে বিবাহ হত। ক্রমে বেআইনি হয়ে এসব প্রথা উঠে যায়। মেলার পরিচালন কর্তৃত্ব রক্ষণশীলদের এবং সরকারের হাতে চলে যায়। মেলার ঐতিহ্য পাল্‌টে যেতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ছিলেন আধুনিক ও লোক সাহিত্যের সংযোগ সূত্র। লোক সাহিত্য সংগ্রহের তিনি আদি সূত্রধার। তিনি তার রচনায়, কবিতায় নানা বাউল উপাদান ব্যবহার করেছেন। 'কে তুমি, কে আমি', 'একাকার' প্রভৃতিতে তিনি বাউল পদ্ধতিতে আত্মানুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্র জন্মের পূর্বেই তিনি মনের মানুষ নিয়ে কবিতা লিখেছেন —

"মনের মানুষ কোথা পাই?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই
যাহা বলি কর তবে তাই।
দ্বিপদ হয়েছে যারা
বিপদের হেতু তারা
জগতে মানুষ কেহ নাই
মনের মানুষ কেহ নাই।"

'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকে তিনি পদ্মলোচনের নামে খ্যাত বাউল গান 'দিন দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হলো ভার' — ঈষদ্ বদলে, ঋণ স্বীকার না করেই ব্যবহার করে, উত্তরকালের ভদ্রলোকদের বাউল উপাদান আত্মসাতের পথ দেখালেন।[৩৯]

নারায়ণ চট্টরাজের 'কলি কৌতুক নাটক' *(১৮৫৯, শ্রীরামপুর)*-এ বেদবিরোধী বাউল, কর্তাভজা কলির অনুচর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ এবং সর্বদর্শন সংগ্রহের চার্বাকের উক্তি, কবীরের দোহা তারা ব্যবহার করে। নাট্যকার বাউলদের ভোগবাদী, বস্তুবাদীদের দলভুক্ত করেছেন। এর পূর্বে ও পরে রক্ষণশীল বৈষ্ণব বা ইসলামি তাত্ত্বিকেরা বাউলদের স্বর্গের অযোগ্য, কলি অথবা শয়তানের অনুচর হিসাবে চিত্রিত করেছে।

হুতোম প্যাঁচার নকশায় (১৮৬১) বৈষ্ণব গুরুদের অর্থ, খাদ্য, নারী লোলুপতার প্রতি কটাক্ষ আছে। তখন বাউলেরা ললিত রাগে, খরতাল ও খঞ্জনি সহযোগে গান করে লোকের বাড়িতে ভিক্ষা করত। তাদের একটি গান বৈষ্ণবদের মালাজপের সমালোচনা,

"ঝুলিতে মালা রেখে জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠকঠকি, সব ফাঁকি।"

উক্ত গ্রন্থে কলকাতার জীবন নিয়ে আরেকটি বাউল সুরের গান আছে। সম্ভবতঃ এটি হুতোমের স্বরচিত পদ। এ সময় বাউল দেহচর্চা থেকে সুরকে ছিন্ন করে, সমাজের ব্যঙ্গ চিত্রঅঙ্কণে শিষ্টেরা ব্যবহার শুরু করেছেন। জনৈক ভদ্রলোক এ গান ও সুর লিখে নিয়ে গায়ককে চার আনা বক্‌শিশ দিয়েছেন। অর্থাৎ বাউল কথা ও সুর সংগ্রহ করে, ভদ্রলোকেরা নিজের রচনায় তা ব্যবহার করছেন।[৪০]

হুতোম 'শখের দল'-এর উল্লেখ করেছেন।[৪১] দক্ষিণবঙ্গে জাত বৈষ্ণবদের একাংশের জীবিকা ছিল গৃহস্থ বাড়িতে গান করে মাধুকরী অথবা মেলায় মহোৎসবে দক্ষিণা সংগ্রহ। সুকুমার সেন সঙ্গত কারণে দক্ষিণবঙ্গের বাউলগানের সঙ্গে ভিক্ষা ও জীবিকার কথা বলেছেন।[৪২] কিন্তু উত্তর, পূর্ববঙ্গে বাউল মতবাদ ছিল এক জীবনচর্যা। কালাচাঁদ তর্কালঙ্কার, গোঁসাই গোপালের মত বহু অদরিদ্র মানুষ এ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বাউলগান সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থমূল্য লাভ করলে, শখের বাউল গায়কেরা এবং পদ রচয়িতারা সাধক বাউলদের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিল গান ও সুর ; মুখ থেকে কেড়ে নিল কথা। বাউলদের সামাজিক মর্যাদা লাভের প্রসঙ্গটি সামান্য বলে নেয়া ভাল।[৪৩]

*চতুর্থ প্রস্তাব*

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিদেশি শাসন এবং খ্রিস্টান ও সংস্কারবাদীদের ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় জাত পাশ্চাত্য জাতীয়তা এবং সন্ত্রাসবাদী মানসিকতায়, ভারতীয় তথা লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ী ঐতিহ্য ছিল জনগণের ঐক্য বিধানের জন্য এক জরুরি বিষয়। এ সমন্বয়ী ঐতিহ্যের প্রবক্তা হিসাবে রামমোহন এবং রামকৃষ্ণ খ্যাত হন। রাজনৈতিক, সমাজনেতাদের বোধে সমন্বয়ী বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব ধর্ম অশেষ গুরুত্ব পায়। রামমোহনের বৈষ্ণববিমুখতা বর্তায় নি দেবেন্দ্রে-রবীন্দ্রে। মূর্তি পূজার বিরোধী এবং প্রচলিত ধর্ম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদী বাউলদের সঙ্গে সহজেই ব্রাহ্মদের ঐক্য গড়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্যও বাউল গান ব্যবহৃত হতে থাকে। জাতীয়তাবোধের মানদণ্ডে বাউলচর্যার ইতিবাচক দিকগুলি গুরুত্ব পায়। নবীনচন্দ্র সেন অক্ষয়কুমারকে অগ্রাহ্য করে কর্তাভজাদের অসাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় পুরীকে হিন্দুর সর্ববর্ণের মিলনভূমি বলা হয়। কিন্তু, তাঁদের মতে, ঘোষপাড়ায় অধিকন্তু মুসলমান হিন্দুর মুখে অন্ন তুলে দেয় বলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এক সময়ে বিপ্লবী ও স্বদেশী আন্দোলনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন মানুষদের ভিড়

ছিল।[৪৪] নানা কারণে তারা বাউল গান সুরকে গুরুত্ব দিয়েছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্যের লোক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের প্রভাব তো ছিলই। কিন্তু এরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করলেন বাউল চর্যায়। তাঁরা যে সমস্ত গান রচনা করলেন, তা বাউল গানের সীমাকে প্রসারিত করল। কিন্তু বাউল গানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশঃ ভদ্রলোকদের হাতে চলে এল।

বাউলতত্ত্ব ও সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে গান। কুলকুন্ডলিনী শক্তির নিম্নগমনে শুক্র ; আর উর্দ্ধগমনে সৃষ্টি হয় শব্দ ; — গান। বাউলের উজান সাধনার মহামন্ত্র হচ্ছে গান। বাউলের পূর্বাচার্য চর্যাকারদের পরম্পরায়, নেপালের নিজমন্ডলীতে এখনো 'চর্যা গানের' (চাঁচা গান) আসর বসে। বাউলের সাধনাটি গুপ্ত, কিন্তু গান প্রকাশ্য। সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের মতো বাউলেরা গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করে তাদের মতবাদ। কিন্তু বাউল চর্যার অংশবিশেষ মাত্র গানে আভাসিত হয়, সমগ্র সাধনাটি জানতে, শিখতে হয় গুরুর কাছ থেকে। দারিদ্র্যের দুঃসহভাবে আখড়া থেকে বাউলগান জনসমাজে গতায়াত শুরু করেছিল। অসাধক জনতার চাহিদায় তাতে খাদও মিশছিল। বাউল গান আদিতে ছিল একক সঙ্গীত। পায়ের নূপুর / কোমরে বাঁধা বাঁয়া ছিল তাল বাদ্য ; হাতের খঞ্জনি, সারেঙ্গি, গুবা, একতারা, দোতারা ছিল সুরবাদ্য। বিচিত্র পোযাক এবং নৃত্য ছিল বাউল গানের অঙ্গ। ক্রমশঃ পৃথক যন্ত্রশিল্পী, দোহার প্রাদুর্ভূত হল। আমরা সাধক-গায়ককে গান রচনা করে, সুর দিয়ে গাইতে দেখেছি। যন্ত্রাদি তারা নিজে বানাতেন।[৪৫] যুগের হাওয়ায় পদকর্তা থেকে সুরকর্তা এবং গায়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। গায়কেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন সাধনা থেকে। ১৯৯৪ তে অগ্রদ্বীপের মেলায় সমীক্ষা করে দেখেছি যে বাউল সাজে সজ্জিত অধিকাংশ জনপ্রিয় গায়কের গানের গুরু আছে, সাধনার গুরু নেই। সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক লাভ এবং দেশে বিদেশে বাউল গানের প্রবল চাহিদার জন্য এখন বহু বাউল গায়ক, বহু গান সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সামাজিক চাহিদার যোগান দিচ্ছে। রাহুল পিটার দাস মন্তব্য করেছেন, "The Commercialisation of Baul songs has resulted in a mighty Industry, * * * which spins out fake Baul songs written and set to tunes by professional artists or their hacks"[৪৬]

আধুনিক কালের সূচনায় বাউলগানকে জনপ্রিয় ও লোকমান্য করেছিলেন কাঙাল ফিকির-চাঁদ ফকির ওরফে হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। তিনি লালনের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেকালের বহু বিখ্যাত মানুষের সঙ্গ ও সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশ, জমিদারবিরোধী আন্দোলন, তিলি সমাজ সংস্কারাদির নানা কর্মে তিনি ছিলেন জড়িত। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতা কুলদানন্দ ছিল

তার সাধনার গুরু। দিব্যদেহী হরিনাথকে সাধারণ মানুষ সিদ্ধপুরুষ বলেই জানত। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মশারফ হোসেন তার প্রতি শ্রদ্ধায় বাউল বিষয়ে আগ্রহী হন। লালনের দৃষ্টান্তে হরিনাথ বাউল গান লিখতে শুরু করেন এবং গানের বিষয়বস্তুকে দৈনন্দিন জীবনেও প্রসারিত করেন। দিনলিপিতে তিনি, "সত্য, জ্ঞান ও প্রেম সাধনতত্ত্ব প্রচারের জন্য" গান রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনেকানেক সুকণ্ঠ গায়কের মাধ্যমে ফিকির চাঁদের গান ও দল বঙ্গ-আসামের সর্বত্র বাউল গানকে অতুল জনপ্রিয় করে তুলে। বাউল গানের বিপুল চাহিদা ও জনপ্রিয়তাহেতু 'বালক চাঁদ', 'গরিব চাঁদ', আজব চাঁদ, রসিক চাঁদ প্রভৃতি দল হয় এবং বাউল গানে প্লাবিত হয় দেশ[৪৭] ভদ্র পরিবারের সুকণ্ঠ গায়কেরা নগ্নপদে, বানানো আলখেল্লা, কৃত্রিম দাড়ি ও চুলে, খেলকা, টুপি, নূপুর পরে, ডুগি-খমক-একতারা নিয়ে বাউল ফকির সেজে আসরে আবির্ভূত হয়ে, দুদলে গানের পাল্লা করত। এরা নিজস্ব গোষ্ঠীর রচিত পদ ব্যবহার করত। এ সাজা বাউল গায়ক ও তাদের গানকেই 'শখের' বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কাঙালকে অনেকে 'শখের বাউল' বলেছেন। তার গানকে বলেছেন 'নকল সর্বস্ব গিমিক'।[৪৮] ফিকিরচাঁদের দল থেকে ফিকিরচাঁদ ভিন্ন। হরিনাথ সাধক পদকর্তা এবং গায়ক ছিলেন। আধুনিক শিক্ষার ফলে তার ভাষা ও যুক্তির বিন্যাস স্বতন্ত্র। দুদ্দু অথবা পাঞ্জু শাহের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর পদের মিল আছে। ঐতিহ্যবাহিত কূটবক্রোক্তি মূলক বাউল গানকে তিনি সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সাধনার মন্ডলী থেকে মুক্ত করে বাউল সুরকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যায়, এমন কি পাটের মন্দা দামে চাষীর দুর্দ্দশা বর্ণনায়, নিযুক্ত করেছিলেন। তার সহচর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সূত্রে বরিশালে অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং তস্য অনুরাগী মুকুন্দদাস বাউল উপাদানে স্বদেশ ভাবনার মূর্তি গড়েন। বঙ্কিমের দেশজননীর মূর্তিও গড়েছেন বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা *(আনন্দ মঠ)*।[৪৯] বাঁকুড়ার জনৈক বাউল পদকর্তা 'চম্পক বরণী ধনী' কীর্তনের সুরে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি রচনা করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে রচিত এ গান অতুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বাউল গানের বিষয় এখন বহুধা বিস্তৃত। এইডস্, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরক্ষরতার সমস্যা, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে বাউল সুরের গান রচিত হচ্ছে। নিম্নবর্গের বাণিজ্যিক গায়কেরা এখন সাধনাহীন বেশধারী শিল্পীমাত্র। এদের এবং ভদ্রলোকদের একাংশের কাছে বাউল গান শুদ্ধ এক সঙ্গীত মার্গ। পূর্ণ দাসের কাছে বব ডিলান, এবং য়ুরোপ আমেরিকার প্রতিবাদী লোকগীতিকার এবং হিপিরাও বাউল বলে প্রতিভাত হয়।[৫০]

সাধনা ও নির্দিষ্ট বিষয় থেকে বাউল সুর গতশতকের মধ্যভাগে ছিন্ন হয়। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তার অভিধানে, আলমগীর জলিল, মযহারুল ইসলাম তাঁদের নিবন্ধে বাউলকে একটি বঙ্গদেশীয় সুর বা সঙ্গীত-সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন।[৫১] রবীন্দ্র-নজরুলের পূর্বে বাউল কথা ও সুর নিয়ে 'বাউল বিংশতি' *(১৯২৪ শে প্রকাশিত কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে লিখিত)* রচনা করেন 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী। তখন বাউলদের সাধুসভায় হত প্রশ্নোত্তরী গান। বাইরে থেকে এটিকে মনে হত দু দলের গানের লড়াই। 'হাফ আখড়াই' গীতরীতিতে শখের বাউলেরা করত গানের প্রতিযোগিতা। বিহারীলাল 'শকের' দু দল বাউল গায়কের জন্য ১০টি করে মোট ২০টি গান এ গ্রন্থে রচনা করেছেন। ইহদেহকেন্দ্রিক বাউলগান এগুলি নয়। কিন্তু বাংলা গীতি কবিতার অগ্রসূচক কবি বাউল গান রচনা করছেন, এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালে তাকে অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুর, কথা, চিত্রকল্প, ভাবনা নিয়েছেন, এমনকি 'রবি বাউল' হিসাবে গানও লিখেছেন।[৫২]

রজনীকান্ত সেন ছিলেন প্রখ্যাত কবি এবং গীতিকার। তাঁর অনেক ব্যঙ্গগীতি *(আছ ত বেশ, বৃথা দর্প, বুড়ো বাঙাল, প্রভৃতি)*, ভক্তি ও তত্ত্বগীতি *(কল্লোলগীতি, শুদ্ধ প্রেম, বেলা যায়, কোলে কর, অরণ্যে রোদন প্রভৃতি)* বাউলের সুরে গীত হওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছে। তখন কি বাউল সুরের নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো ছিল? কিন্তু আমরা সচকিত হই যখন কান্ত কবি, 'বাতাস ধরে নদী পার' হতে চান *(পৃ. ৪২, বেলা যায়)*, বলেন, "সার ভাব এই শরীরটাই" *(দেহাভিমান, পৃ. ১০৩)* তখন মনে হয় বাউলের কণ্ঠ থেকে তিনি আপন কণ্ঠে গান নিয়ে নিয়েছেন।[৫৩]

মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের শরৎচন্দ্র পন্ডিত (১২৮৮-১৩৭৫) বাউল সুরে এবং 'দীন বাউল' ভনিতায় বহুগান রচনা করেছেন। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের যে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার রীতি বাউল গানে ছিল, শরৎচন্দ্র, তাকে ব্যবহার করেছেন খবরের কাগজের গান, কারাবর্ণন, আবগারি সঙ্গীত, ধন *(টাকা মাহাত্ম্য)*, কাউন্সিল, চাই কুলফি বরফ প্রভৃতি গানে। এখানে বাউলাঙ্গের গানের বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।[৫৪] মীর মশারফ হোসেন কাঙালের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 'মশা' ভণিতায় বাউল গান লিখেছিলেন।

এ ভাবে দেখানো যেতে পারে যে মুদ্রণযোগ্যতা, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষমতার সূত্রে বাউল গানের রচনা ও প্রকাশে ক্রমে ভদ্রলোকেরা প্রধান ভূমিকা নিচ্ছিলেন। কর্তাভজাদের লালশশীর গীতাবলী (১২৭৭), শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের "গোপাল গীতাবলী" *(১ম খন্ড, ১৩১২, ইউনাইটেড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৬নং নিমু গোস্বামী লেন থেকে মুদ্রিত)* এবং ছাত্র জলধর সেনের সম্পাদনায় ও বর্ধমান রাজাদের অর্থানুকূল্যে,

কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত ফিকির চাঁদের গান (১৩২০-১৩২৩) ব্যতিক্রমী মুদ্রণ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঞ্জু শাহের রচনাবলী পূর্ববঙ্গ থেকে ১৮৯০ তে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলভী আব্দুল ওয়ালির নিবন্ধে ২৪ পবগণায় পদকর্তা ও গ্রন্থকার হিসাবে শা শের আলির নাম উল্লিখিত হয়েছে। বর্ধমানের খাঁপুকুর থেকে বুদ্ধু শাহের 'মওলা হি মওলা', জলসা নামা, দিদার এলাহী প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম এলাকায় মাইজভাণ্ডারীর গান, পাবনা কুষ্টিয়ায় লালনাদির গান, দক্ষিণবঙ্গে শের আলি, বুদ্ধু শা, যাদুবিন্দু, কুবীরচাঁদ প্রভৃতির গান প্রচলিত ছিল।

এরই সমান্তরালে উনিশ শতকের আটের দশকে প্রায় ৩১টি বাউল গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলক ও রচনাকারদের মধ্যে মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বৈরাগী সকলেই আছেন। নিম্নবর্গের সাধকদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য সুচিহ্নিত করার জন্য এদের অনেকে 'শখের বাউল' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। বৃত্তি নয় বাউল গান, সাধনাও করেন না এমত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এ সমস্ত সংকলনের মধ্যে একটি গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভুবনমোহন ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) ইচ্ছানুসারে ১২৯০ বঙ্গাব্দে বাউলগান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি রাজনারায়ণকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। সেকালে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনারায়ণ ছিলেন কর্ণধার। তিনি প্রসাদী সঙ্গীতের অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু অগ্রন্থিত বাউল গানকে 'রত্ন ভাণ্ডার' মনে করতেন। 'উক্ত গীত প্রকাশ করিয়া পরমার্থপ্রার্থীদিগকে কৃতার্থ" করার জন্য ভুবনমোহনকে এক চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন। গ্রন্থের অবতরণিকায় বাউলদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপশাখা, এ সমস্ত গানকে সাধনের আনুসঙ্গিক সহায় সঙ্গীত বলা হয়েছে। তখন শিক্ষিত সমাজের কাবো কারো গায় 'বাউলের বাতাস' লেগেছে। বাউলভাবাক্রান্ত অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্র বাউল সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে। মুখের গান লিখে তা ব্যবহার করছিলেন অনেকে। এজন্য গান লিখতে দিতে চায় না কেউ। সংকলনে শিক্ষিত মানুষদের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকেও গান সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এগুলি 'বাউল সুরে, ভাবে এবং সাধন প্রণালী' অনুযায়ী ভাষায় রচিত। অর্থাৎ বাউল চর্যাকে নাগরিক শিক্ষিতদের একাংশ আত্মীকরণ করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেক বাউল গানের শব্দ, ভাব ও ভাষা সামান্য পরিবর্তন করে ব্রহ্মসঙ্গীত এবং সংকীর্তন করা হয়েছে। বিষয়টির প্রতিবাদ করে গ্রন্থকার এমন দু'টি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন। গ্রন্থের ৪০ নং গান (পৃ. ২৬) 'হরির নাম লইতে অলস করো না রসনা।' এর 'হরি'র পরিবর্তে শাক্তেরা 'মা' এবং ব্রাহ্মেরা 'দয়াল' শব্দ ব্যবহার করে গানটিকে প্রার্থনাসঙ্গীতে পরিণত করেছে। ৪০ নং *(?), পৃ.* ২৭) "আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াইল" গানটিকেও 'হরি' শব্দ বদলে, ব্রাহ্ম প্রার্থনাসঙ্গীত করা হয়েছে।"

এ গ্রন্থে প্রায় ২০ জনের ১৫৮টি "মহাজন বাক্য" পদ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু লালনাদির, বাউলদের মান্য মহাজনদের কোনো পদ এখানে নেই। পদকর্তাদের পরিচয় নেই। কিছু পদে নেই পদকর্তার নাম। এদের কাউকে কাউকে গ্রন্থকার 'সাধক' বলেছেন।

গুরুবন্দনা, ভজন ও প্রার্থনা, নাম মাহাত্ম্য, সাধুসঙ্গ, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা, গৌরগুণগান, সাংসারিক অনিত্যতা পর্যায়ে গানগুলিকে সাজানো হয়েছে।

কয়েকটি পদ ছাড়া, অন্যত্র গানের সুর ও তালের উল্লেখ আছে। শিষ্টরাগ তাল, প্রসাদী এবং দাশু রায়ের সুর ছাড়া বাউলের সুরে — ৩টি

বাউলের সুরে, তাল খেমটা — প্রায় ১৯টি

বাউলের সুরে, তাল একতালা — ২টি

বাউলের সুরে, তাল দ্রুত তেতালা — ১টি

তাল লোভা — ১টি এবং

আউলের সুর — তাল খেমটা — ৭টি

তাল পোস্ত — ৩টি

একতালা — ১টি গান শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে।

আউল সুব কি কর্তাভজাদের গীতরীতি? জনৈক আনন্দস্বামী গানের রাগ রাগিণী ঠিক করে দিয়েছেন। গানের ব্যাখ্যা ও টীকাটিপ্পনিগুলি মূল্যবান। কিন্তু ইহবাদ দেহবাদকে ভাববাদী আধ্যাত্মিকতায় অনুরঞ্জিত করা হয়েছে।

আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়, রাজনারায়ণের নেতৃত্বে 'হিন্দু মেলায়' বাউল গান হয়েছিল কিনা? রাজনারায়ণের মতোই স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত "বীণাবাদিনী" পত্রিকায় লালনের 'ক্ষম অপরাধ' ও 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না' গান দু'টির তপকীর্তনের সুরে স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলের ইন্দিরা দেবী।[৫৬]

বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সরলাদেবী ১৩০২, ভাদ্র, ভারতীতে লালন ও গগনের গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে দিয়ে রচনা করান লালনের জীবনী ; গগন হরকরার জীবনী রচনার আহ্বান জানান পাঠকদের। উত্তর কালে স্বদেশী বিপ্লবী দলভুক্ত সুরেন ঠাকুরের নাম লালনের খাতার প্রসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।[৫৭]

'বীণাবাদিনী'তে লালনের গানকে বলা হয়েছে, 'পারমার্থিক গান'। সরলাদেবী, লালনকে 'ভগবদ্প্রণয়ী' ও 'নিরাকারবাদী' বলেছেন। সে সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে সাকার

/ মূর্তিপূজা নিয়ে ব্রাহ্মদের তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। গণ ঐতিহ্য থেকে সরলা ব্রাহ্মতত্ত্বের সমর্থন খুঁজেছিলেন।

ভুবনমোহনের গ্রন্থটির সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা এবং কতিপয় ব্রহ্মসঙ্গীতকে গ্রন্থভুক্তিতে আপত্তি জানিয়ে তিনি, "অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরলগান" শুনতে চেয়েছেন। ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মানুষেরা আবহমান বঙ্গদেশ, ভাষা এবং বাঙ্গালির ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। স্বদেশে পরবাসীদের একজন হয়ে তিনি শিকড় খুঁজেছেন এ সমস্ত গানে। তাঁর ধারণা এই যে এখানে পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত বঙ্গীয় ঐতিহ্যের বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে। এর ভাব ও ভাষা একান্ত ভাবেই বাঙালির। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি বিচার করেছেন বাউল গানের। গ্রন্থের হিন্দিগানগুলি যে সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের, ইসলামি বেসরা সুফিদের প্রতীকগুলি যে বহির্ভারতীয়, রেলগাড়ি ইত্যাদি রূপকগুলি যে সমকালীন, কবি তা বিচার করেন নি।

বাউলগানের 'পরকে আপন' করার তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন সর্বমানবের মিলনের আহ্বান। বাউলদের 'আমি' তত্ত্বে তিনি আবিষ্কার করেছেন বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য চেতনা। বলা বাহুল্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বাউলদের ব্যাখ্যা ভিন্ন। এগুলি 'আপন সুর' মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাখ্যা।[৫৮]

এভাবেই উপনিবেশ ভারতবর্ষে লোককবিদের রচনা, সুর, গীত ঐতিহ্য এবং ব্যাখ্যার অধিকার প্রথম পর্যায়ে শাসক শ্রেণী, দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতাশালী ভদ্রলোকেরা কেড়ে নেয়।

মুদ্রিত গান, ব্যাখ্যা, গীতরীতি শখের বাউলদের সাজসজ্জা এবং প্রভাব, শখের বাউল পদকর্তা "মশা" কে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, —

"ছেলে বুড়োয় সং সাজিয়ে
রং লাগিয়ে গান ধরেছে।
তারা বানিয়ে জটা লাগিয়ে আঠা
দাড়ি গোপে খুব সেজেছে।
আবার খেলকা পরে হলকা ধরে
মাজা নেড়ে খুব নাচিছে —
এসব উপড়ি চটক আলগাভড়ক
করে বল কি ফল আছে?"

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, —

ফিকির চাঁদে আজব চাঁদে রসিক চাঁদে সব মেতেছে
কোথা আর পাগলা কানাই লালন গোঁসাই
সব সাঁই এতে হার মেনেছে"[৫৯]

এ সময়ই তো রবীন্দ্রনাথ 'গানভঙ্গ' কবিতা *(কাহিনী, ২৪ আষাঢ়, ১৩০০)* লিখেছিলেন। বাউলপ্রবর, শতাব্দীর চেয়ে বয়সে বড় বৃদ্ধ লালন সাঁই বিমূঢ় হয়ে 'চটকে মাতানো' এ আন্দোলনটি দেখে লিখেছেন,

"আজগোবী বৈরাগ্য লীলা দেখতে পাই
হাত বানানো চুল দাড়ি জট কোন ভাবিনীর ভাবরে ভাই।।

১. যাত্রাদলে দেখি বেশ করিয়ে হয় রে যোগী
ওম্নি দেখ জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নাই।।
২. ফকির দরবেশ বলে ভক্তিকে ভর্ৎসনা করে
কি বুঝে সে বেহাল পরে বল্লে কিছু শুনতে পাই।।
৩. না জানি কলির শেষে কত রং উঠবে দেশে
লালন ভেড়োর দিন গিয়েছে যে বাচো সে দেখবে ভাই।।

এ পদের ভবিষ্যত বাণী অভ্রান্ত।

বাউল গানের প্রকাশক, বাউল ভূমিকার অভিনেতা, বাউল জীবন চর্যা-কথা ও সুরের আত্মীকারক, বাউলকে শ্রদ্ধাযোগ্য আসনদাতা এবং ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথও নিরুপায় হয়ে খাঁটি / নকল, আসল / সস্তা, সেকেলে / একেলে শব্দ ব্যবহার করে সাধক বাউল ও সাধনসঙ্গীতকে ভদ্রলোকদের রচনা ও চর্যা থেকে পৃথক করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক রচনাকার, গ্রন্থকার, সুরকারের, সাজা বাউলদের সাজসজ্জা ও গীতিরীতির বিপুল প্রভাব পড়েছিল সমগ্র বাউল সমাজের উপর। জীবন সায়াহ্নে (১৩৪৩) পত্রপুটের তিনটি কবিতায় বাউল প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। ৫নং কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর আলোকে মধুময় পৃথিবীর এক হাটে দেখা দিল বাউল, — একেলে বাউল ;—

"চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল ;—
তালি দেওয়া আলখেল্লার উপরে
কোমরে বাঁধা একটা বাঁয়া
লোক জমেছে চারি দিকে।

* * * * *

এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।
ওকে ডেকে নিলাম জানলার কাছে
ও গাইতে লাগল —
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।"

নবনী দাস প্রমুখ যে বাউলের ছবি শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে, তার সঙ্গে বর্ণিত বাউলের পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র মিলে যায়। জীবিকা তাদের টেনে এনেছে হাটে, সভা সমিতিতে। একেলে বাউলকে দেখিয়ে তিনি পরবর্তী দু'টি কবিতায় বাউলচর্যার গুরুত্ব এবং মূল বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। ৮ নং প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তাঁর চকিত মন্তব্য,

"জাতে বাঁধা পড়ে নি
ও বাউল, ও অসামাজিক।"

পত্রপুটের ১৫ নং কবিতাটি খ্যাত এবং বহু আলোচিত। এখানে বাউলচর্যার মর্মসত্য আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তাদের দলভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

আধুনিক কালে রাঢ়ের প্রখ্যাত গায়কেরা অনেক ভণিতাহীন ভদ্রলোকদের রচিত পদ গান করে। বর্তমানে মেলা, মহোৎসব, বাউল সম্মেলন, লোক সংস্কৃতি উৎসবে সুকণ্ঠবেশধারী গায়কেরা রঙ্গমঞ্চের নায়ক। লালনের মতো সাধক তাদের প্রাকৃত গান নিয়ে লোকসমাজের গভীরে এখন অজ্ঞাতবাসে।[৬১]

**তথ্যসূত্র।।**

(১) R. Temple, Parker এবং Camphell গল্পাদি থেকে আপত্তিজনক, অসঙ্গত উপাদানগুলি সম্পাদনায় ব্যাপক ভাবে বর্জন করেছেন। বর্জনযোগ্যতার সিদ্ধান্ত তাদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোনকে চিহ্নিত করে।

*Folk Tales of Mahakoshal,* V. Elwin, Oxford University Press, London, 1944, Introduction XV-XVI

প্রবাদের রূপান্তর ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্যবহারের আলোচনা করেছেন Gloria Goodwin Raheja, *Caste, Colonialism and the Speech of the Colonialised : Entextualisation and disciplinary control in India.* American Ethnologist 23 (3) : 494-513, 1996, American Anthropological Association.

(২) Risley, *People of India*, 1908, P. 150.
G. G. Raheja, op. cit, pp. 498-499.

(৩) Quoted in *The British Folk-Lorists, A History* ; Dorson, R. M., University of Chicago Press, U.S.A. 1968, p. 347.

(৪) বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন Gloria Goodwin Raheja, Op. cit.

(৫) *Folklore and Nationalism in Modern Finland*, William A. Wilson, Indiana University Press, Bloomington and London, U.S.A., 1976.

*Folk lore and Nationalism, Politics and ideology, In FolkLore Research around the world*, edited by R.M. Dorson, Kennikat press, port washington, U.S.A., 1973, pp. 67

*Fakelore and Folklore*, R. M. Dorson, Harvard University Press, U.S.A.1976, P.5.

বিশ শতকের তিনের দশকে দেবেন্দ্র সত্যার্থী জাতি গঠনে এবং জাতীয় আন্দোলনে লোকসংস্কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, লোক-সঙ্গীত পুনরুদ্ধারের আন্দোলন প্রস্তাব করেছিলেন। Modern Review, New Review প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি *Folk Songs of Bengal* (Triveni, Vol. XIII, NO. I, 1940) প্রকাশ করেন।

*Flok Song of Maikal Hills*, V. Elwin, S. R. Hivale, O.U.P., 1944, Introduction XX.

বঙ্গে উনিশ শতকের শেষ পর্বেই জাতীয়তাবাদের পাশ্চাত্য আদর্শ এনে লোক সংস্কৃতির জাতীয়তার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষরা।

(৬) *Another Harmony, New Eassays on the Folklore of India*, edited by Stuart H. Blackburn and A. K. Ramanujan, University of California Press, U.S.A., 1986 ; Introduction, P. 3.

(৭) বাংলা লোকবিজ্ঞান চর্চা, ওয়াকিল আহমেদ,

*লোকায়ত সংস্কৃতি, পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা,* সম্পাদনা সঞ্জীব সরকার, অরুণ কুমার রায়, উইলিয়াম কেরী এন্ড রিসার্চ সেন্টার, ১৯৭৮, কলকাতা, পৃ. ১৯।

(৮) *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা,* নেপালচন্দ্র মজুমদার, ২য় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১২০।

(৯) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *দ্বিতীয় স্বাধনিতা সংগ্রাম,* নব ভারত সংস্করণ, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ. ৫৫-এ জাতীয়তাবাদকে বিদেশ থেকে আমদানি বলেছেন। এতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার আদর্শ ছিল।

অন্যদিকে সুদীপ্ত কবিরাজ এক গবেষণাপত্রে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) এর রচনার সূত্রে দেখিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদ ভারতে ছিল না। জন্মভূমির প্রতি মমতা ছিল, স্বাদেশিকতা ছিল। উনিশ শতকের শেষে বঙ্গভূমির প্রতি ভালবাসা এবং বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রবলতা দেখা যায়। সর্বভারতীয় ঐক্যের এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, প্রাদেশিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় পরে।

Asis Nandy, *Illegitimacy of Nationalism*, Oxford University Press, 1998.

(১০) লালনের গানের কপিরাইট নিয়ে সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে আমার, *ফকির লালন সাঁই দেশ, কাল এবং শিল্প,* সংবাদ প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৮।

(১১) বিস্তৃত আলোচনার জন্য, *ফকির লালন সাঁই ঃ দেশ, কাল এবং শিল্প* (পূর্বোক্ত), পৃ. ১৭৬-১৭৭, দ্রষ্টব্য।

(১২) *প্রবাসী,* কার্তিক, ১৩২২, পৃ. ১০২

(১৩) *মধ্যকালীন ভারত,* সম্পাদনা, ইরফান হাবিব (অনুবাদ রাজা মুখার্জী), কে. পি. বাগচী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৮।

(১৪) B. D. Tripathy, 1978, *Sadhus of India,* Popular Prakasan, Bombay, P. 47-এ উদ্ধৃত।

(১৫) Quoted by Mushirul Hasan, *The Myth of Unity : Colonial and National Narratives, In Making India Hindu,* edited by David Ludden, O.U.P. Delhi, 1996.

(১৬) 'সর্বদর্শন সমুচ্চয়ে'র টীকায় মনিভদ্র এমত প্রকাশ করেছেন। বিস্তৃত আলোচনার জন্য Jayantanuj Bandopadhaya, 'Lokayata, Arthasastra and Kamsutra,' *In Essays in Indian Philosophy,* Edited by S. Saha, Allied Publishers' Limited, 1997, Calcutta, pp 550.

(১৭) রাজক্ষ্যাপা ইত্যাদির আলোচনা আছে আমার *'বস্তুবাদী বাউল'* (লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯) গ্রন্থে, পৃ. ১৬২।

এ গোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন Dr. Jeanne Openshaw, *The Bauls of West Bengal, with special reference to Rajkhyapa and his followers,* Unpublished Ph. D. Thesis, 1993, SOAS, London University, U.K.

*নীলকর বিদ্রোহ,* সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ৮-৭১।

(১৮) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৯০।

(১৯) William R. Pinch, *Soldier monks and militant Sadhus, In Making India Hindu,* op. cit, pp. 147.

(২০) বাউলকে হিন্দু এবং ইসলামি দু সমাজেই পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজেও অনেক ফকির, দরবেশ আছেন।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য, *ফকির লালন সাঁই ঃ দেশ কাল এবং শিল্প,* পৃ. ১৪৫-১৪৭, দ্রষ্টব্য।

(২১) Wilson H. H., 1846, *A Sketch of religious sects of the Hindus,* Asiatic Researches, Vol. XVI and XVII.

Hunter W., *A Statistical account of Bengal,* Trubner and Co. London, Vol. I, 1975, P. 65-67 ;

Vol. VIII, 1876, p. 51.

(২২) *A Statistical account of Bengal* Vol. IX, 1876, op. cit,

This is not properly a caste, but a religious sect, pp. 40-45.

হান্টারের গ্রন্থরচনার সময়ে লালন, পাগলা কানাই, ফিকির চাঁদের গানের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। রক্ষণশীলেরা আক্রমণ করছিল বাউল ফকিরদের।

এ সমস্ত গবেষক জাত বৈষ্ণব এবং বাউলদের গুলিয়ে ফেলেছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন Dr. Jeanne Openshaw, op.cit, p.13.

(২৩) মুর্শিদাবাদে ১৯০ জন সন্ন্যাসী, ২১৪৬৪ জন বৈষ্ণব এবং কিছু খৃষ্টান জাতি বিভাগ অস্বীকার করেছিল।

W. Hunter, op,cit, Vol. IX, p. 45.

(২৪) *Tribes and Castes of Bengal* (1891), Firma K.L.M., 1981, Calcutta, p. 78

অশোক মিত্র বাউলের অনৈতিক বিবরণের দায় দিয়েছেন ভদ্রলোকদের এবং রিজলেকে। *Tribes and Castes of West Bengal,* W.B. Census (1951), 1953, Calcutta, p. 260.

(২৫) *District Gazetteer of Rajsahi,* 1916, p. 64.

(২৬) Wise, James. 1884, *Notes on the Races and Caste and Traders of Bengal,* London.
W. James, 1894, *The Mohamedan of Eastern Bengal,* J.A.S.B. (Bombay).

(২৭) W. Crooke, *The Tribes and Castes of the N. W. Province of Oudh.*
*Secret Messages and Symbols used in India,* Journal of the Bihar and Orissa research society, Vol. V, Part IV, pp. 451-462,1919.
*Aghori, 1928, In Encyclopaedia of Religion and ethics,* Vol.I, edited by J. Hastings, Newyork, U.S.A.

(২৮) *Tribes and Castes of Bengal,* op.cit.

(২৯) Kedarnath Basu, 1886-89, *On the Minor Religious Sects of Bengal,* J.A.S.B. (Bombay) Vol. I, No. 8, pp. 477-504.

(৩০) ১৯১১-এর জনগণনায় সাঁওতাল ইত্যাদি জনগণ হিন্দু সমাজ ভুক্ত হয়েছিল। হিন্দুদের উচ্চ নিম্নে, ক্রমে 'জাত' হিসাবে ছোটো বা বড়ো হিসাবে ঘোষণা করা হলে, সমাজে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি হয়। অনেক 'জাত' উচ্চস্থানের জন্য বিচারালয়ে মামলা করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "Freezing the categories of social classification, such as caste, and privileging of 'scriptural' interpretation of social law at the expense of the fludity of local community practices" – 1995, *The Nation and its fragments : Colonial and Post Colonial Histories ;* Oxford University press, Delhi, p. 31.

(৩১) বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, শক্তিনাথ ঝা, *বাউল ধবংসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, বর্তিকা,* ১৯৯৭, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, কলকাতা, মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত।

(৩২) *নবীনচন্দ্র সেন রচনাবলী,* ১ম খন্ড, ১৩৬৬, সম্পাদনা সজনী কান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ১৯০।
দয়ানন্দ সরস্বতী, 'সত্যার্থ প্রকাশে', সর্বভারতীয় ভক্তিবাদী গোষ্ঠীগুলিকে হীন ভাবে চিত্রিত করেছেন। ১৩৮৭, সম্পাদনা ও অনুবাদ, প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্ত ভূষণ, আর্যসমাজ মন্দির, কলকাতা — দ্রষ্টব্য।

(৩৩) K. N. Basu, *On Minor Religious Sects of Bengal*, op.cit.

(৩৪) M.A. Wali, *On Curious Tenets and practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal*, J.A.S.B., Vol. V, No. 4, 1900.
নিবন্ধটি ১৮৯৮ তে পঠিত হয়।

(৩৫) *Hindu Castes and Sects*, J. N. Bhattacharya, 1896, Thacker Spink and Co. Ltd., Calcutta, Reprint 1968, pp. 378-382.

(৩৬) *বিশ্বকোষ*, ৮ম ভাগ, ১৩১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৫৯।

(৩৭) বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার, *ফকির লালন সাঁই ঃ দেশ, কাল এবং শিল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৮ দ্রষ্টব্য।

(৩৮) *দাশরথি রায়ের পাঁচালি*, সম্পাদনা হরিপদ চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

ভেকধারী, বৈরাগী বৈষ্ণবদের কপটতা ও নারীলোলুপতার এবং কর্তাভজাদের উপর অত্যাচারের তথ্য দিয়েছেন দাশরথি। পৃ. ৬৬৮-৭৭৩।

(৩৯) *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, সম্পাদনা মুহম্মদ আবদুল হাই ও অনোয়ার পাশা, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ৩৯-৪০, ৪৪২।

(৪০) *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকসা*, সম্পাদনা অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ১০৭-১১৬।

(৪১) *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮ ; সম্পাদকের মতে অপেশাদার গায়কের দলই 'শখের দল'।

(৪২) অধ্যাত্ম এষণা ও সামাজিকদের প্রসন্ন করে ভিক্ষা লাভ, এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হেতু গানেরও দ্বিঅর্থ থাকতো।

*পদাবলীর অভিসার* ঃ গানের শ্রীক্ষেত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ. ৪।

(৪৩) গানের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদালাভের কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে, *ফকির লালন সাঁই ঃ দেশ, কাল এবং শিল্প*, পূর্বোক্ত গ্রন্থে ; পৃ. ১৭১-১৭৯।

(৪৪) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৯০।

(৪৫) প্রয়াত সোলেমান সেখ, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, প্রখ্যাত গায়ক, কথাকার ও সুরকার ছিলেন। নিজে একতারা, দোতারা, খঞ্জনি বানাতেন।

(৪৬) *New publication on the Bengali Syncretic religion*, Journal of the American Oriental Society, 114. 2 (1994)

(৪৭) নরেন্দ্রনাথ বাবু, *জলধর সেনের আত্মজীবনী,* ১৩৬০, কলকাতা, পৃ. ১২৬-১২৯।

আহাম্মদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব,* ঢাকা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪ দশ খণ্ড, পৃ. ১০০৫।

শক্তিনাথ ঝা, *শখের বাউল এবং লালন,* সহজ মানুষ, ১৯৯৬ পশ্চিমবঙ্গ লালন মেলা সমিতি, ভীমপুর, নদিয়া।

(৪৮) সুধীর চক্রবর্তী, *ব্রাত্যলোকায়ত লালন,* ১৯৯২, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ১৭১।

(৪৯) অশোক চট্টোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙ্গাল হরিনাথ,* লেখক সমাবেশ, কলকাতা, ১৯৯৫।

*কাঙাল হরিনাথ মজুমদার,* আবুল আহ্সান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

(৫০) *Sunday Telegraph,* Calcutta, 5.12.1982, W.B.

(৫১) বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার *বস্তুবাদী বাউল,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯, দ্রষ্টব্য।

(৫২) রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, *ফকির লালন সাঁই, দেশ, কাল এবং শিল্প,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫-১৯৮।

নজরুলের উপর বাউল ফকিরদের প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে, *"নজ(ল, বরদাচরণ মজুমদার এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ"* নিবন্ধে (জলসিড়ি, ২৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯)

(৫৩) *কান্ত কবি রচনা সম্ভার,* প্রমথনাথ বিশি সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশান, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৮ (১৩৬৯)।

(৫৪) *সেরা বিদূষক,* সম্পাদনা অনুত্তম পন্ডিত, ১ম খণ্ড, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৪০২, পৃ. ১-৬৪।

(৫৫) ভুবন মোহন ঘোষ, *সঙ্গীত সংগ্রহ / বাউলের গাথা,* ২১০ / ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা, ১২৯০।

*অবতরণিকা* দ্রষ্টব্য।

(৫৬) অরুণ কুমার বসু, *লালনের গানের একটি অনুষ্ঠান শুনে,* সহজ মানুষ, প. বঙ্গ লালন মেলা সমিতি, আসাননগর, ভীমপুর, নদিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪-৩৭।

(৫৭) গুপ্ত সঞ্জীবনী সভার সভাপতি রাজনারায়ণ, সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সদস্য রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে। বিপ্লবীদলের প্রথম পর্যায়ে সরলাদেবী এবং সুরেন ঠাকুর যুক্ত ছিলেন।
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম,* পূর্বোক্ত, পৃ, ৭, ১৬, ২১, ৮৬, ৯০, ১০১।

(৫৮) *বাউলের গাথা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪২-৬৪৭।

(৫৯) *সঙ্গীত লহরী,* আবুল আহ্সান চৌধুরী সম্পাদিত, কুষ্টিয়া, ১৩৮২, ৮৯ নং গান ; পৃ. ৫৬।

(৬০) নিজস্ব সংগ্রহ। জাহেদপুর, শিলাইদহ, কুমারখালি, কুষ্টিয়ার গোঁসাই গোপালের পরম্পরার সাধক ও পদকর্তা ফিকিরচাঁদ সরকারের নিজস্ব খাতায় পদটি লিখিত আছে। তার পুত্র সুদর্শন সরকারের সৌজন্যে পদটি প্রাপ্ত।

(৬১) সাধক বাউলদের অন্তর্ধানকে চিহ্নিত করে সুকুমার সেন লিখেছেন, "আধুনিক বাউলদের কেউ ব্যবসাদার, কেউ সংসার. কেউ রেডিও বাউল" *শকুন্তলা,* অমিতগুপ্ত সম্পাদিত, জানুয়ারী, ১৯৮৩, কলকাতা পৃ. ১।

# উত্তরবঙ্গের জনজাতি : আর্থ-সামাজিক রূপান্তর

**বিমলেন্দু মজুমদার**

বর্তমান উত্তরবঙ্গের ছ-টি জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তন 2,16,250 বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে (ক) পার্বত্য এলাকা সহ আন্দোলিত ভূমিরূপ ও অরণ্য পরিবৃত হিমালয় সংলগ্ন দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার মিলিত আয়তন 93,200 বর্গ কিলোমিটার। আর (খ) বরেন্দ্রভূমির সম্প্রসারিত সমভূমিতে অবস্থিত কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার মিলিত আয়তন 1,23,050 বর্গ কিলোমিটার। 1981 সালের জনগণনা অনুসারে উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা 94,50,658 জন। এর মধ্যে 5,42,912 জন পুরুষ এবং 5,22,517 জন মহিলাসহ তফশিলি জনজাতির মোট জনসংখ্যা 10,66,429 জন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবিকার উৎস এবং জীবিকাভঙ্গীর (occupational pattern) অনুসারে জনজাতি-জনবিন্যাসের দিক থেকে হিমালয়সংলগ্ন দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে সমতলের চারটি জেলার পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জীবিকার দিক থেকে এ দুটি জেলার বহিরাগত জনজাতি সম্প্রদায় প্রধানত চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে সমতলের চারটি জেলার জনজাতি জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা কৃষি। আবার প্রব্রজন (Migration) এবং বসতিবিস্তারের দিক থেকেও উত্তরবঙ্গের জনজাতি সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ দুটি কালসীমায় তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ— তা হচ্ছে (ক) অধুনালুপ্ত জনজাতি, (খ) স্থানীয় জনজাতি, এবং (গ) বহিরাগত জনজাতি।

[ *সারণি-1* ] উত্তরবঙ্গের জনজাতি

| (ক) অধুনালুপ্ত জনজাতি | (খ) স্থানীয় জনজাতি | (গ) বহিরাগত জনজাতি | (ঘ) মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| (মোঙ্গল জনগোষ্ঠী) | (মোঙ্গল জনগোষ্ঠী) | (অস্ট্রিক / দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী) | |
| ডোয়া, তন্ডু, খোনিয়া, পানিকোচ, জলদা, কিচক, প্রভৃতি। | ভুটিয়া (শেরপা, ডুক্‌পা, টোটো, কাগাতে, ইউলমো, তিব্বতি), মেচ (বোড়ো, রাভা, লেপ্‌চা, গারো, মগ, ম্রু, চাক্‌মা, হাজং। [ ধীমাল, কোচিলা থারু, লিম্বু*] প্রভৃতি। | ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, লোধা (খেড়িয়া / খড়িয়া) অসুর, কোরা / কোড়া, মাহালি, নাগেশিয়া, মাল পাহাড়িয়া, পারাহাইয়্যা, শবর, হো, বীরহড়, ভূমিজ লোহারা ইত্যাদি। | |

উৎস ঃ (i) List of Scheduled Tribes ; West Bengal, Census-1981.

(ii) Brochure containing the list of scheduled Castes and scheduled Tribes and Guidelines for verification of claims for issuing scheduled Caste and scheduled Tribe certificates First Edn. Govt. of India, 1984 (Rept. 1988).

*(ক) হিমালয় ও হিমালয় সংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চল*

আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলে ব্রিটিশশাসন সম্প্রসারণের আগে, এই এলাকা ছিল হিংস্র শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে ঢাকা। সেই সঙ্গে এই এলাকায় ছিল মারাত্মক ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রকোপ। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এই অঞ্চলে জনবসতি বিস্তারের অন্যতম অন্তরায়। দার্জিলিং জেলার কালিমপং মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ডুর্য়াস অঞ্চল ভুটানের অধীন। অন্যদিকে বর্তমান দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চল নিয়ে নেপাল এবং সিকিমের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। অবশেষে 1835 সালে ব্রিটিশ সরকার সিকিম রাজ্যের কাছ থেকে দার্জিলিং অঞ্চল উপহার হিসেবে লাভ করে। আর দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল 1850 সালে ব্রিটিশ-ভারতের অঙ্গীভূত হয়। এরপর 1864-65 সালে ভারত-ভূটান যুদ্ধে ভূটানের পরাজয়ের পর 'সিনচুলা চুক্তি' অনুসারে দার্জিলিং জেলার কালিমপং মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকায় ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত হয়। এরপর ঐ বছরই

1865 সালে দার্জিলিং জেলা এবং 1869 এ রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমাকে পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত করে সৃষ্টি হয় জলপাইগুড়ি জেলা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত হওয়ার পরও জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ এলাকাকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এলাকার বাইরে 'নন্-রেগুলেটেড' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয়।

আলোচনার সুবিধের জন্য হিমালয় ও হিমালয় সংলগ্ন জেলাদুটিকে ভূ-প্রকৃতি ও জনসংস্থানগত দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম (১) জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল এবং দ্বিতীয় (২) তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চল (মেচি নদী ও সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)।

প্রাক্-ব্রিটিশ শাসনকালে এই এলাকায় নেপাল, ভুটান ও সিকিমের রাজত্বকালে এর অধিকাংশ ভূভাগই ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। তরাই ও ডুয়ার্সের দক্ষিণাঞ্চলে নদীতীরবর্তী এলাকাগুলি ছিল নলখাগড়া ও সাভানাজাতীয় তৃণভূমিতে ঢাকা শ্বাপদসংকুল এবং জনবিরল।

ঐ সময় বর্তমান দার্জিলিং এলাকায় ছিল সামান্য কয়েক ঘর লেপচা জনজাতির বাস। আর তরাই অঞ্চলের উত্তরাংশের বনাঞ্চলে বসবাস করতেন মেচ (বোড়ো), ধীমাল, পাণিকোচ, থারু (বা কোচিলা থারু) প্রভৃতি অনুসূচিত ও অ-অনুসূচিত জনজাতির মানুষ। আর জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতেন ভুটিয়া ও তাদের সহযোগী ডোয়া, টোটো, প্রভৃতি জনজাতি। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্সের আন্দোলিত উচ্চভূমি ও দক্ষিণের সমভূমিতে বসবাস করতেন মেচ (বোড়ো), রাভা, গারো, লেপ্চা, টোটো, তন্ডু ডোয়া, পানিকোচ, জলদা, খোনিয়া প্রভৃতি জনজাতির মানুষ।

এই দুই জেলায় আলোচ্য ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনজাতির মানুষেরা তখনও আদিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় শিকার এবং খাদ্যসংগ্রহ করাই ছিল মুখ্য জীবিকা। তাঁদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল বনভূমি। জাতি-সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এসব জনজাতির গোষ্ঠীসংখ্যা বেশি হলেও এঁদের মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় তখন অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল অফুরন্ত। এঁদের জীবনযাত্রার মান ছিল একান্ত অনুন্নত, চাহিদা ছিল ন্যূনতম। মাছধরা, শিকার, বনজ সংগ্রহ (Gleaning) এবং ঝুম চাষ ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। উৎপাদনের উপাদান ও প্রকৌশল এত সেকেলে ছিল যে, তার সাহায্যে তাঁরা শুধুমাত্র জীবনধারণের উপযোগী (Subsistance) খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদন করতে পারতেন। তাঁদের লাভজনক

বা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। তবে লোকসংখ্যার তুলনায় বনজ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল পর্যাপ্ত ; কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বন্যজন্তুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মতো যথেষ্ট অস্ত্র বা লোকবল তাঁদের ছিল না। এসব জনজাতি-গ্রামের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকা ঐ বিশেষ জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি (Communty property) হিসেবে পরিগণিত হত। আর তাঁদের গ্রামগুলি সাধারণত একক জনগোষ্ঠীর বসতি (Mono-ethnic village) হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এমন কী তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো জনজাতি এত বেশি রক্ষণশীল ছিলেন যে, বৎসরে একটা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া তাঁদের গ্রামে বিদেশিদের বা বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় বিদেশিদের প্রবেশের জন্য অনুমোদিত কাল (Foreigners entry period)। এক একটা জনজাতির নাম অনুসারে তাঁদের গ্রামগুলির নামকরণ হত, যেমন — টোটো পাড়া, জলদাপাড়া, মেচপাড়া ইত্যাদি।

এঁদের মধ্যে শেরপা, টোটো, ডোয়া (ডোয়য়া), ড্রুকপা প্রভৃতি জনজাতির প্রধান জীবিকা ছিল 'ভারবাহীর কাজ' (Porterage)। প্রাক্-ব্রিটিশ শাসনকালে প্রত্যন্ত উত্তর বাংলায় এসব অঞ্চলে দু-চারটি মাল্লি বা সড়ক (যেমন রংধামাল্লি, ভাণ্ডামাল্লি, ঘুঘুমাল্লি প্রভৃতি। মাল্লি — সড়ক বা উঁচু মাটির বাঁধ : ভোটশব্দ) থাকলেও দুর্গম এলাকাগুলির সঙ্গে কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না। এমন কী বন পাহাড়ের দুর্গম এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শীতকালের অপেক্ষায় বসে থাকতে হত। কারণ বর্ষাকালে খরস্রোতা নদীগুলি পারাপার সহজসাধ্য ছিল না। আবার শীত পড়লে শীত-শীর্ণ নদীগুলিকে ব্যবহার করা হত রাজপথের বিকল্প হিসেবে। তখন রসদ বা পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হত ঘোড়া, খচ্চর ও বলদ। দুর্গম জনজাতির গ্রামগুলিতে কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি সমতল অঞ্চল থেকে 'বলদের' পিঠে বোঝা চাপিয়ে 'বণিজে'র (বণিকের) দল বিনিময় বাণিজ্য চালাতেন। কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজন বা যুদ্ধ বিগ্রহের সময় রসদ এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী পরিবহনের জন্য নিয়োগ করা হত কঠোর শ্রমক্ষম দক্ষ 'ভারবাহী' (Porter)। সেসময় এ ধরনের ভারবহনের জন্য ভুটান প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলিতে (Strategic point) টোটো, ডোয়্য়া, ডুকপা, জল্দা প্রভৃতি জনজাতি এবং 'দোভাষিয়া' সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। টোটো জনজাতির মতো এঁদের মধ্যে কোনো কোনো জনজাতি ছিল ভুটানের 'জাপো' (Zapo) বা দাস-প্রজা। তাঁরা সরকারনির্দিষ্ট গ্রামে বসবাস করতেন এবং প্রশাসনের প্রয়োজনে বেগার শ্রমদানে বাধ্য থাকতেন বা ভারবাহী হিসেবে পণ্যদ্রব্য ও রসদ ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকতেন।

এই বাধ্যতামূলক জীবিকার অবসরে টোটো, ডোয়্য়া এবং ডুক্‌পা [ ড্রুক-পা > দোক্ষনো (দক্ষিণের আধিবাসী) : তিব্বতি শব্দ ] সম্প্রদায় কমলা লেবুর চাষ করতেন। এতে তাঁরা অবশ্যই প্রকৃতির দাক্ষিণ্য লাভ করতেন। কারণ এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে তখন একবার কমলা লেবুর গাছগুলি লাগালে তার পেছনে সারাবছর তেমন পরিশ্রম করতে হত না। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছগুলি আপনজালা গাছের মতো বেড়ে উঠত এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলত। কমলালেবুর সময়ে বা অবসর সময়ে এঁরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাণিজ্যিক পরিক্রমায় (Short trade tour) বের হতেন। তাঁদের বাণিজ্যিক পরিক্রমার প্রধান উপজীব্য ছিল — বনৌষধি, লাক্ষা, মুষ্টি লতা, চুরপি, পশম ও কমলালেবু। এছাড়া ডুক্‌পা সম্প্রদায় পশুপালনও করতেন।

নেপাল, ভূটান ও সিকিমের শাসনকালে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'মহালবাড়ি ব্যবস্থার' মতো এক ধরনের ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এক একটা জনগোষ্ঠীর নামে এক একটা গ্রাম পত্তন করা হত। এসব গ্রামপত্তনকারী জনজাতির মধ্যে প্রধানতঃ ধর্মীয় প্রধান (Religious Head) এবং অ-ধর্মীয় প্রধান (Secular Head) বা দলপতির (Headman) অধীনে দ্বি-স্তর শাসনব্যবস্থা যুক্ত গ্রাম সংগঠন (Two tier village organisation) গ্রামের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করত। বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনায় এ ধরনের গ্রাম সংগঠনের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি এবং শাসনের শেকড় সমাজ ও পরিবারের অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। গ্রামপত্তনের পর গ্রামের সমস্ত জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিটি পরিবারের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত। যদিও গ্রামের সমগ্র এলাকা প্রধানত তাঁদের ধর্মীয় প্রধানের নামে নথিভুক্ত করা হত এবং তিনি ঐ গ্রামের বাৎসরিক খাজনা সরাসরি রাজসরকারে জমা দেবার জন্য দায়ী থাকতেন। প্রতিটি পরিবারের 'মাথাপিছু' নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক খাজনা বা 'দা-খাজনা' (Capitation Tax) ধার্য করা হত। অন্যদিকে এসব গ্রামের প্রজারা প্রশাসনের প্রয়োজনে বৎসরে কয়েকদিন 'বেগার শ্রমদান' করতে বাধ্য থাকতেন। বর্তমান টোটো জন-জাতির গ্রাম টোটোপাড়া ছিল এধরনের গ্রামের সর্বশেষ নিদর্শন।

এসব জনজাতির প্রত্যেকেই সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাসী ছিলেন। একমাত্র লেপ্‌চা ও ডুক্‌পা সম্প্রদায় ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের কারমা-পা শাখার মতাবলম্বী। তবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও এসব জনজাতি এখনো তাঁদের মন থেকে আদি সর্বপ্রাণবাদী ধর্মীয় ধারাকে মুছে ফেলতে পারেননি। এখনো তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে নানা লৌকিক দেব দেবতার পূজাপার্বণ প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। এসব জনজাতির প্রত্যেকের নিজ নিজ মাতৃভাষা ছিল। ছিল তাঁদের নিজস্ব নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয়বাহী পোষাক। নিজেদের এই পোষাক নিজেরাই বাড়িতে তাঁতে তৈরি করতেন। এই ধারা এখন লুপ্তপ্রায়।

আলোচ্য অঞ্চলে ভোট শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে টোটো (বর্তমান টোটোপাড়ার টোটোরা ছাড়া), ডোয়য়া, ডুক্‌পা, খোনিয়া, জলদা, তন্ডু প্রভৃতি জনজাতির অধিকাংশ মানুষই ভুটানে চলে গিয়েছেন তা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব মুছে ফেলেছেন। এসব অধুনালুপ্ত জনজাতি সম্বন্ধে এখনো কোনো গবেষণামূলক সমীক্ষা হয়নি। সম্প্রতি জলদা জনজাতির দুই সদস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বর্তমানে মেচ উপাধি গ্রহণ করে, তাঁদের পরিচয় সুকৌশলে গোপন করে চলেছেন। অথচ এক সময়ে বর্তমান জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পাশেই জলদাজনজাতির একটা গ্রাম ছিল। আবার ভলকা পরগনায় প্রাচীন কালে জলদাদের নামে দুটো জোতও ছিল বলে সাত্তার সাহেব উল্লেখ করেছেন।

এসব জনজাতির মধ্যে বর্তমানে 'টোটো' এবং ডুক্‌পা ছাড়া আর কোনো জনজাতির মানুষ দেখা যায় না। এঁদের ক্ষুদ্র জনসংখ্যা এবং আদিম প্রকৌশল ও পিছিয়েপড়া মানসিকতার জন্য এসব জনজাতি দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গে বসবাস করলেও আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলে কোনো 'ভৌম-সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটের' (Geocultural land-scape) ছাপ রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু এই অঞ্চলের গ্রাম নামে, স্থান নামে, নদী বা বনভূমির নামকরণে তাঁদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন তাঁদের চিরায়ত সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা যা তাঁদের প্রতিবেশী সংস্কৃতিতে প্রতিফলনের মাধ্যমে আজও এগিয়ে চলেছে।

*(খ) উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জনজাতি*

অধুনালুপ্ত জনজাতিগোষ্ঠী ছাড়া, প্রাচীনকাল থেকে যেসব জনজাতি উত্তরবঙ্গের আলোচ্য অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন, নৃ-বিজ্ঞানীরা অনুসূচিত জাতি হিসেবে তাঁদের ন-টি জনগোষ্ঠীকে উত্তরবঙ্গের জনজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (সারণী-১)। এঁদের প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : — (i) পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতি এবং (ii) সমতলের জনজাতি।

এঁদের মধ্যে ভুটিয়া (শেরপা, ডুক্‌পা, টোটো, কাগাতে, ইউল্‌মো এবং টিবেটান) এবং লেপচা জনজাতিকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় পাবর্ত্য অঞ্চলের বসবাসকারী অনুসূচিত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার তাডিং (টোটোপাড়া) ও বক্সা পাবর্ত্য অঞ্চলে বাস করেন যথাক্রমে টোটো এবং ডুক্‌পা জনজাতি। বাদবাকি অন্যরা বসবাস করেন দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে। যদিও বর্তমানে প্রশাসনের নানা স্তরের কর্মচারী হিসেবে দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা, তিব্বতি প্রভৃতি জনজাতি রাজ্যের এবং দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে দার্জিলিং-এ আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সহজলভ্য হওয়ার ফলে।

অথচ দার্জিলিং এর মতো শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী টোটো এবং ডুক্‌পা জনজাতির মানুষেরা এখনো অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন। [ *সারণী*-২ ]

প্রাচীনকালে টোটো জনজাতি কমলালেবু চাষ করতেন। কিন্তু 1930-31 সালে টোটো পাড়ার কমলালেবুর বাগান মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে টোটোরা চাষবাসের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এছাড়া ভুটান থেকে শীতের মরসুমে কমলালেবু বহন করে ভারতের বাজারে পৌঁছে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। বর্তমানে ভুটানে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে টোটোদের এ ধরনের কমলালেবু বহনের কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে বহিরাগত একটি জনগোষ্ঠীর চাপে টোটোপাড়ায় চাষের জমিরও অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে অধিকাংশ টোটো পরিবার নিজেদের জমিতেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক সমস্যা একময় তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু গত দুই দশকে রাজ্য সরকার কর্তৃক টোটো জনজাতির উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বেশ কিচ্ছু যুবক যুবতী লেখাপড়া শিখে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে বক্সা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ডুক্‌পা সম্প্রদায় এখনো প্রধানত কমলালেবু চাষের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া তারা আদা এবং পাতিলেবুর চাষ ও পশুপালন করেও বাড়তি রোজগার করে থাকেন।

[*সারণি*-২] উত্তরবঙ্গের অনুসূচিত জনজাতির জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার। (১৯৮১)

| জেলার নাম | মোট জনসংখ্যা | তফশিলি জনজাতির মোট জনসংখ্যা | তফ জন-জাতির পুরুষ | তফ জন-জাতির স্ত্রী | শিক্ষিতের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. কোচবিহার | 17,71,562 | 10,105 | 5,310 | 4,795 | 16·50 |
| ২. জলপাইগুড়ি | 22,14,871 | 4,91,791 | 2,52,842 | 2.38,949 | 12·10 |
| ৩. দার্জিলিং | 10,24,269 | 1,51,073 | 77,889 | 73,184 | 24·75 |
| ৪. উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর | 24,04,947 | 2,60,160 | 1,32,915 | 1,27,245 | 10·92 |
| ৫. মালদহ | 20,35,009 | 1,53,300 | 74,956 | 78,344 | 8·05 |
| | 94,50,658 | 10,66,429 | 5,42,912 | 5,22,517 | |

উৎস : জনগণনা প্রতিবেদন - 1981

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভাষাগত সাবলীলতা এবং আধুনিক শিক্ষার সুযোগের সহজলভ্যতার ফলে দার্জিলিং-এর জনজাতি সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছেন। দার্জিলিং-এ বসবাসকারী রাই, লিম্বু, গুরুং, তামাং, ইয়াখা, শের্পা, লেপচা, নেওয়ার, ভুটিয়া, তিব্বতি প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা একসময় প্রবল ছিল। বরং প্রকৃতপক্ষে নেপালি ভাষাভাষীর (মাতৃভাষা হিসেবে) সংখ্যা অন্যান্য অনুসূচিত ও অননুসূচিত গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক কম ছিল। বর্তমানে দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী সব জনজাতিই নেপালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। তবে লেপচা, লিম্বু প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাঁদের ভাষা স্বাতন্ত্র্যের জন্য আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন। জলপাইগুড়ির টোটো এবং ডুক্পা জনজাতি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে পোষাক আসাকের ক্ষেত্রে ডুক্পা, ভুটিয়া, তিব্বতি প্রভৃতি জনজাতি ছাড়া আর বেশির ভাগ জনজাতিই সাধারণ ভারতীয় পোষাক বা নেপালি বা বাঙালি মহিলাদের মতো পোষাক পরায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নানা ধরনের ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার থেকে এঁরা এখনো মুক্ত হতে পারেননি।

টোটো জনজাতি ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আর সব জনজাতিই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে কোনো কোনো জনজাতির একটা অংশ হিন্দুধর্মও সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আবার প্রতিটি জনজাতির একটা অংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এমন কি সম্প্রতি চার জন টোটো যুবক যুবতীকেও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

*সমতলের স্থানীয় জনজাতি*

দার্জিলিং জেলার তরাই ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এবং সমতলে বসবাসকারী (বনবস্তিসহ) মেচ, রাভা, গারো, মগ্, চাক্মা, ম্রু, ধীমাল, থারু, হাজং প্রভৃতি অনুসূচিত ও অননুসূচিত মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এসব জনজাতির অধিকাংশ গোষ্ঠীই একসময় ক্ষেত্রান্তরী চাষ (Shifting cultivation) করতেন এবং স্থানান্তরী (Migratory) জীবন যাপন করতেন। তখন তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক দিক থেকে শিকার ও বনজসংগ্রহ (gleaning) এবং কৃষিকাজ সমান গুরুত্ব পেত। তাঁরা ছিলেন অনেকাংশে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই তাঁদের জীবনে নেমে আসতো বিপর্যয়। এ অবস্থায় বন্যা, খরা, কোনো পরিবারে একাধিক মৃত্যু বা অতিরিক্ত বন্য জন্তুর আক্রমণ ঘটলে তাঁরা নতুন গ্রামপত্তনের উদ্দেশ্যে পুরোনো গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। আর এসব জনবিরল এলাকায় জমির কোনো অভাব না থাকায় বনজঙ্গল কেটে নতুন করে বসতি

স্থাপন করতেও তেমন কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু এই এলাকায় ব্রিটিশশাসন সম্প্রসারিত হওয়ায় পর নানা দিক থেকে তাঁদের মুক্ত জীবনের ওপর আঘাত নেমে এল। ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারণের ফলে এঁদের জীবিকার প্রধান উৎস বনভূমির ওপর থেকে তাঁরা অধিকার হারালেন। কিছু দিনের মধ্যেই বলবৎ হল বনভূমি সংরক্ষণ আইন (ইতিপূর্বে 1865 সালে গৃহীত হয় প্রথম বনসংরক্ষণ আইন — 'Indian Forest Act of 1865')। এর ফলে শুধুমাত্র বনভূমির জমি হাসিল করে 'ঝুমচাষ' করাই বন্ধ হল না, তাঁদের অবাধ শিকার এবং বনজ সংগ্রহের ওপর আঘাত এল। (এই আইনের ফলে ব্রিটিশ এবং তাঁদের স্বজাতির লোকদের শিকারের নামে অবাধ পশু হত্যা বন্ধ না হয়ে বরং বেড়েই গিয়েছিল ; সে অন্য এক বেদনাদায়ক ইতিহাস)। অন্যদিকে জনজাতি বসবাস-বলয়ের অধিকাংশ জমিই চাবাগান পত্তনের জন্য বিলিবন্টন করে দেওয়া হয়। এর ফলে এসব জনজাতির, বিশেষ করে মেচ এবং রাভাদের বিশাল একটা অংশ পূর্ব ডুয়ার্সে (বর্তমান কোকড়াঝাড়, গোয়ালপাড়া জেলা) চলে যেতে বাধ্য হলেন। অন্যরা বসবাস করতে শুরু করলেন বনসংলগ্ন সাধারণ রেভিনিউ ভিলেজে (Revenue village) বা 1894 সালে 'টঙ্গিয়া প্রথা' চালু হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের প্রায় 170টি বনবস্তিতে চুক্তিবদ্ধ বনশ্রমিক হিসেবে বসবাস করতে শুরু করেন।

'টঙ্গিয়া প্রথা' অনুসারে যেসব জনজাতি একসময় বনবস্তিগুলিতে বসতিস্থাপন করেছিলেন, তাঁদের জনসংখ্যা এখন বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো বনবস্তিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেও বেশ কিছু লোক এসে আত্মীয়জনের সূত্রে বসতি স্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে 60% শতাংশের বেশি মানুষ এখন উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে বনবস্তি-গুলিতে যেসব জনজাতি বসবাস করেন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তাঁরা যেমন উদ্বেগজনকভাবে পিছিয়ে পড়েছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা তেমনি খুব পশ্চাৎপদ। শিক্ষায় পরিকাঠামোর অভাব এবং ভাষা বা শিক্ষার মাধ্যম এদের কাছে একটা বিরাট অন্তরায়। বনবস্তিগুলিতে বসবাসকারী সমজাতিদের মধ্যে রাভা, গারো, মেচ প্রভৃতি বাংলা ভাষাকে জীবন জীবিকার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশ বনবাসী জনজাতিই নেপালি ভাষা ব্যবহার করেন। সমতলের জনজাতিদের মধ্যে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি পরিমাণে বনবস্তিগুলিতে বসবাস করেন। আবার তাঁদের একটা বিরাট অংশ সহ রাভা, গারো, স্রু প্রভৃতি জনজাতি বনভূমির বাইরে 'খাজনাপ্রদানকার গ্রামে' (Revenue Village) বসবাস করেন। আবার বনবস্তি এবং সাধারণ খাজনাপ্রদানকারী গ্রামে একদিকে যেমন একাধিক জাতি জনজাতি (Multiethnic) একসঙ্গে বসবাস করেন তেমনি এককভাবেও এক একটি বিশেষ জনবসতি বসবাস করেন। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে একক

জনজাতির গ্রামের (Mono-ethnic Village) তুলনায় মিশ্রজনগোষ্ঠীয় গ্রামাগুলিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী শিক্ষা সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে উন্নত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। এ ধরনের গ্রামের মানুষেরা একাধিক ভাষা অবাধে বলতে পারেন। এমন কি ধর্মীয় ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একই ভিটায় দুটি জনগোষ্ঠী নির্বিবাদে বসবাস করছেন এমন নজিরও আছে।

[ *সারণি-৩* ] উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান জনজাতির ধর্ম-সাংস্কৃতিক অবস্থান। (১৯৯৯)

| | জড়োপাসক ধর্ম-সংস্কৃতি | হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি | বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি | খ্রীষ্টান ধর্ম সংস্কৃতি | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী | টোটো, রাভা, মেচ্, গারো, লেপচা, ম্রু, [ ধীমাল, থারু, লিম্বু ] ইত্যাদি | রাভা++ মেচ+ হাজং++ চাক্মা++ মগ+ ইত্যাদি | ভুটিয়া, তিব্বতি মগ, চাক্মা, লেপ্চা, ডুক্পা ইত্যাদি | ভুটিয়া, ডুক্পা, রাভা, মেচ গারো, লেপচা | সুদূর অতীতে কিছু মেচ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবার তাঁদের মধ্যে সামান্য একটা অংশ ব্রাহ্মধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। |
| দ্রাবিড় / অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী | ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, মালপাহাড়ি পারহাইয়া, নাগেশিয়া, | ওঁরাও+ মুন্ডা+ সাঁওতাল+ নাগেশিয়া, মাহালি কোরা / কোড়া, মালপাহাড়ি+ ইত্যাদি | | ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি, | এসব জনজাতি দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি পূজায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাঁদা তুলে পূজো করতেও দেখা যায়। |

দ্রি.দ্র : + আংশিকভাবে প্রভাবিত। ++ বিশেষভাবে প্রভাবিত। যাঁদের নামের পরে কোনো চিহ্ন নেই তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঐ ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে অভিযোজন করেছেন।

উৎস : ক্ষেত্র সমীক্ষা। 'উত্তর বঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ' ড. নির্মল কুমার দাস। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নির্দেশিকা : অমল দাশ ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সমতলে বসবাসকারী এসব জনজাতির অধিকাংশই তাঁদের চিরাচরিত 'প্রকৃতিবাদী' (anism) ধর্মমতে এখনো বিশ্বাসী। মগ এবং চাক্‌মা জনজাতির বেশির ভাগ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। আর বাকিরা এখনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। মেচদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের একটা ক্ষীণধারাও বর্তমান। আবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকায় সাধারণ গ্রামে বসবাসকারী রাভাদের অধিকাংশই এক সময় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে দাশ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এসম্পর্কে প্রয়াত রাভা স্বাধীনতাসংগ্রামী ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ দেবেন দাশ রাভার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। নকশাল বাড়ি অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে বসবাসকারী বেশ কিছু সাঁওতাল জনজাতির মানুষ জীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে একজন বৈষ্ণব গুরুর কাছে হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা তাঁদের সাঁওতাল উপাধির (টুডু, মার্ডি, হেমব্রম ইত্যাদি) পরিবর্তে গুরুর নির্দেশে বিশ্বকর্মকার লিখতে থাকেন। এর ফলে ঐ জনজাতির মানুষেরা স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পরও কোনো সরকারি সাহায্য পান নি। এখন তাঁরা আবার নিজেদের সাবেক জাতিগত পরিচিতি ফিরে পাওয়ায় জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের বনবাসী রাভারা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপনের জন্য এতদিন নিজেদের চিরায়ত ধর্মমত ও লোকসংস্কৃতির ধারা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু গত চার পাঁচ বছরে নাগাল্যান্ডের একটি মিশন তাঁদের প্রায় সবকটি বনবস্তির মানুষকেই খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষাপ্রদান করতে সমর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের সকলপ্রকার লোকসংস্কৃতির চর্চাও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। ফলে তাঁদের লোকসংস্কৃতির ধারা অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী মেচ, রাভা, গারো, হাজং, চাকমা ও মগ প্রভৃতি জনজাতি বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করছেন এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতৎপরতায় বাংলা ভাষা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে এসব জনজাতি বাংলাভাষার প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। এর ফলে রাজ্যের শিক্ষাসংস্কৃতির মূলস্রোতের সঙ্গে এঁদের মিলন প্রক্রিয়া আরো দ্রুততর হচ্ছে।

[ *সারণি-৪* ] উত্তরবঙ্গের প্রধান জনজাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও ভাষা গ্রহণ প্রবণতা। (১৯৯৯)

| জনজাতির নাম | নিজস্ব ভাষা (মাতৃভাষা) | বাংলা | মাদ্‌রি | নেপালি | হিন্দী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভুটিয়া / ডুক্‌পা | ভুটিয়া | + | | + + | | দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস-কারী জনজাতি গোষ্ঠী নেপালি ভাষা। |
| লেপ্‌চা | লেপ্‌চা | — | | + + | | |
| শেরপা | শেরপা | — | | + + | | |
| লিম্বু | লিম্বু | — | | + + | | |
| টোটো | টোটো | + | | | | |

| জনজাতির নাম | নিজস্ব ভাষা (মাতৃভাষা) | বাংলা | মাদ্‌রি | নেপালি | হিন্দী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মেচ | বোড়ো / বোডো | + + | | | | আর সমতলে বসবাসকারী অন্য সব জনজাতি বাংলা ভাষাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন। |
| রাভা | রাভা | + + | | | | |
| গারো | গারো | + + | | | | |
| চাক্‌মা (ভোট-চীন) | চাকমা | + + | | | | |
| হাজং | বাংলা | + + | | | | |
| মগ্ | বাংলা | + + | | | | |
| মুন্ডা | মুন্ডারি | + | + + | | + | এঁরা সকলেই বর্তমানে বাংলা ভাষা বলতে পারেন। একটা অংশ বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনো কর-ছেন। |
| সাঁওতাল | সাঁওতালি | + | + + | | + | |
| নাগেসিয়া | সাদরি | + | + + | | + | |
| মাহালি | মুন্ডারি | + | + + | | + | |
| কোরা / কোড়া (অস্ট্রিক) | মুন্ডারি | + | + + | | + | |
| ওঁরাও | কুরুখ | + | + + | | + | — ঐ — |
| মালপাহাড়িয়া (দ্রাবিড়) | মাল্‌ডো | + + | + | | | |

+ শিক্ষার প্রয়োজনে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করেছেন। + + প্রায় মাতৃভাষার মতো দ্বিতীয় ভাষা।
উৎস : ক্ষেত্রসমীক্ষা। 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ' ড. নির্মল দাস। 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নির্দেশিকা' : অমলকুমার দাস ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মেচ (বোড়ো) সম্প্রদায় একদিকে যেমন নিজেদের চিরায়ত কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যদিকে তেমনি রাজ্যের প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অসাধারণ আত্মজাতিস্বীকৃতিমূলক চেতনাই অন্যান্য প্রতিবেশী জনজাতির তুলনায় তাঁদের স্বাতন্ত্র্যদান করেছে এবং সমাজের ও দেশের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যান্য প্রতিবেশী জনজাতির তুলনায় মেচদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। ফলে জনপ্রতিনিধিত্ব থেকে প্রশাসনের নানাস্তরে তাঁরা অংশ গ্রহণ করে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে রাভা, গাভো, ধীমাল, ধারু প্রভৃতি জনজাতি পিছিয়ে

রয়েছেন। এর মধ্যে বনবস্তিবাসী রাভারা শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছেন। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার বনবস্তি এবং চা বাগান অঞ্চলে পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা প্রসারিত করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এসব অঞ্চলে বনবাসী জনজাতির মানুষেরা দ্রুত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সুযোগ পাবেন বলে আশা করা যায়।

পোষাক আসাকের ক্ষেত্রে এসব জনজাতির অধিকাংশ পুরুষই সাধারণভাবে দেশের মূলধারাকে অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু মেচ, রাভা, ধীমান প্রভৃতি জনজাতির মহিলারা এখনো নিজেদের চিরায়ত জাতিগত পরিচয়বহ পোষাক পরতেই বেশি ভালোবাসেন। রাভা এবং ধীমানদের মধ্যে মহিলারা এখনো নিজেদের তাঁতে পোষাক বুনে থাকেন। বর্তমানে সরকার থেকে বিভিন্ন স্ব-উপার্জনমূলক প্রকল্প রূপায়ণের ফলে এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তর বাংলার স্থানীয় জনজাতির আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। অন্যদিকে তাঁদের সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাঁরা সকলেই এখন পেশাগত পরিবর্তনে প্রয়াসী। অথচ সেদিক থেকে দেশের সর্বত্র একই ধরনের সমস্যা বর্তমান।

*(গ) বহিরাগত জনজাতি*

উত্তরবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় এবং সমতলে অবস্থিত কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় প্রধানত দুধরনের জীবিকার সূত্রে বহিরাগত জনজাতি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বহিরাগত জনজাতি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে চাবাগান পত্তনের সূত্রে। তার বাদবাকি সমতলের জেলাগুলিতে বহিরাগত জনজাতির আগমন ঘটেছে প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকা ও বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কান্ডের অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে ব্রিটিশশাসন সম্প্রসারণের পর 1855 খ্রিষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ, 1857 খ্রিষ্টাব্দে মুন্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি একের পর এক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ অঞ্চলের জনজাতির মানুষদের ওপর ব্রিটিশের অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। বেড়ে যায় প্রশাসনের সহযোগী নানা ধরনের শোষণ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঐসব অঞ্চলের ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতি সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নতুন মাটি, নতুন জীবিকার সন্ধানে। তাঁদেরই একটি জনস্রোত এলেন গঙ্গা পেরিয়ে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার কৃষিবলয়ে। পরে দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে এ বাংলায় বসতি স্থাপন করলেন। তারা এখন এ বাংলারই মানুষ।

এভাবে উত্তর বাংলার কৃষিবলয়ে বসবাসকারী সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া, পারহাইয়া, খেড়িয়া প্রভৃতি জনজাতি এখনো অনেকাংশে তাঁদের প্রব্রজনপূর্ব বাসভূমির মতো সমাজসংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখতে পেয়েছেন। মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জনজাতি তাঁদের প্রাচীন গ্রাম-শাসন সংগঠন (Village-Organisation) বজায় রাখতে পেরেছেন। আধুনিক গ্রামপঞ্চায়েত ব্যবস্থার পাশাপাশি এধরনের গ্রাম-সংগঠন নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে এবং সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অথচ পাশাপাশি বসবাসকারী উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জনজাতিরা (মেচ, রাভা, গারো, লেপচা, ভুটিয়া, ধীমাল ইত্যাদি) তাঁদের চিরায়ত গ্রামসংগঠনের কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলেছেন।

কৃষিবলয়ে বসবাসকারী এসব বহিরাগত জনজাতিগোষ্ঠী ছোটোচাষী, আধিয়ার বা ক্ষেতমজুর হিসেবে কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কৃষিকাজের পাশাপাশি পরিবারের চাহিদা পুরণের জন্য চাষের মরসুম ছাড়া অন্যান্য অবসর সময়ে তাঁরা মরসুমী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকেন। ফলে জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে চা উৎপাদক বলয়ে বসবাসকারী তাঁদের জনগোষ্ঠীর অন্য অংশের সঙ্গে পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। কৃষি বলয়ে বসবাসকারী এসব জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির উপাদান প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক। কিন্তু চা বাগানে বসবাসকারী জনজাতি তাঁদের জীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লোকসংস্কৃতির একটি ধারাকে বিস্তৃত করেছেন! কৃষিবলয়ে বসবাসকারী জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা বহুজাতিক গ্রামে (Multi-ethnic Village) বসবাস করেন লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজনিত (interaction) আদান প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হচ্ছেন। অন্যদিকে যাঁরা এককভাবে একটি গ্রামে বসবাস করেন তাঁরা তাঁদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও চিরায়ত কুসংস্কার থেকে কোনোভাবেই যেন মুক্ত হতে পারছেন না। এদিক থেকে কৃষিবলয় এবং চা-বলয়ে বসবাসকারী সকলেই যেন একই মানসিক অনগ্রসরতার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই এখনো উভয় এলাকায় বসবাসকারী অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'ডাইনি' অপবাদে হত্যার মতো কুসংস্কারের অন্ধকার চেপে বসে আছে।

তবে বর্তমানে সরকারিভাবে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষাসংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটছে। যার ফলে নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করছেন।

*চা-বলয়ে বসবাসকারী বহিরাগত জনজাতি ঃ*

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় পার্বত্য অঞ্চলে চা-চাষের উপযুক্ত সমস্ত জমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর 1862 সালে ঐ জেলার তরাই অঞ্চলে এবং 1874 সালে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-বাগান পত্তনের সূত্রপাত ঘটে। ফলে জনবিরল এই অঞ্চলে প্রথম দিকে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মতো নেপাল থেকে শ্রমিক নিয়ে আসা হয় এবং তাঁদের সাহায্যে বনজঙ্গল হাসিল করে বন্যজন্তু জানোয়ার তাড়িয়ে চা বাগান পত্তনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তরাই ও ডুয়ার্সের উষ্ণ, আর্দ্র, বৃষ্টিবহুল, সেঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় নেপালি শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সমস্যা সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিল। এই আবহাওয়া তাঁদের কাজের অগ্রগতির পক্ষেও অনুকূল ছিল না। তখন এই অঞ্চলের চা-কররা আসামের অনুসরণে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকা থেকে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মানুষদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। এসব মানুষেরা যেহেতু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে (টিপ সই দিয়ে) চা বাগানে কাজ করতে এসেছিলেন তাই তাদের বলা হত 'গিরমিটিয়া' (Agreement > গিরমেনটিয়া > গিরমিটিয়া)। আবার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী শ্রমিকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর এই শ্রমিকদের বলতেন 'মদেশিয়া' (ম দেশ কো মানসী = সমতলের মানুষ)। এভাবে দার্জিলিং জেলার তরাই এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চা-বলয়ে চাশ্রমিক হিসেবে বিপুল সংখ্যক জনজাতির মানুষের আগমন ঘটল। যেসব জনজাতি তখন এসব চা বাগানে এসে চিরকালের মতো এখানকার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে থেকে গেলেন তাঁরা হচ্ছেন — ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া / খড়িয়া (লোধা), অসুর, মাহালি, ভূমিজ, মাহলি, কোরা / কোড়া, নাগেসিয়া, শবর, মালপাহাড়িয়া, পারহাইয়া, হো, বীরহড় ইত্যাদি। তাঁরা ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনার অরণ্য পরিবেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে চা-বাগান পত্তন পর্বের তরাই ডুয়ার্সে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে উপস্থিত হলেন, সেখানকার অরণ্য পরিবেশ তাঁদের মানসিকতায় দ্বিতীয় জন্মভূমি হিসেবে স্থিতি লাভ করল। এই একই মানসিকতায় তাড়িত হয়ে এঁদের একটা অংশ চা বাগান এলাকার বাইরে 'রেভিনিউ ভিলেজে' জোতজমি ক্রয় করে জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। চাষবাসই এখন তাঁদের জীবিকা।

উত্তর বাঙলায় অভিবাসনের আগে এসব জনজাতির সমাজবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। প্রত্যেকটি জনজাতির গ্রামসমাজ নিয়ন্ত্রিত হত তাঁদের চিরায়ত 'গ্রামসংগঠনের' অনুশাসন অনুসারে। মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি-বলয়ে বসবাসকারী সাঁওতাল,

মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতির মধ্যে এধরণের 'গ্রামসংগঠন' এখনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এদিকে থেকে চা-বলয়ে বসবাসকারী জনজাতির মানুষদের সঙ্গে কৃষিবলয়ে বসবাসকারী একই জনজাতির মানুষদের পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। চা-বাগানের পত্তন পর্বে যেসব জনজাতির মানুষ যোগদান করেছিলেন, তাঁদের জীবন ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মতো। এঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন ছিল না, সামাজিক স্বাধীনতাও তেমনি বিঘ্নিত হয়েছিল। তবে তখন এক একটি বিশিষ্ট শ্রমিক বস্তি এলাকায় বসবাস করতেন। চা বাগানের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সর্দারের হুকুম পালন করা ছিল তাঁদের জীবনের অবশ্যকরণীয়। সমবেত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, নাচ, গান ইত্যাদি নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কী, অন্য জনগোষ্ঠীর ছোঁয়া জলপান করাও নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের পোষাক আসাক অলংকার সবই ছিল প্রথানুসারী এবং সেকেলে। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এসব জনজাতি ছিলেন প্রকৃতিবাদী (Animist)। তাঁদের পুজাপার্বন ও নাচ গান ছিল মূলত কৃষি এবং শিকার কেন্দ্রিক। কিন্তু চা-বাগানে আসার পর প্রথম দিকে শিকার করার সুযোগ থাকলেও কৃষির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায় এসব কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব বাস্তবে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে ফাগুয়া, দশেরা, জিতিয়া, করম, সোহোরাই ইত্যাদি কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া আর সব অনুষ্ঠানের কথা তাঁদের জীবনে ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

চা বাগান কর্তৃপক্ষের কঠোর অনুশাসনে বসবাসকারী এসব দ্রাবিড় অস্ট্রিক জনজাতির জীবনটাও যেন কতটা চা-গাছের মতো হয়ে পড়েছিল। চা-গাছের উদ্ভিদজীবনে যেমন 'চলন' আছে 'গমন' নেই, চা-শ্রমিকদের জীবনেও স্বাধীনভাবে 'গমনের' কোনো অবকাশ ছিল না। চা-বাগানের বাইরের, এমন কী চা-বাগানে বাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁদের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধা ছিল। সাপ্তাহিক হাটের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। আসলে সর্বতোভাবে চা-শ্রমিকদের বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল — যাতে তাঁদের মধ্যে কোনো ভাবে চেতনার আলো প্রবেশ করতে না পারে। তাঁদের দারিদ্রকে জিইয়ে রাখার জন্য মদ্যপানে উৎসাহ প্রদান করা হত। আবার মজুরি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। 1883 সালে একজন চটকল মজুরের মাসিক আয় ছিল যেখানে 13 টাকা 12 আনা, সেখানে ডুয়ার্সের একজন চা-শ্রমিকের মাসিক আয় ছিল মাত্র 3 টাকা। এ থেকেই অনুমান করা যায় তাঁদের অবস্থা কেমন দুর্বিষহ ছিল। চা বাগানে তখন উন্নত বাসগৃহ, পানীয় জল এবং চিকিৎসা পরিষেবার কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিল না। ফলে রোগ ব্যাধি এবং মৃত্যু ছিল নিত্যসঙ্গী। আর নানা ধরনের রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হত

লোকচিকিৎসা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'যানগুরুর' ওপর। এ ধরনের অজ্ঞতায় 'ডাইনি' সন্দেহে চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনাও বিরল ছিল না। চা-বাগান এলাকায় প্রগতিশীল শ্রমিক-সংগঠন (Trade Union) স্থাপিত হওয়ায় আগে পর্যন্ত চা-বাগানের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা 1946-47 সালে 'তেভাগা' আন্দোলনের আগে চা বাগানে কোনো অজ্ঞাত কারণে কোনো ধরনের প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনও গড়ে ওঠেনি। উত্তর-বঙ্গের চা-বলয়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ার কাজে 'তেভাগা আন্দোলনের' ফলশ্রুতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কৃষকদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে জনজাতি-চাষী এবং প্রতিবেশী চা-শ্রমিকরাও তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে দুদফায় পুলিশের গুলি চালনায় এক মাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই অন্তত 12 জন জনজাতির কৃষক ও শ্রমিক শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁদের এই বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই দোমোহনীর রেলের শ্রমিকদের মাধ্যমে জনজাতি চা-শ্রমিকদের সঙ্গে 'লালঝান্ডা' আন্দোলন এবং প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠনের 'সেতু' রচিত হয়। তারপরই গঠিত হয় তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-শ্রমিক সংগঠন। এই দোমোহনী রেল কর্মচারী কেন্দ্র থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু প্রথম বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

এর ফলে, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে জনজাতি চা-শ্রমিকদের জীবনে 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' ঘটে, আসে পরিবর্তনের জোয়ার। আওয়াজ ওঠে চা-শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি হারের, আবাসন, পানীয়জল, চিকিৎসা পরিষেবার। এরপর 1951 সালে গৃহীত হয়

[ *সারণি-৫* ] উত্তরবঙ্গের নথিভুক্ত চাবাগান ও চা শ্রমিকের সংখ্যা (১৯৯১)

| এলাকার নাম | চা বাগানের সংখ্যা | আবাদি এলাকা (হেক্টর) | বাৎসরিক মোট উৎপাদন (হাজার কেজি) | শ্রমিক সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| দার্জিলিং | 102 | 20,085 | 16,214 | 47,637 |
| তরাই (ক) | 82 | 13,783 | 25,059 | 40,539 |
| ডুয়ার্স (খ) | 163 | 68,054 | 1,17,893 | 1,64,944 |
| | 347 | 1,01,922 | 1,59,166 | 2,53,120 |

(ক) পশ্চিম দিনাজপুরসহ (খ) কোচবিহারসহ।

উৎস : 'Tea Statistics' — 1990-91, TEA BOARD, CALCUTTA.

কেন্দ্রীয় সরকারের 'Plantation Labour Act of 1951 এবং 1956 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধিবদ্ধ করা হয় 'Plantation Labour Rules'। এর ফলে চা শ্রমিকরা, বাসগৃহ (পাকা), পানীয় জল, জ্বালানি, চিকিৎসা, প্রসূতিভাতা এবং আট ঘন্টা কাজের অধিকার লাভ করে।

এরপর আইন অনুসারে চা শ্রমিকদের জন্য তৈরি হতে থাকে পাকা আবাস। আর এসব পাকা আবাসে বসবাস করার তাগিদে প্রচলিত প্রাচীন একক জনজাতির বস্তি লাইন (Mono-ethnic Labour Lines) ছেড়ে মিলে মিশে নানা জাতির শ্রমিক একই পাকা বস্তিতে বসবাস শুরু করেন। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এক সঙ্গে বসবাসের ফলে নিজ নিজ জাতির পৃথক অস্তিত্ব এবং রক্ষণশীল মনোভাব অনেকটা শিথিল হল। এমন কি অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহের ক্ষেত্রে উদার মানসিকতার বিকাশ ঘটল। আবার সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের তৎপরতার ফলে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতিগত সংকীর্ণতাবোধের পরিবর্তে সবকটি জনজাতিকে নিয়ে উদ্ভব হল এক মিশ্রসংস্কৃতির। আর সবকটি জনজাতির সংস্কৃতির বাহন হিসেবে এবং দৈনন্দিন আদানপ্রদানের ভাষা হিসেবে 'সাদরি ভাষা' সার্বজনীন ভাষার স্বীকৃতি পেল। বর্তমানে এই ভাষায় তাঁরা আধুনিক সাহিত্য চর্চা, গান, নাটক ইত্যাদি রচনা করছেন। এমন কী, বেশ কয়েকটি টেলিভিশন উপযোগী চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন (সাঁঝ-বিহান, প্যায়ারকে ডহন ইত্যাদি)। গত কয়েক দশকে রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো চা-বাগান এলাকাতেও রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করায় শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে নতুন করে শিক্ষার জোয়ার এসেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে ভাষা। তাঁদের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জনজাতির মানুষদের সর্বজনগৃহীত ভাষা 'সাদরি' (বাংলা, ভোজপুরী-মুন্ডারী মেশানো ভাষা) বা রাজ্যের প্রধান ও প্রভাবশালী ভাষা 'বাংলার' পরিবর্তে হিন্দিতে তাঁদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে তাঁরা প্রার্থিত ফল পাচ্ছেন না। অথচ রাজ্যের কৃষিবলয়ে একই জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নত করেছেন এবং জীবিকার ক্ষেত্রেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সমাজের মূলস্রোতের (Mainstream) সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। এ সমস্যা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ্‌দের, বিশেষ করে এসব জনজাতির বুদ্ধিজীবীদের বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে হয় তবে সে ক্ষেত্রে রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করলে তাঁদের সাংস্কৃতিক ও জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিতই হবে। আর তা না করলে তৈরি হবে বাধার প্রাচীর।

বর্তমানে রাজ্য সরকার কৃষি বলয়ের মতো বনবস্তি এবং চা-বলয়েও পঞ্চায়েতের কাজ প্রসারিত করেছেন। ফলে চা বাগান এবং বনবস্তি এলাকাতেও সরকারি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রসারিত হওয়ায় সুযোগ এসেছে। চা বাগান ও বনবস্তি পঞ্চায়েতের আওতায় আনার আগে এ সুযোগ ছিল না। গত কয়েক দশকে রাজ্য সরকার সকল জনজাতির আর্থিক, সামাজিক ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, ফলে জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষ ইতিমধ্যে তার সুফল পেয়েছেন। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের চেতনার মানও ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরাও জাতিগত পরিচয় বা আত্মপরিচয়ের (Self identity র) নামে সংকীর্ণ বস্তির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আত্মবিকাশের অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছেন। উত্তরবাংলার জনজাতি সম্প্রদায়ও এ ধরনের উন্নয়নমুখী পদক্ষেপের অনুসারী।

*গ্রন্থপঞ্জী*

1. Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal, 1877 (Rpt. 1984).

2. Sunder, D. H. E. Report on the Western Duars In the Jalpaiguri District, Cal. 1895.

3. O'Malley L.S.S. Bengal District Gazetters, Darjeeling, 1907 (Rpt. 1989).

4. Dutta Gupta, J. Census of India, Vol. XVI, West Bengal & Sikkim, Part-V, A(II), Table on Scheduled Tribes, 1967.

5. Census of India 1971, Series 22.

6. Census of India, 1981, Series 23.

7. Census 1981.

8. Das & Saha, " " Special Series. 22 Cultural Research Institute, Calcutta, 1989.

9. Roy Das & Basu. To be with Santals, Sepcial Series : 28, C.R.I. 1982.

10. De. B. Edt.. West Bengal District Gaztteers, Jalpaiguri, 1981.

11. Majumdar, B. The Totos, (Cultural and Economic Transformation). Calcutta, 1998.

12. Majumdar, B. Impact of Cinema on the Tribal culture, In Folklore, Vol. 24. No. 7, July, 1983, Calcutta.

13. Centenary Souvenir of the Duars Branch Indian Tea Association (1878-1978).

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার "ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা" লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী ১৯৪৯।

১৫. ঘোষ, ব্রজগোপাল (সম্পা.) 'সংহতি'- ওয়েস্ট বেঙ্গল টি এমপ্লয়জ এ্যাসোসিয়েসনের স্মারক গ্রন্থ 1995.

১৬. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা) 'মধুপর্ণী' — ১. মালদহ (১৯৮৫), ২. জলপাইগুড়ি (১৯৮৭), ৩. কোচবিহার (১৯৯০) ৪. দার্জিলিং (১৯৯৬), বিশেষ জেলা সংখ্যা এবং 'মধুপর্ণী' ৫. পশ্চিম দিনাজপুর বিশেষ জেলা সংখ্যা। 'মধুপর্ণী' উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৭।

১৭. ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল সাদরীর রূপরেখা, কলকাতা, ১৯৭৮।

১৮. দাস, নির্মল 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ)।

১৯. বিশ্বাস. অচিন্ত্য ও চক্রবর্তী, সব্যসাচী 'প্রসঙ্গ জনজাতি', বিশ্বকোষ পরিষদ, ১৯৯৫।

২০. মজুমদার, বিমলেন্দু 'আদিবাসী প্রতিবেশী' কলকাতা ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ)।

২১. সান্যাল, চারুচন্দ্র ও অন্যান্য জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। (১৮৬৯-১৯৬৮)।

২২. চক্রবর্তী, চন্দনকুমার ও প্রধান, সুধী লোকশ্রুতি-৯, কলকাতা, (চা বাগিচা শ্রমিক লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা) ১৯৯২।

# সুধী প্রধানের কিছু অগ্রন্থিত লেখা

# এই কলিকাতা ! ইহাকে বাঁচাও

সুধী প্রধান

"রাত্রে খাওয়া হবে না— কয়লা নেই" পাচক এসে জানিয়ে গেল। অগত্যা কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য ও আমি অন্যত্র খাওয়া সেরে নেব স্থির করে বার হলাম। কথা ছিল : সকালে সোমনাথের সঙ্গে "আজকের কলিকাতার" কিছু ছবি জনযুদ্ধের জন্য তুলতে যাব। কাজেই রাত্রি তাঁর কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বার হলাম।

ছবি রোজ রোজ দৈনিক সংবাদপত্রে যে রকম বার হচ্ছে আমরা তা তুলতে পারি না। দামী ক্যামেরা, অভ্যস্ত ফটোগ্রাফার ও অর্থের অভাব তার প্রধান কারণ। তাই ছবির বদলে যা দেখেছি তাই কিছু বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা কি সম্ভব? মানুষের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটা করে কান্না অসম্ভব, চেতনা অবশ হয়ে আসতে চায়, রক্তে অতি-মানবীয় শক্তির জন্য চাঞ্চল্য সুরু হয়। মনে হয় : যদি একটা যাদুকর হতে পারতাম — তা হলে এক নিমেষেই — হ্যাঁ এক নিমেষেই ......

সাম্রাজ্যবাদের গর্ব্ব - কলিকাতা তাদের দ্বিতীয় নগরী, দুয়োরাণী। কিন্তু হলে কি হবে? জরাগ্রস্ত আধিপত্যের শিথিল মুষ্টি হতে যখন রাজমহলের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই যায়গায় থাকে কেবল বন্য প্রবৃত্তি : পরিকল্পনাহীন, অসংলগ্ন, কার্য্যতঃ এ আত্মহত্যারই নামান্তর।

কিন্তু আমাদের মনে এই কলিকাতার অন্যরূপ। অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, ঠেসাঠেসি বাড়ী, বড় বাজারের ঘিঞ্জি গলি - এসব তো আছেই। কিন্তু আলোর দিকও তো আছে এখানে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নানাবিধ ঐশ্বর্য্যমন্ডিত স্মৃতি যে এর গলিতে গলিতে, পার্কে পার্কে। এই তো সেদিন : কংগ্রেস মন্ত্রীগ্রহণের পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ আই. সি. সির বৈঠকে, সেই উপলক্ষে দেশবন্ধু পার্কে বিরাট জনসমাবেশ, কলিকাতা ও শহরতলীর শ্রমীকশ্রেণীর সেই সুশৃঙ্খল সামরিক সমাবেশ কি কখনও ভোলা যায়? তার আরও কিছুদিন আগে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস। পার্কে পার্কে শত শত যুবক সামরিক পরিচ্ছেদে কংগ্রেস পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ শিখছে, কখনো রাস্তায় সামরিক বাদ্যের সঙ্গে আগে পিছু ঘোড়সোয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে চলছে, তাদের মুখে দীপ্তি, চোখে ঔজ্বল্য, পদক্ষেপে স্বাধীনতার দৃঢ় সংকল্প। সে কলিকাতা না বিপ্লবমুখর পেট্রোগ্রাদ? অনেক পার্থক্য - তবু মনে পড়ে : ট্রেন থেকে নেমে লেনিন আর্মার্ডকারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সঙ্গে বিরাট শোভাযাত্রা, তেমনি কংগ্রেস সভাপতি মতিলালকে হাওড়া স্টেশন থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে .......

কমরেড লাহিড়ী বল্লেন : "এই যে এই মৃতদেহের ছবিটা তোল", শিয়ালদা ষ্টেশনে যাত্রী বার হবার পথের পাশে সার্কুলার রোডের উপর পড়ে আছে একটি মৃত যুবকের দেহ। গায়ের জামাকাপড় শারীরিক লক্ষণ দেখে মনে হয় না লোকটী পেশাদার ভিখারী। দূরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে দুটো অনাহারক্লিষ্ট বুড়োবুড়ি। প্রশ্ন করতে সাহস হল না। সার্কুলার রোড ও বৌবাজারের দুই ধারে অসংখ্য ক্ষুধার্ত নরনারী শিশু ছোট ছোট দলে বসে আছে — আশে পাশে শেল্টারগুলি থেকে ময়লা দুর্গন্ধে রাস্তা চলা দায় — তবু অনাহার আজ সেখানে জয়ী। তারই একটু দূরে পথচারী পরিবার কয়েকখানি ইঁটের উপর হাঁড়ি বসিয়ে রান্নার চেষ্টা করছে।

*এরা কারা?*

প্রশ্ন করে জানা গেল এদের অধিকাংশই স্বল্প জমিওয়ালা, বা জমিহীন কৃষক পরিবার। কলিকাতার আশে পাশের জেলায় ক্ষেত মজুরী করে এদের দিন চলতো। কিন্তু এখনো ফসল উঠেনি, ক্ষেতে কাজ নেই, জিনিষের দাম অস্বাভাবিক — তাই এই অবস্থা। এমনি একটা পরিবারকে প্রশ্ন করলাম: "তোমার ঘর-বাড়ী আছে?" "হ্যাঁ বাবু"। "কতদিন এসেছ?" "মাস দুয়েক।" যদিও জানি হাজার হাজার লোক ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায় তবু প্রশ্ন করলাম: "রাতে কি বাড়ীতে ফিরে যাও?" "না আমরা জনা এগারো মিলে বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করেছিলাম। তিন টাকা ভাড়া নিত। কিন্তু আজকাল ভিখারীর সংখ্যা এত বেড়েছে যে ভাড়ার টাকা তুলতে পারিনা। তাই কাল রাত থেকে বস্তির মালিক আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।".......

কিছুদিনও আগে এই সব পরিবারের পুরুষেরা পরের ক্ষেতে খামারে খেটেছে, মেয়েরা ধান কুটে, চিড়ে মুড়ি ভেজে, বড়ি তৈরী করে এবং গ্রামের পুকুরের কলমি শাক, মাঠের নটে শাক তুলে বাজারে বিক্রী করে সংসার চালিয়েছে। কোনরকমে দুটি শাক ভাত, আধ পেটা, সিকি পেটা খেয়ে চালিয়েছে। কিন্তু এখন আর চলে না। স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের গৌরব নিয়ে বসে থাকা সামান্য কিছুদিন হয়তো চলে — কিন্তু নিরন্তর ক্ষুধা, চোখের সামনে ছোট ছোট শিশুর আর্তনাদ, তিলে তিলে কঙ্কালসার হয়ে মরা, মরতে দেখা চলে না। ভিক্ষা কি মানুষে সহজে নেয়? বন্যা ও দুর্ভিক্ষে সাহায্য নিয়ে কতবার তো কত গ্রামে গিয়েছি। দিনের পর দিন উপবাসে ক্ষিন্ন হয়ে গেছে — তবু একদিন যারা খেটে খেতে পারতো, গ্রামের লোক যাদের স্বচ্ছল পরিবার বলে মনে করতো — কিছুতেই তারা সাহায্যকেন্দ্রের কাছে আসতে পারছে না এমন নজির কত দেখেছি। আজ তাদেরই দল হাজারে হাজারে কলিকাতার চারিপাশে, গ্রামের ভূমিহীন, অল্প জমিওয়ালা, বন্যাপীড়িত কৃষক পরিবার, যাদের পরিশ্রমে সোনার বাংলার ক্ষেতে মাঠে সোনা ফলে। হোক না বন্যা, হোক না খরতাপ — তবু যাদের রক্তাক্ত পরিশ্রমে এবারও কত লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে অশ্রান্ত সবুজের, সবুজ প্রবাহ বয়ে গেছে .........

*লাইনে*

"এই যে, ও দিকে দেখ, একটা মেয়ে অপেক্ষা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে", হয়তো মরেও যেতে পারে। রাস্তায় আর একটি বুভুক্ষু তার এলুমিনিয়ামের ভাঙ্গা থালা দিয়ে বাতাস করতে গেল, একজন মাথায় জল দিতে লাগল। কে একজন ভাতের ফেন জোগাড় করেছিল তাই তার মুখে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। শুধু তো আর দিনের পর দিন অপেক্ষা নয় দীর্ঘ অনাহারের দুর্বলতা। এক চুমুক খেলে একরত্তি জীবনের শক্তি নেবে — তাই নিয়ে আবার সে হয়তো লড়বে। নিশ্চয় লড়বে, যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ জীবনের এই "সংগ্রাম" চলবে। একি মানুষের আবাসভূমি না জঙ্গল? বাঘ সিংহের সঙ্গে, প্রকৃতির উদ্দাম শক্তির সঙ্গে এ লড়াই তো নয়? তবে এ কার সঙ্গে কার লড়াই? একজন চাল নিয়ে বার হচ্ছে দেখে তাকে প্রশ্ন করলাম। আমাদের ক্যামেরা দেখে সে আন্দাজ করলো আমরা কাগজের লোক। তাই সে চলতে চলতে বল্লে : রাস্তায় রাস্তায় চসমা ফিরি করে খাই। কিন্তু আমার মতো দোকানদারের কাজ থেকে যারা কেনে তারা তো গ্রামের স্বচ্ছল কৃষক বা কারখানার মজুর। তা তাদের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। বাড়ীতে ৪/৫ জন পুষ্যি — কোন রকমে দুটো শাক সিদ্ধ। শাক না তো গাছ গাছড়ার ডাল পাতা। গত কয়েক সপ্তাহ মাছ চোখেও দেখতে পাইনি। মাছ মানে ক্ষুধে চিংড়ি মাছ।

*ডাস্টবিনে*

চিংড়ি মাছ? কিন্তু ও কি! সামনের এ ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে কতগুলি বড় বড় হাড় নিয়ে টানাটানি করছে— একটি ক্ষুধার্ত বালক। দুটি হাড়ের সন্ধিস্থলে যে নরম হাড় থাকে তাই নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা এবং তারই পাশে দুটি কুকুর অন্য একটি হাড়ের রক্ত মাখা অংশ চাটছে। এমনি করে মানুষ পশুতে খাদ্য নিয়ে মারামারি, রাত্রিতে। শোয়ার যায়গা গিয়ে মারামারি। কিন্তু সংখ্যায় আজ শেয়াল কুকুর থেকে ক্ষুধার্ত নরনারী কলকাতায় অনেক বেশী। তা'ছাড়া চাউলের দোকানের অর্থ পশুর কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই দোকানের সামনে যখন অগণিত নরনারী সারি সারি শুয়ে রাত্রি কাটায়, ব্যাফ্‌ল ওয়ালের মাছে মল মূত্রে ভরিয়ে তোলে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদে, কলেরায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, অজ্ঞান হয়, মরে, তখন বুঝি অবুঝ পশুর কাছেও সে স্থান অপ্রীতিকর হয়ে পড়ে। "আরে কি যে ভাবছ, দেখ না?" বৌবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ফুটপাতের কাছে একটা ৯/১০ বছরের মেয়ে শুয়েছিল, মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে তবু ডানহাতটি শেষবারের মত পথচারীদের উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়ে ঢলে পড়ল — সমস্ত শরীরটা একবার কুঞ্চিত হয়ে উঠে রক্তহীন ঠোঁট দুটীর মধ্যে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

*"অন্ন দাও, প্রাণ দাও, রক্ষা কর"*

কলকাতার লোক এ ডাক শুনেছে। রাস্তায় চলি আর ভাবি। গত ডিসেম্বর মাসে যখন বোমা পড়ে তখন এই সঙ্কটের অত্যন্ত সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সঙ্কটে অবসন্ন, আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতায় ও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও দ্বিধাবিভক্ত জাতি কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায় সে দিন পরাধীনতার জ্বালার উপর এই নুতন দস্যুর আঘাতে জেগে উঠেছিল। জনরক্ষা ও আত্মরক্ষার নামে কলিকাতায় স্ত্রী পুরুষ এগিয়ে এসেছিল পাড়ায় পাড়ায়। তবু সেদিন ধনীরা, কংগ্রেস হিন্দুসভা বা লীগের নেতারা, যারা বিশেষ করে চেষ্টা করলে এ ক্ষতি এতোদূবে বৃদ্ধি পেতে নাও পারত তারা আশানুরূপ ভাবে একাজে এগিয়ে আসেনি। ঘরোয়া বৈঠক হয়েছে বার বার। আমাদের পার্টি বার বার চেষ্টা করেছে — কিন্তু কাজের কিছুই হয় নি। তবু এই দেশব্যাপী আত্মহত্যার পাশে আত্মরক্ষার প্রয়াস এই কলকাতাতেই সুরু হয়েছিল।..... কুমারটুলির বাজারের একপাশে শখানেক লোক পুরি তরকারী নিয়ে বসেছে। একজন খেয়ে উঠতে প্রশ্ন করলাম "কেমন খেলে?" " বেশ পেট ভরে খাওয়ায়।" একজন কর্মীকে প্রশ্ন করতে সে বল্লে: 'সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল না দেখে আমরা বাজারের থেকে তরকারি চাঁদা তুলি এবং তাই বিক্রয় করে এদের খাওয়াই। দুধওয়ালাদের বলেছি তারা এককাপ করে দুধ চাঁদা দিলে আমরা

কিছু শিশুদের দুধ দিতে পারবো। দুধওয়ালা রাজী হয়েছে। "বাঃ চমৎকার! তোমাদের মনে তা হলে ভরসা আছে? "নিশ্চয়, গত বোমার হাঙ্গামার পর এসব ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু তখন কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আর আজ দেখুন সবাই কিছু করতে চায়। এই উত্তর কলিকাতাতেই বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে গোপাল মিত্র গলিতে নতুন বাজার, হরিনাথ দে ষ্ট্রীটে এখন সব খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, দৈনিক ৩/৪ শ' লোক খাচ্ছে।" —জানুয়ারি মাসে কিছুই ছিল না আজ দৈনিক ৩/৪ শ' লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ঠিকই তো : এতে ভরসা আসবে না কেন?

" না আমরা খেতে যাব না" — কয়েকটি ছেলে কর্লিন্স ইনষ্টিটিউটের গেটের সামনে জটলা করছে। "কেন খেতে যাবে না ভাই?" "ওখানে খাওয়ার পর গায়ে সুঁই ফুটিয়ে দেয়।" আত্মরক্ষা সমিতির মেয়ে কর্মীরা ও কমিউনিষ্ট পার্টি ডাক্তাররা বেরিয়ে এলেন। ডাক্তাররা বোঝালেন যে এই ঔষধ ফুটিয়ে দিলে কলেরা হবে না, টাইফয়েড হবে না, বাবা মাকে ছেড়ে হাসপাতালে গিয়ে একা একা শুয়ে থাকতে হবে না। "একে তো খাওয়া জুটছে না - তাতে আবার অসুখ হলে কত কষ্ট হবে বলতো!" খোকারা চুপ করে ভাবে, ওরা যে সব বুড়ো মানুষের মতো চালাক হয়েছে। মেয়ে কর্মীরাও পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। আস্তে আস্তে ওরা খাওয়ার ঘরে ঢোকে। ডিক্সন লেনেও তাই। ক্যাম্বেল হাসপাতালের ডাক্তার ও ছাত্ররা ইনজেকশন দেবার জন্য প্রস্তুত। "এই সব ঔষধ কোথায় পেলে।" "কেন আমাদের সঙ্গে একটা ওষুধের কোম্পানীর চেনা ছিল তাই চেয়ে নিয়ে এসেছি। আর দেখুন যদি সব কোম্পানী এমনি কিছু করে ঔষুধ দেয় তো আমরা সব যায়গায় দিতে পারি।" "এত ডাক্তার আপনারা পাবেন কোথায়?" "ডাক্তারের অভাব? কলিকাতায় কতগুলি মেডিকেল কলেজ ও স্কুল রয়েছে না? তাদের ডাক্তার ও ছাত্র সবাই এসে এ কাজ করবে। দেশের নেতারা একবার ডাক দিয়ে দেখুন না?" সত্যিই তো অভাব কিসের? অভাব শুধু এক হয়ে ডাক দেবার। এ পাড়ার একজন জনরক্ষা কর্মী বল্লেন : পার্শিবাগান, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, উলিয়ামস লেন ও বেলিয়াঘাটাতে ফ্রি কিচেন হয়েছে। সেখানকার সমিতির পৃষ্ঠপোষক ১০০ টাকা দিয়েছেন এবং আর একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক ধনী মাসে ৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর একজন ভদ্রলোক তাঁর একটি দ্বিতল বাড়ীই তিনমাসের জন্য খাদ্য কেন্দ্রের কাজে দিয়েছেন।

এরপরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে — বিখ্যাত ধনী সুরুজমল নাগরমলের পরিচালনায় একটি খাদ্য কেন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলাম। লোকেরা পয়সা দিয়ে কুপন নিচ্ছে এবং খেতে পাচ্ছে। বহুবাজারে সেই কন্ট্রোলের দোকানের লাইনের সঙ্গে এখানকার লাইনে কতো

পার্থক্য — কেমন সুশৃঙ্খলে লাইনে দাড়িয়ে আছে। ভাল করে ব্যবস্থা করতে পারলে সব যায়গাতেই এমনি হওয়া সম্ভব। শুধু কি খাওয়ান সম্ভব, আরও অনেক কিছু সম্ভব। নতুবা যেমন দেখলাম বালীগঞ্জের ত্রিকোন পার্কে রোটারী ক্লাবের খাদ্য ব্যবস্থায় - তেমন হওয়া বিচিত্র নয়। হাজার হাজার স্ত্রী ও শিশু খেতে বসেছে। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না মায়েদের বিচলিত করেছে — এবং সেই কান্না সামলাতে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা লাঠি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন। কিন্তু কাকুলিয়া ও গরচা বস্তিতে অন্য দৃশ্য। গরচাতে ছেলে স্নান করে আসে, খেয়ে নেয়, তারপরে গান করে এবং কাকুলিয়াতে স্নান করে এসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করে, তারপর গান করে এবং খেতে বসে। ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় এবং মনে মনে জেগে থাকে জন্মভূমির মহিমা, ত্যাগের, শৌর্য্যের ও বীর্য্যের গান — দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রেরণা।

সবই করা যায় — সবই হয় — শুধু ..... 'শুধু কি?" প্রশ্ন করলাম - হিন্দুস্থান রোডের একটি জনরক্ষা স্কোয়াডকে।

তাঁরা বল্লেন যে মাত্র ঘন্টা দুই পাড়াতে ঘোরার পর ফলে ৩০০ টাকা চাঁদর প্ররিশ্রুতি পেয়েছেন, কলেজের ৩ জন ছাত্র ও দুটি চাকুরিয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রচারে। দেশসেবায় আনন্দ কার না হয় — তবু মানুষ একা একা বোধ করে — আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে চায়। প্রতাপাদিত্য রোডে জন দুই দেশপ্রেমিক নিজের চেষ্টায় দুধ বিতরণ কেন্দ্র খুলেছেন — এখন সেটা বেশ বড় হয়েছে। জনরক্ষার স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের সাহায্য করছিল। মানুষের সহজ শুভ বুদ্ধি আঁধারের মাঝে পথ খুঁজে পায়। তাই শুনতে পেলাম দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি কেন্দ্র মিলিত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করছে।

*সমস্ত কমিটি এক হও*

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, জনরক্ষা, আত্মরক্ষা — নিখিল ভারত মহিলা সঙ্ঘ এবং আরো অনেক সমিতি আজ ক্ষুধার্তদের সাহায্যের কাজে এগিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা অনেক বড়, দিন দিন কলিকাতায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে — ক্ষুধার্তদের সংখ্যাও বাড়ছে। শহরের মধ্যে ময়লা ও আবর্জ্জনায় শহরে স্বাস্থ্য বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যার মুখে গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রামে চড়ে ফিরছি আর বার বার মনে আসচে এই আশ্রয়হীন খাদ্যহীন নরনারীর অবস্থা। দুদিন বাদে বর্ষা শেষ হবে আকাশে চাঁদ উঠবে। আগের দিনে কলিকাতায় অগনিত নরনারী সন্ধ্যায় এই মাঠের সবুজ ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দুর করতো, গাছে ঘেরা এই মাঠে চন্দ্রালোকের বিচ্ছিন্ন সুষমায় জীবনের প্রতি নূতন

করে মুগ্ধ হত — হয় তো যে যার সুখে দুঃখে পৃথক ভাবে চিন্তা করতে পারতো — কিন্তু আজ অধিকাংশেরই এক চিন্তা। অন্ন চাই, আশ্রয় চাই - আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চাই। কে জানে হয়তো বর্ষাশেষের এই চাঁদিনী রাতেই আবার জাপানী বোমা হানবে আগুন আর মৃত্যু।... অনাহারে মৃত্যু... বোমায় মৃত্যু... মৃত্যুর বিভীষিকা। শিউরে উঠে চোখ বুজলাম। আশার সঞ্চার করে দূরে ট্রাম শ্রমিকদের একটা স্কোয়াড চীৎকার করে ওঠে : খাদ্যের জন্য এক হও, কংগ্রেসলীগ এক হও, জাতীয় সরকার কায়েম কর। অন্ধকার রাত্রির মাথায় মিটি মিটি তারার মালাও আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে। একটি তারা, দুটি তারা, জনরক্ষা সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটী — তারপর জ্যোৎস্নালোকিত নীল আকাশ —

এক হও

[ জনযুদ্ধ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ]

# ফুলবাড়ী কৃষক সম্মেলনে

সুধী প্রধান

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের উদ্দেশে কলিকাতা হইতে কয়েকটি ছাত্র ও জেলা কমিটির কমরেডদের সঙ্গে ট্রেনে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছি। সম্মেলনে কি দেখিব বা কি শুনিব তাহা লইয়া গবেষণা করি নাই। কলিকাতায় বসিয়া দেখিয়াছিলাম ২৪ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার গ্রামগুলি একদিন সপরিবারে কলিকাতার রাস্তায় আশ্রয় লইয়াছিল। দেখিয়াছিলাম সেখানে দিনের পর দিন তাহাদের লাঞ্ছনা, শিশুর অকালমৃত্যু, বৃদ্ধের অপমৃত্যু, নারীর অসম্মান। গ্রাম বাংলার জেলায় জেলায় মৃত্যুর এই সর্বব্যাপী তান্ডবের ক্ষত সমস্ত কৃষকের গায়ে কুৎসিত ব্যাধির মত অঙ্কিত হইয়াছে। সে ব্যাধি এখনও প্রবল। এখন মৃত্যু দুই হাত বাড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে। তাই কেমন করিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহারই একটা পরিকল্পনা বোধ করি সম্মেলনে হইবে — মনে মনে অস্পষ্টভাবে এই ধারণাটাই কেবল ছিল। ........

*আলাপের নূতন ভাষা*

গাড়ীতে আমরা ছাড়া সকলেই কৃষক। ফুলবাড়ীর কাছাকাছি একজন মধ্যবিত্ত উঠিল। আমরা নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছিলাম কৃষকদের সঙ্গে আলাপ জমাইতে। আমরা যে স্বদেশী একথা সকলকে শুনাইবার জন্য ১৯২১ সাল হইতে গত ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত যত

আন্দোলন সবটাই গল্প করিতে লাগিলাম। মধ্যবিত্ত যুবকটি সশ্রদ্ধ চোখে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু কৃষকেরা সেই যে হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়া বসিয়া আছে তো আছেই - তাহাদের চিন্তার রাজ্যে আমাদের যেন প্রবেশ নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ছাত্র কমরেড গান ধরিল — ময়মনসিং-এর গ্রাম্য কবি নিবারন পন্ডিতের জারীগান "ওরে ও কিষান ভাই।" চলন্ত গাড়ীর বাইরে জ্যোৎস্নার দুই এক ফালি আলো ঠিকরাইয়া জানালার পাশের সারিগুলিকে আলোকিত করিতেছিল। দেখা গেল ক্রমে ক্রমে নোয়ানো মাথা হাঁটুর বাঁধন হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। গান থামিলে অনেকগুলি কণ্ঠে প্রশ্ন হইল : বাবু এই গানের বই কোথায় কিনিতে পাওয়া যায়? ইহার পর সমস্ত বাঁধন কাটিয়া গেল, মর্মান্তিক ইতিহাসের সকরুণ গাথা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের আপন করিয়া দিল।

*সংবাদপত্রের ক্রটী*

কিন্তু আমাদের আলোচনার মাঝে আপত্তি উঠাইলেন কেবল সেই মধ্যবিত্ত যুবকটী। তিনি অবাধ বানিজ্যের পক্ষে এবং রেশনিং এর বিপক্ষে শ্যামাপ্রসাদী যুক্তিগুলি টিয়া পাখীর মত মুখস্থ বলিলেন। আলোচনায় বোঝা গেল এই শিক্ষাটী 'স্বদেশী' দৈনিকগুলির মারফৎ তাহার হইয়াছে।

ফুলবাড়ী ক্যাম্পের সামনে পৌছাইয়াও আমাদের এই আলোচনা চলিতেছিল। একগাড়ী কৃষকের মধ্যে একটী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কেন মজুতদারের নীতি জাহির করে। ইহা হইতে কি বুঝিব আমরা স্থির করিতেছিলাম। বগুড়ার বুড়া দাড়িওয়ালা কমরেড নাসির বলিলেন : ওরা কি আর শ্যামাপ্রসাদের সভায় রোজ যাচ্ছে? সকালে উঠে রোজ যে কাগজ পড়ে তাতেই ঐ সব শেখে। আমাদের দেশের দৈনিক কাগজগুলির একচোখামির কথা আর বলবেন না কমরেড, এতো আর ছোটখাটো সভা নয় — এই সভা বাংলাদেশের কৃষকদের সভা, যে কৃষকেরা এই সংকটে সব চাইতে বেশী ভুগেছে। এখানে অন্তত ৫০ হাজার লোক জমায়েত হবে। কিন্তু একটা দৈনিক কাগজও তার সংবাদদাতা এখানে পাঠিয়েছে কি?

*সম্মেলনের স্থান ফুলবাড়ী বন্দর*

স্থানীয় কমরেডরা বলিলেন–স্থানটী চোরাবাজারের প্রধান ঘাঁটি। অথচ ঠাকুরগাঁয়ে সংক্রামক রোগ হইতেছে বলিয়া অগত্যা এখানে সম্মেলন করিতে হইতেছে। কিন্তু

ফল ভালোই হইয়াছে। এখানকার জমিদার ও জোতদার এবং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লড়িয়া স্থানীয় কৃষক সমিতি নাজেহাল হইতেছিল কিন্তু সম্মেলনের আয়োজন সে লড়াইয়ের ফল সমিতির পক্ষে আনিয়াছে। ১৫ দিন আগে নাকি ওখানে বসিবার ঠাঁই পাওয়া যাইত না, আর আজ মাড়োয়ারীরা ২৭টী ঘর প্রতিনিধিদের বাসস্থানের জন্য দিয়াছে, জোতদার ও জমিদার নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালানো হইয়াছে এবং আয়োজনের গতি যতই তীব্র হইয়াছে ইহারা ততই পক্ষে আসিয়াছে। এই অঞ্চল মুসলমান প্রধান। মুসলমানদের মধ্য হইতেও সাড়া পাওয়া গিয়াছে প্রচুর। সর্বক্ষণের জন্য যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া হইয়াছিল তাহারা অধিকাংশই মুসলমান। ইহা ছাড়া বগুড়া হইতে ২৫ জন অবস্থাপন্ন মুসলমান ঘরের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হইয়া আসিয়াছিল। সম্মেলনের পরিচালকরা বলেন যে ইহারা সর্বাপেক্ষা শৃঙ্খলা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে।

*সমাবেশ*

দিনাজপুরের বিখ্যাত কমরেড বিভূতি গুহ ও সুশীল সেন বলিতেছেন : ঠাকুরগাঁ হইলে গোনা ৫০ হাজার কৃষকের সমাবেশ হইত। কথাটায় যেন একটু আক্ষেপ প্রকাশ পাইতেছিল। আসল সমাবেশ তাহা হইতে বেশী কম হয় নাই। ফুলবাড়ী হইতে দক্ষিণে ১৮ মাইল, উত্তরে ২৫, পূর্বে ৬ এবং পশ্চি মে ১০ মাইল ব্যাপী প্রচার হয়। দেখা যায় যে সমগ্র জেলার ৩০ টি থানার মধ্যে ২৫টী থানার প্রতিনিধি আসিয়াছে, ৫/৭ মাইল দূর হইতে হাজার হাজার কৃষক আসিয়াছে। ইটাহার হইতে কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে ৬১জন কৃষক সওয়া দুই দিনে হাঁটিয়া আসে। ইহার মধ্যে ছিল ৪ জন কিশোর আর ৩ জন মহিলা। একজন আমাদের মৃত কমরেড কৃষ্ণপদর স্ত্রী ভূতেশ্বরী। গ্রামের পর গ্রাম ইহারা অতিক্রম করিয়াছে, প্রতি গ্রামে ইহারা কৃষকের কথা, কৃষকের সংগ্রাম, দেশের স্বাধীনতার কথা, বক্তৃতায়, গানে, ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছে। এমনি করিয়া ঠাকুরগাঁ হইতে ৪৫০ জন (২৫ জন স্ত্রী), পতিরাম হইতে ১০০ জন (২০ জন স্ত্রী) চিরিরবন্দর হইতে ৩০ জন আসিয়াছে। আর ৭/৮ মাইল দূর হইতে লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে প্রায় ৩ হাজার এবং তার মধ্যে লালপুরের ৭৫০ জন মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা।

*মহিলা ও অনুন্নত জাতির জাগরণ*

মহিলা প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৫০ এবং মহিলা দর্শকের তো কথাই নেই। কোন প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে এত বেশী মহিলা এবং কৃষক মহিলা সমাবেশ ইতিপূর্বে হয় নাই। শোভাযাত্রার মধ্যে বোরখা পরা মুসলমান মেয়েও দেখা যাইতেছিল। খাওয়ার ঘরে প্রায়ই দেখিতাম সামনে আশে পাশে বসিয়া খাইতেছে হাজং মেয়ে, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীর মেয়ে। মনে হইল কৃষক আন্দোলন আজ সংকটের দিনে জাতির শেষ স্তর খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে, তাই বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন লোককে আজ টানিয়া আনিতেছে — সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং উন্নতির কাজ অদূর ভবিষ্যতে এই কৃষক আন্দোলনের দ্বারাই শুরু করিতে হইবে।

*পোষ্টার প্রদর্শনী*

"দেখেছিস হিন্দু মেয়েরা কেমন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।" একজন মুসলমান কৃষক আর একজনকে বলিল। এক মহিলা কমরেড সমাগত দর্শকদের পোষ্টার বোঝাইতেছিলেন। শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন। কাজেই প্রশ্নকর্তার উত্তরে তাড়াতাড়ি জবাব হইল — "তাতে কি হয়েছে, এ হচ্ছে দেশের কাজ, এতে মান ইজ্জতের কথাই ওঠে না।" তাহার চোখের সামনে ছবিতে কৃষক সভার উৎপত্তি, কৃষক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন, দেশবিদেশের কথা, বর্তমান খাদ্য সংকট ও ফ্যাসিষ্ট আক্রমনের ছবি, কানের মধ্যে তাহারই এক বোনের মর্মস্পর্শী আবেদন : ওঠ, জাগো, এক হও। সম্মেলনের বাইরে শিল্পীর আঁকা বিরাট কৃষক মুর্তি দেখিয়া একদল কৃষক বলাবলি করিতেছিল, মূর্তিটা নিশ্চয় একতার কথা বলছে ও ছাড়া আর কি বলিবে? এই পোষ্টার ও ছবিগুলি দিবারাত্র হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছে, লেখাপড়া জানা কৃষক টুকিয়া লইয়াছে। বহু ভালো প্রচারকের ব্যবস্থা থাকিলে এগুলি আরো বেশী কাজ করিতে পারিত।

*চিকিৎসা ব্যবস্থা*

সম্মেলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল : পিপলস্ রিলিফ কমিটির কয়েকজন ডাক্তার এখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং সমাবেশের দিন মিলিটারি ডাক্তারের সহযোগিতায় বসন্তের টিকা ও কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন দিয়াছিলেন। চোখে দেখিয়াছি কৃষকেরা

সরকারী ডাক্তারের কথা শুনিলে টিকা লইতে চাইত না, কিন্তু কৃষক সমিতির নাম শুনিলেই রাজী হইয়া যাইত। (বস্তুতঃ সমাবেশের মধ্যেই ২৫০ জন কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন লইয়াছে।)

*বই এর দোকানে*

সম্মেলনের পাশেই বই এর দোকান। সমাবেশের দিন ন্যাশানাল বুক এজেন্সীর দোকানে দারুন ভিড়। সত্য একা পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া স্বেচ্ছাসেবক দেওয়া হইল। ঐ একদিনে ৩৫০ টাকার উপর বিক্রয় হইয়াছে। মুসলমান ক্রেতারা আসিয়া কংগ্রেস ও লীগের পার্থক্য ও ঐক্যবোধক বই দাবী করিয়াছে। এখানেও মেয়েদের ভিড়। 'কংগ্রেস কি চায়' এই বইখানি ও 'জনযুদ্ধ' মেয়েরা অনেক কিনিয়াছে। এইখানেই আমাকে পাকড়াও করিলেন ঠাকুরগাঁ-এর কণ্ঠমনি। বয়স বোধ করি ৫০ হইবে। লাল সালাম দিয়া প্রশ্ন করিলেন : আমি কি করি? বলিলাম "জনযুদ্ধ লিখি"। "আমার নাম কণ্ঠমনি — আমার নাম জানেন না কমরেড? আপনাদের অফিসে যায় নি?" কণ্ঠমনি জনযুদ্ধের গ্রাহিকা — তাঁহার গ্রামে তিনিই কেবল সামান্য পড়িতে পারেন, ছেলে বুড়ো আর কেউ পারে না। তিনি সেই গ্রামের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেল সেক্রেটারী। নিজের খাওয়া পরার ব্যবস্থা সারিয়া সারাদিন সমস্ত কর্মীর পিছনে, গাঁয়ের লোকের পিছনে পার্টির কাজের তদারক করিতে হয়, জনযুদ্ধের সব লেখা পড়িবার সুযোগ পান না। প্রশ্ন করিলাম "রাত্রে পড়েন না কেন?" "কেরসিন কোথায়? ভাবছি কাগজ পড়ার জন্য সকলের কাছ থেকে তেল চাঁদা নিয়ে একটি কাগজের ক্লাস করতে হবে।"

ইহার পর আসেন বুধুমনি। তাদের গ্রামেও সেল তৈরী হইয়াছে, তাঁর মেয়ে আত্মরক্ষা সমিতির বই কাগজ পড়িতে পারে, তিনি এখনো পারেন না। শহর হইতে মেয়েরা না আসিলে তাঁহারা সব কথা গুছাইয়া গ্রামের মেয়েদের বলিতে পারেন না। আর তাঁহাদের যে তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।

রাত্রে সম্মেলনের শেষে নাচ ও অভিনয় হইল। উদয় শংকরের শিষ্য দিব্যেন্দুকুমার আমন নৃত্য ও একতা নৃত্য দেখাইলেন। সংস্কৃতির অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ ভাল হয় নাই — তবু কৃষকের দুর্দশা ও আশা আকাঙ্খার কথা কৃষকদের বসাইয়া রাখিয়াছিল। এই সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে একটিতে আমি মজুতদার শেঠজী সাজিয়াছিলাম। পরের দিন তাই কিশোর কিশোরীর দল, যমুনা, শান্তি, চাঁপা আমাকে ঘিরিয়া গল্প জমাইল। তাহারা সব জানে। শুধু শেঠজীকেই চেনে না, সোভিয়েটের বীর কিশোরী তানিয়া, তানিয়ার

গল্পও জানে, তাহাদের বাপমায়েরা চীনা কৃষকের মত ৮০ মাইল হাঁটিয়া এই সম্মেলনে আসিয়াছে, তাহারাও সোভিয়েট কিশোরদের মত নিজেদের দেশের জন্য মরিবে। ......... একটা গাড়ীর শব্দে হঠাৎ সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'কমরেড লাল সেলাম।' অজ্ঞাতে হাতটী মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পিছনে দেখি এক লরী বোঝাই আমেরিকান সৈন্য - লাল সেলামের ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া যাইতেছে, আমার সঙ্গে দিনাজপুরের কৃষকের ছেলেমেয়ে যমুনা, শান্তি, চাঁপা, ওধারে ঐ মাঠে সাঁওতাল, হাজং, মুণ্ডা কৃষকদের স্ত্রীপুত্ররা, তাহাদের মাঝে আছে কণ্ঠমনি, বুধুমনি। ভাষা আলাদা, বেশভূষা আলাদা, আচরণও আলাদা — কেবল এক ঐ "কমরেড লাল সেলাম" — পুরনো জগতের মাঝখানে নূতন মানুষের জন্য নূতন জগৎ খোঁজার নিশ্চিত আওয়াজ।

জনযুদ্ধ

*১৫ মার্চ, ১৯৪৪*

# বাংলার পল্লীকবি রমেশ শীল

## সুধী প্রধান

এই বছরের ৬ই আশ্বিন সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' সুভাষ মুখোপাধ্যায় চাটগাঁয়ের শ্রেষ্ঠ কবি রমেশ শীল ও তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়ার কথা লেখেন। সেই লেখা পড়ে বড় রকমের উৎসাহ ছিল ওঁদের সঙ্গে দেখা করার। গ্রামের মানুষ তাই কবি গান আগেও শুনেছি। তবু শ্রদ্ধেয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে কবি গুমানি শেখের কথা অনেকবার শুনে মনে মনে একটা লোভ ছিল এই নূতন ধরনের কবি দর্শনের।

রমেশ শীল কেবল নূতন ধরনের নন — আসলে জাত কবি। বয়সও প্রায় ৬০ বছর হয়েছে। প্রথমে দেখে গ্রামের একটি বৃদ্ধ মোড়ল বলে ভুল হয়। কিন্তু মোড়লের মত গাম্ভীর্য্য নেই মুখে — আছে শিল্পীর কোমলতা — আর শিশুর মত হাসি। কিন্তু যখন কবিগান করতে ওঠেন এবং বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তির বাণ নিক্ষেপ করেন তখন সেখানে ফুটে ওঠে সিংহের বিক্রম।

রমেশ উঠলেই আসরে সাড়া পড়ে যায় — ছেলে বুড়ো সকলেই সমস্বরে বলে ওঠে "এইবার রমেশ উঠছেন।" বিপক্ষের হার তখন থেকেই শুরু।

কথার মোলায়েম ছুরি চালানোর বিদ্যাটা তাঁর অন্যদিক থেকে এসেছে। বাবা ক্ষত রোগের চিকিৎসা করতেন। যেসব রোগী শহরের ডাক্তারদের কাছে পৌঁছাতে পারত না বা যাবা সেখান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতো নানারকম গাছপালার ওষুধে তাদের ঘা সারানো ছিল ব্যবসা। রমেশ শীলও এটা শিখেছিলেন। আজো মাঝে

মাঝে রোগীর ব্যবসা আর গানের বায়নার মধ্যে কোঁদল বাধে। জীবন ভরে যিনি যন্ত্রণায় প্রলেপ দিয়ে এসেছেন — তিনি যে কি গান গাইবেন তা বোঝা কষ্টকর নয়।

৪০ বছর আগে এই উদীয়মান ক্ষত চিকিৎসক শহরে এসে শোনেন বিখ্যাত কবি গাইয়ে মোহনবাঁশী জলদাস ও চিন্তাহরণের কবিগান। "রাস্তার ধারে আসর বসেছে — লোকে লোকারণ্য। দুটি একেবারে নিরক্ষর লোকছন্দের পর ছন্দ রচনা করে যাচ্ছে আর শুনছে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই। গাছ গাছড়া দিয়ে দুরারোগ্য ক্ষত সারানোর কবিরাজ রমেশের মনে বিস্ময় হল "কিসের জোরে এরা পদ-পূরণ করে ; তারপর দিন নেই, রাত নেই স্বপ্নে, জাগরণে, পথে ঘাটে শুধু পদপূরণের চেষ্টা করেছি।"

"দেশে সবেমাত্র রেল লাইন বসেছে। জমিগুলি সব বিদেশীরা কিনে নিচ্ছে — নদীর দুধারে বসেছে বিদেশীর ফাঁপা কারবার। সাগর ও পাহাড়ের মাঝে গড়া সুন্দর চট্টগ্রামের বুকে কুৎসিত ব্যাধির গুটিকা যেন! আমার প্রথম কবিগান তাই চট্টগ্রামের এই বৃত্তান্ত নিয়ে। কিন্তু সে কেবল আবেগ আর মিলের প্রথম কোলাকুলি মাত্র।"

পরের বছর আবার শহরে এসে বসেছে সেই কবিদের আসর। মোহনবাঁশীর বিপক্ষ কবির হঠাৎ গলা ধরে গেল — আসর মাটি হয়ে যায় আর কি। শুধু তাই না — বায়নার টাকা মাঠে মারা যাবে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠলো। আসরের একদিক থেকে কয়েকজন মুসলমান শ্রোতা রমেশকে তুলে দিল। মোহনবাঁশী এসে বলেন, "ভাই, কোনরকমে রাত দশটা বাজিয়ে দাও তা হলেই টাকাটা পাওয়া যাবে।" সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান, তাও আবার শহরে — রমেশের সেদিন ভয়ে কাঁপুনি ধরেছিল। কিন্তু মোহনবাঁশী হঠাৎ গানের মধ্যে কবি সুলভ গালিগালাজ করলেন। ব্যস — আর যাবি কোথায় — "উত্তর দিতে গিয়েও সে এক বিপদ — পদ কি সহজে জোটে? মোহনবাঁশী যদি "শালা" বলেন তো আমি "মালা" দিয়ে পদপূরণ করি। কিন্তু রাত দশটার জায়গায় পরের দিন দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙ্গে না। শেষে শ্রোতারা বল্লে "জোটক দাও" (গানের শেষে দুই পক্ষের মধ্যে রফা)। কিন্তু জানলে তো দেব? বললাম — "যে হারবে সে আসর ছেড়ে চলে যাবে।" কিন্তু মোহনবাঁশী সরকার একটা ছোট ছেলের কাছে কি হারতে পারেন? অগত্যা শ্রোতার নিজেরাই গান ভঙ্গ হল বলে ঘোষণা করলেন।" এইদিন থেকে রমেশ শীল বিখ্যাত হয়ে গেলেন — শ্রোতারা জেনে গেল — মোহনবাঁশী হেরেই গেছেন।

এর কিছুদিন পরে রমেশের জীবনে আর একটা বিরাট প্রভাব এসে পড়ে। চট্টগ্রামে মাঝভাণ্ডার বলে একটি জায়গা আছে। এখানে একজন পীর থাকতেন। এটা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের একটি অত্যন্ত প্রিয় তীর্থ। বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় এখানে

এবং প্রার্থনা চলে গানের মারফতে। রমেশ এখানে এসে ঐ পীরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। রমেশের আগে অনেক কবিওয়ালা ওখানে অমর হয়ে রয়েছেন — কিন্তু রমেশ এতই প্রিয় হয়ে যান যে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই আজ তাঁকে মাঝভাণ্ডারের মাঝি বলে ডাকে। এইজন্য রমেশকে পুরাণ ও কোরাণের অনেককিছু জানতে শুনতে হয়েছিল। এই গানগুলিতেও ছিল — তত্ত্বপ্রধান গুরুভক্তি, বিশ্বাস, অধ্যাত্মবাদ ও বিচ্ছেদ প্রধান গান। এই গানগুলি নিয়ে রমেশের কয়খানা বই হয়েছে — আসঙ্গমালা, শান্তিভাণ্ডার ও সত্যদর্পণ। এই মাঝভাণ্ডারের মারফৎ রমেশ শুধু চাঁটগাঁয়ে নয় — প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু তত্ত্বকথায় ডুবে পৃথিবীর দৈনন্দিন ক্ষত ভুলে থাকার লোক রমেশ নন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ক্ষুদিরামের ফাঁসী, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ, বিধবা বিবাহ ও জাতবিচারের প্রসঙ্গ কবি রচনা করেছেন। স্বাধীনতা ও প্রগতির উন্মাদনায় সমগ্র জাতির সঙ্গে কবিও মেতেছেন এবং মাতিয়েছেন চট্টলের লোককে। এরপরে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস। বারবার পুলিশের চাপে কবিগান বন্ধ হল। কিন্তু তাদের অগোচরে বহু গান রচিত হয়েছে এবং লোকের মুখে মুখে সে গান ছড়িয়ে পড়েছে। তবু অত্যাচারের ফল ফললো। চট্টগ্রামের সাধারণ কবিগানে হতাশার মধ্য দিয়ে গেল অশ্লীলতা, গালাগালি ও কূটতর্ক। রমেশের ভাষায় — "মনে বড় বিক্ষোভ এল — দেখি ভদ্রলোকেরা আর গান শুনতে চায় না এবং গরীব লোকেরা নেশার মত গেলে এই অশ্লীলতার কড়া মদ।" প্রতিকারের জন্য সমস্ত জেলার কবিরা সমবেত হয়ে এক সমিতি গড়লেন। "রমেশ উদ্বোধিনী কবি সমিতি।" এখানে নিয়ম করা হল — অশ্লীল গান যে গাইবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। এ প্রায় ৫/৭ বছর আগের কথা। কিন্তু তারপরে এই যুদ্ধ — সারা জাতির জীবনের বিভ্রান্তি ওদের জীবনেও। শিল্পের প্রতি প্রবল মমত্ববোধে অশ্লীলতা দূর করা গেলেও কিসের উপরে গান রচনা করতে হবে তা কী দেশও জানতো? "রমেশ উদ্বোধিনী কবি সমিতি" তাই বেশি দিন টেঁকেনি।

কিন্তু বর্মা পতন, সেখান থেকে অসংখ্য লোকের ফিরে আসা, জাপানী বোমা ও ১৯৪২ সালের জাতীয় ও অর্থনৈতিক সংকট আবার এদের সহজাত স্বদেশপ্রেমকে নাড়া দেয়। মানুষের এই বিপর্যয় চোখে দেখার পর হতাশাগ্রস্ত 'রমেশ উদ্বোধিনী সমিতি'র কবিরা এবারে নূতন করে "চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি" গঠন করেছেন। রমেশ তার সভাপতি ও ফণী বড়ুয়া সম্পাদক। সেখানে আরো আছেন রমেশের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু বরদা, নিবারণ, রায়গোপাল গোবিন্দ ও হেদায়ত। প্রত্যেক মাসে ২৫শে

তারিখে এদের সমিতির সাধারণ সভা হয়। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বৈঠক চলে। সেখানে সমিতির কাজের কথা ছাড়া নূতন কবিগান গাওয়াও হয়।

রমেশ বল্লেন যে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রী বলেছিলেন যে বৃদ্ধ বয়সে আসরে না নামাই ভাল। তিনি বরং রচনা করে যাবেন আর শিষ্যরা গাইবে। কিন্তু গানের নূতন বিষয়বস্তু এবং জনসাধারণের দুর্দশা রমেশকে বিশ্রাম নিতে দেয়নি। রমেশ বল্লেন, এত অভাবে পড়ে আছে মানুষ, মানুষ আজ আর মানুষ থাকছে না — কেমন যেন একটা মতিচ্ছন্ন অবস্থা এ জেলায়। তবু যখন এই নিদারুণ অবস্থার ব্যাপক ছবি আর পুরানো দিনের গৌরব গানের মধ্যে তুলে ধরতে আরম্ভ করি তখন দেখি মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে। আমাদেরও ডাক পড়ে বারবার। বয়সের অজুহাতে সে ডাক ফেরাই কেমন করে। বিদ্যা আমার বেশি নেই জানি, কিন্তু গাছপালা দিয়ে তো ঘা সারিয়ে এসেছি এতকাল। মতিচ্ছন্ন চট্টলের মনকে সারাবার উজ্জ্বল আশা বৃদ্ধ কবির চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

*"জনযুদ্ধ"*
*২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৫*

# ছায়াচিত্র যারা তৈরি করে

## (স্বাধীনতা : সিনেমার সংবাদদাতা)

[ সিনেমার রাজ্যে টাকার ছড়াছড়ি— এই রকমের একটা জনশ্রুতি আছে। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কোন ছবি থেকে কোন কম্পানী আর কোন অভিনেতা কত লাখ টাকা পেয়েছে, তার রোমাঞ্চকর সংবাদ পত্রিকাতে ছাপা হয়। যুদ্ধের বছরগুলোতে সিনেমার মালিকরা কোটি কোটি টাকা লুটেছে—সে খবর সবাই জানে। কিন্তু এত টাকা ঢেলেও দেশী ছবি ভাল হয় না কেন?

মালিকদের মুনাফা-লোভের মধ্যে এর জবাব পাওয়া যাবে। অন্য আর কারখানার মতই এখানেও শ্রমিকদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করা হয়। যাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে একেকটি ছবি তৈরী হয়, তারা বাঁচার মত মজুরি পায় না, অসুখ হলে ছুটি পায় না। সিনেমার সেই টেক্‌নিশিয়ানদের অবস্থার কথা এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে। ]

কলকাতার ৫৬ টি স্টুডিওতে প্রায় দেড় হাজারের মত লোক কাজ করেন। এঁরা ফটোগ্রাফি, আলো, শব্দ সেটিং ও সাজসজ্জার দিক দেখেন এবং সহকারী পরিচালকেরও কাজ করেন। এদের সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না এবং চিত্র সমালোচনায় মামুলীভাবে বলে থাকি, বাংলা ছবির টেকনিক্যাল দিক খুব খারাপ। স্টুডিওর চিত্র-তারকাদের রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনীর কাছে এঁদের সংবাদ কখনো চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। বছর দেড়েক আগে বিখ্যাত শিল্পী কানন দেবী এঁদের সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। স্টুডিও মহলে তাতে সাড়াও পড়েছিল। কিন্তু তারপর আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে।

প্রত্যেক স্টুডিও মালিক প্রতিদিনের 'শুটিং'-এর জন্য প্রতিটি মঞ্চের বাবদ হাজার টাকা ভাড়া পান। এর মধ্যে আলো, সাধারণ ঘরবাড়ীর আসবাবপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, ক্যামেরা, শব্দযন্ত্র, কুলি, ক্যামেরা ম্যান, শব্দযন্ত্রী প্রভৃতি দেওয়া হয়। প্রযোজকদের পক্ষ থেকে ফিল্ম আনতে হয়।

*কোডাক কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবস্থা*

কোডাক কম্পানী ফিল্মের একমাত্র সরবরাহকারী। বাজারে আর কেউ নেই। ফলে সুনাম দুর্নামের পরোয়া নেই। ফিল্ম সহজে পাওয়াও যায় না! ফলে দুর্নীতি এখান থেকেই শুরু হয়। কোডাক কম্পানীর লোক এবং স্টুডিওর মালিক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে দহরম-মহরম থাকার ফলে গুদামপচা খারাপ ফিল্ম কোন প্রযোজকের ঘাড়ে পড়বে এবং কোন ক্যামেরা ম্যানের সর্বনাশ করবে—কেউ বলতে পারে না। চোরাবাজারের প্রভুদের সঙ্গে পুরনো ব্যবসায়ীদের ভাল রকম আলাপ থাকলে হয়তো নূতন ব্যবসায়ী ও নূতন জুনিয়ার ক্যামেরাম্যানেরই সর্বনাশ হয়ে যায়।

*ক্যামেরাম্যান*

ক্যামেরাম্যানদের দৈনিক ১০/১২ ঘন্টা খাটতে হয়। মাইনে ১২৫ টাকা থেকে খুব বেশি তো ৩৫০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। রীতিমত পরিশ্রমের কাজ এঁদের। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে এঁরা। অল্প মাইনেতে সন্তুষ্ট না হলে প্রযোজকদের কাছ থেকে উপরি আদায় করার পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়। যে কম্পানী যত বেশি উপরি দিতে পারবে তার ছবিও সেই রকমভাবে তোলা হয়। এছাড়া আর একটা নিকৃষ্ট পথ আছে। বড় বড় শিল্পীরা চুক্তির অতিরিক্ত বেশি দিন কাজ করতে পেলে মোটা টাকা 'প্রো-রেটা' পান। ক্যামেরাম্যান এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলে সেই টাকার কিছুটা ঘুষ আসে। বড় বড় শিল্পীরা দৈনিক হাজার পাঁচশো থেকে ১০০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পান সেখানে তাঁদের সমসম্প্রদায়ভুক্ত এঁরা শিক্ষাদীক্ষায় সমান হয়ে মাসে ১২৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় কেনইবা সন্তুষ্ট রইবেন? এঁরা আবার সহকারী থাকা অবস্থায় ১৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা নিয়ে খেটে এসেছেন; অথচ খাটুনী একটুও কম নয় এবং দায়িত্ব হাজার হাজার টাকার। সহকারীদের দামী ক্যামেরাগুলি খুলতে ও লাগাতে হয়। ফিল্ম 'লোড' ও 'আন্-লোড' করে ল্যাবরেটারিতে পাঠাতে হয়। একটু অসাবধান হলে হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া শুটিং-এর সময় রীতিমত কাজ করতে হয়।

*স্টুডিওর কুলি*

ক্যামেরাম্যানদের এবং আলোর জন্যও কুলি ব্যবস্থা আছে। এঁদের মাইনে ৩০ থেকে ৪০ টাকা। কাজের সময় ১০/১২ ঘন্টা। এদের খাওয়ার জন্য একটা পেটভাতা ধার্য্য আছে। কিন্তু সারা মাস কাজ করে খাওয়া বাবদ ১৫ টাকা আদায় করতে তাঁদের জান বেরিয়ে যায়। ওভারটাইমও একটা আছে; কিন্তু পয়সা যথেষ্ট পাওয়া যায় না।

এরপরে শব্দযন্ত্রী এবং তাঁদের সহকারীরা আছেন। শব্দযন্ত্রীদের মাইনে ১০০ থেকে ২০০ টাকা এবং সহকারীরা ৫০ থেকে ৬০ টাকা পান। কাজ ক্যামেরাম্যানদের মত, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম অনেক কম।

ছবির সেটিং যেসব শ্রমিকরা তৈরী করেন তাঁদের মাইনে ২৫-৩৫ টাকা। কাজের সময় ১২-১৪ ঘন্টা। প্রায়ই এমন শিফট্ পড়ে যে সামান্য বিশ্রামের পর আবার কাজ করতে হয়। এঁদের সঙ্গে ছুতোর মিস্ত্রী থাকেন। তাঁদের মাইনে এঁদের থেকে ১০/১৫ টাকা বেশি।

*স্টুডিও'র অবস্থা*

'সেট' তৈরীর মালপত্র বলতে প্রধান জিনিস হল ফ্ল্যাট অর্থাৎ কাঠের কাঠামোর উপর ক্যানভাস লাগানো বস্তু। এই দিয়ে ঘরবাড়ী দেওয়াল তৈরী হয়। নূতন জিনিস কম স্টুডিওতে পাওয়া যায়। তালি মারা, ছেঁড়া, ভাঙ্গা এবং কোঁচকানো দেওয়াল অনেক ছবিতে দেখা যায়। আর, দরজা জানালা যে কয়টা আছে সব ছবিতে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে আর্ট ডাইরেকটরের প্রসঙ্গ আসে। ৩০০-৩৫০ টাকা মাইনে দিয়ে এঁদের রাখা হয়। কিন্তু বেচারারা এমন কোন জিনিস পান না যা দিয়ে ভাল জিনিস করবেন। স্টুডিওর মামুলী কুঁড়ে ঘর বা রাজপ্রাসাদ দিয়েই এঁদের কাজ সারতে হয়।

আলোর ব্যাপারেও এই অবস্থা। অধিকাংশ স্টুডিওতে প্রতি মঞ্চের জন্য ৬টি থেকে ৮টি আলো আছে, অথচ ১২টি থেকে ১৬টি হলে কোন রকমে আলোর কাজ সম্ভব। ফলে ক্যামেরাম্যান আলোর কুলি এবং শিল্পী সকলকেই নাস্তানাবুদ হতে হয় এবং ছবিতে দিন বা রাত্রি কিছুই বোঝা যায় না।

*মেক্-অ্যাপম্যান*

সাজপোষাক এবং মেকআপম্যানরা সচরাচর ৪০-৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত মাহিনা পান। কিন্তু কোন স্টুডিওতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাল মেকআপম্যান বেশী টাকা দিয়ে রাখা হয় না। একজন ভালো লোককে রেখে তার সঙ্গে অনেকগুলি বিনি-মাইনের বা অল্প মাইনের শিক্ষানবীশ রাখা হয়। ফলে, এখানেও বকশীশ পাওয়ার জন্য প্রযোজকদের ওপর চাপ দিতে বাধ্য হয়। ফলে মেকআপ ভালো করে হয় না— শুটিং-এর আগে ঘন্টার পর ঘন্টা শিল্পীদের বসে থাকতে হয়। ছবি তোলার অর্ধেক সময় শিক্ষানবীশদের হাতে শিল্পীদের ছেড়ে দিয়ে স্টুডিওর ভাড়া গুণতে হয়।

*ভবিষ্যতের আশায়*

সহকারী পরিচালক এবং ধারাবাহকরা আছেন — যাঁরা নামের দিক থেকে অনেক উপরের কোঠায় — কিন্তু মাইনা পান ১০০/১৫০ টাকার বেশী নয়। এঁরা পরিচালককে সাহায্য করেন—প্রতিদিনের কাজের, ছবির, সেটের সাজপোষাকের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য সবকিছু লিখে রাখেন। ভবিষ্যতে ডিরেক্টর হবেন, এই আশায় এঁরা মুখ বুজে কাজ করেন। কিন্তু সেদিনের আশায় আগে অনেক মেহনত বে-খরচায় ঢেলে দিতে হয়।

*গাধার মত খাটুনি*

এতবড় একটা শিল্পে যেখানে এত লোক কাজ করে এবং যথেষ্ট বৈদ্যুতিক বাতি নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে হয়, সেখানে কোন ফ্যাক্টরী আইন নেই, ছুটি নেই, চাকুরীর স্থায়িত্ব নেই, নির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যত নেই, অসুস্থতা বাবদ বেতনসহ ছুটি নেই। স্টুডিওতে কাজের যেরকম ভিড় তাতে রবিবারেও কাজ চলে এবং শিল্পীদের দৈনিক ফি এবং বড় বড় টেকনিশিয়ানদের হাতে কিছু টাকা উপরি গুঁজে দিলে ছোটদেরও আসতে হয়। কিছু কিছু শিল্পী এবং পরিচালক গরীব শ্রমিকদের জন্য অন্তত সপ্তাহে ১ দিন ছুটির চেষ্টা করেছেন কিন্তু মালিকদের কৌশলে তা সফল হয়নি।

টেকনিশিয়ানদের মধ্যে এই সব নিয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অধিকাংশ সংঘ টেকনিশিয়ানরা তাদের ন্যায্য দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁরা এবং শিল্পীরা এক হলে শুধু যে তাদের দাবী আদায় হবে তাই নয়, এই ব্যবসাটিকে তাঁরা সুস্থ ও সবল দেশপ্রেমের বাহন হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন।

স্বাধীনতা ১১মে, ১৯৪৭

# সিনেমা শিল্পের সঙ্কট

বাংলাদেশের চিত্রজগতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা আজ প্রযোজক, পরিবেশক, শিল্পী, টেকনিসিয়ান ও সিনেমা কর্মচারীদের কাহারো উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বাংলা দেশে যত ছবি তোলা হয় তাহার ১৪ আনা স্বতন্ত্র প্রযোজকদের অর্থে উঠে। খণ্ডিত বাংলার ছবিঘরে আজ তাহাদের এত দিনের তোলা ছবি রিলিজ হইতে জায়গা পাইতেছে না বলিয়া তাহারা নূতন ছবি তোলার জন্য টাকা খাটাইতে পারিতেছে না। নিউথিয়েটার্স ছাড়া কোথাও শিল্পী বা টেকনিসিয়ানদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নাই। ফলে বড় ছোট ১২০০ শত শিল্পী, ২২০০ টেকনিসিয়ানস, পরিবেশনে রত তিন হাজার কর্মী এবং চিত্রগৃহের কাজে নিযুক্ত ১৩০০০ হাজার কর্মচারী ছাঁটাই, বেকারি, পারিশ্রমিক হ্রাস এবং অল্প পয়সায় বেশী পরিশ্রমের কষ্ট কঠিন অবস্থায় নিষ্পেষিত। টলিউডের স্বপ্নরাজ্যে আজ দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা বুক চাপা গোঙানির সৃষ্টি করিয়াছে।

*প্রকৃত সমস্যা কি*

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নানাভাবে যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থায়ী স্টুডিও মালিক এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টাররা বলেন যে চোরাবাজারের টাকা এবং ভুঁইফোড় ডিরেক্টারের আমদানীতে বাজে ছবি তোলা হইত এবং শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের বেশী টাকা দেওয়া হইত বলিয়া বাজার খারাপ হইয়াছিল, এখন আবার বাজার সুস্থির হইতেছে। এই যুক্তির সাহায্যে বাংলা ফিল্মের উন্নতির চেষ্টা হউক না হউক, স্টুডিওতে ছাঁটাই এবং শিল্পীদের পারিশ্রমিকের হার হ্রাসের ব্যবস্থা পাকা হইতেছে। টেকনিসিয়ানদের শিক্ষার অভাব এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথার্থ শিল্পদৃষ্টির অভাব বাংলা ছবিতে আজ নূতন নয়। এই অভাব দূর করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিল্পীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দরকার জরুরী হইয়াছে তাহাও আমরা মানি। কিন্তু কেবল ঐ কারণেই বাংলার ছবির ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় নাই। তাহা হইলে গত বছরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছবিকে রিলিজ করিতে গিয়া হাউসের কর্তৃপক্ষকে মোটর গাড়ী বকশিষ দিতে হইত না।

এই প্রসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এবং জন-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের কথাও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ছবি ভাল হইলে যে এখনও জনসাধারণ পয়সা দিয়া থাকে — তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কাজেই পূর্বোক্ত দুইটি কারণ মামুলী কারণ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে টেকনিসিয়ানদের কৃতিত্ব স্বরূপ 'বেদিং বিউটি'ও তৈয়ারী হইয়াছে, আবার সত্য, সুন্দর ও শিবের প্রকাশস্বরূপ — বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ বিচারে চার্লির 'মসিয়ে ভের্দু'ও তৈয়ারী হইয়াছে। এই দুইটি বিরোধী ধারায় যে সংঘর্ষ তাহার সমাধান বা একমাত্র সুপরিণতি সামাজিক বিপ্লবেই সম্ভব।

কিন্তু সেই চেষ্টা সুরু করিতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে বাংলা ফিল্ম শিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের পথে। বাংলা স্টুডিওতে বছরে যত ছবি তৈয়ারী হয় —খণ্ডিত বাংলায় তাহা রিলিজ করার মত হাউস নাই। ছবির অধিকাংশ টাকা ওঠে কলিকাতার হাউস হইতে। কিন্তু সেখানে ইংরাজী ও মার্কিন ছবির প্রভুত্ব আগেকার মত বজায় আছে। হিন্দী ভাষায় বিলাতী ছবি দেখানো হইতেছে এবং বিলাতী কোম্পানী এদেশে ছবি তুলিতে সুরু করিয়াছে। ইহা ছাড়া ভিন্ন প্রদেশে তোলা ছবির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছুদিন আগে হইতেই বাংলার নামকরা ডিরেকটর ও শিল্পীরা বোম্বাই গিয়া সেখানকার ধনীদের অধীনে কাজ করিয়া বাংলা ছবি তুলিতেছিলেন। সম্প্রতি শান্তারাম স্বয়ং বোম্বাই হইতে বাংলায় ছবি তোলার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। ফিল্মিস্থানের মালিক রায়বাহাদুর চুণিলাল প্রকাশ্যে দাবী করিয়াছেন যে আঞ্চলিক ভাষায় অর্থাৎ মাদ্রাজ ও বাংলায় প্রচলিত ভাষায় ছবি তোলা বন্ধ করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ছবি তোলার জন্য সরকার আইন করুন। এই দাবী তিনি বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে পেশ করিয়াছেন। তিনি যুক্তি দিয়াছেন যে ইহাতে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার সুবিধা হইবে এবং ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসা (বোম্বাই?) উন্নত হইবে। একদিকে ক্রমান্বয়ে বাংলার চিত্রগৃহগুলিকে অর্থ দিয়া নিজেদের হাতে আনা, — বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সেই ভাষাকে দাবাইয়া রাখা, অভাবক্লিষ্ট বাংলার শিল্পী ও ডিরেকটরদের ক্রয় করা এবং অপরদিকে সরকারের ইঙ্গ-মার্কিন ও টাটা বিড়লা গোষ্ঠীকে তোষণ করার নীতির সুযোগে বাংলার শিল্পকে গ্রাস করা ইহাই হইল বর্তমান পরিস্থিতি। বোম্বাই হইতে তোলা বাংলা ছবি দিয়া সে কাজ নিরাপদে সুরু করার উদ্দেশ্যে এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হইতেছে। বাংলা দেশের ছবি বাংলার বাইরে বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ে অনেক কষ্টে রিলিজ পায়। অথচ চিত্রার মত গৃহে আজ বাংলা চিত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মিঃ সরকারকে 'খিড়কী'র মত জঘন্য ছবি দেখাইতে হইল।

ইহার কারণ কি? আমরা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না। যেকোন ব্যাপারে প্রদেশের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ হউক ইহা কখনই আমাদের কাম্য নহে। তবে আমরা মনে করি যে

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির সাহায্যে, ভাষা ও সংস্কৃতিতে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন এবং তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকারের পরিবর্তে শোষণ ও শাসনের ভিত্তিতে আজ যে বিভক্ত ভারত সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে এবং শিল্প জাতীয়করণ করার পরিবর্তে অবাধ বাণিজ্য-নীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করায় প্রত্যেকটি শিল্পে আজ এই সঙ্কট দেখা দিয়ছে।

*অপরিকল্পিত উৎপাদন*

'উৎপাদন বাড়াও' বলিয়া সরকার যে রব তুলিয়াছে — সেই রব অনুযায়ী কাজ করিলে বর্তমান অবস্থায় যে কি পরিমাণ সঙ্কট সৃষ্টি হয় — তাহার পরিচয় বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে মেলে। ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৭ সালে তোলা ছবির হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৪৩ সালে ১৪৯ খানি ছবি দেখানো হয়। ১৯৪৬ সালে ১৯৮ খানি এবং ১৯৪৭ সালে ২৬২ খানি ছবি সেন্সার করা হইয়াছে। অথচ ছবি দেখাইবার হাউসের অভাবে ইহার শতকরা ৫০ ভাগ ছবি বাক্সবন্দী হইয়া আছে।

ইহার ফলে প্রযোজকরা নতুন করিয়া টাকা খাটাইবার সামর্থ্য ও সাহস পান না। বাংলা দেশে এই ঘটনা চিত্র জগতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি এখানে একমাত্র নিউ থিয়েটার্স ছাড়া সমস্ত স্টুডিওতে প্রধানতঃ স্বতন্ত্র প্রযোজকরা কাজ করেন (ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রডিউসার)। অধিকাংশ স্টুডিও ইহাদের ভাড়া খাটে। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া রাধা ফিল্মস, কালী ফিল্মস, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, অরোরা ফিল্মস, ইষ্টার্ন টকীজ, এম পি ডি লুক্স, এ পি প্রভৃতি স্থায়ী প্রযোজক আছে। ইহারা এবং স্বতন্ত্র প্রযোজকরা খরচপত্র করিয়া ছবি তোলার পর ডিষ্ট্রিবিউটরস বা পরিবেশকদের কাছে দেন। তাহারা আবার এক্সিবিটরস্ বা প্রদর্শকদের কাছে দেন। প্রদর্শকরা হইতেছেন হাউসের মালিক। অবশ্য পূর্বোক্ত স্থায়ী প্রযোজকদের কেহ কেহ পরিবেশক এবং প্রদর্শক হিসাবেও আছেন। অর্থাৎ ইহাদের কাহারো কাহারো নিজের হাউস আছে যেমন নিউ থিয়েটার্সের চিত্রা। পরিবেশকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবি পাওয়ার জন্য প্রযোজকদের টাকা দাদন দিয়া থাকেন।

*পরিবেশক-প্রদর্শক গোষ্ঠীর মুনাফার রাজত্ব*

আগে ছবির সংখ্যা কম থাকায় সমগ্র চিত্রশিল্পটি পরিবেশকদের করায়ত্ত্ব ছিল — কিন্তু বর্তমানে ছবির সংখ্যা রিলিজ করার ক্ষমতার তুলনায় বেশী হইয়া পড়ায় শিল্পটি পরিবেশক-প্রদর্শক শ্রেণীর হাতে আসিয়াছে। যুদ্ধের সময় চোরাবাজারে টাকা কামাইয়া সরকারী দপ্তরে নানা প্রকার কৌশল করিয়া যাহারা চুন সিমেন্ট প্রভৃতি যোগাড় করিয়াছে এবং হাউস তৈয়ারী করিয়াছে— তাহারাই আজ ফিল্ম শিল্পের মালিক হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের কাছে দেশ, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি কিছুরই মূল্য নাই। ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল মুনাফা। তাই বাংলা দেশের চিত্রগৃহে ১৯৩৯-৫৭ সালে বাংলা ছবি দেখানো হয় ১৫২, হিন্দি ছবি ৩০৯ এবং বৃটিশ ও মার্কিন ছবি ৮৩৫ খানা। মিঃ বি এন সরকার তাই নিজের তোলা হিন্দি ছবি বোম্বাই ছবিঘরে দেখানোর সুযোগ লাভের জন্য চিত্রাতে অশ্লীল ছবি "খিড়কী" দেখাইতে আপত্তি করিলেন না।

*'সরাব পিও ভরপুর'*

জাতীয় সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা সরকার হাতে লইয়া ছায়াছবির জগতে দুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে — তাহাদের কুকর্মের বিরুদ্ধে যাহাতে কোন প্রতিবাদ না হয় তাহার জন্য কড়া সেন্সারের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় লেখা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে গুরুতরভাবে বিপন্ন হইবে তাহা এদেশের সকলেই বলিয়াছেন। ফ্যাসিজমের রাজত্বে প্রবর্তিত চিন্তা নিয়ন্ত্রণের ইহাই সূচনা। দ্বিতীয় কাজ হইল— প্রমোদকর বৃদ্ধি ।

ইতিপূর্বেই ছবি দেখাইয়া প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৬০ ভাগই ট্যাক্স দিতে হইত। আমদানী কর, বিক্রয় কর, অক্টোরোয় কর, আয়কর, সুপার ট্যাক্স, প্রমোদকর এবং হাউসের উপর প্রতি রাত্রের শোর জন্য কর ছিল।

পশ্চিমবাংলায় প্রমোদকর বাবদ সরকারী আয় হইতেছে ৩৫,৪৪,০০০ টাকা। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রমোদকর বাবদ সরকারী আয় ছিল ২,৪০,৬৬,০০০ টাকা আর দেশ-বিভক্ত হওয়ার পর আয় ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৮ সালের ১ল মার্চ পর্যন্ত ২,৯০,৮৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ ৫০,২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে। ইহার উপর সম্প্রতি প্রমোদকরের হার বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের ছায়াছবির উন্নতি হইতেছে কিনা, বিদেশী ছবির অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায় কিনা, বিভিন্ন প্রদেশে তোলা ছবির পরিবেশনে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা— তাহার ব্যবস্থা না দেখিয়া এই সরকার অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বিদেশী ও দেশী বণিকদের স্বার্থ পূরণ করিয়া যাইতেছে এবং গরীব সিনেমাদর্শকদের পকেট মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

ছায়াছবিতে অশ্লীলতা দূর করিবার জন্য নাকি সরকার সেন্সার কড়া করিতেছেন। কিন্তু বোম্বাইতে তোলা ছবি এবং বিদেশী ছবিতে যে পরিমাণ অশ্লীলতা আছে বাংলা ছবি তাহার ধারে কাছে দিয়াও যাইতে পারে না। কিন্তু বোম্বাইতে গান্ধী মেমোরিয়াল ফান্ডে চাঁদা দিয়া "খিড়কী" পার পায়—ডলার আর স্টার্লিংয়ের চাপ দিয়া বিলাতী

ছবি অক্লেশ ছাড়পত্র পায়। "সরাব পিও ভরপুর ফুর্তিকা টেক্স মাগে সরকার বাহাদুর"। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহাই হইল জাতীয় সরকারের নীতি।

*আন্দোলন ভিত্তি*

কাজেই এই সরকারের সদিচ্ছা এবং উদ্যোগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ছায়াছবির জগতে উন্নতির আশা নাই। সারা ভারতের ছায়াছবির উন্নতির সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করিতে হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিড়লা-টাটা পরিচালিত সরকারে তাহার আশা সুদূর পরাহত। ইতিমধ্যে মজুদ ছায়াছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিতে হইবে। এদেশে অনেক হাউস আছে যেখানে কখনো ইংরাজী ভাষায় তোলা ছবি ছাড়া দেশী ছবি স্থান পায় না। আমরা সমস্ত বিদেশী ছবির বিরুদ্ধে নহি, কোন শিল্পরসিকই এইরূপ হইতে পারেন না। কিন্তু যে কোন বিদেশী ছবি যে কোন প্রকার অপমানকর সর্ত্তে দেখানোর আমরা ঘোরতর বিরোধী। আমাদের দেশে বিদেশী ছবি অনেক সময় দেশী চিত্রগৃহে রবিবারের সকালেও দেখানো হয়, কিন্তু মেট্রো বা চৌরঙ্গীর অনুরূপ হাউসগুলিতে কোন সময় আমাদের দেশী ছবি দেখানো হয় না। দিল্লীতেও অনেক বিদেশী চিত্রগৃহে রবিবার সকালে দেশী ছবি দেখানো হয়। এইসব অপমানকর ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। কিছু দিন আগে শান্তারাম প্রভৃতি কয়েকজন নামকরা ডিরেকটার ভারতীয় ছবি আমেরিকায় দেখানোর ব্যবস্থার জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া বলেন যে ওদেশে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিজস্ব হাউস না থাকিলে ভারতীয় ছবি দেখানোর কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের দেশের নির্লজ্জ সরকার এবং ধনীপ্রদর্শক গোষ্ঠি এই অপমান বোধ করেন নাই। এখানে দিনের পর দিন অসংখ্য হাউসে বাজে বৃটিশ ও মার্কিন ছবি দেখাইতে দিতেছেন। ইহারা যে শিল্পক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ নন তাহার আর এক নমুনা এই যে সোভিয়েটের ছবি এখানে কদাচিৎ হাউস পাইয়া থাকে।

*গণ-আন্দোলনের দাবি*

কাজেই সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক ফিল্মবোর্ড দাবী করিতে হইবে। এই ফিল্মবোর্ড প্রথমত দেশী বিদেশী ছবির শিল্পগুণ বিবেচনা করিবে। দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারকে বলিব যে আমাদের দেশের ছবি যে পরিমাণে বিদেশে দেখানোর সুযোগ পাইবে সেই পরিমাণে বিদেশী ছবি আমাদের দেশে দেখানোর আইন করিয়া দিতে হইবে।

ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশে তোলা ছবি নিজ নিজ স্বার্থে বাজারে চালানোর যে অসম প্রতিযোগিতা পরিবেশক-প্রদর্শকরা করেন তাহা বন্ধ করিতে হইবে। প্রদর্শকরা ছবি

রিলিজ করার ব্যাপারে যেভাবে চোরাবাজার চালাইতেছেন তাহাতে সমস্ত স্বতন্ত্র প্রযোজক মারা পড়িবেন। প্রকৃত পক্ষে হাউসের মালিকরা বিদেশী ছবির সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। স্বতন্ত্র প্রযোজকদের ছবি রিলিজ করিতে হইলে হাউসের মালিকদের যে পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়—তাহার পর দ্বিতীয়বার নতুন ছবি তোলার অর্থ তাহাদের হাতে থাকে না। এই ব্যাপারে যে জঘন্য চোরাবাজার চলিতেছে তাহা বন্ধ করা দরকার। সৎ প্রযোজক এবং প্রদর্শকরা যদি সত্যকথা স্বীকার করেন তাহা হইলে এমন সব তথ্য বাহির হইবে যাহাতে জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিবে এবং তাদের নায্য দাবির পিছনে সমর্থন জানাইবে।

*ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিত্তি*

স্বতন্ত্র প্রযোজকদের টাকা আটকাইয়া আছে বলিয়া প্রডাকশন কম হইতেছে। ফলে শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের ঘরে ঘরে হাহাকার সুরু হইয়াছে। হাউসের মালিকদের রাজত্ব নিরঙ্কুশ বলিয়া তাহারা চিত্রগৃহের কর্মীদের উপর শোষণ চালাইতে সাহস পাইতেছে। ছবি তোলার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং ব্যবসায়ী সুলভ মনোবৃত্তি প্রবল রহিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালী দর্শক আজ ভাল ছবি দেখিতে পাইতেছে না। কাজেই শিল্পীসংঘ, টেকনিশিয়ান এসোসিয়েসন, মোসন পিকচার্স এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি এবং ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন সকলকে একযোগে এই আন্দোলনে নামিতে হইবে। টেকনিসিয়ানদের কাজ স্থায়ী করিতে, অতিরিক্ত কাজের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে এবং ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইলে প্রত্যেকটি স্টুডিওতে অবিলম্বে ফ্যাক্টরী আইন জারী করাইবার আন্দোলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা বোম্বাই এবং মাদ্রাজে আছে, বাংলাদেশে এখনো কেন ইহা করা হয় নাই তাহার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে হইবে।

*শিল্পীদের স্বার্থ*

নিউ থিয়েটার্স ছাড়া কোন প্রডাকশনে শিল্পীদের অস্থায়ীভাবেও নিযুক্ত করা হয় না। কাজেই বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পী স্বতন্ত্র প্রযোজকদের স্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করেন। অতএব শো হাউসে অবাঞ্ছিত বিদেশী ছবি দেখানো বন্ধ করা এবং বিভিন্ন প্রদেশের চিত্রগৃহের সমানাধিকারের ভিত্তিতে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। কাজেই সমস্ত শিল্পী সংঘকে এই আন্দোলনে সক্রিয় হইতে হইবে। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন ইতিপূর্বেই বেতন বৃদ্ধির দাবী লইয়া মুনাফালোভী হাউসওনারদের বিরুদ্ধে

লড়িতেছেন। তাঁহাদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে তাঁহারা প্রমোদকর বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য সকলকে ডাক দিয়াছেন। এই আন্দোলনে শিল্পী ও টেকনিশিয়ানরা যোগ দিলে তাহাদের নিজ দাবী আদায়ের জন্য জনসাধারণের সমর্থন পাইবেন। কারণ এই কর বৃদ্ধিতে জনসাধারণের পক্ষে সিনেমা দেখা আরো ব্যয়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং দর্শকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত সৎ প্রযোজক এবং হাউসবিহীন সৎ পরিবেশক আছেন তাহারাও এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে তাদেরই সাহায্য করিবে। জনসাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য তাহাদিগকে বর্তমান সরকারী সেন্সর এবং প্রমোদকরের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এইভাবে সমবেত শক্তি লইয়া আন্দোলন করিলে জয় অনিবার্য্য। বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান ও শিল্পরসিকরা, যাঁহারা চিত্রশিল্পের মারফৎ সুরুচিপূর্ণ, সত্যবাদী এবং সরস শিল্প চাহেন তাঁহারা বাংলাদেশের অগণিত শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কেরানী, যাঁহারা অল্পব্যয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রেরণাময় আনন্দ চাহেন তাঁহারা নিঃসংশয়ে এই আন্দোলনে সাহায্য করিবেন।

*আন্দোলনের মূল দাবী*

১। ব্রিটিশ ও মার্কিন ছবির অবাধ প্রবেশ বন্ধ কর।

২। এদেশের বিলাতী ছবির হাউসে দেশী ছবি দেখানোর অধিকার চাই।

৩। বিভিন্ন প্রদেশের ছবিঘরে ছবি দেখানোর ব্যাপারে সব প্রদেশের পরিবেশকদের মধ্যে সমানাধিকার চাই।

৪। অবাঞ্ছিত ও অশ্লীল ছবির ওপর বাধা নিষেধ চাই।

৫। হাউসের মালিকদের চোরাবাজারী বন্ধ কর।

৬। প্রমোদকর বৃদ্ধি চলিবে না।

৭। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফিল্ম বোর্ড গঠন কর।

৮। স্টুডিওতে ফ্যাক্টরী আইন চালু কর।

৯। প্রি সেন্সার শিপ চলিবে না।

১০। চিত্র শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর।

আর্টিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল) সভ্যগণ পরিচালিত 'শিল্পী' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

# সংস্কৃতি ও সরকার

## সুধী প্রধান

গত কয়েক মাস ধরে ভারত এবং প্রদেশ সরকারগুলিকে সংস্কৃতি বিষয় নিয়ে নানারকম প্রস্তাব, আলোচনা ও একাদেমি গঠন প্রভৃতি করতে দেখা গেছে।

মনে হচ্ছে — গুরুতর বিষয়ের ভার কিছুটা লাঘব হওয়ায় সরকার এখন ভাত-রুটি ছাড়া আত্মার খাদ্যের বিষয় চিন্তা করছেন।

কিন্তু আজ পর্যন্ত যা কিছু দেখা গেছে তা হল একাদেমি গঠন ; একাদেমি সদস্যদের বিবৃতি দান এবং সম্পাদিকা মহোদয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ। আরো কিছু ব্যাপার আছে। তা হল বছরে বছরে খ্যাতনামা শিল্পীদের শাল, যন্ত্রপাতি বা পুরস্কার ও খেতাব বিতরণ। রাষ্ট্রপতি সকাশে বা লাট সাহেবদের বাড়িতে তাদের জলসা।

বাংলা সরকার তারও বেশি অগ্রসর হয়েছেন। তারা ফোক এন্টারটেনমেন্ট সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। তার জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন। সেখানে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী মাহিনা দিয়ে রেখেছেন। এবং প্রচারবিভাগীয় অফিসার নাট্যকার মন্মথ রায়কে দিয়ে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের প্রচার সম্বলিত অনুষ্ঠান করছেন।

বাংলায় একাদেমির সম্পাদিকা নির্ম্মলা যোশির চেষ্টায় একাদেমির কোনো শাখা করা যায়নি। কারণ এখানে কংগ্রেস সরকারের সংস্কৃতি নীতির মুখোশ খুব খোলাখুলি। অন্য প্রদেশে যা চলে এখানে তা চলেনা — গণতান্ত্রিক শক্তির এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আন্দোলনের শক্তি এখানে সর্বজনস্বীকৃত।

কাজেই বিধান সরকার রাজি হননি — কেন্দ্রীয় সরকারের মতো শিল্পকলার উন্নতির নামাবলী গায়ে পরতে। বিধানবাবু নাকি সোজাসুজি বলে দিয়েছেন গণসংস্কৃতির নামে বামপন্থীদের নিয়ে আসর জমাতে তিনি রাজি নন। আসল কথা তো — শিল্পীদের

কংগ্রেসের পাশে জমায়েত করা, পয়সা দিয়ে হোক, চাকুরি দিয়ে হোক সে কার্য তিনি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে পারবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

এইখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট নাটক একাদেমির কর্তাদের সঙ্গে তার পার্থক্য। অবশ্য একাদেমি উদ্বোধনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বক্তৃতা করেছেন : "অসুন্দরকে সুন্দর করাই শিল্পকলার ধর্ম। কলা নৈপুণ্যে কুৎসিতও সুন্দর হইয়া ওঠে।" (*যুগান্তর, ২৯শে জানুয়ারী '৫৩*) — এর সঙ্গে বিধান সরকারের কোনো মতভেদ নেই। আসল প্রভেদ হল সোজা কথা সোজা করে বলা বা না বলার মধ্যে। চরম দক্ষিণপন্থীদের এইটাই একটা গুণ।

বিধানবাবু আজকাল ফিল্ম মোহরৎ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন, থিয়েটারের দ্বি-শততম অভিনয় উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। লালদিঘির সদর দপ্তরে লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে চা-কেক্ খাইয়ে সরকারের কীর্তিকলাপ প্রশংসা করার জন্য রচনা করতে উপদেশ দেন। শেষ পর্যন্ত "ধান দিলে কাকের অভাব হয় না" — এই বাস্তব বুদ্ধি ধরেছেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সরকারের সংস্কৃতিনীতির পরিচয় তো কোনো বিবৃতির দ্বারা হয় না। সরকার গত ৭ বছর ধরে রেডিওর মতো একটি শক্তিশালী যন্ত্র নিয়ে কাজ করছেন। সেখানেও লোক-সঙ্গীত এবং মার্গসঙ্গীত ও নাটক অভিনয় হয়। কেবল নাচটাই হয় না। কিন্তু তাতে কী উপকার লোকসংস্কৃতির হয়েছে? কিছু পয়সা মাসের পর মাস কয়েক জন শিল্পী পান এবং গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠান করেন।

শিল্পীদের কাছে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন — পয়সা কম পাই এবং বিষয় বস্তুর পছন্দ অপছন্দ সরকারী কর্মচারীদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

কাজেই পুরনো ও মামুলি জিনিষ চলে মাসের পর মাস।

আসল কথা হল — ভারতের বিরাট জনসাধারণের সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করা। তার জন্য পুরাতনের যা ভাল তা যেমন বাছাই করে গ্রহণ করা তেমনি নতুন যা জন্মাচ্ছে তাকে সমৃদ্ধ করা। এ কাজ শহর থেকে ফতোয়া ছেড়ে বা স্কাউট পাঠিয়ে হয় না। সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ জনসাধারণের মধ্যেকার লোক বার করতে হয় — যারা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে থেকে তাদের সুখ দুঃখের কথা জেনে রচনা করেন এবং পরিবেশন করেন।

বছরে তাদের একবার দিল্লী, কলকাতা বা মাদ্রাজে উৎসবের মধ্যে নিয়ে ঢাকঢোল পেটালেও কিছু হবে না। জল থেকে মাছকে নিয়ে গেলে সে মরে যাবে। গ্রামের যে

জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছে, হারছে এবং জিতছে — তার মধ্যে তাকে সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রদর্শন করতে হবে।

এ কাজ বর্তমান সরকারের কর্ম নয়। কারণ এ সরকার জনসাধারণের ব্যাপক অংশের প্রতিনিধি নয় এবং সরকারের এ লক্ষ্যও নয়।

তার লক্ষ্য হল শহরের মধ্যবিত্ত শিল্পীদের মধ্যে যে কংগ্রেস বিরোধ দেখা যাচ্ছে — দারুণ হতাশার মধ্যে তার যে বৃদ্ধি অনুভব করা যাচ্ছে তাকে রোধ করা। পদবী দিয়ে, চাকুরি দিয়ে, অস্থায়ী সাহায্য দিয়ে তাকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা।

এবং জনসাধারণের উদ্যোগ যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে সব ব্যবস্থা বর্তমান রাখা। নতুবা আজও নাটকের উপর পুলিশি সেন্সার ওঠে না কেন? আজও শহরে অপেশাদার নাট্য, নৃত্য বা সঙ্গীতগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের উপর থেকে প্রমোদকরের ভার ওঠে না কেন? (পেশাদারদের দিতে হয় না।) আজও কেন কলিকাতা শহরে অল্প ভাড়ায় একটি স্টেজও সরকার জোগাড় করে দিতে পারে না? সরকারের অবহেলা সত্ত্বেও জনসাধারণ অবিরত সৃষ্টিমূলক কাজ করে যাচ্ছে। সরকার যদি এতই সংস্কৃতি অনুরাগী তা হলে পূর্বোক্ত বাধা অপসারণে তাঁরা দেরি করছেন কেন? বাংলা দেশে এই তিনটি বাধা দূর করলে জনসাধারণের উদ্যোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে, এবং সৃষ্টিমূলক কাজ আরো বেড়ে যাবে। সরকার কি একথা জানেন না? খুবই জানেন। বিধান বাবুর সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতারা সে সব কথা খুবই জানেন। কিন্তু তাঁরা তা চান না কারণ জনসাধারণের উদ্যোগ তাঁদেরকে গদিচ্যুত করবে একথা তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন। তাই তাঁরা আপাতত "কুৎসিতকে সুন্দর করার" কালচারাল স্কোয়াড গঠনে মনোযোগ দিয়েছেন।

*শারদীয়া ত্রিপুরার কথা*

১৯৫৩

# বামফ্রন্ট সরকার ও লোক সংস্কৃতি চর্চার নূতন গতিমুখ

সুধী প্রধান

১৯৭৯ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে এবং সরকারি ও বে-সরকারি ব্যক্তিগণের সাহায্যে পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যে কাজগুলি শুরু করা হয়েছে তা যদি যুক্তিসঙ্গত পথে অগ্রসর হয়, তাহলে কেবল পশ্চিমবাংলাতে নয় — সারা ভারতে লোকসংস্কৃতি চর্চার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর সূচনা করবে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে — যেখানে এখনো যন্ত্রসভ্যতাতে যে ব্যবস্থা আধুনিক সংস্কৃতির মাধ্যমগুলিকে জনপ্রিয় করতে পারে তা মোটেই সহজলভ্য নয়। ভারতের প্রধান শহরগুলিতেই বিদ্যুতের ঘাটতি এবং প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। সুতরাং বেতার, সিনেমা, টি.ভি., সংবাদপত্র, সাহিত্য প্রভৃতি আধুনিক মাধ্যমগুলি ভারতের বিরাট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের পক্ষে অনধিগম্য। এই অবস্থায় অন্যান্য সকল রাজ্যের মতো পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ মানুষও নিজেদের জীবনধারণের অন্যান্য ব্যবস্থার অপ্রতুলতার মধ্যেও যুগ যুগান্তর ধরে যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করে অন্যান্য জীবের তুলনায় এখনো যে সে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা বজায় রেখেছে — তার যথার্থ মূল্যায়ন আধুনিক শহরের শিক্ষিত মানুষরা প্রায় ভুলতে বসেছিল। আমরা আগে মনে করতাম যে, তারা ক্ষেতে খামারে, বনে জঙ্গলে অকাতর পরিশ্রম করে আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ও বিলাসের দ্রব্যাদি নির্মাণ করে নিজেরা বঞ্চিত রয়েছে, তাদের জন্য বড়োজোর সহানুভূতি প্রকাশ করা যেতে পারে, তখন তারা 'লাঙল যার জমি তার' আওয়াজ তুলে আমাদের সুখনিদ্রা ভেঙে দিল। আমরা তখন তাদের মনের খবর নেবার চেষ্টা শুরু করলাম।

আমাদের কৃষি সমাজের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় তপশিলি আদিবাসী, তপশিলি এবং অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা যথেষ্ট। তাই বর্তমানকালে কেবল জমি নয় — নিজ নিজ ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবীও এই সকল শ্রেণী থেকে উঠছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যখন গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থায় এবং গোটা গ্রামীণ সমাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু করেন, তখন সঙ্গতভাবেই গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তার কর্তব্য স্থির করা জরুরি হয়ে পড়ে।

লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ অনেকদিন থেকেই আমাদের চিন্তাশীল মানুষেরা করে আসছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন গান সংগ্রহ করতে থাকেন গত শতাব্দীতে — তখন তাঁদের মনে হয়েছিল স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন — অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল্যবান সৃষ্টিগুলির সংগ্রহের প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্তের এই কাজ স্বভাবত সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সীমাকে একেবারে আধুনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত করে দিলেন। তিনি কেবল সংগ্রহ নয়, সংরক্ষণ ও চর্চার কাজে নিজের চেনা-অচেনা সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন এমন নয় — তিনি নিজের সংগৃহীত লোকসংস্কৃতিগুলির গ্রামসমাজের পক্ষে উপযোগিতার গুরুত্বও বুঝিয়ে বলতে লাগলেন ' শিক্ষিত সমাজ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির যে সকল তথ্য লোকসংস্কৃতি থেকে সংগ্রহ করতে পারবে — তা ছাড়াও যে গ্রামজীবনের পক্ষে তাদের ফসল ফলানো, ফসল কাটা, আহার-বিহার, বিশ্রামের সঙ্গে এই সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ছড়া ও কবিগান থেকে শুরু করে তিনি গগন হরকরা ও লালনফকিরকে বাংলার শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থিত করলেন — তখন শিক্ষিত সমাজের কিছু অংশ লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিশীল দিকগুলির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, 'হারামণি' খ্যাত মোঃ মনসুর উদ্দিন, জসীম উদ্দিন প্রভৃতির সংগ্রহ ও আলোচনা বাংলা সংস্কৃতিতে মূল্যবান সংযোজন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হল। ডিগ্রির আশায় শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আকৃষ্ট হল।

শিক্ষিত সমাজে যখন এই অবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিতে কিছু কিছু উৎসাহী ছাত্র এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হচ্ছেন — তখন ভারতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে যারা ভবিষ্যৎ ভারতে শ্রমিক-কৃষকের উন্নতির সঙ্গে সমগ্র দেশের উন্নতির প্রশ্ন জড়িত বলে গণ্য করে কৃষক জীবনের প্রকাশগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করলেন — তাঁরা দেখতে পেলেন — কৃষি জীবন আর নিস্তব্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ১৩০২ সালে কবিগানের মধ্যেই সাধারণের অবসররঞ্জনের চেষ্টা দেখেছিলেন এমন নয় — তিনি সে যুগের

সংবাদপত্র ও নাট্যশালাগুলিকেও একই পর্যায়ে ফেলেছিলেন — অর্থাৎ এরা সকলেই ক্ষণিক অবসররঞ্জনের চেষ্টায় নষ্টপরমায়ু — এই ছিল তাঁর বিখ্যাত উক্তি।

কিন্তু আমরা দেখলাম কবিগানের ও গম্ভীরা গানের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। তারা জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বক্তব্য যতটুকু নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আপন করতে পেরেছে — তা অবসররঞ্জনের মারফতে প্রচার করছে। অর্থাৎ চেতনার ও শিক্ষার বিস্তার ও রুচির উৎকর্ষসাধনে সংস্কৃতির প্রগতি বলতে যা আমরা আশা করি — তা করছে। ১৯৪৫ সালে গোমানি ও রমেশ শীলের কবিগান, টগর অধিকারীর দোতরা, মালদহের গম্ভীরা, চট্টগ্রামের সামপানের ও সিলেটের গান বলতে গেলে ভোলা ময়রা ও এন্টনি ফিরিঙ্গির যুগাবসান সূচিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চার সঙ্গে লোককলা ও লোকশিল্পীদের উন্নতিবৃদ্ধির প্রশ্নকেও নতুন ধরনের সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপিত করে লোকসংস্কৃতির বিষয়কে সমগ্র ভারতের গ্রামীণ জীবনের উন্নতির সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে এ যাবৎকাল যাঁরা এই বিষয়ে যা কিছু করেছেন — তার সঙ্গে এই ঘটনার পার্থক্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেই তাৎপর্যের প্রধান হল — বিষয়টি নিছক জ্ঞানচর্চা, ইতিহাস চর্চা, নৃতত্ত্বচর্চা বা সমাজচর্চা নয় — আসলে লোকসংস্কৃতির যারা ধারক ও বাহক এবং যাদের জন্য লোকসংস্কৃতি — সেই গ্রামীণ মানুষের উদ্যোগকেই উদ্দীপিত করা। বামফ্রন্ট সরকারের মনোনীত কমিটি তার সাংগঠনিক অপ্রতুলতা নিয়েও কিছু পরিমাণে এই কাজ যে করতে পেরেছে তা যে কোনো জেলা শহরে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী মানুষ বলতে দ্বিধা করবেন না। গ্রামজীবনের যাবতীয় গঠনমূলক কাজে লোকসংস্কৃতির মূল্য নতুন করে যাচাই হয়েছে।

সরকারি কমিটি (যাতে বে-সরকারী উপদেষ্টার সংখ্যাই বেশী) — প্রথমে লোক-সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষক ও কর্মীদের উপদেশ সংগ্রহ করেছে এবং সেই উপদেশবাণীর নির্দেশ নিয়ে জেলাস্তরে সরকারি, আধা-সরকারি এবং বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের দ্বারা লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য ও লোক কারুশিল্পীদের বক্তব্য, তাদের জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান, কলা সৃষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তাঁরা যা কিছু করেছেন, করছেন এবং করতে চান — তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে এবং যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই। এই উক্তি এখনো সর্বৈবভাবে সত্য জেনে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষের স্বকীয় উদ্যোগকে জাগ্রত

করার লক্ষ্য নিয়েই লোকশিল্পীদের ওয়ার্কশপ বা কর্মশিবিরগুলি পরিচালিত করেছে। গবেষক, বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিকর্মী — যাঁরা এখানে কাজ করেছেন তাঁরা নিশ্চয় বলবেন কেবলমাত্র লোকশিল্পীরাই তাঁদের কথা বলেছেন — তাঁরা কেমন করে এই শিল্প রক্ষা করছেন এবং কী করলে এই শিল্পের উন্নতিবৃদ্ধি হতে পারে — তা তাঁরা জানিয়েছেন। কলকাতার আধুনিক শিল্পকর্মীদের মত তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান চাননি। আন্তর্জাতিক মেলায় স্থান পাওয়ার আবেদনপত্র নিয়েও তাঁরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াননি — তাঁরা জানেন, তাঁদের কদর তাঁদের দেশের এমন কি একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যেই হয়তো সীমাবদ্ধ। তবু সেই সীমার মধ্যে তাঁরা যাতে নিশ্চিন্তে লোককলা সৃষ্টি করতে পারেন — তার পরিবেশ তৈরি করার আশা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় — 'মেঘদূতের কবি অলকা পর্যন্ত গিয়াছেন... আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। যদি পারিত তবে তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিত। কল্পনার সংকীর্ণতার দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে পরন্তু সমস্ত জনগণের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।' সমস্ত জনগণের হৃদয় না হলেও বর্তমানে অন্তত গ্রামের অধিকসংখ্যক মানুষের হৃদয়কে তাঁরা যাতে উদ্দীপ্ত করতে পারেন তার পরিবেশসৃষ্টির কাজে তাঁরা সহায়তা চেয়েছেন।

আমাদের শহরে সংস্কৃতির মুখ এখনো পশ্চিমের দিকে। স্কুল-কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই — তাতে আমরা এখনো আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপানের দিকে তাকিয়ে থাকি। কলকাতার নাট্য ও চলচ্চিত্র আন্দোলনের বিষয়বস্তুর বিচার করলে এ সত্য সহজে প্রকাশ পাবে। ব্রেখ্‌টের ভেলা ধরে সকলে পার হতে পারছেন না। তবু এঁরা মোটের উপর সংবর্ধিত, সরব এবং কেউ কেউ আগেকার সরকার ও বাজারি সংবাদপত্রের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বলে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি প্রথমেই তাদের দিকে ফেরাতে সমর্থ হয়েছে। তাতে শহরের অপসংস্কৃতি কতখানি প্রতিরোধ করা গেছে তা এখনো হিসাব করার সময় আসেনি।

অপরপক্ষে যদি বামফ্রন্ট সরকারের বর্গানীতি, পঞ্চায়েত, সমাজ কল্যাণ দপ্তর, আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর, যুবকল্যাণ দপ্তর এবং কৃষি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের কাজে লোকসংস্কৃতির উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনাকে সংগ্রথিত করা যায় — তাহলে লোকসংস্কৃতিতে অকল্পনীয় গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার যারা সর্বাপেক্ষা বেশি অংশ — তাদের অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার কথা বামফ্রন্ট সর্বাগ্রে চিন্তা করলেও তাদের সংস্কৃতির কথা অনেক পরে ভেবেছেন। অবশ্য বিধ্বংসী বন্যা তার একটি কারণ ছিল। কিন্তু কাজ যখন আরম্ভ হয়েছে — তখন তাকে যুক্তিসঙ্গত

পরিণতিতে অগ্রসর করা উচিত। ১৯৮১ সালের কর্ম শিবিরে পরিকল্পনা ছিল — প্রতি জেলায় লোকশিল্পীদের জেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করা — যাতে করে প্রত্যেক জেলার সমস্ত লোকশিল্পীদের নাম ও ঠিকানা জেলাদপ্তরে থাকে। এই তালিকা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হলে — সমগ্র রাজ্যে সকল রকমের লোকশিল্পী সম্পর্কে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে — তেমনি তাদের সম্পর্কে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ বিচার সমুদায়ভাবে করা যাবে। এই তালিকা তাঁদের কাছে থাকলে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শুধু চর্চা করা নয় — সামাজিক, ধর্মনৈতিক উৎসব, পালাপার্বণ, মেলাগুলিতে এই সকল লোকশিল্পীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। গ্রামের প্রত্যেকটি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে লোকশিল্পকলা যেমন সৌন্দর্য ও সুষমা যোগাবে — তেমনি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করবে। আমরা দেখেছি খ্রীশ্চান ছেলে বাউল গান গাইছেন। হিন্দু বাদক মুসলমানদের বিয়ের গানে সঙ্গত করছেন এবং পটের গায়করা কী পরিমাণে হিন্দু আর কী পরিমাণে মুসলমান — তা গবেষণার জিনিষ। আবার, জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক উৎসবে এমন মহিলা কারুশিল্পী পেয়েছি যিনি রবীন্দ্রনাথ কথিত বীরভূমের মহিলা শিল্পীর মতো নিজের সৃষ্ট কারুকার্য বিক্রি করতে চাননি। অর্থাৎ ব্যবসা নয় — সৃষ্টিশীল কাজের দ্বারা নিজের এবং নিজের পারিপার্শ্বিককে সজীব ও সুন্দর করে তোলাতেই তাঁর উৎসাহ।

এইভাবে আমাদের দেশের গ্রামের গরিব মানুষ লোককলার মারফতে ধনতান্ত্রিক সভ্যতাপ্রসূত বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তিসর্বস্বতাবোধ, যৌন সর্বস্বতাবোধকে অস্বীকার করে সুস্থ ও সংগ্রামী জীবনের মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আশা করেন, বামফ্রন্ট সরকারের লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত নীতি নিছক বুদ্ধিচর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রাম সমাজের নব নির্মাণে তাদের ভূমিকা নির্দেশ করবে এবং সেই ভূমিকা পালনে সাহায্য করবে।

*প্রথম রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা, ১৯৮২*

# রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সমীক্ষা উপসমিতির একটি অপ্রকাশিত প্রতিবেদন : ১৯৮১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত লোকসংস্কৃতি পর্ষদের প্রচেষ্টায় ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে লোককলার চারটি বিভাগ নিয়ে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যে সমীক্ষা হল — তার বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক সংস্কৃতি বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে পর্ষদের সুচিন্তিত সুপারিশ থাকা কর্তব্য। কারণ ওয়ার্কশপগুলির পরিচালনার সময় লক্ষ করা গেছে প্রতি জেলার লোকশিল্পী ও সংস্কৃতিবান মানুষ আশা করছেন এই সমীক্ষার মারফৎ লোককলার প্রকৃত অবস্থা জানার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোককলার উন্নতি বৃদ্ধি সম্পর্কে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

লোককলা গ্রামীণ সমাজের সংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগ, কৃষি বিভাগ, পঞ্চায়েত বিভাগ এবং উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মারফত নিশ্চয় অবগত আছেন গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। বর্তমান সমীক্ষার প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে, "ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে শতকরা ৫৪·৭৩ অংশ ভূমিহীন। ৪০·৩৯ শতাংশ বাস্তুহীন। ৩৭·৯৯ শতাংশ নিরক্ষর এবং ৭০·৬৪ শতাংশ ক্ষেতমজুর। চরম দারিদ্র্যে থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে লোকশিল্পের চর্চা করে চলেছেন। সমগ্র পশ্চিম বাংলার সম্পূর্ণ চিত্র বর্তমান সমীক্ষার তথ্যে প্রকাশ না পেলেও সমীক্ষা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত লোকশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক চিত্র সমীক্ষার চিত্রের তুলনায় বেশি পৃথক হবে না।"

সাধারণভাবে এই সংবাদ জানার পর লোককলার যে চারটি বিভাগ নিয়ে কাজ করা হয়েছে — তার প্রত্যেকটিতে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে লোকনৃত্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। লোককলার এই বিভাগটিতে নৃত্যই প্রধান — কিন্তু তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদ্য ও সঙ্গীত এবং কোনো কোনো

ক্ষেত্রে নাটকীয় সংলাপ আছে। ওয়ার্কশপে প্রায় ৩৭ রকমের নৃত্য দেখা গেছে - আর নর্তকদের মধ্যে তপশিলি আদিবাসী, অনুন্নত শ্রেণী ও তপশিলি শ্রেণীর লোক বেশি। কারণ ওয়ার্কশপে সমবেত শিল্পীদের মধ্যে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা শতকরা মাত্র ৬·৪২ শতাংশ, মুসলমান ৪·৯৬ শতাংশ এবং ক্রিশ্চান ·৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ সমবেত লোকশিল্পীদের ৮৭·৮৪ শতাংশ ছিল তপশিলি উপজাতি, অনুন্নত ও তপশিলি শ্রেণীর লোক। বর্তমানে যখন দেশের কোনো কোনো অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে তখন এই সংবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তপশিলি উপজাতির কোনো কোনো অংশ প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাস করে এবং তাদের মধ্যে কিছু মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠিভুক্ত ও অপরাংশ অষ্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত। পশ্চিমবাংলার মূল ভূখণ্ডের পরিশীলিত নাগরিক সংস্কৃতির উর্দ্ধাধ (Vertical Expansion) সম্প্রসারণ এদের মধ্যে সামান্যই হয়েছে এবং রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি এবং শৈব, বৈষ্ণব ও সুফি সংস্কৃতির অনুভূমিক সম্প্রসারণ (Horizontal Expansion) সমতলবাসীদের মধ্যে দেখা গেছে। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদিয়ার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে ছো নাচ, যাত্রা প্রভৃতির অনুশীলন থেকে তা চোখে পড়ে। অপর পক্ষে উত্তরবঙ্গের টোটো, রাভা, মেচ প্রভৃতি নিজস্ব সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ রয়েছে। যারা নিজ নিজ সংস্কৃতির সীমায় নিজেদের সংকুচিত করে রেখেছে এক হিসাবে তারা আমাদের সিনেমা, বেতার ও দূরদর্শনের মারফত যে অবক্ষয়ী সংস্কৃতি প্রচার হয় তার থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছে বটে কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শিকার হয়ে পড়া তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। অথচ আমরা যারা আঞ্চলিক ও জেলা উৎসবগুলিতে এই সকল মানুষের নৃত্য দেখেছি এবং যে ছায়াছবি এই সকল নৃত্যের সরকারি ব্যবস্থায় তৈরি হয়েছে তার দৃষ্টান্তে মনে হয়েছে এই সকল সম্প্রদায়গত এবং আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই নৃত্যগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে উৎপাদনসম্পর্কের একটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া কঠিন নয়। শিকার, ফলসংগ্রহ, ফসল ফলানো ও পৌরাণিক লোক কথার মধ্যে আধুনিক জীবনের সমস্যার আভাস বিভিন্ন নৃত্যে পাওয়া যায়। এই সকল নৃত্যের অধিকাংশই সামাজিক এবং বছরের কোনো কোনো ঋতু ভিত্তিক (Seasonal) অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক প্রয়াস — যা করার জন্য বায়নার অপেক্ষা নেই। সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদির জন্য কোন ওয়ার্কশপে সমবেত কোনো গোষ্ঠিই বেশি ব্যয়ের হিসাব দেয় নি। মুখোস, সাজ-সজ্জা এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির জন্য সামাজিক এবং সামূহিক (Collective) নৃত্যাদির সাজ-সরঞ্জাম বাদ্যযন্ত্র তাঁরা নিজেরাই চাঁদা তুলে সংগ্রহ করেন। কিছু কিছু নৃত্যের ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানসময়ের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। ছো নৃত্য চৈত্র বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয় — কিন্তু ব্যবসায়ের বায়না পাওয়ার

প্রস্তাব থাকলে অন্য সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ কোনো কোনো নৃত্যের নিজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুষ্ঠানভিত্তিক আয় করার লক্ষণ দেখা যাবে। ফলে লগ্নিকারক ব্যক্তির যোগাযোগ এবং পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শিল্পী সংগ্রহ করার প্রথার সূচনা বিশেষ করে লোকনাট্যে বেশি লক্ষণীয়। লোকনৃত্য যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শিকার হতে পারে লোকনাট্য তেমনি বাজারি অর্থনীতির শিকার হতে পারে (Market Economy) এই সকল বিষয় বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে করণীয় হবে সর্বপ্রথমে যেগুলি সামাজিক ও সামূহিক (Collective) নৃত্যকলা সেইগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করা। এদের জন্য আর্থিক ব্যয় নগণ্য — কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট সময়ে তাদের এলাকাস্থ সমাবেশ বা মেলা জাতীয় উৎসবে শিকার উৎসব ফসল বোনা বা রোওয়ার আগে বা ফসল কাটার পরে যে সকল অনুষ্ঠান হয় — সেগুলির সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের নিজস্ব উদ্যোগের পিছনে সরকারি সহযোগিতা যুক্ত করা। সম্প্রদায়গত এই নৃত্যগুলির নাম সাঁওতালি, করম, রেনঝা — দাঁড়শালি, কাটি নাচর, পাতা নাচ, লাগড়ে ওঁ রাও, গমীরা নৃত্য, মেচ, বোড়ো, রাভা, টোটো, লেপচা প্রভৃতি। বিষহরি, মনসামঙ্গল বা ঝাঁপান এখন আর নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আবদ্ধ নয়। অপরপক্ষে পুরুলিয়ার প্রান্তে ঘোড়া নাচ এবং নাচনি ঝুমুর সম্পর্কে পৃথক চিন্তার প্রয়োজন। ঝুমুর যে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নাচনি রূপ পরিগ্রহ করেছিল — বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। কিন্তু তার ফলে একশ্রেণীর নারী লোকশিল্পী বিপদাপন্ন। তা ছাড়া রায়বেঁশে ও নাটুয়া নাচ সম্পর্কেও পৃথক চিন্তা করা দরকার। রায়বেঁশের তুলনায় নাটুয়া নাচে বীভৎসতা আছে — পরিহার না করাতে পারলে তাকে জনপ্রিয় করা উচিত হবে না। অপরপক্ষে রায়বেঁশে স্কুল কলেজের ক্রীড়া বিভাগের অন্তর্গত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বাদ্যযন্ত্রের সহযোগেই এই ধরণের ক্রীড়াকৌশল শিখতে ও প্রদর্শন করতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ বোধ করবে বলে আশা করা যায়। রণপা নৃত্যও এই বিভাগে বিবেচনার যোগ্য।

লোকসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার সমস্যা তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। কিছু কিছু গান, যা সমবেত ভাবে গাওয়া হয়, তার মধ্যে জারি গান ও মুসলমান মেয়েদের বিয়ের গান — একেবারেই মুসলমানের সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ, যদিও প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মের লোকরাও শোনে। মুসলমান মেয়েদের বিয়ের গানের কথা এবং অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবিকাশের বেশ সুযোগ আছে। যার জন্য গ্রামের গোঁড়া মোল্লা মৌলভিরা পছন্দ করে না। তাই এই উদ্যোগকে সতর্কভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে — গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মুসলমান সংগঠকদের সাহায্যে। ঢোল এবং ঘুঙুর এদের পক্ষে যথেষ্ট। মালদার সানঝা গান প্রায় ভাদুগানের সমগোত্র। কুমারী মেয়েদের

দ্বারা গীত হয়। এর মারফতে গ্রামীণ নারীসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বিস্তারের সুযোগ আছে।

টুসুগানকেও এই পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্গত করা চলে। এছাড়া কবি, তরজা, গম্ভীরা গান, কুশান প্রভৃতি দলবদ্ধ হলেও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে অথচ, ছোটো ছোটো দলের উদ্যোগে ঐতিহ্য রক্ষিত হচ্ছে যার বিষয়বস্তুতে গণতান্ত্রিক চেতনাপ্রকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট। অপর পক্ষে ফকিরি, শব্দ গান, পট, বাউল, ভাওয়াইয়া, রামায়ণ গান ও ঝুমুর প্রভৃতি ব্যক্তিমানসের শৈল্পিক প্রকাশের মাধ্যম। এদের বিষয়বস্তুতে পুরাণকথা, আধ্যাত্মিকতা ও বিরহব্যথার প্রকাশ থাকলেও কোনো কোনোটিতে যথা — পট ও ভাওয়াইয়াতে বাস্তব জীবনের সমস্যাও প্রতিফলিত হয়। বৈষ্ণব ও সুফি মতবাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাখার বক্তব্যগুলি নাগরিক সংস্কৃতির সাঁইবাবা বা অনুরূপ গুরুগিরির প্রভাবের তুলনায় গ্রামসমাজে ধনাত্মক (Positive) ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই এদের মধ্যে যারা বিশেষ ভাবে প্রতিভাসম্পন্ন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। জেলায়, মহকুমায় ও ব্লকগুলিতে যে সকল সাংস্কৃতিক উৎসব, মেলা ও অন্যান্য সামাজিক উৎসব হয় — সেখানে তাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে।

লোকনাট্যগুলির সবই ছোটো ছোটো দলের দ্বারা গঠিত এবং প্রায় নির্দিষ্ট এলাকায় তারা সক্রিয়। গম্ভীরামুখোস দল, আলকাপ, মুখা, খন, চোরচুরনী, হালুয়া-হালুয়ানী, আদিবাসী যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা প্রভৃতির অধিকাংশ সরকারি সহায়তার দাবি রাখে। পশ্চিম দিনাজপুরের খন গ্রাম্যসমাজের নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালাচ্ছে। গম্ভীরা মুখোস নৃত্য জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রচারের জন্য বহুবার রাজরোষের শিকার হয়েছে। আদিবাসী যাত্রা একধরনের উর্দ্ধাধ (Vertical) সম্প্রসারণের ফল এবং অবশ্য সমর্থনযোগ্য। চোরচুরনী ও হালুয়া-হালুয়ানী প্রভৃতি কৃষকজীবনের শিল্পসম্মত বাস্তব চিত্র। এগুলির সাজ-পোষাক ও যন্ত্রাদি দেওয়া ছাড়াও এদের নিয়ে মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করলে (যার সঙ্গে উৎসবও থাকবে) এদের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের উন্নতি সম্পর্কে এদের উদ্যোগ বৃদ্ধি করা যাবে। সিনেমা ও শহরে ব্যবসায়িক যাত্রার মাধ্যমে যে অপসংস্কৃতি প্রচারিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এরা শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। পুতুলনাচকে এই পরিকল্পনার অন্তর্গত করা উচিত। ব্যবসায়িক অপসংস্কৃতিমূলক সিনেমা ও যাত্রার প্রভাব থেকে এদের রক্ষা করার জন্য এইগুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

চারুকলা সম্পর্কে ওয়ার্কশপে সংগৃহীত তথ্য যথেষ্ট নয়। আঞ্চলিক ওয়ার্কশপে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কারুশিল্পীর

প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। পুরুলিয়া ও বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই চারুশিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে বাধ্য হয়েছেন। কেবল জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ওয়ার্কশপে প্রকাশিত চারুশিল্প ছিল — নান্দনিক প্রেরণার সৃষ্টি। পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এই লোককলাকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে অগ্রসর করার মতো সময়, সুযোগ এবং আর্থিক অবস্থা না থাকায় — এই শিল্পের কিছু অংশ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। যেগুলির ব্যবসায়িক দিক আছে সেগুলিকে ফড়ের (middleman) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারি সাহায্য দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত এবং যেগুলি বিস্মৃতপ্রায় অথচ ঐশ্বর্যমন্ডিত সেগুলির নমুনা সংগ্রহ ও রক্ষা করা কর্তব্য।

মোটের উপর চারটি লোককলার যেগুলি সামাজিক ও সমবেত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত, সেগুলির পৃষ্টপোষকতার কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করা উচিত। যেগুলি ছোটো ছোটো দল দ্বারা গঠিত, এরা পুরাতন আঙ্গিকে আধুনিক চিন্তা ধারার বাহন। সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতা দ্বিতীয় স্থান দাবি করে এবং একক অনুষ্ঠানগুলির শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা নানাদিকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, গুরু বা শিক্ষকের কাজ করছেন, গ্রামসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রীতি ও সংহতি সাধনে যাদের কলা নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে — তাদেরও সাহায্য করা কর্তব্য। আমার এই সকল বক্তব্যে গুণগত বিচারের যে চেষ্টা আছে পর্ষদের সকলের কাছে তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি — এই সকল বিষয়ে সকল সদস্যের মধ্যে যতটা ঐক্য আনা যায় তার ভিত্তিতে সুপারিশগুলি করা উচিত। যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে গুণগত বিচারের জন্য আর একধরণের ওয়ার্কশপ করা দরকার — যার জন্য আরো দু বছর সময় নিশ্চয় দরকার হতে পারে। অথচ লোকশিল্পীরা ইতিমধ্যে সরকারি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শহরের সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ইতিমধ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। এই সকল বিবেচনা করে দুইধরনের কর্ম পদ্ধতি সুপারিশ করা দরকার। যথা ঃ

(১) লোককলাগুলির গুণগত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা দরকার যা করতে হ'লে বর্তমান পর্ষদের সম্প্রসারণ দরকার। বর্তমান পর্ষদের মেয়াদ ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। সুতরাং গুণগত অবস্থা অনুসন্ধানের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তিদের (যারা সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল) নিয়ে পর্ষদ তৈরি করা উচিত। লোককলার প্রত্যেকটি রূপের সঙ্গে যুক্ত যে সকল ব্যক্তি বয়সের ভারে অশক্ত -

তাদের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে অনুসন্ধান সফল হবে।

(২) গুণগত অনুসন্ধানমূলক ওয়ার্কশপে আগত শিল্পীদের অনুষ্ঠানগুলির দলিলচিত্র এবং টেপ রেকর্ড রাখা দরকার। এগুলি পর্ষদের সংগ্রহশালার জন্য প্রয়োজন।

(৩) লোকনাট্য ও লোকনৃত্যের রঙীন ছবি ১৬ মিলিমিটারে করা উচিত। এগুলি সারা পৃথিবীর দূরদর্শনে প্রদর্শনের জন্য বিক্রি করা যেতে পারে। লোকসঙ্গীতেরও ডিস্ক রেকর্ড করা উচিত। নিছক ব্যবসায়ী উদ্যোগের উপর নির্ভর করলে লোককলার বিকৃতি ত্বরান্বিত হবে।

(৪) এই বছরের জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসব থেকে লোককলার বিভিন্ন বিভাগকে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে সাজ পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সাহায্য দেওয়ার এবং শিক্ষক, গুরু ও প্রতিভাধর শিল্পীদের মাসিক ভাতা দেওয়ার নীতি ঘোষণা করা উচিত।

(৫) কলিকাতা বা জেলা শহরগুলিতে লেখক, শিল্পী ও শিল্পী সংগঠনগুলিকে যে সকল নিয়মে অনুদান দেওয়া হয় তার পরিবর্তে সরকারি প্রশাসনের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত এবং জেলাস্থ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিদের (পর্ষদের সদস্য সমেত) নিয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা মনোনীত শিল্পীদের অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আগেই বলা হয়েছে — শতকরা ৭০ ভাগ লোকশিল্পী নিরক্ষর।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং অতীতে লোককলার উন্নতি বৃদ্ধি সম্পর্কে সামাজিক নেতৃত্বের অবহেলার কথা বিবেচনা করে নিছক প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া দরকার। অন্যান্য স্বায়ত্বশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানের মতো লোকসংস্কৃতি পর্ষদকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার — যা পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ভারতের গ্রামীণ জীবনে আধুনিক যন্ত্রভিত্তিক সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যমগুলির ব্যবহার নির্ভর করবে গ্রামসমাজের মৌলিক পরিবর্তনের উপর। কৃষি ব্যবস্থা এবং তার উপর নির্ভরশীল কৃষক, ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ কারুশিল্পী — যাদের মধ্যে তপশিলি, অনুন্নত ও তপশিলি আদিবাসীরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশি তাদের উন্নতির কাজ আর্থসামাজিক দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে। তাই তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজও সমান্তরাল ভাবে চালানোর জন্য স্থায়ী সংগঠন থাকা দরকার।

*সুধী প্রধান*
২১.১১.৮১

# লোকসংস্কৃতি চর্চায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত লোকসংস্কৃতির রাজ্য-উৎসব উপলক্ষে ১৪-১৫ মার্চ ১৯৮২ তে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার ভিত্তিতে রচিত]

*এক*

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির উন্নতি, বৃদ্ধি ও লোক-সংস্কৃতির একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনকল্পে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এক আদেশবলে ১৯৭৯ সালে লোকসংস্কৃতি পরিষদ গঠন করেন। ১৯৮০ সালে তা 'লোকসংস্কৃতি পর্ষদ'-এ রূপান্তরিত হয়।

এই পর্ষদ তাদের কার্যক্রম নির্ধারণকল্পে প্রায় শতাধিক লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের পরামর্শক্রমে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করেন এবং লোকশিল্প ও শিল্পীদের অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮০ সালে পুরুলিয়া, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে লোকসংস্কৃতির তিনটি আঞ্চলিক উৎসব ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন। ১৯৮১ সালে একই পদ্ধতিতে ১৫ টি জেলায় উৎসব ও ওয়ার্কশপ হয়। এই উৎসব ও ওয়ার্কশপে শিল্পী সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অঞ্চলের সদস্য এবং বহু লোকসংস্কৃতিবিদের সাহায্য নেওয়া হয়। ওযার্কশপে সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদদের সাহায্যে প্রণালীবদ্ধ করা হয়। এই তথাগুলি পাবার পর রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, লোকসংস্কৃতি পর্ষদ এবং তথ্য আধিকারিকদের একটি সভা পর্ষদের

পরামর্শক্রমে ডাকেন। সেই সভার সুপারিশক্রমে 'লোকসংস্কৃতি চর্চায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা' বিষয়ে ১৪ ও ১৫ মার্চ ১৯৮২ তে এক আলোচনাসভার আয়োজন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি রাজ্য উৎসব উপলক্ষে আহবান করা হয়। এই আলোচনাসভার জন্য খসড়া রচনার দায়িত্ব সদস্যসচিব শ্রীমানিকসরকার ও শ্রীসুধী প্রধানের ওপর দেওয়া হয়। তাঁদের রচিত খসড়া প্রতিবেদন আলোচনাসভায় পেশ করা হয়। দুই দিনের এই আলোচনাসভায় মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্য, গবেষক, অধ্যাপক, সংস্কৃতি কর্মী, পর্ষদ সদস্য, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, বিধানসভার সদস্য, লোকশিল্পী, রাজ্যসরকারের বিভিন্ন স্তরের তথ্য আধিকারিক, অনুলেখক প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার প্রায় একশত প্রতিনিধি যোগদান করেন। খসড়া প্রস্তাবের ওপর ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের সংযোজন, সংশোধন ও সুপারিশগুলির ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি রাজ্য সরকারের কাছে বিবেচনা ও রূপায়ণের জন্য উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

## *দুই*

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও তার শিল্পীদের প্রকৃত অবস্থা কি তা জানবার জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮০ এবং ১৯৮১-তে তিনটি বিভাগে এবং ১৫টি জেলায় লোকসংস্কৃতির ওয়ার্কশপ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

লোকসংস্কৃতির চারটি শাখায় লোকনৃত্য-গীত-নাট্য এবং লৌকিক কারুশিল্পে ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালের প্রাপ্ত সম্মিলিত তথ্যে দেখা যায়, যথাক্রমে ১৪৮১, ১১৬০, ৩৫২ এবং ৮৮ জন শিল্পী (৪৮·২৩, ৩৭·৫৭, ১১·৩১ এবং ২·৮৪ শতাংশ) ওয়ার্কশপ ও উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের মোট সংখ্যা ৩০৮১ জন।

মূল জীবিকা কৃষির সঙ্গে ১৭১১ জন যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ক্ষেতমজুর ১২৬৫ (৭০·৬৪), নিজ চাষের কৃষক ৪৩৪ (২৪·২৩), বর্গাদার ১২ (৫·১৩) ছিলেন। কৃষি ভিন্ন জীবিকার জন্য অন্যান্য পেশায় বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক ৩০১ (৩০·০০) অন্যান্য চাকুরি ৭৮ (৭·৫৭), শিক্ষা ৪৮ (৪·৬৬), ব্যবসায়ী ৬৪ (৬·২১), গৃহস্থালী ৫৪ (৫·২৪), কারুশিল্পী ২১২ (২০·৪৮), ছাত্রছাত্রী ১৯৭ (১৯·১৪), বেকার ৬৮ (৬·৬০), মোট ১০৩০ জন শিল্পী ছিলেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৩·৪৮ এবং ৩৬·৫২ শতাংশ শিল্পী মূল পেশা হিসাবে কৃষি এবং কৃষি ভিন্ন অন্যান্য পেশায় যুক্ত আছেন।

লক্ষ্য করা গেছে ২৬৯৪ জন শিল্পীর মধ্যে এক একরের একটু বেশি চাষের জমি আছে এমন শিল্পীর সংখ্যা ১৩৪ (৪·৯৭)। চাষের জমিহীন শিল্পীর সংখ্যা ১৫৭৪ (৬৪·৭৩)।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী লোকশিল্পীদের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, তাঁদের মধ্যেকার শতকরা ৫৪·৭৩ অংশ ভূমিহীন। ৪০·৩৯ অংশ বাস্তুহীন, ৩৭·১৯ অংশ ক্ষেতমজুর। চরম দারিদ্র্যে বাস করা সত্ত্বেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা লোকশিল্পের চর্চা করে চলেছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ চিত্র বর্তমান সমীক্ষায় প্রকাশ না পেলেও বর্তমান সমীক্ষা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র লোকশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক সাধারণ অবস্থা আলোচ্যমান বর্ণনার তুলনায় বিশেষ পৃথক হবে না।

সামাজিক অবস্থানের বিষয়েও লক্ষ করা দরকার যে, সমবেত শিল্পীদের মধ্যে বর্ণ হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬·৪২, মুসলমান ৪·১৪ ও ক্রিশ্চান ·৭৬ — অপরপক্ষে শতকরা ৮৭·৪৮ সংখ্যক শিল্পী এসেছেন আদিবাসী, অনুন্নত ও তফশিলি সম্প্রদায় থেকে।

শিল্পীদের জীবন ও জীবিকার এই নমুনা তথ্যের সামনে দাঁড়িয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই কর্মসূচির অন্যতম 'লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা' নির্ণয়।

**তিন।।** পঞ্চায়েত ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির (সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদ) অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৮ সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, কিন্তু তা কার্যকরী হতে নানা ধরনের বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ ১৯৭৩ সালে নতুন করে পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে নতুন আইনের কাঠামোতে ১৯৭৮ সালের ৪ জুন তিন স্তরের পঞ্চায়েত সংস্থার (গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) প্রত্যক্ষ নির্বাচন রাজনীতিক দলভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাংলায় ২·৫ কোটি ভোটার অসীম উৎসাহে ৩০ হাজার নির্বাচন এলাকায় ৫৬ হাজার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জেলা পরিষদ, ৩২৪ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩২৪২ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। গ্রামপঞ্চায়েত এখন নিম্নতম প্রশাসনিক কাঠামো এবং গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ঃ

পঞ্চায়েতগুলির কর্তব্য প্রধানত তিন শ্রেণীর ঃ ক) আবশ্যিক, খ) ঐচ্ছিক এবং গ) ন্যস্ত। (ক) আইনের বাধ্যতামূলক কার্যাবলী আবশ্যিক, খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং নির্দিষ্ট আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে করণীয় কার্যাবলী ঐচ্ছিক, গ) সরকারি অর্থ সাহায্যে যে সব কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সংস্থায় অর্পিত হচ্ছে তা ন্যস্ত কর্তব্যের অন্তর্গত।

নিজস্ব এলাকায় নিজস্ব অর্থে বা সরকারপ্রদত্ত অর্থে কোনো প্রকল্পকে রূপায়িত করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতিরও আছে। কিন্তু সাধারণত পঞ্চায়েত সমিতি অধিকাংশ প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত করে থাকেন।

জেলা পরিষদেরও জেলার অভ্যন্তরে যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ উভয় সংস্থাকেই সরকার কর্তৃক কোনো প্রকল্প ন্যস্ত হলে তা রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ণের সমস্ত ব্যয়ভার রাজ্য সরকারই বহন করেন।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি ৮টি স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে কাজ করেন। স্থায়ী সমিতিগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি,
২। জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি,
৩। পূর্তকার্য স্থায়ী সমিতি,
৪। কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি,
৫। শিক্ষা স্থায়ী সমিতি,
৬। ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি,
৭। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি,
৮। মৎস্য ও পশুপালন স্থায়ী সমিতি,

**( 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত'— পশ্চিমবঙ্গ সরকার )**

**চার।।** পঞ্চায়েতের গঠনপ্রণালী, কর্তব্য, কাজের পরিধির পূর্ববর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণের পটভূমিতেই লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নির্ধারিত হওয়া দরকার।

(ক) বর্তমান অবস্থায় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির লোকসংস্কৃতির কাজকে মূলতঃ 'ন্যস্ত কর্তব্যের' মধ্যে রাখার সুপারিশ করা হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে 'ঐচ্ছিক কর্তব্যে'র মধ্যেও রাখা যেতে পারে।

(খ) 'শিক্ষা স্থায়ী সমিতি'র কাজের মধ্যে লোকসংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর নামকরণ 'শিক্ষা সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতি' করা যেতে পারে। এই সমিতিতে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক বা মনোনীত প্রতিনিধি এবং লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সদস্যকে যুক্ত করা যেতে পারে।

(গ) 'ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি'র মধ্যে লোকশিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা চলতে পারে। এর নামকরণের মধ্যে 'লোকশিল্প' যুক্ত হতে পারে। ত্রাণ ও জনকল্যাণকর কাজের সময় লোক-সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক-বাহকদেরও প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করা যেতে পারে।

(ঘ) 'উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি'র কাজের পরিধিকে লোক-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে প্রসারিত করা যেতে পারে। লোকসংস্কৃতি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ভূমি সংস্কারের কাজে লোকশিল্পীদেরও আকৃষ্ট করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, যথার্থ ভূমিসংস্কার লোকসংস্কৃতির যথার্থ জাগরণের প্রধানত চাবিকাঠি।

বর্তমান ভূমি সংস্কারের একটি প্রধান দিক খাস জমির বন্টন। চাষের খাস জমির বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন লোকশিল্পীদের দাবি গুরুত্ব পেতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন হয়ে থাকে। এই অগ্রাধিকারের মধ্যে লোকশিল্পীদেরও স্থান হতে পারে।

বাস্তুহীন লোকশিল্পীদের বাস্তভিটের জন্য বা খাস জমি দানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জমির চাহিদা এবং জমির পরিমাণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে গভীর সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। জমির উপর ক্রমবর্ধমান হারে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবু ভূমিহীন, বাস্তুহীন লোকশিল্পীদের ভূমির চাহিদাকে যতটা সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তবে স্মরণ রাখা দরকার, বর্তমান শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে সমাজের অন্যান্য অংশের ন্যায় লোকশিল্পীদের জীবনেও স্থায়ী সুখ, শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না।

পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে লোকসংস্কৃতির কাজে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের নবনিযুক্ত 'ফিল্ড ওয়ার্কার'রা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

(ঙ) অথবা পঞ্চায়েতের উপরি-উক্ত আটটি স্থায়ী সমিতির অতিরিক্ত একটি সুনির্দিষ্টভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী সমিতি গঠনের কথা রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন।

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের লোকনৃত্য-গীত-নাট্য ও বাদ্যের কমপক্ষে একটি করে স্থায়ী আসর বা আখড়া পঞ্চায়েতের উদ্যোগে হতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের লোকনৃত্য-গীত-নাট্য-বাদ্য ও হস্তশিল্পের তালিকা এবং শিল্পীদের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে পারেন। এর জন্য পাকা খাতা খুলতে পারেন।

লোকশিল্পীদের শিল্পকৃতি প্রথমাবস্থায় হাট, বাজার, মেলা ইত্যাদিতে বিপণনের কার্যকরী করার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। শিল্পীরা নিজ উদ্যোগে পেটের দায়ে এটা করে থাকেন। দেশের দায়ে এই উদ্যোগের অংশীদার পঞ্চায়েত হতে পারেন।

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ কাজ পঞ্চায়েত সমিতির স্তরে হতে পারে। তাছাড়া প্রতি বৎসর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ, সমাজশিক্ষা বিভাগ, পঞ্চায়েত সমিতি, সি. এ. ডি এ. এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতিভিত্তিক লোক-সংস্কৃতির উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রতি বৎসর ৩২৪ টি পঞ্চায়েত সমিতিতে লোক-সংস্কৃতির আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলে সাংস্কৃতিক জীবনে বিপুল প্রভাব পড়তে পারে, যা সুস্থ সাংস্কৃতির আন্দোলনকে সহায়তা করতে পারে। এই সহায়তা সামগ্রিক জীবনেও প্রভাবিত করতে পারে।

(জ) প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন কোন লোককলা বিশিষ্ট ও ব্যাপক জনসমাজে আদৃত তা নির্ণয় করে অঞ্চলের পূজা-পার্বণে, ফসল উৎপাদনের আগে ও পরে অবসর সময়ে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রারম্ভে তাদের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যে লোককলাগুলি কসরতের উপর নির্ভরশীল অথবা যেগুলি গুরু ওস্তাদ বা শিক্ষকের কাছ থেকে শিখতে হয় সেগুলিকে গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঐচ্ছিক বিষয় করা সম্ভব কিনা তা বিচার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

(ঝ) গ্রামসমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির কাজে যেগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে সেগুলিকে শিক্ষক ও শিল্পীদের চেতনার মানবৃদ্ধির জন্য তাঁদের নিয়ে মেলা উৎসবের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনাসভা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা যায়। যে সকল লোককলায় কেবল মহিলা শিল্পীরা যুক্ত সেগুলিকে মহিলা আলোচক বা ওয়ার্কশপ পরিচালিকা দিয়ে তাঁদের উন্নতি ও বৃদ্ধির সমস্যাগুলিকে নির্ণয় করা এবং ত্রিস্তরের পঞ্চায়েত ভিত্তিতে সমাধান করার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা উচিত। একথা গুরুত্বপূর্ণ যে, মৌখিক লোক ঐতিহ্য মহিলাদের কাছে মহিলাদের দ্বারাই তুলনামূলকভাবে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত ও প্রবাহিত হয়। কাজেই এই কাজে মহিলাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঞ) লোকনাট্যগুলি শহরেব ব্যবসায়িক থিয়েটার, যাত্রা ও সিনেমার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও অপসংস্কৃতির কুপ্রভাবে পথভ্রষ্ট হওয়ার মুখোমুখি। অঞ্চলের গণতান্ত্রিক গঠনে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য অনুষ্ঠান

ও ওয়ার্কশপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক-এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার লোকসংস্কৃতির বিনিময় করা যেতে পারে।

(ট) প্রতি অঞ্চলে নিজ নিজ লোককলার গুরুত্ব বিবেচনা করে নানাবিধ লোক কলা আঙ্গিকের উন্নতিকল্পে বাদ্যযন্ত্র, সাজসরঞ্জাম লোকচিত্রের উপকরণ ইত্যাদির জন্য, এককালে খ্যাতনামা অথচ বর্তমানে দুঃস্থ লোকশিল্পীদের অনুদান প্রভৃতি দেওয়ার নীতি কার্যকরী করতে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা করা উচিত। যেহেতু অধিকাংশ লোকশিল্পীই নিরক্ষর এবং যাঁরা সাক্ষর তাঁরাও কদাচিৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি ঘোষণার খবর রাখেন সেহেতু জেলাস্তরে তালিকা তৈরি করে রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করা যায়। অনুদানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

(ঠ) ১৯৮১ সালের পরীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, সাজ-সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির জন্য ৪ শত টাকার বেশি অনুদান কম দলই দাবি করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যদি যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করে সতর্কতার সঙ্গে আর্থিক সহায়তার পরিকল্পনা করেন তাহলে সামান্য অর্থেই লোকশিল্পীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(ড) সুস্থ সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশের পটভূমিতে লোকসংস্কৃতির এই দাবি পূরণের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব। এজন্য পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**মুল কথা ঃ** আমাদের দেশে সুস্থ সংস্কৃতির যথার্থ জাগরণের বিস্তৃত পটভূমিতে লোকসংস্কৃতির স্থান আছে। নতুন জীবন, সুন্দর সমাজগঠনের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে একে গণ্য করে তার দায়িত্ব রাজ্যসরকার, পঞ্চায়েত, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন প্রভৃতির গ্রহণ করা দরকার — এটাই একালে প্রত্যাশা।

স্বাঃ

| | |
|---|---|
| সুধী প্রধান | পবিত্র সরকার |
| মুহম্মদ আয়ুব হোসেন | দিলীপ সেনগুপ্ত |
| পুলকেন্দু সিংহ | পল্লব সেনগুপ্ত |
| শিবপদ ভৌমিক | অরুণকুমার রায় |
| ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে | মানিক সরকার |

(১৬.৩.১৯৮২)

# গম্ভীরা গানের পরিচয় গ্রহণ প্রসঙ্গে

## সুধী প্রধান

'জোয়ার' পত্রিকায় গম্ভীরা সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বার করার চেষ্টা খুবই সময়োচিত। লোকনাট্যের এই ফর্মটি ব্রিটিশ যুগ থেকেই যেভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল তা আমার মতে গভীরভাবে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ বা সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে ইংরাজীশিক্ষিত শ্রেণী যে মুক্তি আন্দোলনের পরিকল্পনা করে তাকে বর্তমানযুগের ঐতিহাসিকরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলেন। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা রাজনারায়ণ বসু থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পর্যন্ত কেউই মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজের প্রশাসনে, বিচারব্যবস্থায় যথাক্রমে চাকরি-বাকরি এবং সমান অধিকারের ব্যাপারে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের প্রাধান্য মুসলমান উচ্চশিক্ষিতদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত মুসলীম লীগের ১৯৪০ সালে পাকিস্তান দাবি ও তার পরিণতিতে ভারতবিভাগ আজ ইতিহাসের বিষয়।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই যে মানসিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তার কোনো প্রভাব কি গম্ভীরা গানে প্রকাশ পেয়েছিল? আমার কাছে যে সমস্ত গম্ভীরা গানের নিদর্শন আছে সেগুলির মধ্যে আমি তা খুঁজে পাইনি। অধ্যাপক প্রদ্যোৎ ঘোষের বইতে আছে যে অবিভক্ত মালদা জেলাতেই কেবল গম্ভীরা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদে দু-চারটি শিবপূজা এখনও গম্ভীরা পূজা নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটি কেবলমাত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাবের পরিচয়। প্রদ্যোৎ বলেছেন গম্ভীরা মালদহ জেলাতে একটি জাতীয় উৎসবরূপে গণ্য, অর্থাৎ এটি ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষভাবে মালদার সকল মানুষেরই উৎসব। যাঁরা অংশগ্রহণ করেন না তাঁরা বাধা দেন না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা দর্শক ও শ্রোতা।

গম্ভীরা যদি কখনো সাম্প্রদায়িক চেহারা না নিয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কী — তা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। গম্ভীরা গানের শিব কি করে 'নানা'তে পরিণত হলেন তা

জানতে পারলে ভাল হয়। প্রদ্যোৎ ঘোষ জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসীরা হলেন ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী ভুক্ত। এদের রং পীত নয়, বরং কৃষ্ণবর্ণ। ইনি আরও জানিয়েছেন, ধর্মগত ভাবে এরা মূলতঃ শৈব হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও তন্ত্র — এই চার ধারা অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। প্রদ্যোৎবাবু আরও বলেছেন যে গম্ভীরার শিববন্দনায় শূন্যপুরাণের ধর্ম ঠাকুরের উল্লেখ মেলে। তিনি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মত উল্লেখ করে শূন্যপূজাকে সূর্যের পূজা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। বৌদ্ধ যুগে বেদবহির্ভূত আচার-আচরণ, পূজা ও উৎসব সাধারণ মানুষ করতে সমর্থ হয়েছিল। শঙ্করাচার্য যখন নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধবাদকে তত্ত্বগতভাবে পরাস্ত করেন তখন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, বিশেষ করে পাল রাজত্বে (৭৫০-১১৫০) বৌদ্ধবাদ, হিন্দুবাদের ভালভাবেই মোকাবিলা করছিল। শিল্পকলা ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। নেপাল, তিব্বত, ভুটান, সিকিমে তার পরিচয় আজও পাওয়া য়ায়। কিন্তু মুসলমানরা যখন এল তখন তারা শঙ্করাচার্যের পক্ষভুক্ত হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলাকে ধ্বংস করতে লাগল। কিন্তু কিছু বেঁচে থাকল বাংলার লোকআঙ্গিকের মধ্যে। সূর্যদেবকে সরিয়ে শিব, বিষ্ণু এবং বিভিন্ন নামে দুর্গার প্রতিষ্ঠা এবং তার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক গবেষণার যোগ্য। মুসলিম ধর্মের ধাক্কায়, বিশেষ করে ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুধর্মের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। দেবতার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে কৃষ্ণ এবং রামে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বৈদিক প্রথার যজ্ঞ ও বলির পরিবর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাধান্য ঘটে।

আমরা যদি আরও কিছুদিন পিছিয়ে যাই অর্থাৎ মহীপালের রাজত্বের বিবরণ পড়ি, তাহলে দেখব যে মহীপাল সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত কীর্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান ছিলেন। একই সঙ্গে বারাণসীতে শিব ও দুর্গার মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহন করার পরে কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও মূর্তি সব ধ্বংস হতে থাকেন। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (১০৫৪-৭২ খ্রীঃ) লক্ষ্মীকর্ণ আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। রাঢ়দেশের কোনো কোনো অংশ তাঁর অধিকৃত হলেও তাঁর শাসন বেশিদিন চলেনি। কিন্তু পালরাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পালরাজাদের দুর্বলতার সময়ে কর্ণাটের চালুক্যরাজগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এইসময় আরও অনেকেই বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ও অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। ঐ বংশের দ্বিতীয় মহীপাল পরাস্ত ও নিহত হন কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্যকের দ্বারা।

আমার এই প্রসঙ্গে যাওয়ার কারণ হলো যে মুসলমান আক্রমণের যুগে বৌদ্ধ প্রভাব যে কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট ছিল এবং মুসলমান আক্রমণকারীরা মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধদের ওপর যে অত্যাচার করত তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি এখানে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক লক্ষ্মণসেনের বঙ্গকে সতেরটি অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা দখল করার গল্পের আলোচনা করতে চাইছি না। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে রামপালের রাজধানী রামাবতী সম্পর্কে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ঐতিহাসিকরা মনে করেন রামাবতী মালদহের নিকটে ছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি আমৈর নামে একটি জায়গাকে রামাবতী বলে মনে করেছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে লক্ষ্মণসেন নিজে বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। যদিও বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব তখন বেশ রয়েছে বলেই বখতিয়ার খিলজির সৈন্যরা বৌদ্ধবিহার এবং মুণ্ডিত মস্তকের অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিল যে সংবাদ আমরা মীন্‌হাজুদ্দিনের বই 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে পাই।

প্রাচীন যুগের শিল্পকলার পরিচয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে পাওয়া যায়। রাজশাহীর কাছে পাহাড়পুরে বা মালদহের কাছে জগদ্দলে যেসব প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন আছে তা একইসঙ্গে লোকশিল্প ও অভিজাত শিল্পের পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার পাহাড়পুরের লোকশিল্পের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বেশ বোঝা যায় বৌদ্ধ যুগ থেকে পাল ও সেনযুগ পর্যন্ত শিল্পকলাক্ষেত্রে একইসঙ্গে নতুন ও পুরাতন আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছিল। শিল্পকলার মধ্যে ঐ যুগে বুদ্ধের পরে যাঁকে বেশি পাওয়া গেছে তিনি হলেন বিষ্ণু। তারপরেই শিবের স্থান। সেই তুলনায় সূর্যমূর্তি সংখ্যায় কম। কাজেই আমাদের অনুমান যে বৌদ্ধ নেড়ানেড়ি, যাদের থেকে অনেকেই মুসলমান হয়েছিল তারা অধিকাংশই গ্রামের গরীব মানুষ। তাদের শিল্পকলাতে সেইসব জিনিষই এসেছে যা গ্রামসমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিপোষক হয়। লোকশিল্পের যে দৃষ্টান্ত পাহাড়পুর, ময়নামতী ও মহাস্থান প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায় তার থেকে আমার মনে এইসব প্রশ্ন জেগেছে যে সমাজের ওপরতলায় ধর্মীয় ধ্যানধারণা ইহলৌকিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যতই দ্বন্দ্বমূলক হোক, নিচুতলার মানুষ নিজেদের মত করে তার সমাধান করে এবং সে সমাধান অনেকক্ষেত্রেই বাহ্যতঃ জোড়াতালি দেওয়া মনে হলেও কার্যতঃ তা সারগ্রাহী এবং বাস্তবধর্মী।

*'জোয়ার'*

*বিশেষ গম্ভীরা সংখ্যা, ১৯৯৫*

# লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি

সুধী প্রধান

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা গঠন করেছে। ইতিপূর্বে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালে যে লোক সংস্কৃতি পর্ষদ নামে একটি উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করেছিল, তা এই কেন্দ্র গঠনের আগেই ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত পর্ষদের মনোনীত সদস্যরা সবাই এই নতুন কেন্দ্রের সদস্য মনোনীত হয়েছিল এবং পুরনো পর্ষদের কর্মসূচি অনুযায়ী গত বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের কাজগুলিকে কেন্দ্র সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি তৈরির জন্য সংগঠনে যে নতুন গঠনতন্ত্র এবং তদনুযায়ী জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, তার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পুরনো পর্ষদের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে কতখানি সম্পর্ক এবং নতুন করে কার্যপদ্ধতি স্থির করার প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচ্য বিষয় বলে আমি মনে করি। এই কারণে পূর্বোক্ত লোকসংস্কৃতি পর্ষদের গঠনকালীন অবস্থা ও তার ক্রিয়াকর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা দরকার।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের চলচ্চিত্র বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসাবে আমাকে মনোনীত করা হয়। সেই গ্রুপের কর্মসূচি অনুযায়ী 'বাংলার কবিগান' শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র তুলতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরি এবং বহু লোকশিল্পীর সংস্পর্শে আসি। এই সময় কান্দিতে অবস্থিত লোকায়ত শিল্পী সংসদের সম্পাদক পুলকেন্দু সিংহের সাহায্য নিই। এই তথ্যচিত্র তুলবার সময়ই মনে আসে লোকশিল্পীদের নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে কিছু কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তখন বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকালের সূচনাতেই পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যার পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের উদ্ধার ও পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কর্মীরা যে

কর্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন তার জন্যে বহু লোকের সঙ্গে আমারও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উপর আস্থা জন্মেছিল। লোকসংস্কৃতির আজ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে — তা পঞ্চায়েতের জন্যই হয়েছে বলেই তাদের অধিকতর সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

পঞ্চায়েত সমিতিগুলি মূলত গ্রামজীবনভিত্তিক। লোকসংস্কৃতিও প্রধানত গ্রামের কৃষিজীবনভিত্তিক। কাজেই আমার মনে হয়েছিল যে লোকসংস্কৃতির বিষয়টি পঞ্চায়েত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। তাই আমি ১৯৭৮ সালের ২রা মার্চ তারিখে স্বরাষ্ট্র (কারা) ও পঞ্চায়েত বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে একটি পত্র দিই। সেখানে আমি আমার পরিকল্পনা সংক্ষেপে পেশ করি। শ্রীদেব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পত্রটি তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে পাঠান বলে শুনেছি। কারণ একটি সরকারি কাগজে সেই প্রস্তাবগুলিকে ছাপিয়ে তার একটি কপিও আমাকে দেওয়া হয় যা এখনো আমার কাছে আছে।

১৯৭৯ সালের প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর লোকসংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে, যে পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১৯৭৯ সালের ১৭ই জুলাই এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ব্যক্তিগণ, সুপরিচিত লোকশিল্পী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষকদের কাছে লোকশিল্পের উন্নয়ন কল্পে তাঁদের সুচিন্তিত সুপারিশ প্রার্থনা করা হয়। এই চিঠির প্রায় ৮০ খানা উত্তর পাওয়া যায়। পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রয়াত অরুণ রায় ও আমি উক্ত চিঠিগুলির সুপারিশ সমূহকে বিচার-বিবেচনা করে পর্ষদের কাছে যে রিপোর্ট দিই তাতে পর্ষদ স্থির করে যে রাজ্য সরকারের উচিত হবে নতুন করে অনুসন্ধান করে লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকার অবস্থা জানা এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা এবং সেই বিশ্লেষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে উন্নয়নবিষয়ক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

পর্ষদ ছিল একটি উপদেষ্টামূলক সংগঠন। তার নিজস্ব কোনো কর্মী ছিল না। তার সমস্ত কাজই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা করতে হয়েছে। কাজেই প্রথম কাজ হয়েছিল পর্ষদের তৎকালীন সদস্য সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-আধিকারিক মানিক সরকারকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিভাগ যথা — বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও উত্তরবঙ্গ বিভাগের জেলাগুলির তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে সভা করা এবং তাদেবকে বোঝানো — কিভাবে পর্ষদ লোকশিল্পীদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন সম্পর্কে কাজ করবে। দুর্গাপুর, বহরমপুর ও শিলিগুড়িতে মানিক সরকারকে নিয়ে আমি এই বৈঠকগুলি করি। তারপর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল

ইনষ্টিটিউট-এর অধ্যাপক দেবকুমার বসু ও সুহাস চ্যাটার্জীর সাহায্যে আমরা একটি প্রশ্নমালা তৈরি করি এবং ১৯৮০ সালেই বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও উত্তরবঙ্গ বিভাগে কর্মশালা ও উৎসব করি, যে উৎসবে সর্বসমেত প্রায় ৩০৮১ জন লোকশিল্পীকে সমবেত করা হয়েছিল এবং পূর্বোক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই জেলাভিত্তিক কর্মশালা ও উৎসব সংগঠিত করে একই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে আরও অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়। এই কাজে সরকারি দপ্তরগুলি ছাড়া প্রতিটি জেলা পরিষদের সভাধিপতির সাহায্য সর্বস্তরে পাওয়া গিয়েছিল। এই কাজের মারফতেই আমাদের ধারণা হয় যে, লোকসংস্কৃতির কোনোরূপ উন্নতি করতে হলে তা কেবল পঞ্চায়েত মারফতেই করা সম্ভব। ১৯৮২ সালে কলকাতাতে যে রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব হয় সেই উপলক্ষে পর্ষদের পক্ষ থেকে সদস্য সচিব মানিক সরকার ও আমি একত্রে একটি প্রস্তাব রচনা করি যাতে বলা ছিল কিভাবে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি লোকসংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে সাহায্য করতে পারে। প্রায় শতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তি নিয়ে দুই দিনের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র, কৃষক সভার নেতা আবদুল্লা রসুল, শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং কয়েকটি জেলার সভাধিপতি ছিলেন।

এই আলোচনায় যে সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তিকা 'লোকসংস্কৃতির চর্চায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা' নামে প্রকাশিত হয়। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ—

"বাংলার লোকসংস্কৃতি ও তার শিল্পীদের প্রকৃত অবস্থা কী তা জানবার জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮০ এবং ১৯৮১-তে তিনটি বিভাগে এবং ১৫টি জেলায় লোকসংস্কৃতির ওয়ার্কশপ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

লোকসংস্কৃতির চারটি শাখায় লোকনৃত্য, লোকনাট্য, গীতনাট্য এবং লৌকিক কারুশিল্পে ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালের প্রাপ্ত সম্মিলিত তথ্যে দেখা যায় যথাক্রমে ১৫৮১, ১১৬০, ৬৫২ এবং ৮৮ জন শিল্পী (৫৮·২৩, ৩৭·৫৭, ১১·৩৭ এবং ২·৪ শতাংশ) ওয়ার্কশপ ও উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের মোট সংখ্যা ৩০৮১ জন।

মূল জীবিকা কৃষির সঙ্গে ১৭১১ জন যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ক্ষেতমজুর ১২৬৫ (৭০·৬৪), নিজ চাষের কৃষক ৪৩৪ (২৪·২৩), বর্গাদার ১২ (৫·১৩) ছিলেন। কৃষি ভিন্ন জীবিকার জন্য অন্যান্য পেশায় বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক ৩০১ (৩০·০০) অন্যান্য চাকুরী ৭৮ (৭·৫৭), শিক্ষা ৪৮ (৪·৬৬) ব্যবসায়ী ৬৪ (৬·২১), গৃহস্থালি ৫৪ (৫·২৪), কারুশিল্পী ২১২ (২০·৪৮), ছাত্র-ছাত্রী ১৯৭ (১৯·১৪) বেকার ৬৮ (৬·৬০)

মোট ১০৩০ জনশিল্পী ছিলেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৩·৪৮ এবং ৩৬·৫২ শতাংশ শিল্পী মূল পেশা হিসাবে কৃষি এবং কৃষি ভিন্ন অন্যান্য পেশায় যুক্ত আছেন।

লক্ষ্য করা গেছে ২৬৯৪ জন শিল্পীর মধ্যে এক একরের একটু বেশি চাষের জমি আছে এমন শিল্পীর সংখ্যা ১৩৪ (৪·৯৭)। চাষের জমিহীন শিল্পীর সংখ্যা ১৫৭৪ (৬৫·৭৯)।

ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণকারী লোকশিল্পীদের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যেকার শতকরা ৫৪·৭৩ অংশ ভূমিহীন। ৪০·৩৯ অংশ বাস্তুহীন, ৩৭·১৯ অংশ ক্ষেতমজুর। চরম দারিদ্র্যে বাস করা সত্ত্বেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা লোকশিল্পের চর্চা করে চলেছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ চিত্র বর্তমান সমীক্ষায় প্রকাশ না পেলেও বর্তমানের সমীক্ষা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র লোকশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক সাধারণ অবস্থা আলোচ্যমান বর্ণনার তুলনায় বিশেষ পৃথক হবে না।

সামাজিক অবস্থানের বিষয়েও লক্ষ করা দরকার যে, সমবেত শিল্পীদের মধ্যে বর্ণ হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬·৪২, মুসলমান ৪·১৪ এবং খ্রীষ্টান ·৭৬ — অপর পক্ষে শতকরা ৮৭·৮৪ সংখ্যক শিল্পী এসেছেন আদিবাসী, অনুন্নত ও তফশিলি সম্প্রদায় থেকে।

শিল্পীদের জীবন ও জীবিকার এই নমুনা তথ্যের সামনে দাঁড়িয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই কর্মসূচির অন্যতম লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা' নির্ণয়।"

এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছিল যে পঞ্চায়েতের যে তিন প্রকার কর্তব্য আছে যথা — আবশ্যিক, ঐচ্ছিক এবং ন্যস্ত — এই তিন প্রকার কর্তব্যের মধ্যে ন্যস্ত-কর্তব্যের মধ্যেই লোক-সংস্কৃতিকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি যে আটটি স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে কাজ করে সেইগুলির মধ্যে শিক্ষা স্থায়ী সমিতি, ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি অথবা অতিরিক্ত একটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী সমিতি গঠনের কথা যেন রাজ্য সরকার বিবেচনা করেন। এরপর উক্ত সুপারিশে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কী করতে পারে তারও একটি তালিকা দেওয়া হয়। যথা — একটি করে স্থায়ী আসর বা আখড়া অথবা লোকসংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে ; একটি পাকা খাতা খুলে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লোকনৃত্য, গীত, নাট্য, বাদ্য ও হস্তশিল্পীদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে পারে ; গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রচলিত লোক উৎসব ও মেলাগুলিকে উৎসাহিত করে লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান করা যেতে পারে ; গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ কাজ পঞ্চায়েতের সমিতি স্তরেও হতে পারে ; তাছাড়া প্রতি

বছর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, আদিবাসী জনকল্যাণ বিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ, সমাজ শিক্ষা বিভাগ এবং সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে। এভাবে ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতিতে লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করলে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে এই আশা সেই সুপারিশগুলিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। মহিলা লোকশিল্পীদেরও পৃথকভাবে সাহায্য করার সুপারিশও ছিল -- যার পরিচালনায় মহিলাদের উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রতি অঞ্চলে নিজ নিজ লোককলার গুরুত্ব বিবেচনা করে নানাবিধ লোককলার আঙ্গিকের উন্নতি কল্পে বাদ্যযন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, লোকচিত্রের উপকরণ ইত্যাদির জন্য, এককালে খ্যাতনামা অথচ বর্তমানে দুঃস্থ লোকশিল্পীদের অনুদান প্রভৃতি দেওয়ার নীতি কার্যকরী করতে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা করা উচিত। যেহেতু অধিকাংশ লোক-শিল্পীই নিরক্ষর এবং যাঁরা সাক্ষর তাঁরাও কদাচিৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি ঘোষণার খবর রাখেন না সেহেতু জেলা স্তরে তালিকা তৈরি করে রাজ্য স্তরে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করা যায়। অনুদানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

১৯৮১ সালের সমীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, সাজ-সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির জন্য চারশত টাকার বেশি অনুদান কম দলই দাবি করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যদি যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করে সতর্কতার সঙ্গে আর্থিক সহায়তার পরিকল্পনা করে, তা হলে সামান্য অর্থেই লোকশিল্পীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এইভাবে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে লোকশিল্পীদের সম্পর্ক গভীর হতে পারে।

সুস্থ সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশের পটভূমিতে লোকসংস্কৃতির পূর্বোক্ত দাবি পূরণের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব। এজন্য পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে এই সুপারিশগুলি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকার এই সুপারিশগুলি সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। যদিও জেলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি পর্ষদের মারফতে পঞ্চায়েত স্তরেই পর্ষদ কাজ চালিয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে সমিতিগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার মত দক্ষ কর্মীর অভাব আছে। তখন আমরা পর্ষদের পক্ষ থেকে পাইলট প্রজেক্ট নামে একটি প্রস্তাব দিই, যার বক্তব্য ছিল এই যে — প্রতি জেলার সভাধিপতি সেই জেলার কোনো কোনো পঞ্চায়েত সমিতির যেটি কর্মকুশলতায় দক্ষ বিবেচিত তাদের নির্বাচন

করে পর্যদকে জানান, তাহলে পর্যদের লোক সেই পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়ে কীভাবে লোকসংস্কৃতির কাজ করতে হবে তা দেখিয়ে আসবেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং তদনুযায়ী রাজ্যের ১৫টি জেলার ৪৫টি পঞ্চায়েত সমিতিতে পর্যদ কাজ দেখিয়ে আসে। ইতোমধ্যে রাজ্য সরকার জেলাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে জেলা লোকসংস্কৃতি পর্যদ ভেঙ্গে দিয়ে জেলা সংস্কৃতি পর্যদ গঠন করে এবং একটি আইন করে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির শিক্ষার স্থায়ী সমিতিতে সংস্কৃতি ও খেলাধূলার বিষয়টি যুক্ত করে দেয় যা আমাদের বিবেচনায় লোকসংস্কৃতির উন্নতির পক্ষে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কারণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার জন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিভেদ যে সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয় সকলেই স্বীকার করবেন। শিক্ষিত শ্রেণীর সাহিত্য, নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি বর্তমান যুগে ভারতে তথা বিশ্বে উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। অপরপক্ষে সেই পরিমাণে অবহেলিত হয়েছে কৃষক এবং কৃষিজীবনভিত্তিক সংস্কৃতি যাকে লোকসংস্কৃতি বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই ভারতে একমাত্র সরকার যে এই বিভেদ সম্পর্কে সজাগ থেকে বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা যেমন কৃষক জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করছে তেমনি তার সংস্কৃতিকেও উন্নত করার চেষ্টা করছে। তাই বেশ কিছুদিন লাগবে লোক-সংস্কৃতির জন্য পৃথক এবং বিশেষ ব্যবস্থা বজায় রাখা। যেমন ব্যবস্থা আমরা আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য করছি। যতদিন শিল্পায়নের দ্বারা কৃষি ও অকৃষি অর্থনীতির ভারসাম্য না সৃষ্টি করা যায় — ততদিনই গ্রামোন্নয়নের উপর যেমন বিশেষ জোর দিতে হবে তেমনি লোকসংস্কৃতির উপরেও গুরুত্ব দিতে হবে। মাঝে মাঝে উৎসব করা মানেই উন্নতি করা নয়। যেমন জমির হিসাব নেওয়া হয় তেমনি কোথায় কোথায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক নিজ শক্তিবলে গ্রামের জনসাধারণের সৃষ্টিশীলতার সহায়ক হয়েছে তার তালিকাও প্রস্তুত করা দরকার। সে কাজ শহরের কোনো সমিতি বা প্রতিষ্ঠান করতে পারে না। শহরে থেকে আমরা পেরেছি কিছু কিছু অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিককে সাহায্য করতেঃ— ছৌনাচ, বাউল, গম্ভীরা, কবিগান, পুতুলনাচ, ভাওয়াইয়া, লোকনাট্য প্রভৃতির শিক্ষাশিবির করেছি — সেগুলির উন্নতি বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐ আঙ্গিকগুলির অভিজ্ঞ পুরাতন শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে যে সকল লোকসংস্কৃতির প্রতিভা রয়েছে তাদের সৃষ্টিশীলতাকে সক্রিয় করার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কারণ আমরা এখনো বহু গ্রামীণ শিল্পীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি।

আমরা ১৯৮১ সালে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তা মাত্র ১০টি জেলার তথ্য। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর-এর সংগৃহীত তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।

এই দশটি জেলার তথ্য থেকেই আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে পঁয়ত্রিশ রকমের লোকগীতি আছে। একুশ রকমের লোকনৃত্য আছে। ছয় রকমের লোকনাট্য আছে এবং এগারো রকমের কারুশিল্প আছে, অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি লোকনাট্য লোকগীতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় লোকসংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য ছাড়া তৃণমূল স্তরে কাজ অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কারণেই আমাদের পূর্বোক্ত সুপারিশগুলিতে লোকসংস্কৃতির জন্য যে পৃথক একটি স্থায়ী সমিতির কথা বলা হয়েছিল সেইরূপ একটি স্থায়ী সমিতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে করা যায় কিনা তা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পঞ্চায়েত দপ্তরকে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। এই বিষয়ে প্রতি জেলার সভাধিপতিদেরও সুচিন্তিত মত প্রকাশের প্রয়োজন আছে।

আমাদের বিবেচনায় কাজটা জরুরি — এই কারণে যে, পূর্বতন লোকসংস্কৃতি পর্ষদ ছিল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী। বামফ্রন্ট সরকার কিছু লোককে মনোনীত করে তথ্য দপ্তরের সাহায্যে কাজ চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল প্রতি জেলার সভাধিপতিদের সারা গঠিত কমিটিগুলি। বর্তমানের স্বয়ংশাসিত সংস্থায় সরকার মনোনীত সদস্য ছাড়াও প্রতি জেলাব সভাধিপতি অথবা তার প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত জেনারেল কাউন্সিল হয়েছে। অবশ্য এখানেও বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং অর্থদপ্তর প্রভৃতির আধিকারিকরা আছেন। বামফ্রন্ট সরকার এই সংস্থার কাজ চালাবার জন্যে কিছু অর্থও দিয়েছেন যা ব্যয় করতে হলে প্রতি জেলার সভাধিপতি বা তার প্রতিনিধিদের তরফে সেই জেলার লোকসংস্কৃতির অবস্থার ভিত্তিতে উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আসা প্রয়োজন। প্রস্তাবগুলি সংস্থার জেনারেল কাউন্সিলের দ্বারা গৃহীত হলে তদনুযায়ী ব্যয় মঞ্জুর করাতে হবে। দুঃখের বিষয় গত এক বছরের জেনারেল কাউন্সিলের দুটি সভায় তিন জনের বেশি সভাধিপতি যোগদান করেননি এবং কোন জেলা থেকেই জেলাভিত্তিক লোক-সংস্কৃতির উন্নয়ন বিষয়ক কোনো প্রস্তাবও আসেনি। আমি জানি যে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামসমাজের উন্নতিকল্পে বিরাট কর্মকাণ্ডে যুক্ত। কিন্তু বৈদ্যুতিক যন্ত্রভিত্তিক সংস্কৃতির দ্বারা ব্যবসায়ী চক্র নিছক মুনাফার স্বার্থে যে বিষাক্ত সংস্কৃতির বীজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার প্রতিরোধ করার জন্য লোকসংস্কৃতির সাহায্য না নিলে পঞ্চায়েতভিত্তিক ব্যাপক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মানসিকতা বিঘ্নিত হতে পারে। এই কারণে লোক-সংস্কৃতির কাজকে অবহেলা করা উচিত হবে না।

*উত্তর ২৪ পরগণা লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরক পত্রিকা*
*১৮-১৯ মার্চ, ১৯৯৬*

# পরিশিষ্ট

## পরিশিষ্ট — ১

# দেশপ্রেমিক লোকসংস্কৃতির পতাকা জনসাধারণের হাতে

বিনয় রায়

জনবহুল বউবাজার ষ্ট্রীটে সেদিন সাড়া পড়িয়া গেল। দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত নর-নারীর মুখের অন্ন, পরনের বস্ত্র জোগাইবার জন্য জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতি যুক্ত মিছিল বাহির করিয়াছে। মিছিল তো কলিকাতা শহরে কত বাহির হয়, দেখিয়া শুনিয়া গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনকার মিছিল আবার যেন নূতন করিয়া মরা গাঙ্গে জোয়ার আনিল। মিছিলের সাথে ছিল গান - "শোন ওরে ও শহরবাসী, শোন ক্ষুধিতের হাহাকার" — "চাইরে অর্থ, চাইরে বস্ত্র, চাইরে অন্নজল" — মুকুন্দদাসের প্রাণস্পর্শী সুরে এ গান শুনিয়া কি কেউ স্থির থাকিতে পারে? দোকানদার, পথচারী, ট্রামবাস- যাত্রী, বাড়ীর মেয়েরা এমন কি ইংরেজ সৈন্য পর্যন্ত আগাইয়া আসিল — আনি, দুআনি, টাকা, চাল, ডাল, জামা, যার যা সামর্থ অকাতরে দান করিল। অনেকে মিছিলের সাথে সাথে গান করিতে করিতে চলিল, গানের কাগজ চাহিয়া নিয়া গেল। সারা মধ্য কলিকাতার লোকের মুখে মুখে এই গানের মধ্য দিয়া এক নূতন ধরণের দেশপ্রেমিক উৎসাহের সঞ্চার হইল। — "দেশবাসী না এগিয়ে এলে দেশ বাঁচানো বিষম ভার।"

ডিক্সন লেনে ছেলেমেয়েদের লঙ্গরখানা। কিছুদিন আগেও এরা হাসিতে জানিত না, ক্ষুধার তাড়নায় দিশাহারা হইয়া কাঁদিত। আজ তাহারা খাওয়ার পর পরম উৎসাহে গান করে—

"মোরা ছেলে মেয়ে, আসি নেয়ে ধুয়ে
রোজ ক্যান্টিনে যাই, গরম খিচুড়ী খাই।"

এমনিভাবে, একদিকে যখন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষুকে পরিণত হইতেছে, দীর্ঘদিনের অনাহারে পথে-ঘাটে শিয়াল কুকুরের মত পড়িয়া মরিতেছে, ক্ষুধাতুরা উন্মাদিনী মা ছেলেকে মাটিতে পুতিয়া বা জলে ভাসাইয়া সকল জ্বালার অবসান করিতে চাহিতেছে, এতবড় সঙ্কটের মুখে

দেশবাসী হতাশ ও বিহ্বল হইয়া, দুয়ারের শত্রু জাপানকে পর্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছে; তখন লোকের হতাশা দূর করিয়া আশার আলো দেখাইতে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর দেশবাসীর মুখের আহার পরণের কাপড় জুটাইবার জন্য মজুর, চাষী নির্বিশেষে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের সুপ্ত দেশভক্তি জাগাইয়া তুলিতে এক নূতন ধরণের নাচ, গান, নাটক ও ছবির আন্দোলন এই দেশেরই মাটিতে দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে।

হুগলীর কৃষক কমরেড দুলাল রায়, তাঁর এলাকার নাম করা কীর্তনীয়া ও কবি, আবার কৃষক সমিতির একজন সমঝদার কর্মী। তিনি বুঝিয়াছেন দেশের লোকের অতি প্রিয় কীর্তনের মধ্য দিয়া ফসল বাড়াইবার কথা বলিলে তা লক্ষ লক্ষ কৃষককে অনুপ্রাণিত করিবে। তাই তিনি নূতন কীর্তন বাঁধিয়াছেন—

"ওরে চাষী ভাই!
তোর আশার জো লেগেছে আজ ফসল
বাড়ানো চাই"

জাপানের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া তিনি রাশিয়ার নজীর দেখাইয়া দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন —

"আজি রাশিয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে সকলে
সাজিছে রণে
সারা দুনিয়ার মুক্তি আনিতে সকলে সাজিছে রণে।"

নূতন রূপে কীর্তন আজ হুগলীর হাজার হাজার চাষী ভাইকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে ফসল বাড়াইতে। "মধুর" "নিমাই সন্ন্যাসের" পাশেই তাহারা কমরেড দুলালের কীর্তনকে স্থান দিয়াছে।

মৈমনসিংহে জারি ও গাজীর পট গ্রাম অঞ্চলের অতি প্রিয় নাচগান। জারিগানে একজন মূল গায়েন থাকেন আর সকলে গোল হইয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া দোহারকী করে। পট গানে ছবি দেখাইয়া গানের মধ্য দিয়া ছবির বিষয় বুঝানো হয়। মৈমনসিংহের গ্রাম্য কবি ও কৃষক কর্মী নিবারণ পণ্ডিত এই জারি ও পটগানের ছন্দে চাষীকে ডাক দিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইয়াছেন।

"গেলে হাটবাজারে
গেলে হাট বাজারে, ঘুরে ঘুরে. জিনিষ পাওয়া দায়
চাল মিলে তো ডাল মিলে না প্রায় সব জাগায়।"

*(পট)*

"হারে ও কৃষক ভাই,
চল সবে মিলে জোট বান্ধিয়ে সবারে জানাই
নইলে তো আর বাঁচবার উপায় নাই।"

*(জারি)*

"দেশে জাগবে জনগণ কংগ্রেস লীগ মিলন হইবে
রে এবার"

*(জারি)*

তাঁহার ডাক চাষীরা শুনিয়াছেন, হাজারে হাজারে এই গানগুলির ছাপানো বই বিক্রী হইয়াছে, হাটেগঞ্জে সর্বত্র এই গান আজকাল লোকমুখে ফেরে -- সারা বাংলায় এই গানগুলি ছড়াইয়াছে। ভারত জোড়া নিবারণ পণ্ডিতের নাম।

দেশ জুড়িয়া বিভিন্ন জেলা হইতে আজ এইরূপ কবি, গায়ক, নাট্যকার ইত্যাদি বাহির হইয়া আসিয়াছেন জনসাধারণ ও দেশকর্মীদের মধ্য হইতে। জনসাধারণের পরিচিত বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন, কবিগান, জারি, পট ইত্যাদি লোকশিল্পের মধ্য দিয়া তাঁহারা শুনাইতেছেন আশা ও উৎসাহের কথা, হতাশ ও বিহ্বল জনগণের মনে জাগাইতেছেন আত্মবিশ্বাস, লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া গানগুলি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছিতেছে, তাহাদের দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মৃতপ্রায় লোকশিল্প নবজীবন ফিরিয়া পাইতেছে।

উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া পাঁইত্যালী গান, রাখাল ছেলের, কৃষক-যুবকের, নৌকার মাঝির নিত্যসঙ্গী। মুখে মুখে বানাইয়া তাহারা গলা ছাড়িয়া গান ধরে— " ও আমার সোনার বঁধুয়ারে"। কৃষক সমিতির কর্মীরা উৎসাহের সাথে ভার নিয়াছেন নিত্য নূতন প্রয়োজনে নূতন নূতন ভাওয়াইয়া, পাঁইত্যালী গান রচনা ও চালু করিবার।

বেহুলা, লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী লইয়া 'পদ্মপুরাণ' পালা গান শুনিতে হাজার হাজার লোক আসে। রংপুরের কৃষক কর্মী পূর্ণ এরূপ একটি দলের অধিকারী — তিনি ভার নিয়াছেন, কৃষক জীবন ও খাদ্য ফসল বাড়ানোর উপর নূতন পদ্মপুরাণ বাঁধিবেন ও বিভিন্ন জায়গায় 'গান দিবেন।'

হুগলীর কবি ও দেশকর্মী দয়াল কুমারের রচিত কায়ুর শহীদের উপর প্রাণস্পর্শী পাঁচালী ক্ষুদিরাম কানাইলালের কথা মনে করাইয়া দেয়। এ পাঁচালী শুনিয়া হুগলীর হাজার হাজার লোক চোখের জল ফেলিয়াছেন, অধিবাসীর মনের কালি ধুইয়া গিয়াছে।

ঢাকার জনপ্রিয় বেদে-বেদেনীর নাচ গান, সর্দার বাউীর গান, বৈরাগীদের প্রভাতী গান, ছাদ পেটানো গান ইত্যাদি আজ উৎপাদন বাড়ানো, খাদ্য-সমস্যা সমাধান, দেশরক্ষা, প্রভাতফেরীর রূপ লইয়া নূতনভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার লোকে এই গানগুলি করিতেছে।

ফরিদপুরের 'নীল' গান, মালদহের 'গম্ভীরা' গান নূতন রূপে হাজার হাজার লোককে দেশপ্রেমের কথা শুনাইতেছে।

এই নূতন নাচ, গানের আন্দোলনের ঢেউ নাচ-গান পাগল সাঁওতালদের মধ্যেও ঢুকিয়াছে। রংপুর জেলায় তাহারা তাহাদের 'দঙ্গ' 'রিএঝেং' ইত্যাদি নাচগানের মধ্যে নূতন দেশপ্রেমিক রূপ দিয়া বিভিন্ন নাচগানের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই তাহারা সমস্ত সাঁওতালকে জাপানী চর, ইতালীর পাদরীদের প্রচারের বিরুদ্ধে এক করিবে, দেশ-বাঁচানোর সৈনিক হইবে।

শ্রমিকেরাও বসিয়া নাই। তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়াছেন চটকল শ্রমিক বিপদ। মুখে মুখে বানাইয়া কবিগান করিতে তাঁহার জুড়ি নাই। চটকল শ্রমিকদেব বস্তি, কারখানা, সভা সমিতিতে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনাইতেছেন —

"মেরে চটকলকে ভিতর
ক্যা ক্যা হোতা হ্যায় দিনভর—"

চটকল শ্রমিকদের তিনি শুনাইতেছেন কারখানার বে-বন্দোবস্তির কথা, ইউনিয়নের কথা, অধিক মাল উৎপাদন করিয়া দেশকে বাঁচানোর কথা। তাহাদেরই সহকর্মী বিপদের গুণপনায় চটকল শ্রমিক গর্ব অনুভব করে। বিপদ তাহাদের অতি প্রিয় ঘরোয়া কবি।

'ট্রাম শ্রমিক' ও ইউনিয়নের নেতা দশরথলাল ও চতুর আলী নূতন দেশপ্রেমের তুফান তুলিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদের অতি প্রিয় 'কাজরী' গানের মধ্য দিয়া —

"লাল ঝণ্ডা তুঝ সে কহ্‌তা হ্যায় পুকার
ভাইয়া মজদুরো
দেশকে রক্ষা করো সভি হ্‌রবার ভাইয়া
মজদুরোঁ।

অথবা-

"অইলে ক্রান্তিকে সমনওয়া, কামোয়া
ভটকে করবই না"

ঢোলক, খঞ্জনীর সাথে উৎপাদন বাড়ানোর এই গানগুলি সমস্ত মনোহরণ করিয়াছে, হাজারে হাজারে তাঁহারা হাততালি দিয়া এই দেশপ্রেমিক গানগুলি করেন দশরথ চতুর আলীর সাথে।

'কাওয়ালী' ঢং এ হাওড়ায়, শ্রমিক কবি আলী হুসেনের উৎপাদন বাড়ানোর গান এক নূতন দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছে—

"খতরেমে হমারা গুলসন হ্যায়,
শিরপর জাপানী দুষ্মন হ্যায়
কুরবানে বতন, তন-মন-ধন হ্যায়,
হম পৈদাবার বঢ়ায়েঙ্গে।"

এ গান শুনিয়া নেহাৎ পিছিয়ে-পড়া শ্রমিকও উৎপাদন বাড়ানোর দেশপ্রেমিকতায় অভিভূত হয়।

উৎপাদন বাড়াইয়া দেশরক্ষার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আদর্শ হইল সোভিয়েট ও তাহার লাল ফৌজ। সমঝদার শ্রমিক মহম্মদ এরসাদ তাই 'কাজরী' ঢংয়ে লালফৌজকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন—

ষ্ট্যালিনগ্রাড কী কাহানী, সব কো ইয়াদ হ্যায় জো বাণী
খানা মিলে না হরগিজ পানী, দেশকী রক্ষা করনা থা।
মিশালে ইষ্টালিনগ্রাড, করেঙ্গে দুশমন কো বরবাদ
ইসিসে হোঙ্গে হম আজাদ, হম ইয়ে ওয়াদা
করতে হ্যায়।

করপোরেশন শ্রমিকরা কলিকাতাকে চালু রাখিবার প্রতিজ্ঞা নিয়াছে। ঝাড়ু, বুরুশ নিয়া নাচগানের মধ্য দিয়ে তাহারা সমস্ত শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, বিভিন্ন এলাকায় তাহারা এইরূপ নাচগানের দল গড়িয়া তুলিতেছে।

শুধু গানই নয় মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক কর্মী গুরুদাস পাল উৎপাদনের উপর নাটক লিখিয়াছেন এবং স্থানীয় শ্রমিকরাই এই নাটক করিয়াছেন। ফলে এলাকায় সমস্ত শ্রমিক আজ ইউনিয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর নীতি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়াছেন।

এমনি করিয়া চৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ, ডি.এল. রায়, রজনী সেনের সোনার বাংলার বুকে আবার নূতন এক সংস্কৃতির স্পন্দন জাগিয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন জেলার বহুমুখী লোকশিল্প আশার আলোকে আসিয়া আবার জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। শ্রমিক কৃষক, সাধারণ দেশকর্মীদের মধ্য হইতে বিভিন্ন ধরণের নূতন নূতন শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বাহির হইতেছে। লোকশিল্পের বিরাট বৈচিত্র ও তাহার সহিত সবল দেশপ্রেমের নূতন জোয়ার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শিল্পী ও সাহিত্যিককেও নাড়া দিয়াছে। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন সাধারণ গ্রাম্য জীবনের হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়া নাটক, কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকেরা শ্রমিক সম্মেলনে সেই নাটক করিতেছে, বাংলার শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা জেলায় জেলায় ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গড়িয়া, জনসাধারণের উপযোগী গান, নাটক, ছবি ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেছেন। নিজেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকশিল্পের বিভিন্ন রূপ, জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও নানা সমস্যার সাহিত পরিচিত হইতেছেন।

আজিকার গণসংস্কৃতি আন্দোলন এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ভিত্তি স্থাপন করিতেছে।

*"জনযুদ্ধ"*

*৬ই অক্টোবর, ১৯৪৩*

প রি শি ষ্ট — ২

# মন্ডল আবার সংসার পাতিবে

## দুঃস্থ বাঙ্গালীর জীবন কথা

### সরোজ মুখার্জী

আষাঢ়ের বর্ষা। লোকটি জলে ভিজিয়া জড়সড়। গাত্রাচ্ছাদন বলিতে একটা শতছিন্ন কাপড়। দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম — ওইখানে গিয়ে গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াওগেনা। একেবারে গ্রামের লোক, কলিকাতায় বোধ হয় এই প্রথম আসিয়াছে। তাই পিচঢালা রাস্তার কোনে সে বসিয়া ভিজিতে পাইতেছে সেইটাই তার কাছে সৌভাগ্য মনে হইতেছিল। বসার জায়গা পাইলে যে মাথা ও শরীর জলের ঝাপটা থেকে বাঁচান যায় না — সে বুদ্ধিটুকুও নাই। লোকটির গতর পেটানো চেহারা - কিন্তু বলিষ্ঠতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধাইলাম ব্যাপার কি। তখন কলিকাতার রাস্তায় বিনা কাজে বহু লোককে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা যায়, সেও তাদেরই একজন। অন্নাভাবে এখানে আসিয়াছে। সে সেরাজ মন্ডল। তার দুইটি ভাই ও দুইটা ছেলেমেয়ে আর এক রাস্তার এক কোণে আছে বলিল — রাস্তার নাম জানে না। তার স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছে। মুসলমানের মেয়ে গ্রামের পর্দ্দা টর্দ্দা ছাড়িয়া এখন কলিকাতার শহরে, সে গিয়াছে পাঁচ হাজারের একদল মেয়ের সঙ্গে লাট-কাউন্সিলে, তারা সব চালের অভাবের কথা জানাইবার জন্য মন্ত্রীদের ও বড় বাবুদের কাছে দৌড়িয়াছে।

তখন সবেমাত্র হক - মন্ত্রীসভার পালা শেষ হইয়াছে। চালের দর বাঁধার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া তাঁরা সিংহাসন হইতে বিদায় লইয়াছেন। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় লোকজন সভাসমিতি ও মিছিলের সোরগোল, সেখান থেকে আওয়াজ উঠিতেছে — "এ মন্ত্রীত্ব ভাল কি সে মন্ত্রীত্ব ভাল তা নিয়ে গবেষণা নয়, দেশের কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের দিকে তাকিয়ে সবাই একত্রে দাঁড়াও। জনরক্ষা সমিতিতে আশ্রয় নাও। মিলিত শক্তিতে দাঁড়িয়ে বুভুক্ষুদের মুখে ভাত তুলে দিতে হবে। আজ দলাদলি একেবারে ছাড়তে হবে।"

নূতন মন্ত্রীরা শ্রাবণে ঘোষণা করিয়াছেন — '৭০/৮০ লাখ মন চাল পাওয়া গিয়াছে, ১৫ টাকা দরে কন্ট্রোল দোকানের মারফত এই চাল বিক্রী করা হইবে —। আরো মজুত বাহির করা হইবে, খয়রাতী হিসাবে রাঁধা ভাত অথবা চালও দেওয়া হইবে।'

ঐ লোকটীকে বলিলাম লঙ্গরখানায় যাও, খিঁচুড়ী পাবে। কাছাকাছি একটা ঠিকানা বলিয়া বুঝাইয়া দিলাম।

কলিকাতার বুকে কঙ্কালসার নর নারী শিশু জন্তু জানোয়ারের মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তারা সব যেন রাস্তা ঘাট চিনিয়া ফেলিয়াছে। বাঁধান ফুটপাত, গাড়ী ঘোড়া, বিজলী, কাপড়-জুতা-জামার চক্ষুমনোরম দোকানপাতি সব কিছুই ইহারা দেখিয়া লইল। কলিকাতার সভ্যতার সঙ্গে গ্রামের এই সরল ও সেকেলে লোকগুলি যেন খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না।

এরা বাংলার শ্রেষ্ঠ নগরী দেখিয়া ধন্য হইল সত্য। কিন্তু এই মহাতীর্থ দর্শনের জন্য তাহাদের অনেক খরচ করিতে হইয়াছে। বাপপিতামহর ভিটা ছাড়িতে হইয়াছে, পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মা-ছেলের স্নেহের ডোর খুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে, ঘর বাঁধিয়া দল বাঁধিয়া গ্রামে বসবাস করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে — বহুদিনের এই অভ্যাস যেন আজ এদের শেষ হইয়া গেল। সংসার করার চিরপরিচিত রাস্তাগুলি সব যেন হঠাৎ প্রবল বন্যার জলে ডুবিয়া গেল। সরল মানুষ কুলকিনারা না পাইয়া জলে ভাসিতে সুরু করিয়াছে।

ভাদ্রমাসেও লোকে ভাবিতে শিখে নাই যে দেশে এত বড় দুর্য্যোগ আসিয়াছে। সোমনাথ লাহিড়ী বলিলেন — "সুধী একবার সারা কলকাতাটা ঘুরে বাঙ্গালার মানুষের দুর্দ্দশাটা ছেঁকে তুলে আন তো যদি জনযুদ্ধের পাতায় বাংলাদেশকে এঁকে দেখান যায় তবে হয়তো অবস্থার গুরুত্বটা লোকে একটু বুঝবে। বাঁচবার পথটাও হয়তো বেরিয়ে আসবে তাদের কাছে।" ১৮ই ভাদ্র সারা কলিকাতা ঘোরা হইল। সুধী প্রধান খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমার পরিচিত সেই সেরাজ মন্ডল আর তার স্ত্রী ফাতিমার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। লঙ্গর খানার খিঁচুড়ী তার ছেলেমেয়ের সয় নাই। শিশু দুইটি আজ সেরাজের দুই চোখে খালি দুই ফোঁটা জল! ভাইটি মিলিটারীর কুলী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সেরাজ তার কি জানে? কিন্তু ইহারা দুইজনে বেশ একটী গলির কোণে বসবাসের জায়গা করিয়া লইয়াছে।

তিন চার মাস এইরূপই চলিল। চালের দোকানে চাল নাই — পিছন দিকে চাল আছে, দর কিন্তু আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে। নূতন মন্ত্রীরা ভাদ্রের প্রথমদিকে চালের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন — কিন্তু সব চাল ভেল্কীবাজীর মতো মুনাফাখোরদের চোরগুদামে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সরকার কন্ট্রোল দোকানে চাল সরবরাহ করিতে পারিতেছে না।

সেরাজ মন্ডলের প্রাণের ভিতরটা যেন কেমন করিতেছে। গ্রামের বন্ধন স্মৃতিপথে প্রায়ই ধাক্কা দিয়া যায়। অগ্রহায়ন-পৌষ মাস। ধান চাল নিশ্চয় সেখানেই পাওয়া যাইবে — আর গ্রামের লোকজন তো তাকে চিনে প্রথমে দিনকয়েক নিশ্চয়ই ধার দিবে। ফাতিমার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই। স্বামীর সহিত থাকিয়া দুঃখে সুখে ভাগী হইবার চির ইচ্ছা তাহার মন হইতে শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাহাকে বুঝান গেল না। সেরাজ ঠিক করিল — সে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া একটা ব্যবস্থা করিবে, তার পর ঠিক এই জায়গায় আসিয়া একদিন তার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে।

পৌষ মাস আজও পড়ে নাই। ঢাকা জেলার মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নে একটা মিটিং করিতে গিয়াছি। সেখানে গিয়া দেখি — বসন্ত, কলেরা আর ম্যালেরিয়া। আমাদের কর্মীরা কেবল মরা লোক টানিয়া টানিয়া নদীতে ফেলিতেছেন। আর একটা ছোট চালাঘরে হাসপাতাল খুলিয়াছে। কর্মীদের খাইবার ঘুমাইবার সময় নাই। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটা বাড়ীতে দিনরাত খিঁচুড়ী পাক হইতেছে। গ্রামের

মধ্যখানে ডাক্তার-কবিরাজদের সারা দিন ধরিয়া রোগী দেখিতে হয়। নদীর ধারে পাহারা দিয়া চোরা-নৌকায় বোঝাই-করা ধান-চাল ধরিতে হয়। গ্রামের উত্তর কোনে চালাঘরে বাঁশের চৌকী বানাইয়া হাসপাতাল করা হইয়াছে, দিনরাত ৮ জন রোগীর সেবা পথ্যের জোগাড় ও চার চারটী শিশুর তত্ত্বাবধান করিতে হয়। বারোয়ারীতলায় খাদ্য কমিটীর দোকানে চিনি চাল মাপিতে হয়। এত কাজ তাদের করিতে হয়।

মিটিং শুরু। ময়দানে লোকে লোকারণ্য, জ্ঞানবাবু জোর গলায় বুঝাইতেছেন — "নতুন ধান এক কণাও মজুতদারদের দিও না, আন্দোলন করে সরকারকে বলো — ৫ কোটী মন ধান কিনতে হবে, শহরে গ্রামে সব জায়গায় কন্ট্রোল দামে চাল ধান, চিনি, কেরোসীন সরবরাহ করতেই হবে। কুইনাইনের জন্য খুব দরখাস্ত চালাও। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ খাদ্য কমিটি গড়। আমাদের দেশ আমাদের ভাই, আমরাই তাদের বাঁচাব।"

খাদ্য কমিটির কাজ চালাইবার জন্য গ্রামের ২ জন টাকা-পয়সাওয়ালা লোক হাজার দুই টাকা দিয়াছিলেন। কমিটির হাতে টাকা আসায় ধান-চাল কেনা হইয়াছিল, হাসপাতালে কিছু ঔষধও আনা হইল। কিন্তু এতেও কিছু হয় নাই।

মিটিং সারিয়া উপেন দাসের বাড়ীতে খাইতে যাইতেছি। একটি লোক পিছন হইতে আসিয়া একটি খামে ভরা চিঠি দিল — "বাবু পড়ে দিন তো।" সেরাজ মন্ডল নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম — তাহাকে ডাকিয়াছে এক রিলিফ হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তাহার স্ত্রীর নাকি জঘন্য এক অসুখ, মরিবে কি বাঁচিবে তা জানা নাই। ডাক্তারটি তাদেরই গ্রামের লোক, তাই এত পরিশ্রম করিয়া তাহাকে খবর দিয়াছে।

ভাবিলাম এত দিন পরে ফাতিমা কেন আত্মপরিচয় দিল। সমাজের ঘৃণিত লোকগুলির এতটুকু শক্তি নাই যে, তার নারীত্বের মর্য্যাদা একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারে। বহুবার সে নারীত্বের অপমান সহিয়াছে তবু স্বামীর প্রতি টানটুকু বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিয়া জাগিতেছিল। সমাজের এই ঘোর বিপর্য্যয়ে স্বামী-স্ত্রীর অমর বন্ধন শিথিল হইলেও এখনও ছিড়িয়া যায় নাই। মানুষের অন্তরের গভীর কোণে সংসার, স্বামী-স্ত্রী বাপ-ছেলে এসবের গৌরবময় আসন এতখানিই দৃঢ় মূল। মনুষ্যত্বের যাহারা অবমাননা করে, তাদের শক্তি আপাতদৃষ্টিতে অজেয় মনে হইলেও ভিতরে ঘুনধরা। স্বাভাবিক মৃত্যু ইহারই ; জীবন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অসীম শক্তি রাখে।

তারপর ৮/৯ মাস যে কি করিয়া দিন গুজরান হইয়াছে তাহা সে রাজ মন্ডলের চেয়ে আমি ভাল করিয়া বলিতে পারি না। বিক্রমপুরের বশলদি গ্রামে যাইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতে আসিলে আপনারা নিঁখুত ছবি পাইবেন। বরাবর সে কেদার রায়ের জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। আজ কেদারের নিজের জমিতে কোন স্বত্বই নাই। যিনি একটিও টাকা না দিয়া কাগজের লেখায় একটু অদলবদল করিয়া কেদারের জমি হস্তগত করিয়াছেন, তিনি তাঁর এত জমিতে চাষ করাইবার লোক পান নাই। এই সেদিন কৃষক সমিতির লোকেরা দল বাঁধিয়া জমির চাষ উঠাইল। এমন ফসল ফলিয়াছে সেরাজ শুধুই ভাবে এত ধান কার কার গোলায় উঠিবে।

এদিকে ছোট ভাইটি আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেশ বাবুগিরি চাল-চলন শিখিয়াছে। কিছু টাকা ও ম্যালেরিয়া সঙ্গে আনিয়াছে। তারই টাকায় কিছুদিন কন্ট্রোলের চাল কিনিয়া খাওয়া হইয়াছে।

সেরাজের মনে নিজ বাসভূমে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবার ক্ষীণ আশা বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই এতদিন পরে ফাতিমার কথা মাঝে মাঝে বেশ আঘাত দেয়। সে জানে না ফাতিমা এখনো সেই হাসপাতালেই চিকিৎসা করাইতেছে কিনা। গ্রামের পাশে যে মেয়েদের কাজ করার ও রোগ চিকিৎসার একটি আটচালা ঘর হইয়াছে, সেইখানেই ফাতিমাকে আনিবার জন্য তদ্বির তদারক করিতে তাহার বড় ইচ্ছা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলিলেন — "এ সব কারবার গ্রাম থেকে উঠে যাচ্ছে, শহরে একটা এই রকমের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে পাঠাতে পার। তা-ও আবার আমার ওপর হুকুম আছে, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে কাউকে সেখানে পাঠান হবে না। ওসব আশা ছাড়, সেরাজ। যাক্‌গে আর ফাতিমা ফাতিমা করে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আর আমায় বিরক্ত করোনা। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে আমার মনটা বিষিয়ে গেছে। আমি নিজেই ভাল কুইনাইন জোগাড় করতে পারছি না। আবার তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য ওষুধ চাচ্ছ। ওসব কিছু হবে না যাও।

ফাতিমার আশা তাকে ছাড়িতে হইবে। কাপড়, চিনি, কেরোসীনের যে দাম! সে সব জিনিষ তো এখনো সেরাজ চোখেই দেখিতে পায় না। চাল পাওয়া যায় কিন্তু পয়সা কোথায়? আগে ছোট ভাইটি আর ফাতিমাকে যদি ঘরে বসাইয়া কাজকর্মে লাগাইতে পারে তো তারপর সে — এসব কথা ভাবিতে তার মনে দুঃখ ক্রোধ সব জমাট বাধিতেছে।

বহু মানুষজনের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিয়া নারীত্বের অপমান, লোককে খাইতে না দিয়া লাখ লাখ টাকা মুনাফা — এই সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অধিকার যে সব ঘৃণিত লোক চাহিতেছে — সমাজের খিড়কী দুয়ার দিয়া তারা মুষ্টি ভরিয়া এই অধিকার পাইল। আর সমাজের সদর দরজায় যে ৬২ লক্ষ লোক বাঁচার অধিকার ভিক্ষা করিতেছে তাদের জন্য সারা সমাজ এক হইয়া দাঁড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ এই মহান কাজে লাগাইতে আজও সাহস পায় না।

সেরাজের সংসারটা বেশ ছিল। সে নিজে চাষ আবাদ নিয়ে বছর কাটাইত। ভাইটি তার তাঁতে কাপড় বুনিত। ফাতিমা ছেলে-মেয়ে দুইটিকে মানুষ করিত। কিন্তু কিছুতেই আর তেমন করিয়া গুছাইতে পারিতেছে না। ছেলে-মেয়ের মায়া তো কলিকাতায় কাটাইয়া আসিয়াছে। ভাইটিকে সংসারে বসাইবার ইচ্ছা আছে। ফুড কমিটি আর ইউনিয়ন বোর্ডের বাবুরা বলেন, সরকার তাঁতীদের সূতা তাঁত, জেলেদের নৌকা প্রভৃতি দেবার নিয়ম করে দিয়েছে। কই সেরাজ তার ভাই-এর জন্য তো কিছুই পায় না।

নূতন করিয়া নিজের গ্রামে ঘর গুছাইবার মন লইয়া সেরাজ গাঁয়ে যত মিটিং হয় সবটাতেই যায়। সবারই কাছে যাইয়া, প্রশ্ন করিয়া, উপায় জানিয়া সেরাজ সংসার বসাইতে চায়। মন তার ভাঙ্গিয়া যায় নাই। একদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিল — বাবু আমি সবারই বক্তব্য শুনতে যাই। সবাই-ই তো আমাদের নিয়েই কথা বলেন, তবে সবাই যদি একসঙ্গে এসে আমাদের বলতেন বা সাহায্য করতেন তাহলে আমার খাটুনীটা কমে। একটা মিটিংএ যেয়েই সব বুঝতে পারতাম আর কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেতাম।'

বাংলার সেরাজ মন্ডল একজন নয়। ইহারই মত কোটি কোটি লোক আছে এই দেশে। সবাই বাঁচিতে চায়। ঘর সংসার বাঁধিতে চায়। তাদের এই বাঁচার আকুল আগ্রহ, আমাদের সবাইকে একসঙ্গে — হিন্দু মুসলমান কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট সব এক সঙ্গে — হাত মিলাইয়া দাড়াইবার ডাক দিতেছে।

*জনযুদ্ধ*

*৮ নভেম্বর ১৯৪৪*

পরিশিষ্ট — ৩

# বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নূতন ভবিষ্যতের সূচনা

## ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে প্রতিদিন দশ সহস্র লোকের সমাগম

## সঙ্ঘের নূতন নাম ঃ "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ"

গত ২রা হইতে ৮ মার্চ কলিকাতায় ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রায় সমস্ত জেলা হইতে নির্বাচিত দুই শতাধিক শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া দিল্লী ও বোম্বাই হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। মহম্মদ আলি পার্কের সুসজ্জিত বিরাট সভামন্ডপে ছয় দিন ধরিয়া যে প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রতিদিন দশ সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিল। সভামন্ডপের নামকরণ করা হইয়াছিল 'রবীন্দ্র নগর' এবং তোরণের নামকরণ করা হইয়াছিল 'সোমেন চন্দ স্মৃতি তোরণ'। বাংলার শহর ও গ্রামের সংস্কৃতির এত বড় প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন বাংলাদেশে ইহাই সর্বপ্রথম। সম্মেলন পরিচালনার জন্য সে সভাপতিমন্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহাতে শুধু যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও ডাঃ ধীরেন সেনের মতন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকই উপস্থিত ছিলেন তাহাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পল্লীকবি শেখ গোমহানি ও গ্রাম্য মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য্যও এই সভামন্ডলীতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাংলায় শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি ও গ্রাম্য লোকশিল্পের মধ্যে যে বিচ্ছেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, জনজীবনের মধ্যে সংস্কৃতির মূল প্রসারিত করিয়া এই সম্মেলন এক নূতন ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত অখ্যাত প্রতিভা ছড়াইয়া আছে, সঙ্ঘের কর্মীদের চেষ্টায় তাহাদের কয়েকজনের পরিচয় আমরা এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া লাভ করিয়াছি। রংপুরের অন্ধ দোতারাবাদক টগর অধিকারী, চট্টগ্রামের কবি গায়ক রমেশ শীল, ফণি বড়ুয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ধারা সম্মেলনের নৃত্য, গীত অভিনয় ও চিত্রপ্রদর্শনীর মধ্য দিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তাহাতে নূতন বাংলাকে গড়িয়া তোলার উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হইল।

*শিল্পের উৎস জীবন*

২রা মার্চ লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল হলে 'আমার দেশ' চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া বলেন, শিল্পের উৎস জীবন এবং শিল্পী তাঁহার তুলি ও রঙে

বিচিত্র জীবনেরই রূপদান করিয়া থাকেন। অতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদীন, সতীশ সিং, শৈল চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন আশ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মুরলীধর টালি, মণি রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের অঙ্কিত ছবি এই চিত্র প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ইহা ছাড়া কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও ঢাকার মসলিন শিল্প এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

৩রা মার্চ হইতে মহম্মদ আলি পার্কে মূল সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার সিয়ান ওকেজি, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সাজ্জাদ জাহির, অন্ধ্র প্রাদেশিক গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ডাঃ রাজা রাও, লক্ষ্ণৌ হইতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মণিপুর হইতে ইরাবৎ সিং, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি যে বাণী প্রেরণ করেন, সম্মেলনে তাহা পাঠ করা হয়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া ডাঃ ভূপেন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন। বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক ডাঃ আহম্মদ আলি সম্মেলনে তাঁহার স্বরচিত দুইটি কবিতা পাঠ করেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, আজীবন তিনি সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন। তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও এই সম্মেলনের ডাক তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নদীয়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যও এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান।

সম্মেলনের মূল সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, কুলি মজুরদের অভিশপ্ত জীবনযাত্রাই তাঁহাকে প্রথম সাহিত্যের প্রেরণা দেয়। তাহাদের দুর্গত জীবনের ছবি তিনি তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আজ দেশের সামনে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সংকট দেখা দিয়াছে, সাহিত্যিকদের তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে, সেই নব চেতনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করার জন্য তিনি নবীন সাহিত্যিকদের আহ্বান জানান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে আজ একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক কুৎসিত দলাদলি আরম্ভ করিয়াছে : প্রগতির শক্তিতে তাহারা সন্ত্রস্ত, মানব কল্যাণের তাহারা শত্রু, সাহিত্যের আবর্জ্জনা দিয়া ইহারা নূতন সাহিত্যের প্রাণচঞ্চল গতিকে বার বার রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, মন্বন্তর বাংলা সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। সাহিত্যিক ও শিল্পীর দল দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের বেদনাকে ভাষা দিয়াছেন। আজকের দিনে সাহিত্যিক ও শিল্পীর দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি বলেন 'রচনা করো রচনা করো রচনা করো নবজীবনের গান।' গ্রাম্য কবি শেখ গোমহানি বলেন, গ্রাম আজ শহরবাসীর কাছে উপেক্ষিত, রোগে অন্নাভাবে গ্রাম্যজীবনের মেরুদন্ড আজ ভাঙিয়া যাইতেছে। গ্রামবাসীর দুঃখ বেদনার কথা শহরবাসীদের আজ জানিতে হইবে। এই সম্মেলন গ্রাম ও শহরের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করুক। গ্রাম্য মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধই শিল্পের উৎস।

*সঙ্ঘের নূতন নাম*

বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়াও আজকের দিনে লেখক ও শিল্পীদের কর্তব্য, সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন, রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা, শিশু

সাহিত্য, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন মুখার্জী, হিরণ স্যান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, অশোকবিজয় রাহা, সরোজ দত্ত, নীহার সরকার, সুধী প্রধান, অমল সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করিয়া 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' রাখার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া হীরেন মুখার্জ্জী বলেন দেশের একটি বিশেষ অবস্থায় 'ফ্যাশিস্টবিরোধী' আখ্যা প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন যে দ্বিধা ও সংশয় ছিল, তাহা আমরা নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র নামে আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার নামকরণ করিতেছি।

রবিবার সকালে সম্মেলনমন্ডপে সংস্কৃতিউৎসবের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলা হইতে গ্রাম্য গায়কের দল তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার লোকসঙ্গীত শুনাইলেন। আগরতলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল গায়ক সাহেব আলির গান এবং নির্মল চৌধুরীর ও খালেদের নেতৃত্বে শ্রীহট্টের পল্লীগীতি সকলকে মুগ্ধ করিল। রংপুরের অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারীর অপূর্ব যন্ত্রসঙ্গীত ১০ হাজার শ্রোতাকে যেন যন্ত্রমুগ্ধ করিল, কুমিল্লার অন্ধ বাদক ব্রজেন বিশ্বাসের সুর সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। চট্টগ্রামের গায়কদের একটি গান প্রত্যেকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল — গানটি চিত্তপ্রসাদের লেখা 'মা ভৈনর কাহিনী'। ইহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত গৃহস্থবধূর আত্মবিক্রয়ের হৃদয়বিদায়ক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এ ছাড়াও জলপাইগুড়ি, খুলনা প্রভৃতি জেলার গায়কের দল এই সংস্কৃতি উৎসবে গান করে। এই দিনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বাংলার গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যদের দ্বারা গীত ১৯০৫ সালের পরবর্তী জাতীয় সঙ্গীত। বহু দিন পর এই গানগুলি শুনিয়া বাংলার গৌরবময় অতীত মনে পড়িয়া গেল। ইহার পর কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নব জীবনের' গানে একদিকে আর্ত বাংলার মর্মবেদনার কথা, অন্যদিকে পুনরুজ্জীবনের সংকল্প ঘোষণা অপূর্ব সুরসৃষ্টির মধ্য দিয়া জনতার মনে বলিষ্ঠ প্রেরণা আনিয়া দিল।

*কবির লড়াই*

পরের দিন সন্ধ্যায় সভামন্ডপে কবিগানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়া এবং মুর্শিদাবাদের শেখ গোমহানি ও লম্বোদর চক্রবর্তী কবিগান গাহিলেন। কলিকাতায় এ ধরনের কবিগানের আয়োজন এই প্রথম। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া নাগরিক পরিবেশের মধ্যে গান করিতে এই গ্রাম্য কবিরা কেহই অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু ইঁহাদের দৃঢ় চাতুর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও সপ্রতিভ বাক্‌নৈপুণ্য দেখিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত হাজার হাজার জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া থাকিল।

ইহার পরদিন বিজন ভট্টচার্য্যের বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন' অভিনয় করিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা, কলিকাতায় এত বিরাট জনতার সামনে ইতিপূর্বে আর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।

শেষ দুই দিন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াড সম্মেলন মন্ডপে ''ভারতের মর্মবাণী' ও অন্যান্য নৃত্যাবলী দেখান।

*"জনযুদ্ধ"*
*১৫ মে ১৯৪৫*

প রি শি ষ্ট — ৪

# সুধী প্রধানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের অংশ ঃ ১৯৮৮

**প্রঃ আপনি ১৯৪৫ সালের গোড়ায় চট্টগ্রামে রমেশ শীলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কেন?**

**উঃ** কেন গেলাম — ওই সুভাষ (মুখোপাধ্যায়) এসে বললে সুভাষ বললে যে — রমেশ শীলের ওপর ওর একটা প্রবন্ধও আছে। সেটা পড়ে আমার খুব ধারণা হল যে — যোশি বলল যে .......... যোশিও তো চট্টগ্রামে গেছিল — বিয়ে করার পরে — যোশি বললে, আমি তো শুনেছি সব slogan mongering! তা আমি সে জন্যে ভাবলাম যে দেখে আসি ব্যাপারটা কী — সুভাষ এত সুন্দর লিখেছে ওর সম্পর্কে। আমি চট্টগ্রামে গিয়ে একেবারে ওর বাড়িতে চলে গেলাম। রমেশের বাড়িতে গিয়ে আমি হারমোনিয়াম ধরে নিজে আমাদের ওই নবজীবনের গানের কয়েকটা, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি যে সব গান আমরা গাইতাম সেইসব শোনালাম ওকে। সেদিন সন্ধেবেলা — ভবানীবাবুও সেই সময়ে গেছিলেন — একটা যাকে বলে party র general meeting ছিল। বহু লোক এসেছিল, একেবারে বোঝাই, হল বোঝাই। সেই হলে হয়তো ......... জনযুদ্ধ খুলে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। সে meeting এর date ফেট সব দেখিয়ে দেব। সেই হলে সেদিনকে ওরা কবিগান গাইল, সেদিন সেই গান শুনে চট্টগ্রামের party leader-রা আমাকে একেবারে বললে, মশাই করেছেন কী! আমি — কেন? বলে, আজকে ও অসাধারণ গান গাইল। আমি বললাম, আমি কিছু করি নি। আমি শুধু লোকটার imagination টাকে stir করে দিয়ে এসেছি, এবং actually সে ওস্তাদ লোক, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছে যে কিসে আমার কি ভাবে জিনিসটা place করতে হবে। এবং তারপরেই ওর জন্যই আমি চিঠি চিন্মোহন সেহানবিশকে লিখলাম, যে আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা জানান। আমি ওদের কথা দিয়ে যাই তাহলে। সে জানালে যে হ্যাঁ। এবং তারপর ওখান থেকে ফিরেছি ওটা বোধ হয় January তেই। '45 এর January তে শীতকালে গেছিলাম। আমার মনে আছে।

প্রঃ তাহলে মানে সেই সময়ে যোশির বক্তব্য ঐ Slogan mongering আপনি মানতে পারেন নি।

উঃ না।

প্রঃ এবং মানতে পারেননি বলেই '45 সালে মহম্মদ আলি পার্কে এ যে সম্মেলনটা হয় তাতে আপনি লোকশিল্পীদের আনার ব্যাপারে উদ্যোগটা নিয়েছিলেন? যোশিকে আসল ব্যাপারটা দেখানোর জন্য?

উঃ হ্যাঁ ওটা দেখানোর জন্য।

প্রঃ যে যোশি যা বলেছেন সেটা ঠিক না?

উঃ হ্যাঁ। এবং ওই গান শোনার পর কবিগানে যোশি এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন — Joshi was present. তিনশো টাকা করে Central কমিটির পক্ষ থেকে announce করেছে। এর আগে তার ঐ ধারণাই ছিল না। সেই meeting সারা রাত্রি ধরে বুড়ো বুড়ি সব শুনছে। মণি বিশ্বাসের বাবা বুড়ো, সে বসে আছে। ডাঃ মণি বিশ্বাস। বহু লোক। তখনকার দিনে তো সেই তখনও সেই black out টাউট ওঠে নি, তা সে যোশি তারপরে খুব converted হলেন এবং যার জন্য দ্যাখো ওই চিঠিটা আমি ছাপিয়েছি।

অনুলেখক : মালিনী ভট্টাচার্য

# গুমানি দেওয়ানের একটি চিঠি

১৮।১।৭৩

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

[illegible]

[illegible] ভা

গুমানী দেওয়ান-



To
Sri Sudhi Pradhan
P. 738. A. Block. P.
New Alipur
Calcutta 53

জিন দীঘি
পোঃ তাঁতি বিড়ল
মুর্শিদাবাদ
১৮.১.৭৫

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। বহুদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে কি যেন হারানো কথা প্রানের লুকান ব্যথা উঠ্‌ল জেগে আমারই অন্তরে। আপনাকে, শ্রদ্ধেয় জোসি সাহেবকে গৌরী ভট্টাচার্য্য কে কাহাকেও জীবনে ভূলিতে পারিনি, আপনারা অবিস্মরনীয়। আজ কাল লেখারই সময় এসেছে অন্তত আমার কিছু আগে হতেই উচিত ছিল, তা হয়নি চারিদিকে শুধু লেখা আর তথ্য সংগ্রহের যেন একটা হিড়িক পড়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে আমার অবস্থা রাজনীতিক জটিল সমস্যার আবর্তে হাবু ডাবু খাচ্ছে, আমি চিন্তিত ও বিব্রত যে হতভাগ্য স্বাধীন দেশে, লেখক, সাহিত্যিক, কবি শিল্পীর সমাদর নাই সে দেশের মেরুদন্ড একদিকে দুর্বল সাক্ষাতে বলব, বর্তমানে আমি খঞ্জ ও অসুস্থ, আপনি মুর্শিদাবাদ এলে অবশ্যই একবার আস্‌বেন, সুখী হব ঝরা পাতার মধ্যে শুধু আমিই শুষ্ক অবস্থায় ডালে লেগে আছি, বুকে কতকগুলি কিশলয় অস্ফুট হয়ে আছে, নিদাঘ তপন তাপে দগ্ধ না হয় এই মমতায়।

গুমানী দেওয়ান

লোকশ্রুতিব ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত সুধী প্রধানকে লেখা গুমানী দেওয়ানের একটি চিঠি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

পরিশিষ্ট — ৬

## লোকসংস্কৃতি পরিষদ ১৯৭৯-৮০

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
চেয়ারম্যান, লোকসংস্কৃতি পরিষদ

শ্রী সুধী প্রধান
শ্রী অরুণকুমার রায়
শ্রী রামশঙ্কর চৌধুরী
ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত
শ্রী পুলকেন্দু সিংহ
শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত
ডঃ পবিত্র সরকার
অধ্যাপক মানস মজুমদার
মুহম্মদ আয়ুব হোসেন
শ্রী শিবপদ ভৌমিক
শ্রী নিবারণ পণ্ডিত
শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা
শ্রী পদম লামা
শ্রী বঙ্কিম দত্ত

শ্রী পার্থসারথি চৌধুরী
সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী সুনীলকুমার সেনগুপ্ত
তথ্য অধিকর্তা,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উপসচিব,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী সন্তোষকুমার চক্রবর্তী
সংস্কৃতি অধিকর্তা,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
অবর সম্পাদক,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী মানিক সরকার
সদস্য-সচিব, লোক-সংস্কৃতি পরিষদ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রী খালেদ চৌধুরী

## লোক-সংস্কৃতি পর্ষদ ১৯৮১-৮২

(১) শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
চেয়ারম্যান, লোকসংস্কৃতি পরিষদ

(২) শ্রীসুধী প্রধান
(৩) শ্রী অরুণকুমার রায়
(৪) শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

(৫) ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত

(৬) শ্রীপুলকেন্দু সিংহ

(৭) শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত

(৮) ডঃ পবিত্র সরকার

(৯) অধ্যাপক মানস মজুমদার

(১০) মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

(১১) শ্রী শিবপদ ভৌমিক

(১২) অরুণ চৌধুরী

(১৩) শ্রী পার্থসারথি চৌধুরী
সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

(১৪) শ্রী সুনীলকুমার সেনগুপ্ত
তথ্য অধিকর্তা,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

(১৫) শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী
সংস্কৃতি অধিকর্তা,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

(১৬) শ্রী মানিক সরকার
সদস্য-সচিব, লোক-সংস্কৃতি পরিষদ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

(১৭) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
অবর সম্পাদক,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

উৎস : প্রথম রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা, ১৯৮২

পরিশিষ্ট — ৭

# সুধী প্রধানের গ্রন্থতালিকা

## প্রথম পর্যায়

### অনূদিত গ্রন্থ

১. কমিউনিষ্ট লিগের প্রতি — কার্ল মার্কস — বর্মন পাবলিশিং (১৯৩৯)

২. কৃষি ভারতের নগ্ন রূপ (অবলম্বন : রজনী পাম দত্ত) ঐ (১৯৪১)

৩. ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঐ (১৯৪১)

৪. সোভিয়েটের গল্পসংগ্রহ — ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (১৯৪৩)

৫. জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ — সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ (১৯৪৪)

৬. সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি — লেনিন (১৯৪১)

### মৌলিক গ্রন্থ

১. কয়েকজন লোককবি — ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ (১৯৪৫)
(কবিয়াল জীবনী, ভূমিকা :
তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়

২. শিল্পভারতে প্রতিরোধ — অগ্রণী (১৯৪৬)
(রাজনৈতিক প্রবন্ধ)

## দ্বিতীয় পর্যায়

### সম্পাদিত

১. Nildurpan & Trial of Rev. James Long (1957)

২ The People's Theatre—Roman Rolland (1980)

৩. Marxist Cultural Movement In India
Vol I-National Book Agency (1981)

৪. Marxist Cultural Movement In India
Vol II Navana (1982)

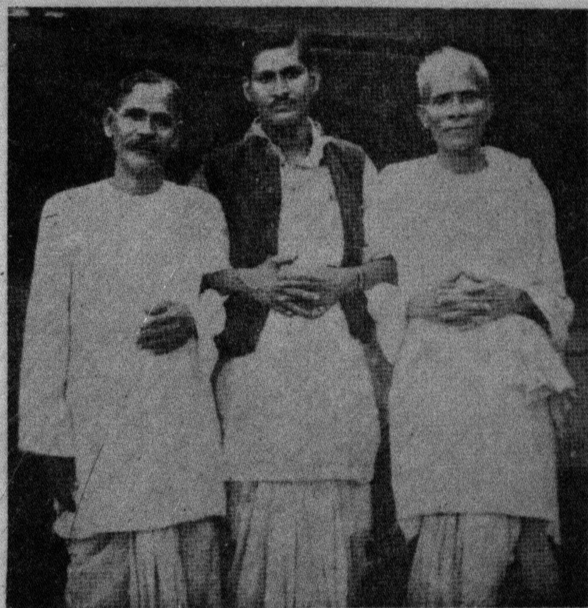
৫. Marxist Cultural Movement In India
Vol III - Pustak Bipani (1985)

৬. Nildurpan or The Indigo Planting Mirror
with Trial of Rev. James Long —
Paschimbanga Natya Academi (1997)

## মৌলিক গ্রন্থ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩. | সংস্কৃতির প্রগতি | পুস্তক বিপণি | (১৯৮২) |
| ৪. | নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব | পুস্তক বিপণি | (১৯৮৯) |
| ৫. | সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ | পুস্তক বিপণি | (১৯৯০) |
| ৬. | গণ-নব-সৎ নাট্যগোষ্ঠী কথা | পুস্তক বিপণি | (১৯৯২) |
| ৭. | কস্মৈ দেবায় হবিষা | সংবাদ | (১৯৯৩) |
| ৮. | বাংলার চিরায়ত নাট্যমঞ্চ | গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন | (১৯৯৬) |
| ৯. | সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি | পুস্তক বিপণি | (১৯৯৭) |
| ১০. | বঙ্গসংস্কৃতি সুভাষচন্দ্র ও তেভাগা সংগ্রাম | প্রিন্টোবুক্‌স | (১৯৯৮) |

(এখনও সুধী প্রধানের অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ অগ্রথিত রয়ে গেছে)



গুমানি দেওয়ান এবং রমেশ শীলের মাঝখানে সুধী প্রধান